অংখ্যা - ১-১২
১৩৭১-১৩৭২

২৩শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

শিক্ষা

অগ্রহায়ণ
১৩৭১

3101
8K 61

শিক্ষা : অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

সূচী

আলোচনা ১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদান ৪
শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

সেকাল ও একাল ৬
শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর স্থান ৮
শ্রীমহাদেব পাণ্ডুই

ভারতের ভাষা সমস্যা ১১
শ্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

[illegible] ১৩

[illegible] ১৮

[illegible]

অনন্তের সুরে

এশিয়া পাবলিশার্স
১৫৮-বি লিণ্টন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৪

মূল্য তিন টাকা মাত্র

নিয়মাবলী

১। শিক্ষা প্রতি বাংলা মাস অগ্রহায়ণ হইতে বাহির হয়। বার্ষিক চাঁদা ৩ টাকা ৫০ নয়া পয়সা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা ৩১ নয়া পয়সা মাত্র। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ।

শিক্ষা ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনার জন্য এ কাগজ নয়।

২। প্রবন্ধাদি 'শিক্ষা' সম্পাদক, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৩। বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পৃষ্ঠা ৩০৲ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ১৮৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা। পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ৩৫৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ২৫৲, সিকি পৃষ্ঠা ১২৲ টাকা।

৪। টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র কার্যাধ্যক্ষ, ১ ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২৩শ বর্ষের (১৩৭১—৭২) প্রবন্ধ সূচী

অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৭৮
শ্রীঅরবিন্দ ও কর্মসাধনা	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	৮৫
অভিক্ষিপ্ত	শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত	৬১
আদর্শ শিক্ষক গোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়	২৩১
আদর্শবাদী শিক্ষক	শ্রী	১০৯
আমাদের ছাত্ররা ও ছাত্রীরা	শ্রীঅরুণ রায়	১৩
আমাদের ছেলেবেলাকার খেলা ও খেলাধূলা	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	১৬৯
আমাদের দৃষ্টিশক্তি	যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	২০১
আলোচনা	১, ২৫, ৫৯, ৮৩, ১০৭, ১৩১, ১৫৫, ১৭৯, ২০৩, ২২৭, ২৫১	
উড়িষ্যার ছাত্রজীবন	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	২০৫, ২৩৪
কি আর কী	শ্রীমনীন্দ্রকুমার ঘোষ	২৫৯
গান্ধী প্রয়াণ দিবসের আত্মচিন্তা	শ্রীকাননগোপাল বাগচী	৮১
গোড়ার গলদ		৭১
গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষক রীতির পড়াইবার অসুবিধা—শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত		২৬১
ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা	শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী	২২৮
ছুটি	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	১৯০
দিনের পর দিন	শ্রী	৮৮
পড়ান ও পড়া	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১১
পরীক্ষা	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৩৮, ৯০, ১১৯, ১৪৬
পরীক্ষা পাসের অন্তরায়	শ্রীপ্রমথভূষণ ভট্টাচার্য	১৬৩
পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করণের সমস্যা	শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত	১৬৫
পাঠ্যক্রম : একটি দার্শনিক সমস্যা	শ্রীকালিদাস বসু	৯৯
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদান	শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	৪
পুস্তক পরিচয়	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন,	২৯০
বিদেশী শব্দের ব্যবহার	শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য	৯৬
বিদ্যালয় পরিদর্শক	শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	২২৪
বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর স্থান	শ্রীমহাদেব পাণ্ডুই	৮
বিদ্যাসাগর ও শিক্ষা	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	২৪৬
ঘুর্ণিয়ামী বিদ্যালয়ে কার্যক্রম	শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য	১৩৪
বয়স্কশিক্ষায় বাক্যক্রমিক পদ্ধতি	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়	১১২
বর্তমান শিক্ষার সংকট	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	২৪০
ভারতের ভাষা সমস্যা	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১১

মহাজ্ঞানী মহাজন	শ্রীমতী প্রতি মুখোপাধ্যায়	৬৭
মহাশিল্পী গান্ধী	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	১৫৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা	শ্রীসবিতারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৩০
রবীন্দ্র তত্ত্বে শিক্ষা	শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য	১৮৮
রবীন্দ্রনাথের বিবিধ কৃতি ও বাঙালীর কর্তব্য	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	১১১
রাজা রামমোহন রায় ও শিক্ষা	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	১৯৫, ১১১
লোকশিক্ষক রামানন্দ	শ্রীকাদাইলাল বসু	১৫৪
শাঁওতালের সহপাঠী	শ্রীসুবারলাল দাশগুপ্ত	১৬, ১২৬, ১৩৭, ১৬০, ১৮২, ২০৯, ২৩৮
সাহিত্যের প্রকৃতি	শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য	৪২
সূর্য মন্দিরের কথা	শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য	২৪৩
সেকাল ও একাল	শ্রীসুবারলাল দাশগুপ্ত	৬
'সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম'	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	২২৯
সংস্কৃতের মর্যাদা	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৪৪
স্কুলবোর্ডের সভাপতি	শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	১৯২
স্নাতকোত্তর ছাত্রজীবনের কথা	শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন	২৫৩
শিক্ষক ও অভিভাবক	শ্রীহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য	৬৩
শিক্ষা ও জীবনের মান	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	৭১৮
শিক্ষা ও ভাষায় হিন্দির স্থান	শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত	১০৪
শিক্ষার লক্ষ্য : জীবন অভিযোজন	শ্রীকালিদাস বসু	২১৬
শিক্ষাব্রতী রাজনারায়ণ বসু	শ্রীদয়াময় ভট্টাচার্য	১০২
শিক্ষাব্রতী রাধাকান্ত দেব	শ্রীদয়াময় ভট্টাচার্য	১২৮
শিক্ষাব্রতী রামনারায়ণ তর্করত্ন	শ্রীদয়াময় ভট্টাচার্য	২২১
শিক্ষায় ছড়ার প্রাধান্য	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	৬১
শিক্ষায় ছড়ার প্রাধান্য (২)	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	৪৫
শিক্ষায় পরিবেশ	শ্রীকালিদাস বসু	৯৫
শিক্ষার লক্ষ্য : ব্যক্তি না সমাজ	শ্রীকালিদাস বসু	৫০০ ১৫৫
শিক্ষাশাস্ত্রী গান্ধীজী	শ্রীকাকাসাহেব কালেলকর	২৭
শিবসোমের সভায়	শ্রীসন্ত বিনোবা	২০৪
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শিক্ষা	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	১৩৯, ১৭৩
হিন্দীভাষার যোগ্যতা	শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার	২৪৫

২৪

শিক্ষা

মহি কল্যাণকৃৎ কান্তিঃ দুর্গন্তিং তাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ | ১ম সংখ্যা

আলোচনা

ওয়ার্ধায় শিক্ষামণ্ডল

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন ওয়ার্ধায় শিক্ষামণ্ডল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। শিক্ষামণ্ডলের পঁচিশ বৎসরের জয়ন্তী উপলক্ষে এই পরিদর্শন। শিক্ষামণ্ডলের আদর্শ কিন্তু সার্বজনীন আদর্শ, সুতরাং রাষ্ট্রপতির মন্তব্য বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য। বিপদ হইতেছে, শিক্ষা বিষয়ে আমাদের এই সমবকার সকল প্রতিষ্ঠানই গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত; এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেই সহযোগিতা ও সেই পার্থক্য কতখানি আছে, তাহা ভাল করিয়া জানা ও দেখা দরকার। পার্থক্য এই জন্যই বলিতেছি যে এই পার্থক্য না থাকিলে এই সব প্রতিষ্ঠানকে এক করার বাধা হইত না। সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আদর্শে না হউক প্রক্রিয়ার পার্থক্য আছে। সেইজন্য সংগঠনগত ঐক্যই চাই।

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন

আগামী ৭, ৮, ৯ই পৌষ তারিখে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন। এবার সমাবর্তনে ভাষণ দিবেন ডঃ কে. এল. শ্রীমালি। ডঃ শ্রীমালি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহার যাহা মত ছিল, এখন তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, একথা অনেকের মনে হইতেছে। প্রাচীন ও আধুনিক উভয় দিকের আকর্ষণ আমরা কাটিয়ে উঠিতে পারিলে বিশ্বভারতীর শিক্ষাকেন্দ্রের আছে। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলালে নেহরুকে আকর্ষণ করিত, ইহার প্রাচীনতার দিক। ডঃ শ্রীমালি কোন দিক রক্ষা করিবেন—সুলভ নবীনের দুর্বার আকর্ষণ না শান্ত সমাহিত প্রাচীনের শাশ্বত বাণী?

নূতন বৎসর

এই সময়টা শিক্ষা জগতের নূতন বৎসর আরম্ভ—অগ্রহায়ণই বলি, বা জানুয়ারীই বলি। শুধু বলিতে পারি, "নূতন করিয়া আরম্ভ হইল"।

স্মরণে:

অধ্যাপক হাসলেন সাহেব জীবনে চিন্তার আদর্শে ও গবেষণায় জগতের ঐক্য কার্যতঃ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষকে শেষ জীবনে কর্মক্ষেত্র করিয়া [illegible] এবং

শিক্ষা বিষয়ে নিজের আদর্শ হিসাবে সর্বজনের হিত সাধন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার দেহ বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এ. টি. বিড় ইনষ্টিটিউশনের সুপরিচিত প্রবীন ও প্রধান শিক্ষক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশীয়ানা মিশ্রিত ছিল এবং সাংবাদিকতাও তাঁহার মজ্জাগত ছিল। তাঁহাদের আদর্শ বহু লোককে উজ্জীবিত করিয়াছে।

নিউ ইয়র্কের বিদ্যালয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পঠন পাঠন

আগামী বছরে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের সরকার পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যক্রমে ভারত সম্পর্কীয় বিষয় সমূহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে পাঠ্যক্রম নির্ধারণে সাহায্য করার জন্য নিউ ইয়র্ক রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ কয়েক প্রখ্যাত ভারতীয় শিক্ষাব্রতীকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এঁদের একজন হইলেন মিসেস মুজিবেল ওয়াসী। ইনি ছাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং-এর সদস্যা। মিসেস ওয়াসী বর্তমানে নিউ ইয়র্কেই আছেন। আর একজন নয়াদিল্লীর মডার্ণ স্কুলের অধ্যক্ষ এম. এল. কাপুর। ইনি শীঘ্রই নিউ ইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

বর্তমানে দেখা যায় আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করিয়া যে সকল ছাত্রছাত্রী বাহির হইয়া আসে তাহাদের পশ্চিমী দুনিয়ার বাহিরে যে জগৎ রহিয়াছে সেই জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান খুবই ভাসা ভাসা। মার্কিন শিক্ষাব্রতীরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করিয়াই ঐ ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এশিয়া সম্পর্কীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে স্থির করিয়াছেন।

শিক্ষাব্রতীদের এই পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার রূপায়ণে সরকার এবং অনুদানকারী সংস্থা সমূহ সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা পাঠ্যসূচীর সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছেন—ফলে কেবল মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরই নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ভারত এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞানের সীমা প্রসারিত করিতে পারিবে।

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সুতরাং কুলের ছাত্রছাত্রীদের কি কি পড়ান হইবে, জ্ঞানের সীমা কোন বিষয়ে বাড়ানো হইবে, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা হইবে কি না, তাহা রাজ্য সমূহই স্থির করিয়া থাকেন। তবে পশ্চিমী দুনিয়ার বাহিরের জগৎ সম্পর্কে বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিবার বিষয়ে নিউইয়র্ক রাজ্য অগ্রণী হইয়াছে। এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা সেখানে স্বীকৃত হইয়াছে এবং পাঠ্যক্রম সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হইয়াছে। তা ছাড়া ভারত এবং প্রাচ্যখণ্ডের অন্যান্য দেশের জীবন যাত্রার সঙ্গেও শিক্ষকদের পরিচিত করিবার কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ইউ এস অফিস অব এডুকেশনের উদ্যোগেই মিসেস ওয়াসী এবং মিঃ কাপুরের ৭৮ মাস আমেরিকায় থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সংস্থা সমগ্র আমেরিকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের উন্নতি সাধনে ও আধুনিকী করণে সাহায্য করিয়া থাকে। মিসেস ওয়াসী ও মিঃ কাপুর ডাঃ ওয়ার্ড মোরহাউসের সঙ্গে কাজ করিবেন। ডাঃ মোরহাউস নিউইয়র্ক রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত বৈদেশিক অঞ্চল সংক্রান্ত বিষয়ের অনুশীলন সম্পর্কে পরামর্শদাতা।

গত বৎসর শিক্ষাদপ্তরে তিনি যে রিপোর্ট

দিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন ভবিষ্যতে মার্কিন আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিতে ও বিকশিত করিতে হইলে যে দুনিয়ায় আমরা রহিয়াছি সেই দুনিয়া বিশেষ করিয়া প্রতীচ্য জগতের বাহিরের দুনিয়ার জনগণের ও তাহাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ভরুণদের আরও জানিতে হইবে—এ সকল বিষয়ে তাহাদের জ্ঞানের সীমা আরও প্রসারিত করিতে হইবে।

প্রকৃত পক্ষে প্রতীচ্য খণ্ডের বাহিরের দেশসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানানুশীলন সম্বন্ধে আলোচনা বৈঠক ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই হইয়া আসিতেছে। ডাঃ মোরহাউসের এই সুনির্দিষ্ট আহ্বানের পর সমগ্র রাজ্য জুড়িয়া সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে সভা-সমিতি-আলোচনা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ঐ সময়েই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আলোচনা বৈঠক ও গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাশিবিরের ব্যবস্থা করিবার জন্য কলেজসমূহকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়া বিষয়ক বিদ্যানুশীলন সম্পর্কে গ্রীষ্মকালীন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের শিক্ষা-দপ্তর ঐ সম্মেলনে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার হইতে সংগৃহীত ইংরেজি ভাষায় রচিত ভারত সম্পর্কে নানা উপকরণ বিলি বণ্টন করে।

প্রতীচ্য জগতের বাহিরের দেশ সমূহের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য পরিবেশনে ঐ সকল বৈঠক ও সম্মেলন অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে। তবে যাঁহারা এ সকল বিষয়ে বিশেষভাবে জানিতে চাহিয়াছেন, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর তাঁহাদের গত গ্রীষ্মকালে অন্তত্ব মার্কিন শিক্ষা কাউন্সেলর কর্তৃক ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে পরিচালিত শিক্ষা শিবিরেও এজন্য আরোপিত নানা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য উৎসাহ দিয়াছেন, আশ্বাস জানাইয়াছেন।

গত বৎসর ভারতের শিক্ষায়তন সম্পর্কে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে ঐ সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কুড়িজন শিক্ষককে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। এ বছরের শীতকালেও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় আরও একদল শিক্ষককে ভারতীয় জীবনধারা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে ভারতে পাঠাইতেছেন।

ডাঃ মোরহাউস এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে জানিবার তৃষ্ণা যুদ্ধোত্তর যুগে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের মতই, মননশীলতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিরাট হাত কালে সীমিত নয়। প্রতীচ্য জগতের বাহিরের জনগণকে তাহাদের সংস্কৃতির ধারাকে আমাদের জানিতে, বুঝিতে হইবে। সমকালীন দুনিয়ায় তাঁহাদের গুরুত্ব, বিশ্বসভ্যতায় তাঁহাদের মূল্য অবদান এবং আমাদের সমস্যা, সাফল্য, এবং রীতিনীতি উপলব্ধি করিবার পক্ষে যে অন্তর্দৃষ্টি তাহারা আমাদের দিয়াছে তাহাও উপলব্ধি করিতে হইবে।

তখন পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষণ বিষয়েই দৃষ্টি দেওয়া হইত। তবে নিউইয়র্ক রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সমূহ বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই বিষয়টি ছিল সমাজবিদ্যা বিভাগের অন্তর্গত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় পর্যায়ের এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও ও দশম পর্যায়ের পাঠক্রমে এই বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তবে বহু বিদ্যালয়েই ভারত সংক্রান্ত বিষয়ে অনুশীলনের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। নিউইয়র্ক রাজ্যের শিক্ষক ও প্রশাসকবর্গের সঙ্গে মিসেস ওয়াসী ঐ সকল বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের বিদ্যার্থীদের জন্য ভারত বিষয়ক পুস্তক নির্বাচন ও পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। এ বিষয়ে তিনি পরামর্শ দিবেন এবং ভারত বিষয়ক বিদ্যানুশীলনে বিদ্যার্থী ও শিক্ষকবর্গের মধ্যে যাহাতে আগ্রহের সঞ্চার হয় সে দিকেও তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন "এ বিষয়ে আমার কোন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। কারণ এখানে আসিবার পর সকলের মধ্যে ভারত সম্পর্কে যে ঔৎসুক্য ও জানিবার আগ্রহ আমি দেখিয়াছি তাহা আমাকে অবাক করিয়া দিয়াছে। ইহাতে আমার ধারণা হইয়াছে যে এই পরিকল্পনা সফল হইবে।"

———

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদান

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ছয় হইতে এগার বৎসর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা পড়ে। ইতিহাস পড়ানো হয় তৃতীয় শ্রেণী হইতে। তাহারা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী এই দুই শ্রেণীতেই ইতিহাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। সুতরাং যখন তাহাদের বয়স প্রায় আট নয় বৎসর হয় তখন তাহারা ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করে। যিনি ইতিহাস পড়াইবেন তাঁহাকে এই বিষয় পড়াইতে যাইয়া যে সকল অসুবিধা হয় তাহার সম্মুখীন হইতে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রত্যেক ইতিহাস শিক্ষক প্রথমতঃ মনে রাখিবেন যে, তিনি শুধুমাত্র ইতিহাস শিখাইতেছেন না। তাহাদের বয়স ও সামর্থ অনুযায়ী শিশুদের প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়া ইতিহাস বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দান করিবেন। প্রথমতঃ তাহাদের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটিবে, তারপর নিয়মিত ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান দান আরম্ভ করিতে হইবে। ইতিহাস পাঠে শিশুদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করাই ইতিহাস শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। অতীতের ঘটনাবলী নিয়া প্রথমতঃ ইতিহাস পাঠ শুরু হয়। শিশুরা অতীতের বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। যে অতীতের সঙ্গে পরিচয় তাহারা লাভ করে তাহা ঐতিহাসিক যুগের সুদূরের ইতিহাস। আদিম মানবের বিষয় জানিতে শিশুরা কত আগ্রহ প্রকাশ করে। আদিম মানবের জীবন কি প্রকার ছিল তাহার তীব্র অনুভূতি শিশুর কল্পনারাজ্যের উপর সহজেই সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে, তখনকার দিনে জীবন-যাত্রার অনেক কিছু চকমকি পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর নির্ভর করিত। শিশুমনকে এই জিনিষটির বিষয়ে জ্ঞান দান করিতে হইবে। এই ভাবে কৌতূহল জাগাইয়া শিশুদের ইতিহাস পঠনে আনন্দ ও আগ্রহ জন্মাইতে হইবে। এইভাবে হইবে ইতিহাস শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন। ক্রমে শিক্ষক ছেলেদের নানা দেশ বিদেশের অতীত ইতিহাসের জ্ঞান দিবেন এবং শিশুরা ক্রমে জানিতে শিখিবে পৃথিবীর সকল জাতির ইতিহাস সর্বত্র সমান। সুদূরতম অতীতে দূরতম দেশের মানবের কাহিনীও তাহাদের দেশের মত খুবই সুন্দর। এইভাবে তাহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার বাস্তবিক বনিয়াদ যাহাতে গড়িয়া উঠে সে বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন।

তারপর তাহারা পাঠ আরম্ভ করিবে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের এবং বীরত্বের গল্প। শিশুরা ইহা শুনিতে কত ভালবাসে! শিক্ষক গল্প করিয়া এই সকল পড়াইবেন। 'গল্প বলিতেছি' বলিলে কোন শিশু না আগ্রহ সহকারে চুপ করিয়া শুনে! যদি এই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সেই সময়কার কথা বলা যায় তবে শিশুর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করিবে। শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী উদার, বৃহৎ ও বিস্তৃতিশীল করাই ইতিহাস শিক্ষার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। ইতিহাস পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিবে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে জীবনযাত্রার কত পার্থক্য। বর্তমান কালের মত অতীত কালেও মানুষ বিভিন্ন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিত, শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের বুঝাইয়া দিবেন। শিশুদের কাছে সেই প্রসঙ্গে নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক বস্তুর অবতারণা করিবেন, যেমন খাদ্য, পানীয়, পোষাক পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, আগুন, আলো,

খেলাধূলা প্রভৃতি। এই বিষয়-বস্তুগুলির ধারণা জন্মাইবেন।

সকল দেশে সকল যুগের ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের নিবিড় যোগাযোগ আছে, ইতিহাস ভূগোলের সঙ্গে পারস্পরিক সংযোগ রাখিয়া পড়াইতে হইবে। তাঁহার মনে রাখিতে হইবে অতীত কালের বিষয় ঔৎসুক্য সৃষ্টি করাই তাঁহার কাজ। কারণ শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই শ্রেণীতে যে ইতিহাস পড়ে তাহাতে অতীতের ইতিহাসই বেশী। শিক্ষক শুধু মাত্র গল্প বলিয়া ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করিবেন না, রেখাঙ্কন, উজ্জ্বল রংয়ের চিত্র অঙ্কন, মডেল—অতীতকালের কোন ঘটনা বর্ণনা করিয়া ছাত্রদের উৎসাহ দিবেন। সময় সময় ছেলেদেরও চিত্রাঙ্কণ করিতে, মডেল তৈয়ারী করিতে বলিবেন। ছেলেরা কেবল শুনিল, দেখিল তাহাতে কাজ হইবে না, কতদূর তাহারা শিখিল শিখাটাই হইবে পাঠের মূল উদ্দেশ্য। পাঠদান কালে না চিত্রাঙ্কন, মডেল তৈয়ারীতে জাতি বিদ্বেষের কোন মন্তব্য, বৈদেশিকদের উপহাস করিয়া কৌতুকপূর্ণ গল্প শিক্ষকমহাশয় যেন না করেন। প্রত্যেক জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ ভাব স্থাপন এবং আগ্রহ সৃষ্টি করাই ইতিহাস পাঠের মূল উদ্দেশ্য। ইতিহাস পড়াইবার জন্য শিক্ষকদের বই, ম্যাপ, মডেল, চার্ট ইত্যাদি উপকরণ চাই। শিক্ষক নানাপ্রকার ক্রসাকোশন প্রয়োগ করিতে পারেন, পাঠদান হৃদয়গ্রাহী করিতে স্থানীয় ইমারত দেখিতে ছাত্রদের নিয়া যাইতে পারেন। কোন কোন সময় ইতিহাস পাঠ হইতে ছোট নাটক করিয়া দিয়া শিক্ষক ছেলেদের দ্বারা অভিনয় করাইতে পারেন। কোথাও ঐতিহাসিক কিম্বা দেখাইয়া বিষয়বস্তু বুঝান যাইতে পারে।

শিশু যদি কাজের একখানা রেকর্ড বই রাখে তবে তাহার মূল্য অনেক হয়। শিশু যে সকল স্থান দেখিল, বইয়ে যে সকল বিষয় পড়িল তাহার বৃত্তান্ত এই রেকর্ড বহিতে থাকিবে। ইহাতে তাহার নিজের অঙ্কিত চিত্রও থাকিবে, রেখাঙ্কন, কাগজের ছবি কাটিয়া আঁটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। শিশুদের চতুর্থ শ্রেণীতে লিখিত কাজ বেশী দিতে হইবে। তাহাদের লিখিত কাজ শিক্ষক দেখিবেন। মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশুদের আঁকা প্রাচীন কালের অস্ত্রশস্ত্র, পোষাক পরিচ্ছদ এই সব থাকিবে। যতদূর সম্ভব শিশুদের হাতে এইগুলি সাজাইবার ভার থাকিবে। আগ্রহশীল ছাত্রদের মডেল তৈয়ারীর ভার দেওয়া হইবে। ছাত্রদের পক্ষে ইহা মূল্যবান চেষ্টা। মডেল দ্বারা তাহাদের সৃষ্টি-ইচ্ছা তৃপ্ত হয়। ইতিহাস শিখাইতে সঙ্গীতও সাহায্য করিতে পারে, গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শুনিতে পারে। শিশুরা গান ও নাচের সাহায্যে নিজেরা অভিনয় করিতে পারে। ডি এল রায়ের 'ভারত আমার' গানটি গাহিতে পারে। সুসজ্জিত ঘরে ইতিহাস পড়াইলে শিক্ষকের পড়ানোর উদ্দেশ্যও আরো বেশী সফল হইবে। শিখাইবার ও পড়াইবার জন্য ঐতিহাসিক ছবি ভরা, মডেল ও চার্ট টাঙানো ঘরের প্রয়োজন। যেন শিশুরা দেখিয়া অনেক শিখিতে পারে। প্রথম ইতিহাস পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য ইহা খুব দরকার। শিক্ষার ভিতর স্নেহ ও আদরের বিশেষ স্থান থাকিবে। শিক্ষক সর্বদা প্রফুল্ল চিত্তে, আনন্দিত আননে বিষয়টি পড়াইবেন। শিক্ষাদানে কঠোরতার স্থান থাকিবে না, কারণ শিশু স্নেহ বুঝে, শাসন বুঝে না।

সেকাল ও একাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

(৭)

সাতই মে, ১৯৬১ সাল, বিকেল তিনটে, বাজারের পথ ধরে ষ্টেশনের দিকে চলেছি। চওড়া রাস্তা, দুদিকে ঘেঁষাঘেঁষি পাকা বাড়ী, মুদীর, বশিহারীর, কাপড়ের, লোহালক্কড়ের ও ওষুধের দোকান। পথ নির্জন নয়, অনেক লোক চলাফেরা করছে, হড়মুড় করে ট্রাক আসছে যাচ্ছে। সামনে একটা তেমাথা, সেখানে বাজারের রাস্তা হাজারীবাগ যাবার বড় রাস্তায় এসে মিশেছে। তেমাথায় পৌঁছেছি এমন সময় যাত্রী বোঝাই দু খানা হাজারীবাগের বাস্ পাশ দিয়ে চলে গেল, আর ধানোয়ারের বাস্ এসে থামলো। বাস খালি করে লোক নেমে গেল, দেখতে দেখতে আবার বাস্ ভরে গেল, ছেড়ে দিতে হর্ণ বাজতে লাগলো। তেমাথায় কলরবের অন্ত নাই।

তেমাথা ছেড়ে একটু এগিয়ে যেতেই পথের ধারে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফটক। ফটক আজ ফুল পাতা দিয়ে সুন্দর করে সাজান হয়েছে, ভিতরে বড় আঙিনায় প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে, সেখানে শিক্ষকরা ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছেন, ছেলের দল জটলা করছে। ফটক পার হয়ে আঙিনায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আজ ২৫শে বৈশাখ, স্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব হচ্ছে, এত সাজসজ্জা তারই জন্যে। প্রাচার্য (Principal) আমার হাতে একখানা বিষয়-সূচী দিলেন, দেখলাম শিক্ষক ও ছেলেরা প্রবন্ধ পাঠ, কবিতা পাঠ ও গানবাজনা করবেন এবং রাত্রে রবীন্দ্রনাথের লেখা ডাকঘরের হিন্দী অনুবাদ অভিনয় করবেন।

বিকেল পাঁচটায় অনুষ্ঠান শুরু হবে, আর বেশী দেরী নাই, উদ্যোক্তারা ছুটোছুটি করছেন, যেখানে যেটুকু কাজ বাকি আছে তাড়াতাড়ি তা শেষ করছেন। হাজারীবাগ থেকে অনেক অতিথি আসবেন, অভ্যর্থনা করবার জন্যে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অতিথিদের বহন করে একে একে মোটর আসতে লাগলো। এলেন জিলা শিক্ষা-পদাধিকারী (District Inspector of Schools), এলেন তাঁর সহকারী, এলেন প্রশাসক মহোদয়, জিলা পরিষদ, হাজারীবাগ (Administrator, District Board), এলেন অবর প্রথম পদাধিকারী (S. D. O), এলেন প্রথম বিকাশ পদাধিকারী (B. D. O), এলেন হাজারীবাগের কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী উকিল। তারপরে এলেন ছোট খাট অনেকে। ভিতরে নিয়ে তাঁদের বসানো হ'ল। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন জিলা শিক্ষা পদাধিকারী মহোদয়। একটি শিক্ষক, বাড়ী তাঁর ভাগলপুর, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করলেন। কয়েকটি বিহারী ছাত্র রবীন্দ্রনাথের মূল বাংলা কবিতা আবৃত্তি করলো, ভালই লাগলো। একটি পাঞ্জাবী ছেলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বরচিত গান গাইল, তার একটি লাইন মনে পড়ছে—"কলকত্তামে জনম লিয়া, দুনিয়া জগ্‌মগা দিয়া।" হয় তো গান লেখবার এই তার প্রথম প্রয়াস, কাঁচামনের ভাবটুকু অপটুভাবে প্রকাশ করলেও আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল। একটি হিন্দী

কবিতা পড়লেন আর একজন শিক্ষক, কিছু মনে আছে—

ভারত বাসিরোঁকী আশাকে সমুহ সে প্রকট ওরে
অমৃতময় কবিতাকে সুন্দরতম চন্দ্র খে।
কবিয়োঁকে নয়েন্দ্র কাব্যকলাকে মহেন্দ্র
ঔ অমৃতপত্নী কবিতাকে দর্শক রবীন্দ্র খে।

স্কুলের পণ্ডিতমশায় সংস্কৃতে কবিতা লিখে পড়লেন, কবিতাটা তাঁর কাছ থেকে চেয়ে রেখেছিলাম, এইখানে তুলে দিলাম—

রবিপ্রকাশেন সমস্তবিশ্বং
শিপাতি শক্রক সুবর্ষণেন।
যাত্যাময়ং কাব্য সুধোবিতাত্যাং
যথার্থনামা ভবত্তরবীন্দ্রঃ ॥

মানে মোটামুটি এই—রবির উদয় হলে সমস্ত বিশ্ব আলোয় ভরে যায় আর ইন্দ্র বারিবর্ষণ করে ধরণীকে শস্যশ্যামলা করেন। রবীন্দ্রকাব্যে আলোও আছে শ্যামলতাও আছে। তাই কবির রবীন্দ্রনাম যথার্থ; কেন-না রবি ও ইন্দ্র মিলিত হয়ে রবীন্দ্র হয়েছে।

অভিনয় হবে রাত্রে, অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ হলে বাহিরের অভিথিরা বিদায় নিলেন। সন্ধ্যা নামতেই ভিড় আরো বেড়ে গেল, অভিনয়ের আকর্ষণে আশে পাশের গ্রাম থেকে অনেক লোক এল। রাত আটটায় যবের পট উঠলো। শুরু হোলো অভিনয়। কর্তা অমল, ঘর থেকে বেরোতে মানা, আশ্বাসার ধারে বসে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, এমন সময় পথ দিয়ে যায় 'দহীওয়ালা', হাঁক পাড়ে —"দহী লে লো, দহী—ভালা দহী।" অমল ডাকে "দহীওয়ালে ও দহীওয়ালে।" দহীওয়ালা বলে "কোঁ বুলাতে হো ভুবে? ক্যা দহী ধরীহোলে?" কথা চলে দুজনে। অমল বলে "অচ্ছা দহীওয়ালে, বাতাও কি তুম কাঁহা সে আয়হে হো?" দহীওয়ালা বলে "হমারা গাঁও পকমোরা পাহাড়কে দামদহে শাবলী নদী কি কিনারে হৈ।" অমল বলে "বুঝে বাতাও হৈ কি মৈসে উসে কভি দেখা হৈ। তুমহারা গাঁও লালপাড়ক কে কিনারে, উচে উঁচে ঘুমোঁকে নীচে হৈ। হৈ না?" দহীওয়ালা জবাব দেয় "ঠীক হৈ বচ্চে।" অমল বলে "ওঁর তুমহারে গাঁওকী স্ত্রিয়াঁ লাল সাড়িয়া পহনে হুয়ে নদী সে অপনী গাগরেঁ ভরকর অপনে সিরপর লে আতী হৈ।" দহীওয়ালা বলে "বিলকুল ঠিক হৈ।"

চারিদিকে চেয়ে দেখলাম এত লোক অথচ একটু শব্দ নাই—তন্ময় হয়ে সকলে শুনছে। ছেলেবেলায় ডাকঘর আমরা নিজেরা অভিনয় করেছি, বাংলাদেশের কত জায়গায় কতবার এই অভিনয় দেখেছি। বন্দী অমলের মুক্তির জন্যে আকুলতা বাঙালী দর্শককে যেমন করে মুগ্ধ করে আজ দেখলাম বিহারী দর্শককে তেমন করেই মুগ্ধ করেছে।

কিছুক্ষণ অভিনয় দেখে উঠে পড়লাম। প্রাচার্য ও বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে বাইরে এলাম। বাজারের পথ ধরে বাড়ীর দিকে চললাম। আকাশে চাঁদ উঠেছে, পথের বিজলীবাতি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। নির্জন পথ ধরে চলতে চলতে হঠাৎ আমার মনে হলো চারিদিকের পরিবেশ বাড়ী ঘরের সঙ্গে আমার যোগসূত্র যেন ছিঁড়ে গেল, আমি ধীরে ধীরে অতীতের দিকে ফিরে চলেছি। স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল বড় বড় বাড়ী, দোকানপাট, দেখলাম বহু অতীতের সেই গানের পথ, খোলার চালায় খান দুই মুদীর দোকান, অদূরে মাঠের মধ্যে ভাঙা ঘরের প্রাঙ্গনে জনার্দন পাঁড়ের পাঠশালা আর চারিদিকে সবুজ শালে অরণ্য। নিজের দিকে তাকিয়েও অবাক হলাম খুব, অনেকদিন আগেকার দেখা, কিছু মনে পড়ে কিছু মনে পড়ে না এমন একটি মানুষ, মালকোঁচামারা, পাঞ্জাবীর হাতা গোটান, ২৪।২৬ বছর বয়সের যুবক। একমিনিট কি দুমিনিট, তার পরে এই অদ্ভুত স্বপ্ন ভেঙে গেল, ফিরে এলাম বর্তমানের মাঝখানে। পথের দুধারে সেই বড় বড় বাড়ী আর দোকান পাট, অতীতের সঙ্গে তার কোন মিল নাই। মিল নাই আমারও—চুলে পাক ধরেছে, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, কাঁধে চাদর, হাতে লাঠি। মনে প্রশ্ন উঠলো —"আমি সেকালের না এ কালের?" জবাব দিতে পারলাম না।

বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর স্থান

শ্রীমহাদেব পাড়ুই

(বি. এ. ডিপ্লোমা ইন বেসিক-এডুকেশন)

(Place of Co-curricular activities in the School.)

কেবল পুঁথিগত জ্ঞান সকলই প্রকৃত শিক্ষা নয়; শিক্ষার্থীর দেহের ও মনের শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশই প্রকৃতশিক্ষা। ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যতীত নিছক জ্ঞান অনেকখানি অকেজো; জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ই আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা। এজন্য শিক্ষামূলক কাজ শিক্ষার্থীর জীবন গঠনে বিশেষ ফলপ্রসূ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই শ্রেণীর পড়াশুনা ছাড়াও নানাভাবে শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করা উচিত। আজ বিদ্যালয়ের কাজ কেবল পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ লাভ করে, তা তাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তোলে। তাই নানা ধরণের কাজ আজ বিদ্যালয় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু শিক্ষকের সদিচ্ছা, উৎসাহ, আগ্রহ, আন্তরিকতা ও বাধা অতিক্রম করার সাহস থাকলে বিদ্যালয়ে কিছু না কিছু শিক্ষামূলক কাজ প্রবর্তন করা শক্ত নয়। শিক্ষামূলক কাজগুলি আজ বিদ্যালয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ সকল শিক্ষাবিদই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে কেবলমাত্র পঠনপাঠনই শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের উপায় নয়। শ্রেণীকক্ষের বাইরের কাজের গুরুত্ব শ্রেণীকক্ষের ভিতরের কাজের গুরুত্ব অপেক্ষা কম নয়। পঠন পাঠন ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের মধ্যে পার্থক্য তুলে দেওয়া উচিত। যে কোন বিষয়ের শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতা প্রদান বাঞ্ছনীয় ব'লে বিবেচিত হবে (তা পঠনপাঠন সংক্রান্ত হোক আর না হোক) বিদ্যালয়ের সময়ের ভিতরেই তার স্থান করে দিতে হবে—তা টাইমটেবিলের অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা এমনভাবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত যে, একটিকে অবহেলা করে অপরের উপর গুরুত্ব আরোপ করলে সমগ্র শিক্ষাদান প্রচেষ্টাই ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

শ্রেণী পঠনের বাইরে যে সব কাজের ব্যবস্থা করা উচিত, সেগুলিকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা যায় :—

(ক) খেলাধূলা ও শরীর চর্চা।
(খ) শিল্পকাজ ও সৃজনাত্মক কর্ম।
(গ) আনন্দ উৎসব।
(ঘ) উদ্যান রচনা ও গৃহসজ্জা।
(ঙ) সমবেত প্রার্থনা ইত্যাদি।

খেলাধূলা ও শরীর চর্চা :

বিদ্যালয়ের রুদ্ধ পরিবেশের অন্তরালে শিক্ষার্থীর প্রাণ অনেক সময় হাঁপিয়ে ওঠে। তাই নানা প্রকার খেলাধূলার মাধ্যমে বিদ্যালয় জীবনে বৈচিত্র্য-আনা দরকার। খেলাধূলার মাধ্যমে শিশু যে আনন্দ পায় তা তার শিক্ষার পথকে সুগম করে দেয়। খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুর মনে সৃজনা সম্পর্কে চেতনা ও সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর নানারকম সহজাতবৃত্তি খেলাধূলার মাধ্যমে পরিমার্জিত হয়। প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার ভাব নানারকম খেলার মাধ্যমে

উন্মেষিত হয়ে আমার খেলাধূলা শিশু মনে কেবল আনন্দেরই সন্ধান দেয় না, দেহ মনকে সুস্থ ও সবল করে তোলে। বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে বিদ্যালয় জীবনে খেলাধূলার স্থান সর্বতোভাবে প্রয়োজন। সকল শিক্ষাবিদই আজ শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় জীবনে খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফ্রোএবল-এর কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি এবং মেরিয়া মন্তেসরীর মন্তেসরী পদ্ধতি, শিশুকে শিশুর স্বাভাবিক "ভাল লাগা"কে কেন্দ্র করে গঠিত। মন্তেসরী বলেছেন, খেলাটাই শিক্ষার সবচেয়ে সহজ—সবচেয়ে কার্যকরী পথ।

শিল্পকাজ ও সৃজনাত্মক কাজ :

খেলাধূলা ছাড়া সাহিত্য প্রকাশ, ছবি আঁকা, প্রাচীর পত্রিকা রচনা, মাটি কাজ ইত্যাদি সৃজনাত্মক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব পরিণতি লাভ করে। শিশুর দৈহিক উন্নতি, বুদ্ধির পরিচালনা, রুচি গঠন ও উৎকর্ষ সাধনে এই সব কাজের মূল্য অনেকখানি। এই কাজের মাধ্যমে শিশু স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দলাভ করে এবং এই সব কাজের মাধ্যমে শিশুর অন্তর্গত ক্ষমতা ও আগ্রহ বিকাশ লাভ করে। খুবই দুঃখের বিষয় সুযোগের অভাবে আমাদের দেশের শিশুরা সৃজনাত্মক কাজে লিপ্ত হতে পারছে না এবং ফলে তাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা রুচি ও আগ্রহের বিকাশ লাভ হ'তে পারছে না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয়ে সৃজনাত্মক কাজের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। শিশুরা তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী যাতে বিদ্যালয়ে নানারকম সৃজনাত্মক কাজ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার, সুশিক্ষক তার সুযোগ্য পরিচালনায় শিক্ষার্থীকে উপযোগী কিছু সৃজনাত্মক কর্ম করতে চেষ্টা করবেন।

প্রত্যেক বিদ্যালয়েই প্রাচীর পত্র, বিতর্কসভা, মাটির কাজ, ছবি আঁকা, কবিতা রচনা, স্ক্রেপবুক ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

আনন্দ উৎসব :

বিদ্যালয় জীবনকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে বিদ্যালয়ের আনন্দ উৎসব। তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়। কেবল লেখা ও পড়া সংক্রান্ত গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকলে শিশুদের আনন্দ শুকিয়ে আসে। মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে কোন উৎসব পালনের ব্যবস্থা করলে শিশুরা এতে যেমন উল্লসিত হয় তেমনি শেখেও অনেক কিছু। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন করে প্রতিষ্ঠাতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো শিক্ষার্থীদের একটি নৈতিক কর্তব্য। এছাড়া স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, মহাপুরুষদের জন্ম দিবস - যেমন গান্ধিজী, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি সর্বজনবরেণ্য মহামানবদের স্মরণতিথি পালন করা চলে। শিক্ষক যদি উৎসাহী হন তবে এই মহান ব্যক্তিদের বাল্য-জীবনের দুই একটি ঘটনার নাট্যরূপ দিলে শিশুরা তা শুনে যেমন আনন্দলাভ করবে তেমনি উপকৃতও হবে। এই লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক শিক্ষাবিদই সজাগ। শিক্ষার এই লক্ষ্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েই রবীন্দ্রনাথ গড়েছিলেন তার শ্রীনিকেতন ও শান্তি-নিকেতন, গান্ধিজী গড়ে তুলেছিলেন তার সেবাগ্রাম।

উৎসব পালনের মাধ্যমে শিশুরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে বড় কাজ সম্পন্ন করার শিক্ষা লাভ করে। শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজ নিজ কাজটুকু করা, নেতার আদেশ অনুযায়ী কাজ করা, জড়তা পরিহার করে অপ্রতিভ আচরণে অভ্যস্ত হওয়া এবং পরিপাটি করে সাজানোর ভিতর দিয়ে রুচি ও সৌন্দর্যবোধ পরিতৃপ্ত করার সুযোগ তারা পাবে।

উদ্যান রচনা ও গৃহসজ্জা :

বিদ্যালয় গৃহ ও তার পরিবেশ সুন্দর হলে

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। ফুলের বাগান না থাকলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ চিত্তাকর্ষক হয় না। বাগানে যদি কোন সময় ফুল না থাকে তাও সুন্দর দেখায়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিশ্রম ও যত্নে গাছপালা তৈরী করলে তারা যেন কেবল শিল্প সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করে। এর ভিতর দিয়ে যে কেবল বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বাড়ে তাই নয়, ছাত্রদের উদ্ভিদের পুষ্টি ও বিকাশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। শিশুর মনের সুস্থ বিকাশে-এর যথেষ্ট উপকারিতা আছে।

সাজানো গোছান সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বাস করলে মনে সৌন্দর্য বোধ স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠে। সুরুচি শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিদ্যালয় গৃহে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ও মহাপুরুষদের ছবি সাজান চলে; সাধক ও সাহিত্যিকদের সুন্দর সুন্দর কতকগুলি বাণী সুন্দর অক্ষরে লিখে দেওয়ালে লাগিয়ে রাখাও চলে। টবে তোলা পামগাছ ও নানা জাতীয় ফুলগাছ দিয়ে বিদ্যালয়ের বারান্দা সাজানো চলে।

সমবেত প্রার্থনা :

প্রার্থনার দ্বারা মন সংযত হয়। প্রতিদিন থাকে। বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করার আগে সকল শিক্ষার্থী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা নিবেদন করে জ্ঞান সাধনার কাজে ব্রতী হতে পারে। এই সময় তারা সমবেত কণ্ঠে ধর্ম বা দেশপ্রেম সম্বন্ধীয় কোন গীত গাইতে পারে। এতে শিশুদের পাঠগ্রহণের উপযোগী মন তৈয়ারী হয় ও তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ধর্মবোধ জাগরিত হয়।

উপরি লিখিত বিষয়গুলি পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কর্ম বলে তাদের Extra curricular activities বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে "পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত কর্মগুলি" সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি যে শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নত করতে পারলে, তাদের চরিত্র গঠন করতে পারলে এবং যেগুলিকে আমরা "পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কর্ম" বলি সেগুলিকে তাদের মধ্যে যথাযথ ভাবে চালনা করতে পারলে পঠন পাঠনেও সাহায্য হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে ঐসব কাজের কোন কোনটি বিদ্যালয়ের টাইম টেবিলের অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করেছে। তাই আজ বিদ্যালয়ের এই সব সম্বন্ধে Extra curricular activities না বলে Co-curricular activities বা সহপাঠ্য-ক্রমিক কার্যাবলী বলা হয়ে

ভারতের ভাষা সমস্যা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ভারতরাষ্ট্রের ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা তাহা মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ কথিত "জাতিক সত্তার" উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জাতিক সত্তাই জাতিকে স্বদেশ প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ করে, দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী করে, দেশের কল্যাণ সাধনে তৎপর ও অকল্যাণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি যোগায়—এই জাতিক সত্তার উপলব্ধিতে স্বদেশবাসী পরস্পর পরস্পরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকে, সেই ঐক্যসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে জাতি স্বজন বিয়োগ ব্যথা অনুভব করে, তাহার উপর আঘাত হানিলে জাতি মরিয়া হইয়া উঠে। মাতৃভাষা মাতৃস্নেহে জাতিকে লালন পালন করে, তাহার অমৃত রস মাতৃস্তন্যের সঞ্জীবনী শক্তিতে জাতিকে বলিষ্ঠ করিয়া তাহার হৃদয়বৃত্তি ও মানবিক অনুভূতির পুষ্টিসাধন করে। কিন্তু যদি জাতিক সত্তা ভাষার মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ ও বিস্তৃত করিতে না পারে তাহা হইলে আঞ্চলিকতা, দেশপ্রীতি, ঐক্য ও সংহতির আদর্শ জাতির জীবনে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উক্তি স্মরণীয় :

"In the present background of the language controversy raging through out the country, and in a way endangering unity and integrity of the Nation, a few all-India policy regarding Minority languages should be prepared mainly on the basis of [that memorandum]"

এই memorandum বা স্মারকলিপি ১৯৫৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে রাজ্য সরকারের অধীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা সংরক্ষিত হইবে এরূপ কথা ছিল।

ডাঃ রায় তাঁহার অন্য একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে রাজ্যগুলিকে একাধিক ভাষাকে সরকারী স্বীকৃতি দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিবৃতিটিতে ভারত বিখ্যাত চিকিৎসক হিসাবে তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রোগের উৎপত্তি, প্রসার ও তাহার বিষময় ফলের প্রভাবে ভারত রাষ্ট্র কিভাবে পর্যুদস্ত হইতে চলিয়াছে তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার তিন দফা প্রস্তাবে ভারতের ভাষা সমস্যার সমাধানের যে উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহা wishful thinking অর্থাৎ শুধু সদিচ্ছা প্রণোদিত চিন্তা মাত্র নহে, তাহা যুক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ ও সুস্থ রাজনৈতিক শুভবুদ্ধি প্রসূত। সেজন্য ইহা অবশ্যই প্রণিধান যোগ্য এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেখা আবশ্যক—ইহার সম্ভাব্য ফলশ্রুতি সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে অনেকখানি মনোযোগী হইয়াছেন। দীর্ঘসূত্রী আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য এই সমস্যাটি অনেকদিন নথিভুক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার ফলে দেশময় একটা নৈরাশ্য, অসন্তোষ ও অস্বস্তির ভাব ক্রমশই বাড়িয়াই চলিতেছিল। এ সমস্যাটির প্রতি রাষ্ট্র উদাসীন থাকিলে লোকচিত্ত ক্ষোভে অন্যান্য চেষ্টাও ব্যাহত হইবে, পরিশেষে আমাদের অনুশোচনার আর অন্ত থাকিবে না।

ডাঃ রায় অনুযোগ করিয়াছিলেন যে ১৯৫৬ সনে

গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে কোন্ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বাহন কি হইবে সে সম্বন্ধে ভারত সরকারের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করার কথা ছিল কিন্তু তখনো পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থাই হয় নাই। সংবিধানের ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৭ ধারার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা যায় রাজ্যে এক বা একাধিক ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য ইহার মধ্যে যে ত্রুটি আছে তাহা সংশোধিত হইলে সেই অনুসারে কাজ করিবার অধিকার রাষ্ট্রপতির আছে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের মতের মিল থাকা সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত রাজ্য-সরকারের মতামত জানিবার কোন চেষ্টাই তাহারা করেন নাই। ভারতে ভাষা আন্দোলনকে এইভাবে বৃদ্ধি পাইতে না দিয়া ভারত সরকারের উচিত ছিল প্রত্যেক রাজ্যকে বহু ভাষাভাষী রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা এবং কোন রাজ্যে শতকরা পাঁচ ভাগ লোক সংখ্যা লঘু হইলেও তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহাকেও ৩৪৭ ধারা অনুসারে সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া, পৃথিবীর বহু দেশে এ ব্যবস্থা রহিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থায় কিছুই আসিয়া যাইবে না কিন্তু যাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহারা নিজেদের নিরাপদ মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন।

পরিশেষে ডাঃ রায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন—

A declaration should be made as early as possible, and if necessary, this declaration may follow a discussion between the Union Home Minister and State Chief Ministers as to the necessity of having every State declared as a polyglot or Multilingual State. The conditions under which more than one language will be accepted in a state will depend upon the situation prevalent in that State."

অর্থাৎ যথা শীঘ্র সম্ভব একটি ঘোষণা করা উচিত এবং প্রয়োজন হইলে এই ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সহিত আলোচনায় স্থির করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক রাজ্যকে বহুভাষাভাষী রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করার প্রয়োজন আছে কিনা। একাধিক ভাষা সরকারী ভাষারূপে কোন রাজ্যে স্বীকৃত হওয়া নির্ভর করিবে সেই রাজ্যে তৎকালীন অবস্থা কিরূপ আছে তাহার উপর।

ডাঃ রায় আরো বলিয়াছিলেন যে ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকারের স্মারক-লিপিতে যে সকল সুপারিশ আছে সেগুলি সুস্পষ্ট ভাষায় বিধিবদ্ধভাবে প্রকাশ করা আবশ্যক এবং সংখ্যালঘুদের ভাষা সংরক্ষণের জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা আছে তদনুযায়ী রাজ্য সরকার কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতেছেন কিনা তাহা দেখিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন উপরওয়ালা নিয়োগ করার প্রয়োজন আছে।

কোন রাজ্যে ভাষা সম্পর্কে ৩৪৭ ধারা অনুসারে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করিতে হইলে উক্ত ধারায় ভাষার পরিবর্তন হওয়া উচিত যাহাতে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিতে পারেন।

ডাঃ রায়ের এই "ফরমূলা" লইয়া আমাদের দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিশদ আলোচনার দ্বারা জনসাধারণকে অবহিত করার যত্নপ্রসূত চেষ্টা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে "যুগান্তর" ও "জনসেবক"-এর নাম উল্লেখযোগ্য। নিখিল ভারত কংগ্রেস এই মূলনীতিতে বিশ্বাসী। পুণার কংগ্রেসের ঘোষণায় আঞ্চলিক ভাষা সংরক্ষণের নীতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ডাঃ রায়ের মূল সূত্র (ফরমূলা) কংগ্রেসের আদর্শের উপরই

প্রতিষ্ঠিত। ডাঃ রায়ের প্রস্তাব অনুসারে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার ভাষা পরিবর্তন করিলে কংগ্রেসের ভাষা সম্পর্কিত নীতির সঙ্গে তাহার অংশ বিশেষে যে পার্থক্য আছে তাহা লোপ পাইবে —এই কারণেই কংগ্রেসের পক্ষে উৎসাহিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। ডাঃ রায় সেদিকটাও চিন্তা করিয়াছেন।

ভাষার প্রশ্ন রাজনৈতিক প্রশ্ন নহে—ইহা মানুষের শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌলিক অধিকারগত প্রশ্ন—এখানে দলমতের স্থান নাই —জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্নও এখানে অবান্তর। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ— যাহার দিকে আজ সর্বদেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ। সুইজারল্যাণ্ড, কিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যদি সংখ্যালঘুরা নিজ নিজ ভাষার স্বীকৃতি পাইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতবর্ষেই বা তাহা সম্ভব হইবে না কেন?

যুগান্তর ভাষা সমস্যা সমাধানের ডাঃ রায়ের এই "ফরমুলা" বা মূল সূত্রকে যুগান্তকারী বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "এই প্রস্তাবের দ্বারা একটি মাত্র ভাষার সর্বগ্রাসী সরকারী কবল হইতে রাজ্যগুলিকে মুক্তি দিয়া প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য মাইনরিটির ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার উদার নীতি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। অথচ ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনও স্বীকার করা হইতেছে। ভারতবর্ষের বর্তমান জটিল অবস্থায় এই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক মীমাংসা ছাড়া আর কোন উপায় দেখা যাইতেছে না।"

আমাদের ছাত্ররা এবং ছাত্রীরা

শ্রীঅরুণ রায়

আমাদের দেশের বর্তমানকালের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আলাপ আলোচনা অনেক চলেছে। সে আলোচনা যেমন উচ্চস্তর মহলে চলে, তেমনি ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, বাড়ীর বৈঠকখানাতেও চলে। সে আলোচনায় যে পরিমাণে হতাশা আছে সে পরিমাণে আনন্দ নেই এবং সমস্ত দোষের বোঝা অনেক পাঠ্যবিষয়ের বোঝার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে তুলে দেওয়া হয়। আমাদের দেশের এখনকার ছাত্রছাত্রীদের অবনতি হয়েছে—আলোচনার এই বিষয়টি হয় প্রতিপাদ্য। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খুব স্পষ্ট যুক্তি হয়ত দেখানো যাবে না, কিন্তু তার জন্য সব দোষ যে তাদেরই এমন ধারণাও অভ্রান্ত নয়।

প্রাচীনকালের গুরুগৃহে আকর্ষণীয় গুরুভক্তি অথবা একলব্যের একনিষ্ঠতা যদি দুর্লভ হ'য়ে পড়ে, তার কারণ বর্তমানকাল 'প্রাচীনকাল' নয়। এখনকার ছাত্রছাত্রীরা যেখানে শিক্ষালাভ করে সেটাও অতীতের 'গুরুগৃহে'র মত নয়। সেদিনের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমানের সমাজব্যবস্থার কোন মিলই নেই। প্রাচীন ভারতের ধ্যান-গম্ভীর নিশ্চিন্ত পরিবেশ বর্তমান ভারতের সমাচ্ছন্ন ক্ষুব্ধ জীবনপ্রবাহের মধ্যে কোনমতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে অতীতের মৌল চিন্তাগুলো বর্তমান কালে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কাজেই অতীতের ঐকান্তিক পাঠানুরাগ, ভূমিষ্ঠ কিনয় বর্তমান-কালে খুঁজতে যাওয়া বৃথা

পরিশ্রম মাত্র। নগর নিয়ে, আমাদের অরণ্য ফিরিয়ে দাও—কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা এ প্রার্থনা জানাতে পারি, কিন্তু আমাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ হবে না। বিদ্যালয় যদি সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা যদি সামাজিক হয়, তবে উন্নত সমাজে সুযোগ্য ছাত্রছাত্রী পাওয়া সম্ভব হবে না।

কেবলমাত্র প্রাচীন কাল নয়, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বলতা প্রমাণের সময় বিদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়ে থাকে। বিদেশের ছাত্রছাত্রীদের মত আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও যখন সর্বাঙ্গীন সুযোগ সুবিধা লাভ করবে, মনে হয়, কেবল সে সময়েই এ তুলনা প্রাসঙ্গিক হবে, তার আগে সে তুলনায় যুক্তিবোধের অভাবটাই স্পষ্ট হয়।

এদেশের ছাত্রছাত্রীরা কেন ঠিকমত লেখাপড়া শিখছে না, এবং কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তা সম্ভব হবে, তা নিয়ে অনেক চিন্তা করা হয়েছে। এর জন্য পাঠ্যবিষয়ের সংস্কার করা হয়েছে, পাঠদানের পদ্ধতি যাতে সার্থক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, আদর্শ বিদ্যালয়, আদর্শ শিক্ষক এবং আদর্শ শিক্ষার্থীর কোন্ কোন্ গুণ থাকা দরকার, তার সুদীর্ঘ তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু তার ফলে আসল সমস্যার ঈপ্সিত সমাধান হয়নি। তার কারণ, মূল সমস্যা সাধ্যের বাইরে ব'লেই হয়ত অনেক সময় দৃষ্টির বাইরে থেকে গিয়েছে। মূল সমস্যা হ'লো অর্থনৈতিক সমস্যা। সমস্ত পরিকল্পনা উপযুক্ত আর্থিক আনুকূল্যেই সম্ভব এবং সফল হয়। আদর্শ বিদ্যালয়, আদর্শ শিক্ষক এবং আদর্শ ছাত্রছাত্রী সে দিনই সার্থকভাবে তৈরী হবে, যে দিন সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হবে,—সে দিনই সমস্ত পরিকল্পনা, পুঁথির পাতা থেকে বাস্তব জগতে বাস্তবরূপ লাভ করবে।

অর্থের দীনতা এখনও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। যে পরিমাণে ছাত্রছাত্রী আছে, সে পরিমাণে বিদ্যালয় নেই। বিদ্যালয়ের পাঠাগার, ল্যাবরেটারী, খেলার মাঠ ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন-মত গ'ড়ে তোলা যাচ্ছে না, আর তার ফলে পাঠদানের সার্থক পরিকল্পনাগুলো পদে পদে বাধা পাচ্ছে।

যেখানে এই অর্থনৈতিক সমস্যা নেই, সেখানে এই বাধা এত প্রবল হ'য়ে ওঠেনি। উচ্চ-সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা অথবা আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন বিদ্যালয়গুলো এই সব অসুবিধে থেকে মুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে এই দুটোই সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার অতি ক্ষুদ্র অংশ। আসলে, এদেশে অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা দুর্বল। অধিকসংখ্যকের সঙ্গে সমগ্রের সম্পর্কের গুরুত্ব অনেক বেশী। কাজেই বর্তমানে শিক্ষা-জগতের আলোচনায় অর্থনৈতিক সমস্যার দিকটি মোটেই অবহেলার নয়।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা অনেকে বাড়ীতে থেকে পড়াশুনো করে, কিন্তু তারা সবসময় পড়া-শুনোর অনুকূল পরিবেশ বাড়িতে পায় না। তাদের অনেকেরই পড়ার জন্য আলাদা কোন ঘর নেই—সংসারের প্রয়োজনীয় কথাবার্তা একপাশে চলছে, এবং ঘরের অন্য পাশে চলছে পড়াশুনো। আলাদা কোনো ঘর পড়াশুনোর জন্য থাকলেও বাড়ীর প্রায় সব ছেলেমেয়ে এসে সেখানে পড়া করে। একজন যখন সজোরে ধারাপাত পড়ছে, অন্যজনকে তখন হয়ত স্ট্যাটিস্টিক্সের জটিল জালের মধ্যে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। পড়তে ব'লে বাড়ীর টুকিটাকি কাজও তাদের করতে হয়। রাত্রে পড়ার সময় উপযুক্ত আলোও তারা সব সময় পায় না। গ্রামের ছেলেমেয়েদের অনেককে পায়ে হেঁটে দূরের বিদ্যালয়ে যেতে হয়—ক্লান্ত শরীর নিয়ে পড়াশুনোয় তারা ঠিকমত মন দিতে পারে না। কিছু ছাত্রছাত্রী হোষ্টেলে থাকে—এরা সব চেয়ে ভাগ্যবান। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে প্রতিমাসের

খরচ চালানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করে—সেই পরিশ্রমের মধ্যে প্রাইভেট পড়ানোটাই প্রধান—যার ফলে তাদের মূল্যবান সময় এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। এরা তাদের বাড়ির অবস্থা কেমন, তা ভালোভাবেই জানে, আর তাদের পড়াশুনোর খরচ চালাতে—বাড়ীর লোকদের যে অনেক অসুবিধে হচ্ছে, তা-ও তারা বোঝে—সব মিলে তারা পড়াশুনোর মধ্যে বেশী সময়েই কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না। যারা কোনো আত্মীয়স্বজনের কাছে থেকে পড়ে, তাদের অনেকের অবস্থা আরও মারাত্মক—প্রাইভেট পড়ানো ছাড়াও অনেক সময় তাদের বাজার সরকারের কাজও করতে হয়।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জীবনকে জটিল করে তুলেছে। পড়াশুনোর যে অনুরাগ তারা আনতে চায়, অভাবের উত্তাপে সে অনুরাগ উড়ে যায়। বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক নেই। পুষ্টিকর খাদ্য দূরে থাক্, অনেকে তারা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পায় না। সরল জীবন যাপন ক'রে উচ্চমার্গে চিন্তা আমাদের আদর্শ হ'তে পারে, কিন্তু সরল জীবন অর্থে অর্ধাহার অনাহার নয়—আর পেটে ক্ষিদে নিয়ে পড়াশুনো ঠিকমত করা সম্ভব হয় না।

অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার দিক থেকে আমাদের দেশের এখনকার ছাত্রছাত্রীরা কোনো দেশের এবং কোনো সময়ের ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়—কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনীর বিকাশই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার জন্য নব নব পরিকল্পনার প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশী প্রয়োজন তাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা। এর জন্যে যেমন সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আনা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ব্যক্তিগত জীবনেও। সামাজিক দিকে সমস্যার সমাধান হয়ত অনেকখানি সময়সাপেক্ষ হ'তে পারে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র বিস্তৃত না হ'লে এবং এর দিকে আশু ও উপযুক্ত দৃষ্টি না দিলে, উন্নত শিক্ষার প্রবাহ সম্ভব হবে না। সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা এবং ছাত্রছাত্রীদের অভাব পূরণ করা প্রয়োজন—আর দুটোর কোনটাই এখন পর্যন্ত ঠিকমত হয়নি,—এ কথা মনে রাখলে আমাদের দেশের এখনকার ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন আমরা অন্ততপক্ষে কিছুটা সতর্কভাবে করতে পারব।

পড়ান ও পড়া—৩

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পূর্ব প্রবন্ধ দুইটিতে শঠম হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। নবম ও দশম এবং বর্তমানের নবম, দশম ও একাদশ এই শ্রেণীগুলিতে যে সব ছেলেমেয়ে পড়ে তাহাদেরও আমি মোটামুটি কিশোরই বলিতেছি। কাজেই এ সময়টাও জীবনের একটি প্রকৃষ্ট ও কঠিন স্তর বলা যায়। আগেকার নবম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি অতি দ্রুত একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হইতেছে। পাঠক্রমেও মোর তারতম্য দেখি। আমাদের সময়কার নবম ও দশম শ্রেণীর কথা আগে বলি।

পুণ্যশ্লোক আশুতোষ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রবর্তন করেন। তৎপূর্বে বহু বৎসর যাবৎ নবম ও দশম শ্রেণীতে কি ইংরাজী কি বাংলা কোন পাঠ্য বই ছিল না। তবে মিশ্রিতভাবে ইংরাজী যে পড়ান হইত তাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। বাংলাও পড়িতাম, কিন্তু ইংরাজীর উপরে, বোধ হয় বিদেশী ভাষা বা রাজ ভাষা বলিয়া বেশি জোর দেওয়া হইত, সময়ক্ষেপও হইত খুবই। কোন বিশেষ পাঠ্য বই ছিল না বলিয়া শেষ পরীক্ষার জন্য পড়ার কোন বালাই থাকিত না। কিন্তু গদ্য পদ্য এমন কতকগুলি বই নির্দিষ্ট ছিল যাহা আমাদিগকে রীতিমত ক্লাসে পড়িতে হইত। পদ্যের মধ্যে "Lahiri's Select Poems" এবং গদ্যের মধ্যে "Lamb's Tales From Shakespeare" ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "Prose Selections" আমরা পড়িতাম। নবম ও দশম শ্রেণীতে এ সকল বইয়ের অধিকাংশই পড়িয়া ফেলা হইত। পল্লীর ছোট স্কুল, সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষক মহাশয় গদ্য অংশ পড়াইতেন। পদ্য অংশ পড়াইতেন, যতদূর স্মরণ হয়, সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয়।

আমাদের প্রধান শিক্ষক ৺অনন্ত কুমার কর গদ্য বই দুখানি বড় যত্ন করিয়া পড়াইতেন। শেক্সপীয়রের গল্পগুলির রস ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া লওটা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাক্যগুলি দীর্ঘ, শিক্ষক মহাশয় বাক্যাংশগুলি ভাঙিয়া ভাঙিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। শাইলকের কথা, পোর্শিয়ার কথা, হ্যামলেটের কথা, ম্যাকবেথের কথা আমাদের বড় ভাল লাগিত। অন্য বইখানির প্রবন্ধ সংগ্রহগুলির কিন্তু কোন কোন অংশের মর্ম এখনও হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। বড় হইয়া কলেজে এবং বাড়ীতে শেক্সপীয়রের মূল বই অনেকগুলি পড়িয়াছি, পড়িয়া রসও পাইয়াছি। কিন্তু আগেকার গল্পচ্ছলে পড়া বিষয়গুলির কথাই যেন আজ বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে। অনেক সময় কোন বইয়ের বিষয়বস্তু আগেভাগে জানিয়া লইলে মূল বই পড়িতে আর আগ্রহ বা প্রবৃত্তি থাকে না। ল্যাম্ব মহোদয়ের গল্পগুলি এমন সুন্দর করিয়া লেখা যে, মূল বই পড়িতে আমাদের আগ্রহ কমে ত নাইই বরং বাড়িয়া যায়। এই সে দিন পুনরায় ল্যাম্বের লেখা কয়েকটি গল্প পড়াইয়া শুনিলাম, এখন বুঝি বাক্য-গুলি দীর্ঘায়ত; একাধিক clause লইয়া এক একটি বাক্য। এই জন্যই অবশ্য বুঝাইতে প্রবীণ শিক্ষক মহাশয়কে এত বেগ পাইতে হইত। শব্দগুলি আজ মনে হয় খুবই পরিচিত, তখন হয়ত উহার মধ্যে বিস্তর শব্দ নূতন ঠেকিত। তথাপি বলিতে পারি ছেলেদের জন্য লেখা বলিয়া প্রচলিত সহজ-উচ্চার্য শব্দ ল্যাম্ব উহাতে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

অপর গল্প বইখানির কথা কিছু বলি। আজকাল গোল্ডস্মিথের কথা ছেলেরা বড় একটা জানে না। তাঁহার বিখ্যাত কবিতা "Deserted Village" ('পরিত্যক্ত গ্রাম') সেকালের ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই বিদ্যালয়ে পড়িতে হইত। তিনি ছিলেন গরীবের ছেলে। নানা দেশে বীণা বাজাইয়া ও গান গাহিয়া যে দু পয়সা পাইতেন তাহার দ্বারাই প্রথম জীবনে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। পরে কিন্তু বিখ্যাত সাহিত্যিক হইয়াছিলেন। তাঁহার "Letters from a Chinese" নামে অনেকগুলি চিঠি আছে। ইহাতে তৎকালীন সামাজিক সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ের কথা নবাগত অনৈক চীনা প্রমুখাৎ পত্রচ্ছলে লিখিয়াছেন। ইহার কিছু আমাদের পাঠ্য বইখানির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফুটবল খেলার কথা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন যে, ইহাতে ঠেস দুমড়ি চুকিয়াছে। ভাড়া করিয়া খেলোয়াড় আনিতে হয়। ইহাতে দেহ-চর্চার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। হাজার হাজার লোক খেলা দেখিয়া আনন্দ পায় বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের প্রত্যেকের শারীরিক উৎকর্ষ কিরূপে ঘটিতে পারে? এই ধরণের কথাগুলি এখন মনে পড়িতেছে। ইহা পাঠ করিয়া তখন বড় আনন্দ পাইতাম।

পরীক্ষার জন্য না পড়িলেও আমরা পাঠ্য বই রূপেই এগুলি পড়িয়াছি। ক্লাসের পরীক্ষায় এ সব বই হইতে প্রশ্ন থাকিত এবং পাঠ্যাংশ, বুঝিতেই পারেন, আমরা খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়িতাম। ইহার ফল যে, কিরূপ ভাল হয় তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। টেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—ইংরাজী কি পড়িব? পাঠ্য বই ত আর নাই। স্কুলের লাইব্রেরি হইতে তিনখানি বই আনিয়া পড়িয়া ফেলি। ইংরাজী ছিল একখানি, নাম—'লা-মিজারেবল'। সবটা বুঝি নাই, হয়ত অনেকটাই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, তবু ইংরাজীর আদলের সঙ্গে খানিকটা পরিচয় হওয়ায় ইহার মূল ভাব গ্রহণে কতকটা সক্ষম হই। ফ্রীন ত্যালজীন কর্তৃক কারাগারের প্রাচীর টপকাইয়া পলায়ন ব্যাপারটি আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, এখনও তাহা স্মরণ আছে। ইংরাজীর কথা বলিতেছি। তবে বাংলা অন্য দুইখানি বইয়ের নামমাত্র এখানে উল্লেখ করি। একখানি ছিল বিপিন বিহারী গুপ্তের "বিচিত্র প্রসঙ্গ—নব পর্যায়।" কোন্ খণ্ড ঠিক স্মরণ নাই। অপরখানি ছিল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।" এই বই দুইখানিও তখন সাগ্রহে পড়িয়া ফেলি।

নবম শ্রেণী হইতে আমরা মেদকিল্ডের 'গ্রামার' পড়ি। বেশ মোটা বই, চারি খণ্ডে ভাগ করা। আজকাল এ বই সচরাচর দেখি না। রো অ্যাণ্ড ওয়েলের "হিন্টস্" ও ছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত বইখানিরই চলন ছিল বেশি। সহকারী প্রধান শিক্ষক মহাশয় এখানি আমাদিগকে পড়াইতেন। মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃতি ছিল। অবশ্য কোন কোন বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপই এই উদ্ধৃতি। একটি মনে আছে—"Writing makes man perfect". কথাটি যে কত সত্য মানসিক দিক হইতেই ইহা পরে বুঝিয়াছি। Gerund ও Verbal Noun'র উদাহরণস্বরূপ এবং কখন কখন পার্থক্য বুঝাইতে গিয়া এ ধরণের নানা প্রকার উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। ব্যাকরণ অমনি ভাল শেখা যায় না; দৃষ্টান্ত চাই। ইংরাজী পাঠদানকালে শিক্ষক মহাশয় ব্যাকরণের খুঁটিনাটি দৃষ্টান্ত আমাদিগকে যোগাইয়া দিতেন। 'Parsing' বা বিভিন্ন শব্দের অন্বয় একটি অত্যাবশ্যক পাঠ। এটিও আমরা তখন শিখিয়া লই। শুধু ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠেই ত চলে না সঙ্গে সঙ্গে কম্পোজিশনও লেখা চাই। পি. সি. রেন্ নামক এক সাহেবের কম্পোজিশন বই দশম শ্রেণীতে কিনি। দেখিলাম ইহার অনেক-গুলিই আমরা পূর্বে জানিয়াছি। তথাপি বিশেষ বিশেষ কথাগুলি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া নূতন করিয়া

বলোইয়া দেই। নূতন কথাগুলি বা আবশ্যক বৃত্তান্তগুলি মোটা অক্ষরে লেখা ছিল।

ঐ সময়ে আমাদের ট্রান্সলেশন বই ছিল বেণী মাধব গাঙ্গুলীর। গাঙ্গুলী মহাশয়ের ক্ষুদ্রতর ট্রান্সলেশন বই আমরা পূর্বে পড়ি। নবম দশম শ্রেণীতে বড় বই পড়িতে পাইলাম। তখন গঙ্গাধর বাঙ্‌ময়ের "Translation and Retranslation" নামক আর একখানি বই ছিল। ইহাও কেহ কেহ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চ মানের এবং কতকটা ভিন্ন ধরণের বলিয়া বেণী মাধব গাঙ্গুলীর বইয়েরই ব্যবহার ছিল অধিকতর। আমাদের সময়ে "Substance" এবং "Expansion" নামক আর দুইটি ব্যাপার ছিল। কোন বাছা বাছা ইংরাজী গদ্যাংশের মর্মার্থ ইংরাজীতে লিখিতে হইত। আবার কোন কোন ছোট ছোট কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখিতে হইত। শুনি এ দুইটি এখনও ভিন্ন আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। রচনার প্রতিও খুব দৃষ্টি দেওয়া হইত। পরীক্ষায় দুইটি করিয়া রচনা লিখিতে হইত। রচনা লিখিতে গেলে ইংরাজীর উপরে খানিকটাও অন্ততঃ দখল চাই। তখনকার দিনে কতটা দখল জন্মিত বলিতে পারি না, তবে আমরা লিখিতাম। এত রকমারী অনুশীলন সত্ত্বেও বহুলোক ছিল গ্রাজুয়েটরা পর্যন্ত ভাল ইংরাজী লিখিতে জানেন না।

ইংরাজীর কথাই বলিতেছি কাজেই আজকাল-কার ইংরাজী শিক্ষার ধরণধারণ সম্বন্ধেও আগে কিছু বলি। যে রকম পাঠক্রম এবং যে রকম পাঠনার রীতি তাহার উপরেই কিছু মন্তব্য করিব। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও নানা সূত্র হইতে যতটা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি তাহার উপরেই আমার নির্ভর। লোকমুখে শুনিতে পাই, প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অদ্ভুত অপলব ঘটিয়াছে। আমাদের সময়ের পরে বোধ হয় ১৯২৬ সন হইতে পুনরায় প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ইংরাজী ও বাংলা পাঠ্য বই নির্দারিত হয়। এই ব্যবস্থা চালু ছিল উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত। বুঝিয়া হোক, না বুঝিয়া হোক অথবা নোট মুখস্ত করিয়া হোক পরীক্ষার জন্য পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত হইতে হইত। কয়েকখানি বই অন্ততঃ তাহারা পড়িতে পাইত। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামার, ট্রান্সলেশন, কম্পোজিশন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহাদের খানিকটা জ্ঞান লাভ করিতে হইত। নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পুনরায় ইংরাজী পাঠ্য বই বর্জন করা হইয়াছে। আমাদের সময় দুই বৎসরের জন্য কোন পাঠ্য বই ছিল না, এখন তিন বৎসরের জন্য কোন পাঠ্য বই নাই যাহা হইতে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসিতে পারে। তবে ঐ সময়ে যেমন এখনও তেমনি নবম হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে কিছু কিছু পাঠ্য বই নির্দারিত রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ঐ তিন শ্রেণীর কোনটিতেই ধরাবাঁধা ইংরাজী গদ্য বা পদ্য পুস্তক ক্বচিৎ পড়ান হয়। শুনি, কোন বইয়ের পাঁচটি গল্পের মধ্যে একটি কি দুইটি গল্পও এই তিন বৎসরে শেষ হয় না। শিক্ষক মহাশয়েরা গা করেন না, কেন না পরীক্ষায় ত ইহা হইতে প্রশ্ন আসিবে না। কিন্তু তাহারা নিশ্চয়ই এ কথা বুঝেন যে, ইংরাজী বই রীতিমত না পড়িলে ছেলেরা ইংরাজী শিখিতে পারে না। ভাষার সঙ্গে পরিচয় হওয়া একান্ত দরকার। ইহার আনুসঙ্গিক রূপে গ্রামার, ট্রান্সলেশন কম্পোজিশন প্রভৃতিরও অনুশীলন চাই। আগে দুই বৎসরে কোন নির্দিষ্ট পাঠ্য বই ছিল না, বা থাকিলেও আমাদের রীতিমত পড়ান হইত।

বর্তমানে তিন বৎসরের জন্য কোন পাঠ্য বই রীতিমত পড়ান হয় না। এ কারণ দেখিতেছি এবং আপনারা অভিভাবক অভিভাবিকারা নিজ নিজ সন্তানদের পঠন পাঠন দেখিয়া যাচাই করিয়া লইবেন, ছেলে কি মেয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যাহা

দেখে, বড়ই দুঃখের কথা, রীতিমত পঠন পাঠনের অভাবে নবম শ্রেণী হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ ইহা ভুলিতে থাকে। Precis, Story building, Translation ইত্যাদির উপর বড়ই জোর দিল না, Test papers হইতে অনুশীলনীর পর অনুশীলনী বড়ই করাল না, ভিত্তি যে একেবারে নড়বড়। ইংরাজী ভাষার সম্বন্ধে যাহার কিছু জ্ঞান হইল না, অথবা ছেলে যাহা শিখিয়াছে চর্চার অভাবে তাহা যখন ক্রমশঃই ভুলিয়া যাইতেছে সেই সময় তাহার কাঁধে এতাদৃশ ভার চাপান নিতান্তই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক নয় কি? হয়ত বলিবেন এখন অনেক বিষয় ছেলেদের বা মেয়েদের পড়িতে হয়—কাজেই ইংরাজীর উপরে ততটা জোর দেওয়া চলে না বা সময়ক্ষেপ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিষয় বাড়িলেও ইংরাজীর গুরুত্ব ত কমে নাই সেই দু'শ নম্বরের উপরে পরীক্ষা দিতে হইবে এবং কত বিষয়ই না উত্তর পত্রে লিখিতে হয়। এই যে সমস্যা আজ দেখা দিয়াছে ইহার প্রতিকার কি?

নবম হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়ে, যেমন বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতিতে দু শত নম্বরের পরীক্ষার ব্যবস্থা। ইংরাজীতেও তেমনি দু'শ নম্বর অন্যান্য বিষয়ে পাঠ্য বই নির্দিষ্ট থাকায় এবং তাহা হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইবে এইরূপ ধার্য হওয়ায়, ছাত্রছাত্রীরা কতকটা হদিস পাইয়া থাকে। কিন্তু ইংরাজী সম্বন্ধে পাঠ্য বই না থাকায় এবং রীতিমত পঠন পাঠনার অভাবে তাহারা দিশাহারা হইয়া যায়, পরীক্ষাকালে প্রশ্নপত্র হাতে পাইয়া চোখে সর্ষে ফুল দেখে। সকলের বেলায় যে এইরূপ এমন বলি না। কিন্তু অধিকাংশের ক্ষেত্রে এইরূপ যে ঘটে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। হয় পাঠ্য বই নির্ধারণ করুন এবং রীতিমত পড়ানর ব্যবস্থা করুন নতুবা ইংরাজীর গুরুত্ব কমাইয়া দিন। আমাদের সময় কোন নির্দিষ্ট বই হইতে প্রশ্ন দিবার ব্যবস্থা না থাকিলেও যেমন পাঠ্য বই রীতিমত পড়ান হইত এখনও কি তেমনটি করা সম্ভব নয়? আগে কি নিয়ম ছিল বা উপর হইতে কি নির্দেশ দেওয়া হইত জানি না। আজিকার দিনে কিন্তু দেখি উহার ঠিক বিপরীত। পূর্বে বলিয়াছি ইংরাজীর মূলকাঠে ছেলেমেয়েরা বলি হইতেছে। এই ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন বা সংশোধন না হইলে ইংরাজী শিক্ষারই শুধু অপচয় হইবে না শিক্ষার প্রসারও বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। এইরূপ আর কিছুকাল চলিলে ইংরাজীর শিক্ষক পাওয়াও হইবে দুষ্কর। আজকাল কি স্কুল কি কলেজ সর্বত্রই ইংরাজী শিক্ষকের চাহিদা বাড়িয়াছে। কিন্তু এই চাহিদা মিটাইবার উপায় সম্বন্ধে কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ইংরাজী শিক্ষার গোড়াতেই যখন এত গলদ তখন উপরের দিকে যে ইহা ক্রমশঃ পঙ্কপুট বিস্তার করিবে তাহা আর বলিতে হইবে না।

ইংরাজী শিক্ষা প্রসঙ্গেই ইহার ত্রুটির কথা কিছু বলিলাম। অন্য বিষয়ও যে ত্রুটিহীন এ কথা বলিতে পারিলে সুখী হইতাম। একটি বড় মজার কথা সে দিন শুনি। উচ্চ মহলে ঘোরাফেরা করেন এমন একজন শিক্ষাব্রতী বলিলেন, 'মশায় বলিব কি মাত্র পনর দিনের নোটিসে উচ্চতর বিদ্যালয়ের পাঠক্রম নির্ধারণ করিতে হইয়াছে। হুকুম আসিল নির্দিষ্ট তারিখে কমিটির সম্মুখে পাঠক্রমের খসড়া উপস্থাপিত করিতে হইবে।' যাহার উপরে এই খসড়া তৈরীর ভার পড়ে প্রকৃত পক্ষে তিনি পাইলেন মাত্র সাতটি দিন। কেন না খসড়া ত সাতদিন আগে 'ঘূর্ণির' নিযুক্ত কমিটির প্রত্যেক সভ্যকে পাঠাইতে হইবে। এমন সাত তাড়াতাড়িতে কি কোন সুষ্ঠু পাঠক্রম তৈরী করা যায়? কিন্তু হইয়াছে তাহাই। ইহার ব্যতিক্রম যদি কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে আমার চেয়ে বেশি কেহ সুখী হইবেন না। বস্তুতঃ Higher Secondary School বা

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই গ্রামতরা গ্রামের উপযোগী পাঠ্যক্রমই প্রস্তুত করা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এই পাঠক্রম অনুসরণ করিতে, অনুশীলন করিতে পারুক কি না পারুক সে দিকে কেহ বড় একটা নজর দেন নাই। অবশ্য বলিবেন বাংলা যখন বাধ্যতামূলক তখন অন্য সময়ে অধিক বিদ্যা আয়ত্ত করা যাইবে না কেন? এইখানে পণ্ডিতপ্রবর যোগেশচন্দ্রের কথা উল্লেখ না করিয়া পারি না। তিনি একবার দেখাইয়াছিলেন ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের বোঝা বহন করা দৈহিক ক্লেশকর ত বটেই, উপরন্তু দু হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী পাঠ্য বিষয়ের বোঝা মগজে বহন করা আরও দুঃসাধ্য। তখন দেখিয়াছি ভূগোলের পর্যন্ত 'নোট বই'।

আজ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম বিস্তৃততর এবং ব্যাপকতর হইয়াছে। আগেকার বিষয়গুলির কিছু ছাঁটকাট করিয়া কর্তা ব্যক্তিরা নূতন নূতন বিষয় ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন। তর্কশাস্ত্র, পৌরবিজ্ঞান-অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, অংকশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে। আমি এখানে কলা বিভাগের কথাই মাত্র বলিতেছি। ইতিমধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত প্রত্যেকটির জন্য দুইশত নম্বর এবং অপরাপর বিষয় হইতে দুইটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য দুই শত নম্বর। এইরূপে হাজার নম্বর ধার্য হইয়াছে। নবম ও দশম শ্রেণীতে আরও কতকগুলি বিষয় পড়িতে হয়। কিন্তু দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছেলেরা তাহা হইতে রেহাই পায়। মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা। এই বিষয় যাহারা লইবে তাহাদের ইংরাজী বাংলা বাদে ইহার উপর দুই শত নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। এই ধরণের কতকগুলি বিধি ব্যবস্থার ত্রুটিও অনেক। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষায় মেয়েরা নৈপুণ্য দেখাইলেও অধিকাংশকেই এইখানে ছেদ টানিতে হয়। কেন না এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্র অতীব সীমিত। মনস্তত্ত্বের বিষয়ে ঐ একই কথা। ছেলেরা বা মেয়েরা এই ধরণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিতেছি উচ্চতর শিক্ষায় অন্যান্য বিষয় লইতে বাধ্য হইয়া থাকে।

এ ত গেল ব্যবস্থাপনার দিক। ছেলেদের বা মেয়েদের শিক্ষাদানের দিক হইতেও অনেক কথা বলিবার আছে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (কি ছেলেদের কি মেয়েদের) কলেজী রীতিপদ্ধতি কিছু কিছু ঢুকিয়াছে। হয়ত বলিবেন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী ত আজ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে কেহই দ্বিমত করিবেন না। কিন্তু কলেজী হাল চাল যে নবম শ্রেণী হইতেই ঢুকিয়া গিয়াছে ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? কোন কোন শিক্ষাব্রতী বলেন, আজকাল রুটিন তৈরী করা একটা বিষম সমস্যা। বিষয় বাহুল্য হেতু পীরিয়ডের সময় কমিয়াছে এবং সংখ্যা বাড়িয়াছে। শিক্ষক সংখ্যাও বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপরের দিকে তাহাতে লাভ কি ক্ষতি হইয়াছে ভাবিয়া দেখুন। তিনটি মূল ভাষা শিক্ষার বিষয় বাদে অপর দুইটি বিষয় ছেলেরা বা মেয়েরা লইয়া থাকে নবম শ্রেণী হইতে। এই বিষয়গুলির শিক্ষার ভার স্বতন্ত্র শিক্ষাব্রতীর উপর ন্যস্ত। কলেজের মত তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি আলাদা রেজিষ্টার থাকে এবং ক্লাসে গিয়া তাঁহারা নাম ডাকেন। এ ত সাধারণ কথা। ইহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? কিন্তু এই ব্যবস্থায় যে একটি মারাত্মক ত্রুটি রহিয়াছে সে কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

অর্থনীতির শিক্ষক তর্কশাস্ত্র পড়ান না। মনস্তত্ত্বের শিক্ষক ইতিহাসের ধার ধারেন না। ভূগোলের শিক্ষকই বা অংকশাস্ত্র ঘাটিতে যাইবেন কেন? আবার এই অংক নাকি খুবই উচ্চ ধরণের বিদ্যালয়ের এমন সঙ্গতি নাই যে, এক একটি বিষয়ের জন্য একাধিক শিক্ষক রাখেন। কাজেই দেখুন যে

দিন তর্কশাস্ত্রের শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন সে দিন ইহার পাঠনা আর হয় না। ক্লাসে ছেলেরা বা মেয়েরা বলিয়া থাকে। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও এই একই কথা। আমি জানি শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী না আসায় কোন কোন দিন আট পীরিয়ডের মধ্যে চার বা পাঁচ পীরিয়ডই ছাত্র ছাত্রীদের বসিয়া থাকিয়া আলস্যে কাল কাটাইতে হয়। নানা রকম সোলবালের সৃষ্টি হয়। নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষাও দায় হইয়া উঠে। ইহারই বা প্রতিকার কি? আমাদিগকে এই সব বিষয় আজ ভাবিতে হইবে। কৈশোরকে ক্ষুব্ধ করিলে বা কৈশোরের শিক্ষায় গলদ ঢুকিলে জাতীয় প্রগতি পদে পদে যে বাধা প্রাপ্ত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

বিবিধ বিষয় পড়ানর মধ্যেও বেশ গলদ ঢুকিয়াছে। কিশোর মন এবং যুবক মন—ইহার মধ্যে বিস্তর তফাৎ। দেখি কিশোরদেরও যুবাদের মতই পড়ানর রীতি। শিক্ষক বা শিক্ষিকা ক্লাসে আসিলেন—কেহ এক একটি অধ্যায় ধরিয়া বক্তৃতা দিয়া যান, আবার কেহ বা পঙক্তির পর পঙক্তি পড়িয়া যান। মাঝে মাঝে দুই একটি শব্দের বা বাক্যাংশের মানে স্বরূপ কিছু বলেন। ইহাতে কিশোর মন পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। পাঠ্য বিষয়ও কিশোরদের মনে গাঁথিয়া যায় না। আমরা যখন কলেজে পড়ি তখন লজিক বা তর্কশাস্ত্র পড়াইতেন অধ্যাপক রাধারমণ বাবু। ইংরাজী বাহল্য, তবু তাঁহার পড়ান এত প্রীতিপ্রদ হইত যে, আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। কোন কোন বাক্য বা বাক্যাংশের যেমন 'few and far between' 'more reasons to seek' ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি করিতেন, তবু তাঁহার পড়ান আমাদের বড় ভাল লাগিত। তর্কশাস্ত্র এখন নবম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য। এ জন্য আলাদা শিক্ষক বা শিক্ষিকাও আছেন। কিন্তু এমন একটি সুন্দর বিষয় যদি দৃষ্টান্ত দিয়া ভাল ভাবে পড়ান হয় তাহা হইলে কিশোর চিত্তও আনন্দ পাইতে পারে। বইয়ের ভাষা খটমট তার উপর শিক্ষয়িত্রীর পড়ান আশানুরূপ নহে। এ কারণ এই মনোজ্ঞ বিষয়টি ছেলে বা মেয়েদের মনে আদৌ ধরে না। শুনিয়াছি এ বিষয়টি পড়িবার জন্য একটি ছাত্রী কোন শিক্ষিকার বাড়ী যান এবং মাসে ৪০ কি ৫০ টাকা দক্ষিনা দেন। অন্যান্য বিশেষ বিষয়ের বেলায়ও ঐ এক কথা। তবে কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা যে ভাল করিয়া পড়ান না বা পড়াইতে পারেন না, একথা আমি বলি না।

স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষিকা পৌরবিজ্ঞান ও অর্থনীতি পড়ান। তাঁহার পড়াইবার কায়দা এমন যে, মেয়েরা কিছুই বুঝিতে পারে না। বাণ্মাষিক পরীক্ষায় একটি মেয়ে মাত্র পাস করে, অপর সকলেই ফেল হয়। তখন বর্ষাকাল, তিনি ঘরে ঢুকিয়া কাব্যি করিয়া বলিলেন 'আজ মেঘের ঘনঘটা একটু পরেই অজস্র বারিবর্ষণ হইবে, তোমরাও একটু পরেই যখন মজর পাইবে তখন গলদশ্রু লোচনে কোঁপাইয়া কোঁপাইয়া কাঁদিতে থাকিবে!' এই নির্মম উক্তিও অগ্রাহ্য করিতাম যদি বুঝিতাম তিনি ক্লাসে পঠিতব্য বিষয় মেয়েদের ভাল করিয়া পড়াইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধেই একবার শুনি, বাণ্মাষিক পরীক্ষার খাতা দুই মাস রাখিয়া পরে না দেখিয়াই মেয়েদের ফেরত দেন! এ রকম গলদ হয়ত বেশি নয়। তবে ইহার দৃষ্টান্ত যে একেবারেই কম তাহাও বলিতে পারি না।

উচ্চতম শ্রেণীগুলিতে পড়াইবার গলদের কথা বলিতেছি। এই সময় আর একটি কৌতুককর বিষয়েরও উল্লেখ না করিয়া পারি না। ছেলে-মেয়েদের আত্মপ্রত্যয় কিরূপ কমিয়া যাইতেছে ইহা তাহার একটি উদাহরণ। ইংরাজী সম্বন্ধেই বলিতেছি। আগে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের আত্ম-প্রত্যয় যে হইতে পারে না তাহা সহজেই আমরা বুঝিতে পারি। দেখুন দশম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত মেয়েরাও গৃহশিক্ষকের নিকট ইংরাজী পড়িতে যায়! ইহার মানে কি? যাহারা ভাল ছেলে বা মেয়ে তাহাদেরও কি ইংরাজী বিষয়ে এতটুকুও আত্মপ্রত্যয় বা বিশ্বাস জন্মে নাই। অন্য পরে কা কথা। আমি ত শুনিয়া অবাক।

আমি বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিভাগের কথা এখানে বলিতেছি না। তবে ইংরাজী প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। স্থানীয় একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর আই দশটি

করিয়া ছেলে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতেছে। তাহাদেরও নম্বর যখন আসে তখন দেখা যায় ইংরাজীর দুই শত নম্বরের মধ্যে তাহারাও পাস মার্কের উপরে খুব কম নম্বরই পাইয়াছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে ছেলে মেয়েরা অধিক নম্বর পায় বলিয়া প্রথম বিভাগে যাইতে আটকায় না।

নবম হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কোন বিষয়ে কত পীরিয়ড পড়ান হয় তাহার একটি মোট পরিসংখ্যান লওয়া আবশ্যক। এই ১৯৬৪ সনের কথা আলাদা করিয়া বলিলে হয়ত অনেকের অনেক রকম কৈফিয়ৎ শুনা যাইবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাত্র ধর্মঘট, শিক্ষক শিক্ষিকা ধর্মঘট প্রভৃতি নানা কারণে কতদিনই স্কুল বন্ধ রহিয়াছে। তবু এ বৎসরেরও একটি পরিসংখ্যান লইলে বুঝা যাইবে ছুটিছাটা-হীন পূর্বেকার দুইটি বৎসরে কত অধিক পীরিয়ড পড়ান হইয়াছে। তুলনামূলক আলোচনাও হওয়া দরকার। আর একটি বিষয়ে sample survey বা নমুনা পরিসংখ্যান লইলেও ভাল হয়। একটি বিশেষ অঞ্চল ধরুন, হিসাব লউন কটি ছেলেমেয়েদের উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কোন ক্লাসে কটি ছেলেমেয়ে পড়ে, শিক্ষয়িত্রী কত, গৃহ শিক্ষক, কোচিং ক্লাস বা শিক্ষণ কেন্দ্রই বা কত, ইহাতে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের সংখ্যা কিরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। আসল বিষয় পড়ান ও পড়া লইয়া। ইহার ব্যত্যয় না ঘটাইয়া উৎকর্ষ সাধই আবশ্যক। যতই গৃহ শিক্ষক এবং শিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িতেছে ততই বিদ্যালয়ের ও বাড়ীর শিক্ষার গলতি হইতেছে। বর্তমানের হাল চাল দেখিয়া এইরূপই আমার প্রতীতি হয়।

পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে আমার এখন কোন বক্তব্য নাই। কেননা ইহা আমার লেখার বিষয়ের বাহিরে। তবে একটি কথা না বলিয়া পারি না। পরলোকগত বিমলচন্দ্র সিংহ বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের জন্য কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহার একটি ছিল বিলাতের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্বন্ধে। দেখিলাম এই পাঠক্রম হইতে কলা বা বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরগুলি কোনটিই বাদ পড়ে নাই। আপাতদৃষ্টিতে পাঠক্রম ভারি ঠেকিবে। আসলে কিন্তু তাহা নয়। ছেলেমেয়েদের ঐহিক বিষয়গুলির সাধারণ জ্ঞান দেওয়াই এই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য। ইহাতে কোন বিকল্প বা পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয় নাই। প্রত্যেকটিই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে পড়িতে হইবে। পাঠক্রম এই ধারণা বশে নির্দিষ্ট হয় যে, শতকরা নব্বই পঁচানব্বই ভাগ ছেলেমেয়েরই শিক্ষা এইখানেই সমাপ্ত হইবে। তাহারা প্রতিরক্ষার বিভিন্ন বিভাগে, শিল্পে, বাণিজ্যে, কলকারখানায়, স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। প্রাথমিক জ্ঞান হিসাবে যতটুকু বিদ্যা আয়ত্ত করা দরকার তাহাই এই পাঠক্রমের লক্ষ্য। আমাদের লক্ষ্য কিন্তু অন্য দিকে। মুখে স্বাধীন স্বাধীন বলিতেছি, কিন্তু মানসিকতায় এখনও পুরাতন পরাধীন। নূতন পরিবেশের একান্ত অনুপযোগী ধারণা লইয়াই কাজ চালাইতে অভ্যস্ত। আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়-গুলির পাঠক্রম তৈরীর উদ্দেশ্য কলেজী শিক্ষায় যাহাতে ছেলেমেয়েরা উন্মুখ হইয়া উঠে। ইহার ফল যে কিরূপ বিষময় ও ভয়াবহ তাহা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠি।

মানুষের ভিতরকার মনুষ্যত্ব জাগ্রত করিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইতে পারিলেই শিক্ষালাভের সার্থকতা। আমাদের এখন সকলের চেয়ে বড় কাজ ছেলেমেয়েদের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত করান। কলেজী শিক্ষার প্রস্তুতির ব্যবস্থা করার মধ্যে ইহার সার্থকতা আদৌ দেখি না। দেশের, রাষ্ট্রের, সমাজের স্থিতির, উন্নতির ও প্রসারণের পক্ষে যে ধরণের শিক্ষা আবশ্যক তাহারই ব্যবস্থা আমাদের করিতে হইবে। পূর্বে বলিয়াছি পরাধীন ও স্বাধীন ভারতে তফাৎ যেন সুমেরু ও কুমেরু। পরাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদীর প্রয়োজনে আমাদের সকল কার্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আজ সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি আমরা। এখন আমরা নানা রকম জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য ভাবিতেছি। কিন্তু এই সমাধানের খুঁটি যাহারা তাঁহাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের কি উপায় হইতেছে? এইখানেই আসে শিক্ষার ভোল পরি-বর্তনের কথা। ইহাই আজ আমাদের মূল সমস্যা।

———

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শিক্ষা

মহি কল্যাণকৃৎ কাঙ্ক্ষিত্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | পৌষ-মাঘ, ১৩৭১ | ২য়-৩য় সংখ্যা

আলোচনা

অবশ্য জ্ঞাতব্য

আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক সকলকে আমাদের পত্রিকার গুণ অধিকতর বৃদ্ধি করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। আমাদের পত্রিকা মনে হয় সুলভতম, বার্ষিক চাঁদা ৩ টাকা ৫০ পয়সা মাত্র। সুখের বিষয়, দুই চারি জন এবারও বিনা তাগিদে বাকি রকেয়া এক সঙ্গে দিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা কম হইলেও তাঁহারা যে যেওয়ার কথাটা একেবারে ভুলিয়া যান নাই, ইহাই আশার কথা।

এই সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিতেছি যে আমাদের বিজ্ঞাপনের হারও এইবার হইতে বাড়াইয়া দিলাম, তথাপি ইহা সমপর্যায়ের পত্রপত্রিকার তুলনায় খুবই অল্প। প্রতি পৃষ্ঠা ৫০৲ অর্ধ পৃষ্ঠা ৩০৲ সিকি পৃষ্ঠা ১৫৲ পনেরো টাকা, পিছনের কভারের পৃষ্ঠা ৬০৲, তাহার অর্ধ পৃষ্ঠা ৪৫৲ সিকি পৃষ্ঠা ২৫৲ টাকা।

আমেরিকায় ভারত-পরিচয়

আমেরিকায় ভারত বিষয়ে জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা দেখাদেখির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুত চালু হইতেছে। গত সংখ্যায় এ বিষয়ে আমরা কিছু কিছু সংবাদ দিয়াছি। আরও ব্যাপকভাবে ব্যবস্থা চালু হইতেছে। সেখানকার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা এদেশে আসিয়া অল্পদিন থাকিয়া এদেশের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবেন। কবিগুরু তো বলিয়াছিলেন—

"দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে,
যাবে না ফিরে"—

সেই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইতে চলিয়াছে। তবে দেখিতে হইবে, ভারত এই লেন-দেনের ব্যাপারে তাহার স্বকীয়তা না হারাইয়া ফেলে। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার পরিচয় বাড়িতে থাকুক, তাহা অবশ্যই কাম্য, কিন্তু আমেরিকার ভাবস্রোতে ভারতকে গা ঢালিয়া দিলে চলিবে না। উভয়দেশের ঐতিহ্য মহান, কিন্তু পৃথক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এক বা একাধিক মনীষির দীক্ষান্তভাষণ শুনিতে পাওয়া যায়,

এবং ছাত্রসভ্যদের পক্ষে ও ছাত্রসমাজের বাহিরেও যাঁহারা তাঁহাদেরও শোনা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ শিক্ষকমণ্ডলী পর্যন্ত সর্বত্র শুনিতে পাইতেছি, টেকনলজি শেখ, বিজ্ঞান শেখ। বিজ্ঞান অবশ্য সকলকেই শিখিতে হইবে, কিন্তু তাহাও সহজ নয়। বাংলার মাধ্যমে না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার হইবে না, পণ্ডিতেরা বলিতেছেন। আমরা কোথায় যাই। রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন, আমাদের পিতামাতা যে প্রাচীন বটবৃক্ষতলে বসিয়া আমাদের উপদেশ দেওয়ার জন্য নিশ্চিন্তভাবে অপেক্ষা করিতেছেন, সেসব কি ভুলিয়া যাইব? বিজ্ঞান অবশ্য শিখিব, কিছু কিছু লোক টেকনলজিও শিখিবে, কিন্তু ভারতের অধ্যাত্মবিদ্যাই যে ভারতের প্রকৃত সম্পদ ঘোর দুর্দিনেও তাহা ভুলিলে চলিবে না। শান্তিনিকেতনের এবং বিশ্বভারতীর ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মূল্য এইখানে।

কৃষিবিদ্যা শিক্ষা

সমাবর্তন ভাষণের আর একটি বক্তব্য বিষয়, কৃষির সম্প্রসারণ। বাঁচিতে হইলে খাদ্য চাই—কৃষির ব্যাপ্তি চাই। ইহাই কৃষিবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। সেজন্য আয়োজন যথেষ্ট হইতেছে, কিন্তু ফল এতাবৎ তেমন কিছু দেখিতেছি না, অর্থাৎ ব্যাপক ভাবে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রত্যাবায় হইত। এই ত্রুটি আজকাল ভারতের প্রকৃত অবস্থা মনে করিয়া চোখে বড়ই ঠেকিতেছে। সমাবর্তন উৎসবে এবং অন্যত্র শিক্ষাহিতৈষীদের এ বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

নূতন সহযোগী

আমরা সানন্দে প্রকাশ করিতেছি—১লা জানুয়ারী হইতে "চলতি জগৎ" নামে ৪ পৃষ্ঠার একটি পাক্ষিক কাগজ মুদ্রিত করিয়া বাহির হইতেছে। সদ্য সাক্ষরদের জন্য এই পত্রিকা, ইহাতে সদ্যসাক্ষরদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য থাকিবে।

মূল্য প্রতি সংখ্যা পাঁচ পয়সা ও বার্ষিক (২৪টি সংখ্যা) এক টাকা।

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

স্মরণে

পরলোকগত শিক্ষকদের প্রতি সংক্ষেপে শ্রদ্ধা নিবেদনের অবকাশে আমরা স্মরণ করি স্বামী বিমুক্তানন্দজীকে—ধর্মজীবনের মধ্যে যিনি শিক্ষার সাধনা করিয়া গিয়াছেন—এবং বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা বাস্তব রূপ দিতে পারিয়াছিলেন; রেভারেণ্ড বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে যিনি বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিশেষ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। অল্পকথায় ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব নয়, তথাপি ইঁহাদের নামকরণও সম্ভব না হইলে

শিক্ষাশাস্ত্রী গান্ধীজী

কাকাসাহেব কালেলকর

ভক্তদের রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেই গান্ধীজীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেখানে আমার শিক্ষকের কাজ ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়া গান্ধীজী আমাকে তাঁহার আশ্রমে ডাকিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে তিনি আশ্রমের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃত্বের আমাকে সমর্পণ করিলেন। বলিলেন যে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রচার কি ভাবে হইবে ইহা ভাবিয়া দেখিবার কাজ, আর আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতবর্ষে সর্বত্র ছড়াইয়া দিবার কাজ কাকার উপর রহিল। নিজের মাথায় এত বড় মিশন লইবার জন্য আমার কোনও প্রস্তুতি ছিল না; কিন্তু গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত মনে করিয়া প্রয়োগের দ্বারা তাহা আত্মসাৎ করিবার সংকল্প করিলাম।

নিজে শিক্ষাশাস্ত্রী বলিয়া দাবি করি—গান্ধীজীকে খুবই নিকট হইতে দেখিলাম।

শিক্ষাশাস্ত্রী—এডুকেশনিস্ট—কাহাকে বলিব? জীবনের বিকাশের জন্য যে যে সাধনা করা হয়, তাহা সকলই শিক্ষা। শুদ্ধ ব্যক্তিগত জীবনেও মা-বাপের নিকট হইতে প্রাপ্ত পারিবারিক সংস্কার, আর পূর্বজন্মের অবতীর্ণ দৈবী ও আসুরী —সমস্তই বিচার করিতে হয়, আর আমরা তো ব্যাপক জীবনে ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মনুষ্য জীবনের অন্তর্গত করিয়া লই, অগ্রসর হইয়া স্বীকার করি যে মনুষ্য জীবনও জীবসৃষ্টির এক অংশ মাত্র। জীবন-মীমাংসা ও জীবন-সাধনা, জীবসৃষ্টির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিকাশলাভ করিতে পারে।

এই দৃষ্টি হইতে দেখিলে তিনিও শিক্ষাশাস্ত্রী হইতে পারেন যাঁহার সম্মুখে জীবসৃষ্টির মধ্যে যে সামগ্রস্য বিকাশলাভ করিতেছে তাহার ব্যাপক চিত্র উপস্থিত রহিয়াছে এবং যাহার দ্বারা তাঁহার সুখের জীবনসাধনার স্বরূপ স্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে।

গান্ধীজী ব্যাপক বিশ্বে ও সমাজের জীবন বিকাশের এক চিত্র সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। তিনি সেই জীবন বিকাশের দিক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এরূপ জীবনের রহস্য তিনি সত্য ও অহিংসা, সংযম ও সেবা এই চারটি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। এই চারটি তত্ত্বের জ্ঞান তাঁহার মনে কতখানি গভীর ছিল, তাঁহার সঙ্গীরাও সম্পূর্ণ জানিতেন না। আর আমার মনে হয় তাঁহার নিজের বিশাল সাহিত্যের দ্বারাও তিনি এই প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারটি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হইত, তবে বলিতেন "সত্য ও অহিংসার সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা, তাঁহার চিন্তা ও জীবনের দ্বারা অখণ্ডভাবে ও উৎকর্ষের সহিত নিয়ত চলিতেছে। সত্য ও অহিংসার সাক্ষাৎকার দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিতেছে, কিন্তু একথা বলা যায় না যে, আমার এই সাক্ষাৎকার পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছে।" তিনি একথাও বলিতেন, "সত্যই ঈশ্বর, আর অহিংসা হইল তাঁহাকে পাওয়ার সাধনা। সেজন্য এই দুইটি অমর। সাধনা শেষ দিন পর্যন্ত চলিবেই। উহার অন্তিম লক্ষ্য—মোক্ষ; আর মোক্ষ অর্থ বিশ্ব হইতে মোক্ষ।"

গান্ধীজী এই শব্দগুলি হয়ত কখনও বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার ভাব ত এইরূপই ছিল। গান্ধীজীর সমস্ত চেষ্টা বর্তমান সংস্কৃতির সীমা পর্যন্ত বিচার করিয়া মনুষ্য জাতিকে বিশ্ব মুক্তির দিকে লইয়া

যাওয়ায় মত ছিল। আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত কর্মসাধনা একেবারে সরল কিন্তু গুরুরূপে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আরম্ভ করিতেন। তিনি জানিতেন ও বলিতেন, হেতু শুদ্ধ ও ব্যাপক হইলে কর্মসাধনা যতই ক্ষুদ্র পরিসরে হোক না কেন, উহা উৎকর্ষ এবং ব্যাপক করিতে দেরি লাগে না, কখনও কঠিন লাগে না।

এরূপ ব্যাপক এবং শুদ্ধ বুনিয়াদকে জীবন দৃষ্টির বলে তিনি নিজের জীবনকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর দেশসেবা ও সমাজসেবা করিতে করিতে Ideals of Education নির্দেশ করিতেন আর তাঁহার এই আদর্শ লোকে সহজে বুঝিতে পারিত, এরূপ ছিল তাঁহার স্বচ্ছ বুদ্ধি।

শিক্ষাশাস্ত্রীর প্রথম কার্য হইল, শিক্ষার আদর্শ নিরূপণ করা, গান্ধীজীর সমস্ত জীবন দর্শন, জীবনের প্রয়োগের দ্বারাই নিজের রূপ পরিগ্রহণ করিত। এজন্য তিনি তাঁহার জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার আদর্শকে একেবারে বর্ণের রূপ দিয়াছিলেন।

Ideals of Education ইহার পর আসা চাই Contents of Education. শিক্ষার ধারায় কি কি শিখিতে হইবে, কোন কোন শক্তির বিকাশ হওয়া চাই, জীবন সাধনার সফলতা পাইবার জন্য কোন কোন কৌশল প্রয়োজন, কোন কোন জ্ঞান বুনিয়াদি, এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষার স্বরূপ নিরূপণ করা চাই। একাজ শুধু শিক্ষাশাস্ত্রীর নয়, জীবন উৎসর্গকারীর, লোকসেবা যুগপুরুষকেই শিক্ষাশাস্ত্রী হইয়া এসব কাজ করিতে হয়।

মানবজাতি নিজের ইতিহাস জুড়ে কি কি ভুল করিয়াছিলেন, কোন কোন ক্ষতি হইয়াছিল, কি উৎপাত হইয়াছিল সেসবের কোন পথ প্রকৃত পথ এবং তাহার জন্য কি কি করা চাই, এইসব ভাবিবার ও নিজের যুগের সীমা হইতে উপরে উঠিবার যাহার ক্ষমতা আছে, সেই এরূপ কাজ করিতে পারে। তাহার দৃষ্টি যতই জীবনসমৃদ্ধ হউক, অতীতের গৌরব যতই তিনি বুঝুন, আর এই কথার কোন ক্রমেই পুরাপুরি ধারণা যতই থাকুক, যে ভূত কালে মরিয়া যায় না, বরং বর্তমান কালের মধ্যে পরকায়া প্রবেশশক্তির দ্বারা নিজের কাজ নিরন্তর করিতে থাকে, যুগপুরুষের ধ্যান ও তাহার দৃষ্টি ভবিষ্যৎ-কালের দিকেই কেন্দ্রিত থাকে। বর্তমানকালের দাবদ হিসাবে যতই মূল্য থাকুক, অন্তিম সাধ্য তো ভবিষ্যৎ কাল, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া প্রকৃত জীবনশাস্ত্রী শিক্ষার কথা চিন্তা করেন।

গান্ধীজীর মধ্যে এই সব তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে পাওয়া যাইত; এইরূপে তিনি যত চিন্তা করুন, কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারা এদিকেই চলিতেছিল, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে।

মধ্য শ্রেণীর ও উচ্চ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা তিনি সাধনাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের দ্বারা প্রস্তাবিত হইয়া নয়, অহিংসা ও কারুণিকতার জন্য। ইহার দ্বারা চেষ্টা ব্যাহত হইতে থাকিলেও, আসল নিরাশা পৌঁছাইলেও, লোকে আত্মশক্তি আহরণ করিতে উদ্যত হইল এবং ভগবানও তাঁহার বক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিবদ্ধ ভারতীয় মজুরদের সেবার কার্য সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিলেন।

যখন লোকদের দারিদ্র্যের সেবা করিতে হইত তখন উন্নত জীবনের অভ্যাসেও এই মহত্ত্ব যাইত না। যেখানে পেটভরা পুষ্টিকর আহারই পাওয়া যাইত না, সেখানে নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য, মূল্যবান দুগ্ধ ও মধুর সঙ্গীতের চেষ্টা মানুষ ভাবিতেই পারে না। গান্ধীজীর শিক্ষাদৃষ্টিতে এই সমস্ত স্থান পাইত। উদ্দেশ্যকে তিনি প্রাধান্য দিতে কখনও কার্পণ্য করিতেন না।

Ideals of Educations ও Contents of Education-এই দুইয়ের পরে আসে Methods of Education. ইহাতে শিক্ষকদের সমস্ত জল্পনা দেখা যায়। আর আজকাল শিক্ষা-শাস্ত্রীতো তাঁহাকে বলে যিনি এ বিষয়ে পারদর্শী।

শিক্ষণ অথবা অধ্যাপনা সুন্দর ও প্রভাবশালী কলা। আত্মার বিকাশের জন্য এই কলার সর্বোচ্চ বিকাশ হওয়া চাই, ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্ধকার যুগ এই কলার পিছনে পড়িয়া আছে এবং ইহাতে তালমতই সিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিতে হয়, এ সমস্তই খানিকটা একপেশে হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিকতার শিক্ষাব্রতীদের স্বতন্ত্রতার কিছুটা পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু পুরা নয়। জীবনের বিষয়ে যখন তাঁহাদের গভীর ও সম্পূর্ণ দৃষ্টি মিলিবে, তখন শিক্ষা পদ্ধতিতে অনেক কিছু সংস্কার হইবে এবং অধ্যাপকদের নিজেদের জীবনে অনেক-কিছু মৌলিক সংস্কার হইবে। ইহা তখনই হইবে, যখন অধ্যাপকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের উপদেশ, তাঁহাদের অধ্যাপনকলা, তাঁহাদের জন্য রচিত বাহ্য বায়ুমণ্ডল —এ তিনটির অপেক্ষা তাঁহাদের জীবনেরই শিষ্যদের উপর অধিক ও প্রধান প্রভাব হইবে।

আমি একথা মানি না যে গান্ধীজী অধ্যয়নকলা গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু পরিবার লইয়াই যে পারিবারিক বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্যেই তাঁহার শৈশবকাল কাটাইতে হইয়াছিল। এজন্য বড়দের প্রতি সমাদর ও সেবার ভাব উহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সমবয়স্ক ও ছোটদের প্রতি প্রেম ও আত্মীয়তা থাকার জন্য তাঁহার বিকাশের চিন্তা ও দায়িত্ববোধ ছিল। এজন্য তাঁহার মধ্যে অধ্যয়নকলার বিকাশ যে হইয়াছিল, তাহা ছিল তাঁহার মূলগত। আমি এ কথা স্বীকার করিয়া যে, তাঁহার নিজস্ব শিক্ষণের দ্বারা কোন আদর্শ অধ্যাপকের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। বিলাতে আইনের অধ্যাপকদের, সামাজিক নেতাদের, ধর্মপ্রাণ মিশনারীদের সঙ্গ তিনি লাভ করিয়াছিলেন, সে সব কথা তিনি তো আত্মচরিতে বলিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার বিশাল আশ্রম-পরিবারের শিশুদের পড়াইতে গিয়া তিনি অধ্যাপনা কলার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহাকে তিনি অতিশয় গুরুত্ব দিয়াছিলেন। এখানে তিনি মানবতার উচ্চ আদর্শ সামনে রাখেন নাই, সচ্চরিত্র, একনিষ্ঠ, শত্রু এবং আদর্শ সেবক তৈয়ার করিতে চাহিয়াছিলেন। এ আদর্শ যথেষ্ট উন্নত, সত্য; এক জনের কথা কি, এক মত বড় যুগের সমস্ত শক্তি লইয়াও ঐ আদর্শে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

তথাপি ঐ আদর্শের সঙ্গে তিনি অধ্যাপনকলার যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কলা হইয়া পড়িয়াছিল গৌণ, তাহাকে অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। অধ্যাপনকলায় বিদ্যার্থী ও তাহার পূর্ব সংস্কার জানিবার যে আবশ্যকতা হয় তাহা গান্ধীজীর মধ্যে পুরাপুরি দেখা যায় নাই।

তাঁহার মধ্যে মানুষকে চিনিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, তিনি মানুষকে চিনিতেন কর্মী স্বরূপে। অন্য সকল বিষয়ে তাঁহার মানস, একরকমে গৌণ ছিল।

সঙ্গীদের জীবন বিকাশে গান্ধীজী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার মধ্যে যতখানি শক্তি থাকা চাই তাঁহার মধ্যে ততখানি ছিল— আমার অভিজ্ঞতা সে কথা বলে না। অধ্যাপন-কলায় প্রবীণ বলিয়া তাঁহাকে আমার কখনও মনে হয় নাই। তাঁহার মধ্যে যাহা কিছু অধ্যাপনকলা দেখা যাইত তাহা হইল তাঁহার অসীম প্রেম ও অহিংসার সাধনার জন্য। এই দুই তত্ত্ব যে কোনও অধ্যাপকের দোষ ক্ষালনের জন্য যথেষ্ট। অধ্যাপন কলা এই দুই তত্ত্বের মধ্যদিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। এইজন্য গান্ধীজী কিছু দূর পর্যন্ত সকল অধ্যাপক হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যাপন কলায় চিন্তন ও অনুশীলন যদি সযত্নে করিতেন তবে শিক্ষাব্রতী হিসাবে এক অদ্বিতীয় ঋষি ও আচার্য হইয়া দাঁড়াইতেন। কিন্তু তাঁহাকে এক নিমজ্জমান দেশকে বাঁচাইতে হইবে, আর বাঁচিয়া লোকোত্তর কার্য করিতে হইবে। তাহার মধ্য হইতে এক পরিকৃৎ শিক্ষাব্রতী হইয়া গেলেন। ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।*

*শিক্ষার জন্য 'মানসপ্রভাত' হইতে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক অনূদিত।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা

শ্রীসবিতারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

[পশ্চিমবঙ্গের বহুমুখী বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা প্রবর্তন করা হইয়াছে। বহু বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষকও নিযুক্ত করা হইয়া থাকে, কিন্তু শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ভাল নাই। যদিবা যন্ত্রপাতি এবং ক্লাশঘর পাওয়া যায় তাহা হইলেও শিল্প শিক্ষার জন্য যে সময় দেওয়া হয় তাহাতে শিল্প সম্বন্ধে তাত্ত্বিক কিছু শিখিতে পারে হয়ত, কিন্তু প্রকৃত শিল্প শিক্ষা হয় না। ইহার বিহিত প্রতিকার হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ বর্তমান না হইলে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি সুদূরপরাহত।]

শিক্ষাবিদ্‌রা পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে শিল্প শিক্ষার গুরুত্ব মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও প্রচুর। তাঁহারা বলিয়াছেন—Let a young man draw a perfect straight line, he will learn so many things which no lips of a teacher could ever teach him. এই ফলকে বাস্তবে পাইবার জন্য নিম্নতনশ্রেণীতে শিল্প শিক্ষা চালু করা হইল। মাত্র কয়েক বৎসর হইল এই শিল্প শিক্ষা চালু হইয়াছে কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা হতাশ হইতেছি, ভাবিতেছি এই শিক্ষার কোন মূল্যই নাই, শিক্ষাবিদ্‌দের গবেষণা সত্য নয়। আমরা সব কিছুরই ফল চাহি, কিন্তু ফল পাইতে হইলে বীজ পুঁতিলেই হয় না। তাহার উপর বহু সাধ্যসাধনা ব্যয় করার প্রয়োজন। নতুবা তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইবে না অথবা তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। বর্তমান শিক্ষাজগতে শিল্প শিক্ষার এই বাস্তব ফলাফল নির্ধারণে দারুণ ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইতেছে। এই বিষয়ে আমি দু একটি কথা বলিতে চাহি। তাহার সার হইল সাধনা ছাড়া যাদুর সিদ্ধিলাভ ঘটে, নতুবা বিড়ম্বনা, ইতিবত্তায় তাহা পর্যবসিত হয়।

শিল্প শিক্ষক সপ্তাহে একটি বড়জোর দুইটি ক্লাশ খুলে পাইয়া থাকেন। ক্লাশের সময় ৩৫ মিঃ, বা ৪০ মিঃ। এই অল্প সময়ে একজন শিল্প শিক্ষকের পক্ষে ক্লাশের সমস্ত ছাত্রকে (ধরা যাউক ৩৫ হইতে ৪০) শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই অত্যল্প সময়ে শিক্ষার্থীদের অভিপ্রায়কে নিষ্ঠ করা অসম্ভব। যন্ত্রপাতি ঠিক করিতে প্রচুর সময় দরকার হয়। দেখা যাবে ৩৫ মিঃ. কি ৪০ মিঃ ছেলেদের যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া দিতে ও কার্যোপযোগী করিতেই চলিয়া গেল। একেত্রে সুফল আশা করা বৃথা মাত্র। তাহা ছাড়া একজন শিক্ষক যেখানে মাত্র বড়জোর বিশজন ছাত্রকে দেখাইতে পারেন সেখানে তাঁহাকে পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ জন ছাত্রকে দেখাইতে হয়। ইহা প্রধান অসুবিধা।

দ্বিতীয় অসুবিধা এই। স্কুল কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেন না। তাহার কারণ, এই শিক্ষাকে ফালতু মনে করেন। শিল্প শিক্ষায় অকৃতকার্য হইলে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র প্রমোশন পায় না। কিন্তু আইনগত এই বাধা তাঁহাদের সুব্যবস্থায় বাধাস্বরূপ থাকে না। শিল্প শিক্ষককে বলিয়া কহিয়া বা গোপনে নম্বর পাঠাইয়া দিয়া ছাত্রদের পাশের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকারের অবাঞ্ছিত কাজও কোন কোন শিক্ষায়তনে চলিতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। অতএব মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ-এর কাছে এই কাতর আবেদন জানাইতে চাহি, তাঁহারা এবিষয়ে বিশেষ সচেতন হউন। তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে

এই প্রকারের হইলে সুফল ও খুবের কথা সুকলই প্রসবিত হইবে।

তৃতীয় অসুবিধা এই যে সামান্য যন্ত্রপাতি স্কুলে থাকিলেও কাজের উপাদানগুলি আর পাওয়া যায় না। যন্ত্রপাতির ঘরে সিমেন্ট তরিয়া রাখার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তাহার ফলে যন্ত্রগুলিতে মরীচা পড়িয়া গিয়া যন্ত্রগুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়। হেডমাষ্টার মহাশয়রা এই শিক্ষায় আগ্রহশীল হইলে কোন অসুবিধাই দেখা দেয় না। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে তাঁহারা অনাদরে এইগুলির সমালোচনা করেন বলিয়া রিকুইজিশন করা সত্ত্বেও কাজের ব্যবহারিক উপাদানগুলি আর পৌঁছায় না। সেই কারণে শিল্প শিক্ষককে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান পরিবেশন করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হয়। কিছুদিন যাবৎ এক আগাছে এইরূপ চলিতে থাকার জন্য ছেলেদের মনঃপীড়া উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয় শিল্প শিক্ষায় বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, উন্নাসিক মনোভাব। সেই তরুণ ভবিষ্যতে গিয়া কোনদিনই শিল্পশিক্ষার ফল অনুভব করিতেই পারে না। পশ্চাদ্বর্তী তরুণদের নিকট আলাপ আলোচনা কালে তাহাদের সেই বিতৃষ্ণ মনোভাব ব্যক্ত হয়। প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে ছাত্রবৃন্দ তাহাদের সেই নৈরাশ্যজনক মনোভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে এবং পূর্ববর্তীদের অনুবর্তী হইয়া পড়ে। পৃথক কিছু ফল লক্ষ্য করা যায় না।

চতুর্থ অসুবিধা এই যে, শিক্ষায়তনগুলিতে শিল্প শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা অতি সামান্য। বর্তমান সমাজে চাকুরির পয়সার অঙ্কে আমরা ব্যক্তির মূল্যনির্ণয় করিয়া থাকি। সেই সমাজে বাস করেন শিল্প শিক্ষক-ও। কিন্তু তাঁহার মাহিনা ১১৫ হইতে ১৮৫ টাকা। এই অল্প মাহিনা অন্যান্য শিক্ষকের কাছে যেমন হেয়, সমাজের কাছেও তেমনি। ছাত্ররাও সমাজের ঐ মনোভঙ্গি শিল্প শিক্ষককে সম্মান দেয়। ফলে শিল্প শিক্ষক শিক্ষায়তনে মুখ ঢেকে চলেন। তাঁহার শক্তি, উৎসাহ দিনক্রমে হ্রাস পায়। সুযোগ ঘটিলেই অন্য চাকুরীর সন্ধান করেন। ফলে ভাল শিক্ষক স্কুলগুলিতে থাকেন না। বেতনের হার সমুচ্চে লইয়া যাওয়া হউক বা নাই হউক অন্যান্য শিক্ষকদের সমপর্যায়ে লইয়া না যাওয়া পর্যন্ত ইহার সুরাহা নাই। ইহা ছাড়া শিল্প বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকগণের জন্য বিদ্যালয়গুলিতে কোন স্থানই রাখা হয় নাই।

উপরোক্ত বিবিধ অসুবিধা দূরীকরণ ও শিল্প শিক্ষার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা অবলম্বিত হওয়ার জন্য সরকারের সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন। দেশ উন্নয়নের শিল্পমুখ হইয়াছে। এই শিল্পবিকাশে সহায়তা করিবে ঐ সমস্ত শিল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদল। তাহাদের জীবিকা সন্ধানে, বুদ্ধির উন্নয়োত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে এই শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাছাড়া ছাত্রাবস্থাতে এই শিক্ষার মাধ্যমে যদি ছাত্রদের দেহমন গড়িয়া উঠে তাহা হইলে ভবিষ্যৎ নাগরিক হইবে সুখী, সম্পদশালী। প্রাণপ্রাচুর্যের বন্যা বহিবে ধরণী ধারায়। তাহারই শীতল ধারায় স্নাত হইবে সমাজ, জাতি তথা দেশ।

শিক্ষায় পরিবেশ

শ্রীকালিদাস বসু

মানুষে মানুষে আমরা প্রত্যেকে আলাদা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই যে পার্থক্য—তা বহু কারণের উপর নির্ভর করে। এ সমস্ত কারণকে চূড়ান্তভাবে দুটি মূল কারণে ভাগ করা যায়—বংশগতি ও পরিবেশ। মান্-এর ভাষায় বলা চলে: "Nature" ও "Nurture"। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই এই দুটি শক্তি কাজ করে। প্রত্যেক মানুষই, সংক্ষেপে বলা যায়, বংশগতি ও পরিবেশের ফলশ্রুতি। মানুষকে বুঝতে গেলে—তাদের মধ্যে তফাৎ বুঝতে গেলে—এ দুটিকেই বুঝতে হবে। কোনটিই বাদ দেবার নয়, কারণ, "Man is not exclusively either heredity or environment, but heredity and environment."

এ দুটির মধ্যে কোনটির প্রভাব বেশী—এই নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মত, তাঁদের মতভেদের অন্ত নেই। একদল বংশগতির ওপর জোর দিতে চান। তাঁদের কথা হল: ফসল পেতে হলে চাই ভাল বীজ। অন্য দল বলেন: মাটিটাই সব। এঁরা গুরুত্ব দেন পরিবেশের প্রভাব এবং তার বিস্তারের ওপর। কিন্তু ফসল ফলাতে গেলে দুইয়েরই দরকার—ভাল বীজ আর ভাল মাটি: দুইই চাই।

এ প্রশ্নের বিচারের আগে জানা দরকার—বংশগতি কাকে বলে, আর পরিবেশই বা কি? মানুষ যা নিয়ে জীবন সুরু করে তাকে বলে বংশগতি। জীবনের সুরু তার জন্মসময় থেকে নয়, আরও প্রায় ৯ মাস আগে থেকে। আর পরিবেশ বলতে বোঝায় এর পর থেকে ব্যক্তির ওপর যা কিছু প্রভাব বিস্তার করে। বংশগতি যেন মানুষের জীবনে মূলধন, আর পরিবেশ তাকে দেয় পরিণতি। একটি ফুল ফুটতে পারার সম্ভাবনা, অপরটি বাস্তবিক ফুটে ওঠা।—এ দুটি তাই পরস্পরে সম্পূরক।

যাঁরা বংশগতিকে বড় করে দেখেন, তাঁরা বলতে চান আমড়া গাছে কখনো আম ফলে না। আর পরিবেশকে বড় করে দেখান যাঁরা, তাঁরা মহাভারতের কর্ণের মত বলেন: জন্ম মোর যথা তথা কর্ম মোর হাতে। অর্থাৎ, একদল অদৃষ্টের ভক্ত, অপরদলের বিশ্বাস পুরুষকারে।

মোট কথা, এই দ্বন্দ্বের মূল বক্তব্য হল—প্রথম দলের মতে: পিতামাতার শুক্র ও ডিম্বকোষের (Spermatozoa and Ovum) সংসর্গের সঙ্গে সঙ্গেই জাতকের জীবনের পথ সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, পরিবেশ তার যতটুকু পরিবর্তন ঘটায় তা সামান্য। দ্বিতীয় দলের মতে: জাতক একেবারে সাদা স্লেট (tabula rasa) নিয়ে পৃথিবীতে আসে, তারপর পরিবেশের প্রভাবে লেখা সুরু হয় সেই স্লেটে। —পিতামাতার যে প্রভাব শিশুর জীবনে দেখা যায় তা পিতামাতার পরিবেশে শিশুরা মানুষ হয় বলে।

শিক্ষায় এই পরিবেশের প্রভাব কতটা জানতে গেলে বংশগতির ধারাটি সংক্ষেপে আগে বুঝে নেওয়া দরকার। এ সম্পর্কে বিতর্কে না গিয়ে সাধারণ একটা সিদ্ধান্ত সূত্র এই মর্মে গ্রহণ করা চলে:—যেমন, মানুষের গর্ভে মানুষই জন্মায়। সন্তানেরা পিতামাতার সদৃশ হয়, তবে হুবহু তাদের প্রতিচ্ছবি নয়। উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বপুরুষের কোন গুণ (যেমন, কটা চোখ) অনেক সময় দেখা যায়। পিতামাতার চেষ্টালব্ধ বা অর্জিত বিশেষ কোন নিপুণতা (যেমন, অভিনয় দক্ষতা) নবজন্মে উত্তর পুরুষে বর্তায় না। রং কালো

হওয়ার দোষ রক্ত—না বাঁধায় অসুখ ঠিক পরপুরুষে দেখা না গেলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়। দুটি বিপরীত গুণের মিশ্রণে কখনো কখনো (কোন একটি প্রকট বা কোন একটি অপসৃত না হয়ে) এ দুটি গুণের সবরকম মিশ্রণই সন্তানে সৃষ্টিত হয়। বংশানুক্রমিক ধারার একটা প্রবণতা হল গড়ের দিকে আসা; অর্থাৎ, পৈতৃক ধারার সমতা এবং বিষমতা দুটিই সমানভাবে বংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর ক্রমশ বৈচিত্র্যের সংখ্যা কমে গিয়ে গড়ের দিকে এগিয়ে চলে গুণগুলি।

কোন ব্যক্তিতে কোন কোন গুণ প্রকট হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শক্তি বা সম্ভাবনার ওপরে। এই উত্তরাধিকারের উপাদানগুলিকে নানাভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, মানুষের সন্তানে মানুষের বৈশিষ্ট্য থাকে। সন্তানের মধ্যে জাতিগত লক্ষণ প্রকাশ পায়—তার দেহের উচ্চতায়, মাথার গড়নে, শরীরের কাঠামোয়, চুলে এবং মেজাজে। সন্তানের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বিশেষ নৈপুণ্য পরিবারের ধারা অনুসরণ করে চলে। স্ত্রী পুরুষ ভেদে দৈহিক ও মানসিক প্রভেদ তৈরী হয়। প্রত্যেকের জন্মসূত্রে প্রাপ্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

এই বংশধারার স্বরূপ তিনটি পথে প্রকাশ পায় —দেহগতভাবে, অর্থাৎ গায়ের রং, আকৃতি, গঠন ইত্যাদিতে; মানসিকভাবে, অর্থাৎ, প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ-চিন্তা-কল্পনা-নিপুণতা প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলিতে। মনঃ প্রকৃতিতে বংশধারা বলতে (অলপোর্ট-এর ভাষায়) বোঝায় "আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া" গলতি কথায় যাকে বলে মেজাজ।

এবারে আসা যাক মূল প্রশ্নে—শিক্ষায় পরিবেশের প্রভাব প্রসঙ্গে। পরিবেশ বলতে বোঝায় ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্ব। পরিবেশের শব্দগত অর্থ হল: যা বেষ্টন করে থাকে তাই পরিবেশ। শিশু জন্মাবার মুহূর্ত থেকেই পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং পরিবেশের নিহিত শক্তি তার ওপরে নিয়ত তাদের প্রভাব বিস্তার করে চলে। শিশুকে সেই পরিবেশের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সঙ্গতিবিধান (adjustment) করে চলতে হয়, না হলে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। "Life is a process or continuous interaction between the living organism and the environment... The organism adjusts itself in order to maintain or regain equilibrium"—(Skinner: Educational Psychology.) আর এই সঙ্গতি বিধান করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে যে আচরণের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বলে শিক্ষা। অতএব, পরিবেশের কাজ এবং শিক্ষার লক্ষ্যকে এই বিচারে এক বলে ধরে নেওয়া চলে। কারণ, "Education is process of living"—(Dewey: Creed.)

পরিবেশকে প্রভাবের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে দেখলে তার তিনটি রূপ পাওয়া যায়—প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানসিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ হল ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদির প্রভাব। (অর্থাৎ, বলতে পারা যায় ভৌগোলিক পরিবেশ)। মানসিক পরিবেশ একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সহজ হবে—যেমন, একজন বিশ্বের ইতিহাস গবেষণারত ছাত্রের কাছে বিশ্বীয় সভ্যতার উপাদান যে প্রভাব বিস্তার করে তুলনায় তার ঘরের কাছে নিত্য-দেখা শহর কলকাতার ঐতিহাসিক কোন নমুনা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। মানুষের ওপরে এই মানসিক পরিবেশের প্রভাব যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। সামাজিক পরিবেশ অর্থে সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, [illegible] প্রথা, ধারণা-বিশ্বাস ইত্যাদি বোঝায়।—মানুষের

ওপর এদের প্রভাবও অনস্বীকার্য। সমাজের এ পরিবেশ মানুষের প্রকৃতিতে এমনভাবে মিশে যায় যে তাকে তার বংশগতি বা উত্তরাধিকার থেকে আলাদা করা যায় না।—তাই অনেকে এদের সামাজিক উত্তরাধিকার (Social heredity) বলার পক্ষপাতী।

পরিবেশকে গভীর বিচারে তিনটি এলাকায় ভাগ করা যায়—গৃহ, বিদ্যালয়, পল্লী তথা বৃহত্তর সমাজ পরিবেশ। গৃহ পরিবেশ হল—পিতামাতা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, স্নেহ-মমতা প্রীতি-ভালবাসা, নিন্দা-প্রশংসা-ভয়-লজ্জা-ঘৃণা, রীতি-নীতি-প্রথা-সংস্কার, আলো-বাতাস-খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয় নিয়েই। বিদ্যালয় পরিবেশ বলতে বোঝায় শিক্ষক, শিক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, আইন-কানুন, শাসন-শৃঙ্খলা, শাস্তি-পুরস্কার, স্বাধীনতা, খেলাধূলা, উৎসব-অনুষ্ঠান, সঙ্গী-সংসর্গ। সমাজ পরিবেশ—ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণা আচার-আচরণ, বিধি-নিষেধ, ব্যবহার-বিশ্বাস, পালা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, সংস্কার-প্রথা, ভাষা, ঐতিহ্য, জাতীয়তা, সংস্কৃতি, লোক পদ্ধতি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বনিয়াদ সমস্ত নিয়েই সর্বব্যাপক সমাজ পরিবেশ।

এখন প্রশ্ন হল কোন্‌টি বড়—পরিবেশ না বংশগতি—এই বিতর্কের সমাধান খোঁজা হয়েছে নানাদিকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং পরিসংখ্যানের সাহায্যে। এ সব গবেষণাগুলিতে প্রায়ই মূর্তির প্রভেদ কতটা জন্মগত আর কতটা-বা পরিবেশগত এই প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। এই গবেষণার কতকগুলি সিদ্ধান্ত গেছে বংশগতির অনুকূলে, আর কতকগুলি গেছে পরিবেশের পক্ষে। এসব গবেষণা থেকে (বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে) এই সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে, বংশানুক্রম বা পরিবেশ, এ দুইয়ের কোনটিই উপেক্ষার বস্তু নয়। বংশানুক্রম হ'ল ব্যক্তির সম্ভাবনা, সে সম্ভাবনা কতটুকু বা কিভাবে বাস্তব রূপ পাবে তা নির্ভর করছে পরিবেশের ওপর। পরিবেশ হচ্ছে বংশগতির পরিপূরক—পরিবেশ কেবলমাত্র নির্ধারণ করে বংশগতির কোন লক্ষণটি কতটুকু পরিমাণে বিকাশলাভ করবে। (বংশগতির ত্রুটি পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে অনেকটা সংশোধন করা যেতে পারে, কিন্তু পরিবেশের ত্রুটিও ভাল বংশ-গতিকে অনেকটা নষ্ট করে দেয়)।

এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে স্বভাবতই দুটি বিকল্প প্রশ্ন জাগে (প্রভাবের অনুপাতের প্রশ্ন নিয়ে)—প্রভাবের দিক থেকে কোনটির অনুপাত বেশী—বংশগতি না পরিবেশের। যদি বংশগতির অনুপাতিক প্রভাব ব্যক্তির ওপর বেশী হয় তবে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে বেশী উন্নত প্রজননের দিকে; অর্থাৎ সুপ্রজনন বিদ্যা (eugenics)-র দিকে। আর যদি পরিবেশের প্রভাবের মাত্রা ব্যক্তির ওপর বেশী হয় তাহলে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দিকে, অর্থাৎ পরিবেশকে কার্যকরী (effective environment) করার দিকে।

এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি বড় এবং কোনটি ছোট—এ বিতর্ক এখানে নিষ্প্রয়োজন, অর্থহীন। কেননা, কেবলমাত্র বংশধারা শিশুর ব্যক্তিসত্তা গড়ে তুলতে পারে না, তেমনি কেবলমাত্র পরিবেশও শিশুর পূর্ণ বিকাশসাধন করতে পারে না। ব্যক্তিসত্তা এ দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যৌথ ফল। বংশধারা জোগায় কাঁচা মাল আর পরিবেশ তাই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ রূপ, পরিণত ফসল। এ দুয়ের সংঘর্ষে উভয়েই বদলে যায়—এবং তাদের মধ্যে থেকে তৃতীয় একটি সত্তার আবির্ভাব ঘটে—তাকেই বলে ব্যক্তিসত্তা। কাজেই বংশধারার পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করে পরিবেশের সহযোগিতায়, তার আনুকূল্যে।

বংশগতি নিয়ে আসে ব্যক্তির মধ্যে সম্ভাবনা, আর পরিবেশ সেই সম্ভাবনাকে দেয় রূপ, পরিণতি।

কাজেই জীবন বিকাশে পরিবেশের দামও কম নয়। সার্থক পরিবেশ রচনায় শিক্ষক তথা শিক্ষার একটি বিশিষ্ট কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে, যা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে একথা সত্যি যে মূলের থেকে কিছু গড়ে তোলা যায় না—বীজের মধ্যে সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে তাই গাছ হয়। আবার বীজ জমি থেকে কি রস পাচ্ছে, কতটা নিতে পারছে তার ওপর নির্ভর করে বীজের গাছ হওয়া তার—ফুল-ফলের সম্ভাবনা। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে সম্ভাবনারও একটা সীমা আছে, যেটা সে লঙ্ঘন করতে পারে না কোনমতে—অর্থাৎ বংশসূত্রের গুণেরও একটা সীমারেখা (limiting factor) আছে। শত যত্নেও সে সীমা অতিক্রম করা যায় না। কাজেই পরিবেশ নিয়ন্ত্রণেরও একটা সীমা (optimum point) আছে—যারপর হাজার কলাকৌশলেও সে সীমা লঙ্ঘন করা যায় না।

এবারে আসে শিক্ষক তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রশ্ন। শিক্ষক যথোপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে প্রত্যেকের সহজাত সম্ভাবনাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্য কার্যকর পরিবেশ রচনা করে সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে তাকে যথাসম্ভব বিকাশ পেতে সাহায্য করতে পারেন শিক্ষার্থীর জীবন-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উপযুক্ততা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বিদ্যালয় পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রহণযোগ্য করে তোলা শিক্ষক তথা বিদ্যালয়-পরিচালন-বিভাগের অন্যতম একটি প্রধান দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে প্রাকৃতিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবেশকে কার্যকরী পরিবেশ হিসাবে রচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়, নতুবা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য (এ ছাড়া রয়েছে আরও দুটি পরিবেশ—গৃহ ও পল্লী তথা সমাজ পরিবেশ - এ দুটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সমগ্র সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার।)

জৈব বংশগতির পারিবারিক উপাদান তিনটি —শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বিশেষ নিপুণতা—এ গুলির সম্ভাবনাকে সক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের যথাসাধ্য বিকশিত করে তোলাও শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের তালিকায় পড়ে।

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গঠনে তার মানসিক ও মনঃপ্রকৃতিগত বংশগতির উপাদানগুলির যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সম্ভাবনাকে পূর্ণাঙ্গত সামাজিক করে গড়ে তোলা শিক্ষকমাত্রেরই কর্তব্য। এই জৈব বংশগতি (biological heritage) ছাড়া রয়েছে সামাজিক উত্তরাধিকার (social heritage)। সামাজিক উত্তরাধিকার বলতে বোঝায় একটা নতুন পর্যায়ের ওপর পূর্বপুরুষেরা তাদের কাজকর্ম, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারনা, বিধি-নিষেধ, চিন্তা-অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা যে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।—অনিবার্যভাবেই শিক্ষা হচ্ছে সামাজিক উত্তরাধিকারের অঙ্গ। কাজেই সামাজিক উত্তরাধিকার উচ্চারণের করে গড়ে তোলা শিক্ষক তথা শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব তথা কর্তব্য।

এই হিসাবে প্রতিটি শিশুই হল এক-একটি জৈব সামাজিক একক (bio-social unit)—আর শিক্ষকমাত্রেরই এই দিক থেকে দায়িত্বের এলাকা হল মূলত দুটি—পরিবেশকে কার্যকরী করে তোলা এবং সামাজিক উত্তরাধিকারকে ছাত্রদের গ্রহণ-যোগ্য করে তোলা (অর্থাৎ effective environment ও social endowment)। তাহলে দাঁড়াল এই যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জৈব বংশগতি সম্ভাবনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করবেন দুদিক থেকে —কার্যকরী পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক উত্তরাধিকারকে শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে পরিবেশন করবেন। এইজন্যে শিক্ষকের আর [redacted] দায় দেওয়া যেতে পারে পরিবেশ নিয়ন্ত্রক (manipulator of environment)।

পরীক্ষা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভাবিয়াছিলাম পরীক্ষা সম্বন্ধে কিছু লিখি। অর্থাৎ কিনা পরীক্ষা গ্রহণের রীতি-পদ্ধতি, প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান হালচালের নিরিখে ইহার পরিবর্তন বা সংশোধন সম্বন্ধে কিছু লিখিব। এখনও ইহা লিখিবার আশা ছাড়ি নাই। কিন্তু বর্তমানে আর একটি কথা লইয়া কিছু লিখিতে চাই। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কিছু কিছু রহিয়াছে।

কথায় বলে 'বড় বাড়ীর বড় কথা'। আমি সাধারণতঃ 'বড় কথা' বলিতে অভ্যস্ত নহি। 'ছোট কথা' লইয়াই আমার কারবার। কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন এই জন্য, যাহাতে বন্ধুবর আপত্তি না তোলেন। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশনের একটি বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে। 'বিজ্ঞপ্তি' না বলিয়া ইহাকে 'আবিষ্কার' বলাই হয়ত সঙ্গত। এই নূতন আবিষ্কার বেশ ফলাও করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কাগজ পড়িবার সাধ্য নাই। কিন্তু অপরে যাহা পড়িয়া শুনাইলেন তাহাতে এইরূপই মনে হইল। কোন কোন পরীক্ষার উত্তর পত্রের Sample বা নমুনা কমিশন লইয়া গিয়া পরীক্ষকদের পরীক্ষণ রীতি যাচাই করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী উত্তরপত্র দেখা হয় নাই। যে প্রশ্নের উত্তরে একজন পরীক্ষক পঁচিশ দিয়াছেন, আর একজন পরীক্ষক অনুরূপ উত্তরের জন্য দিয়াছেন পাঁচ নম্বর। আমি শুধু দৃষ্টান্ত স্বরূপই এই কথার উল্লেখ করিলাম। কমিশন খুঁটিয়া খুঁটিয়া আরও দেখিয়াছেন এবং কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছেন। আমার যতদূর মনে হয় এগুলি এইরূপ [redacted]রের নির্দিষ্টমান পূর্বে নির্ধারিত যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি হয় না; ২ পরীক্ষকগণ খেয়ালখুশি অনুযায়ী নম্বর দেন; ৩ ফলে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সুবিচার হয় না, অধিক সংখ্যক ফেল করার ইহা একটি মস্ত বড় কারণ। কমিশন যে ধরণের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লইয়া কোথাও কিছু আলোচনা হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। শিক্ষাবিদ্‌দের এ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবিবার খোরাক মিলিবে।

কয়েক বৎসর পূর্বের কথা। সেবার বি. এ. পরীক্ষায় শতকরা ২৯ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমি একজন প্রবীণ অধ্যাপককে শুধাই, এ বৎসর এত কম ছেলে পাস করাইলেন কেন? তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের ত একটি পাল্টা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়। ছেলেদের পাস করাই কেমন করিয়া? সব সময়ই চেষ্টা করি যাহাতে বেশি সংখ্যক উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু যেরূপ উত্তরপত্র পাই ঠিকমত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উক্ত সংখ্যাও পাস হয় না।" তিনি যাহা বলিয়াছিলেন এতদিনের পর তাহার মর্মই শুধু এখানে ব্যক্ত করা সম্ভব হইল, ভাষা ঠিক মনে নাই! এই ত সমস্যা। ছেলেরা সম্বৎসর হুজুগে হুজুগে কাটায়, পরীক্ষার আগে দু চার দিন বই পত্র নাড়া চাড়া করে। কিন্তু পরীক্ষায় পাস করিতে হইলে আরও কিছু বেশি দরকার। আজ রীতিমত পড়াশুনা করিবার রেওয়াজ যেন চলিয়া গিয়াছে। সকাল সন্ধ্যায় বই লইয়া বসা ছাত্রছাত্রীদের যে অবশ্য গ্রহণের মতই কর্তব্য তাহা বুঝি তাহাদের ধারণায় আর আসে না।

এখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি। ইহা হইতে বুঝিবেন ছাত্রছাত্রী শুধু নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা তথা বর্তমান

শিক্ষনীতি ও যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সকলই এতাদৃশ দুর্গতির জন্য কমবেশি দায়ী। আমি দীর্ঘ ষোল বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার একটি বিষয়ের পরীক্ষক ছিলাম। কাজেই নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অনেক কিছু বলিতে পারি। পরীক্ষক থাকা কালে একটি বিষয় পালন করিতে হইত। পরীক্ষা সম্পৃক্ত যাবতীয় বিষয় গোপনীয়। এখন আর সে বালাই নাই। কেন না বহুবার বৎসর পূর্ব হইতেই আমি দৃষ্টিহীনতা-বশতঃ পরীক্ষকের কার্য ছাড়িয়া দিয়াছি।

প্রথমবার আমাদের বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক ছিলেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরীক্ষকগণ সভায় উপস্থিত। সুনীতিবাবু নমুনা স্বরূপ কয়েকখানি উত্তরপত্র আনাইয়া তাহার উপর আলোচনা করিতে শুরু করেন। এক ঘণ্টা কি তাহারও উপর আলোচনা চলিয়াছিল। এক একটি প্রশ্নের উত্তর ছাত্র বা ছাত্রী কিরূপ লিখিয়াছে তাহা তিনি পড়িলেন এবং ইহার উপর কিরূপ নম্বর দেওয়া যাইতে পারে পরীক্ষকগণের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করিলেন। এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, সুতরাং বুঝিতেই পারেন আমি খুব মন দিয়া শুনিয়াছিলাম এবং উত্তরপত্রও যথাসাধ্য যত্ন সহকারে দেখি। এই প্রথম বারেই আমার হাতে খুব কম ছেলে মেয়ে ফেল হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে ১০৮ ছাত্রী পরীক্ষার্থীর মধ্যে একটি মাত্র ফেল করিয়াছিল, সে পাইয়াছিল ২৮ নম্বর। পরীক্ষার্থী কম ফেল হইলে প্রধান পরীক্ষকের পরিশ্রম কমে। সুতরাং পূর্ব পরিচয় ও কথঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও পরীক্ষকরূপে এই প্রথম পরিচয়েই তাঁহার প্রীতিলাভ করিতে সমর্থ হই।

প্রথমবারের সংকোচ ক্রমে কাটিয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন প্রধান পরীক্ষকের সংস্পর্শে আসিলাম। পরীক্ষকদের প্রথম মীটিং বা সভায় যে রীতি দেখি তাহাই বরাবর অনুসৃত হয়। উত্তরপত্র পরীক্ষার তিনটি স্তর: ১ সাধারণ পরীক্ষক; ২ তদারক পরীক্ষক (scrutiniser) এবং ৩ প্রধান পরীক্ষক। এই সব বেড়া ডিঙাইয়া তবে ছাত্রছাত্রীদের পাশ ফেলের সংখ্যা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার পর আবার (Re-examination) জন্যও বিষয়ের সঙ্গে অঙ্কিত ছিলাম, তাহার কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছি। আমার মনে হয় 'ব্যতিরেকে দিল্ল' ছাড়িয়া দিলে উপরি উক্ত তিনটি স্তর ডিঙাইলেই পাস ফেলের সংখ্যা যথাযথ নির্ণীত হইয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তর-বিশ্ববিদ্যালয় যুগের প্রবেশিকা পরীক্ষার কথাই এখানে বলা হইতেছে। কলেজীয় রীতিপদ্ধতির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নাই। তবে সাক্ষাৎ পরিচয় না ঘটিলেও ঐ সব স্থলেও যে রীতি বলবৎ সে সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধবদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। আমার অভিজ্ঞতা হইতে এখানে আরও কিছু বলা যায়। উত্তর পত্রের মান প্রধান পরীক্ষক মহাশয়েরা আলোচনা কালে যে মান নির্দিষ্ট করিয়া দেন আমাদের সাধারণ পরীক্ষকদের তাহাই মানিয়া এবং অনুসরণ করিয়া কাজ করিতে হয়। এই মান কিন্তু মৌখিক: প্রত্যেক পরীক্ষককেই নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি মত উত্তরপত্রের এইরূপ মানের কথা মনে রাখিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। ইহাতে যে অনেক ক্ষেত্রে গলতি দেখা গিয়াছে আর উত্তরপত্র পরীক্ষায় পরীক্ষকের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যও পরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা এই দীর্ঘ দিন বেশ লক্ষ্য করিয়াছি। একবার দেখিলাম একজন পরীক্ষক শতকরা ৫৯ জন পরীক্ষার্থীকে পাস মার্কের কম নম্বর দিয়াছেন। এরকম ক্ষেত্রে প্রধান পরীক্ষক বড়ই ফাঁপরে পড়েন। তাঁহার মাথা ব্যথার অন্ত নাই। পরীক্ষককে হয় চিঠি দিয়া কিম্বা খবর দিয়া আনাইয়াছেন। দু তিন খানি কাগজ কিরূপে দেখিতে হইবে বলিয়া দিলেন এবং তাহার উপরই ভার দিলেন উত্তরপত্রগুলির নম্বর ঠিক করিয়া আনার।

ইহার পরও যদি ফেলের সংখ্যা বেশি থাকিয়া যায় তাহা হইলে তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করেন, এবং সহকর্মীদের সঙ্গে বসিয়া নম্বর বাড়াইয়া পাস করাইয়া দেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তর-বিশ্ববিদ্যালয় যুগের মধ্যে এই বিষয়ে কতকটা পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছি। আগে বাংলার পাসের নিম্নতম নম্বর ছিল ৩৬। দ্বিতীয় যুগে ইহা কমিয়া হয় ৩০। প্রথমে আমরা কোন কোন প্রধান পরীক্ষকের মৌখিক নির্দেশে বা গুপ্ত বাসনা অনুযায়ী কতকটা leniently বা উদারভাবে দেখিতাম। পরবর্তী যুগে নম্বর সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতেই বোধ হয় এই রীতির খানিকটা বদল হয়, আমাদিগকেও কথঞ্চিৎ কড়া হইতে হয়। তথাপি প্রত্যেক পরীক্ষকেরই জ্ঞানবুদ্ধি ও সংস্কার উপরে উত্তরপত্র দেখার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইত। পরীক্ষার কার্যে কখন কখন হস্তক্ষেপ হইত না বা এখনও হয় না সে কথা বলি না। তবে একেবারেই যে অনুদার ভাবহীন ভাবে ইহার পূর্বে বা পরে পরীক্ষাকার্য চালনা হইত তাহা বলিতে পারিব না। এখন আমার কোন কোন অভিজ্ঞতার বিষয় আরও একটু খোলসা করিয়া বলি।

পদ্ধতির বিষয়ই আগে কিছু বলা যাক। বিশ্ব-বিদ্যালয় যুগের কথা। তখন আমরা পরীক্ষকেরা প্রত্যেকেই সাড়ে পাঁচ শতের মত উত্তর পত্র পরীক্ষার জন্য পাইতাম। প্রধান পরীক্ষক মৌখিক ভাবে নির্দেশ দিতেন যাহাতে আমরা এক এক কিস্তি করিয়া পাঁচ ছয় কিস্তিতে এ সমুদয় দেখিয়া ফেলতে পারি। খাতার সংখ্যা বেশি, এ কারণ পাঁচ ছয় সপ্তাহ সময় পাইতাম। অনেকেই আমরা এই নির্দেশ মানিতাম, আর ইহাতে কাজেরও সুবিধা। কিন্তু দেখিতাম কেহ কেহ এই নির্দেশ মানিয়া চলিতেন না। একজন পরীক্ষক আমাকে এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত মাসই প্রায় কাজে ব্যস্ত থাকেন। খাতা দেখিবার ফুরসুৎ পান না। পরিশেষে জমা দিবার শেষে দিনের পূর্বে সপ্তাহ-খানেক ধরিয়া দিন রাত্রি কাগজ দেখেন এবং কোন মতে পরীক্ষার কাজ সারিয়া ফেলেন। একজন নামী পরীক্ষকের প্রমুখাৎ এ কথা আমি শুনি। কিন্তু অপর কেহ কেহও যে এরূপ করিতেন না তাহা হলপ করিয়া বলিতে পারি না।

আর একজন পরীক্ষকের কথা। বন্ধুবর প্রধান পরীক্ষক এক সময় আমাকে দুঃখ করিয়া বলেন যে, অমুকের নিকট হইতে কাগজ আদায় করা বড়ই কঠিন হইত। তখনও ৪৬ সনের ধাক্কার ঢেউ চলিতেছে। মফস্বলের কোন কোন শহরে প্রধান পরীক্ষকের কেন্দ্রস্থল নির্দিষ্ট। টেলিগ্রাম করিয়াও উক্ত পরীক্ষকের নিকট হইতে উত্তর পত্র আদায় করা কঠিন হয়। পরন্তু পরীক্ষক কখন কখন বমকাইয়া এরূপ চিঠিও লেখেন যে, তাঁহারা বংশ পরম্পরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হালচাল তাঁহারা জানেন, তাঁহাকে এরূপ তাগাদা করা নিষ্প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত স্বরূপই ইহা উল্লেখ করিলাম। এটি ব্যতিরেকে নিত্য হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘটনা যে পূর্বে বা পরে আরও না ঘটিয়াছে এমন কথা বলা যায় না।

নির্দিষ্ট সময়ে, কিন্তি মাফিক উত্তর পত্র প্রধান পরীক্ষকের নিকট পৌঁছিলে তিনি তাহা তদারক পরীক্ষকদের দ্বারা পরখ করিয়া লইবার উপযুক্ত অবসর পান। ইহাতে পরীক্ষকদের দোষত্রুটি ধরা পড়ে এবং পরীক্ষার্থীর প্রতিও অবিচার হয় না। তদারক পরীক্ষক শুধু নম্বর যোগে ঠিক আছে কিনা তাহাই দেখেন না, তাঁহার উপর প্রশ্ন মাফিক উত্তরের উপর ঠিক ঠিক নম্বর দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহাও দেখেন। কোন ভুল ত্রুটি লক্ষিত হইলে তাহা প্রধান পরীক্ষকের গোচরে আনেন। সমস্ত মত কিস্তির খাতা পৌঁছিলেই তবে এরূপ তদারক হওয়া সম্ভবপর। সমস্ত খাতা এক সঙ্গে হাজির

করা হইলে ইহা হইয়া উঠে না। ফলে পরীক্ষার্থীদের উপর সুবিচার না হইবারই সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে দুইজন পরীক্ষকের বিষয় উল্লেখ করিলাম যেহি উত্তর-বিশ্ববিদ্যালয় যুগে তাঁহারা প্রধান পরীক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাহির থাকে পড়িলে পূর্ব দোষত্রুটি অনেকটা শোধরাইয়া যায় সত্য, কিন্তু কিছু থাকিয়াও যাইতে পারে। তবে উহারা যে দোষত্রুটি-মুক্ত হন নাই সে কথা বলি না। আমি দ্বিতীয় যুগে ইহাদেরও অধীনে পরীক্ষকরূপে কার্য করিয়াছিলাম।

এখন উত্তর-পত্রের কথায় আসা যাক। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। অনেক সময় মনে হইত কিছু কিছু নমুনা টুকিয়া রাখি, কেন না ভবিষ্যতে কাজেও বা লাগিতে পারে। ইহা তখন করি নাই। এখন দেখিতেছি এরূপ করা থাকিলে আজ তাহা কাজে লাগিত। উত্তর-পত্রের শেষে কখন কখন খুব কৌতুককর বিষয় পাওয়া যাইত। কবি শৈলেন্দ্রনাথ লাহা এইরূপ দুর্বোধ্য দুই পঙক্তির কবিতা পান। তিনি অনেক সময় উহা মুখস্থ বলিতেন এবং আমরা কৌতুক বোধ না করিয়া পারিতাম না। কবিতাটি ছিল আদিরসাত্মক। আবার কোন উত্তর-পত্রের শেষে পরীক্ষার্থী দুঃখ করিয়া লিখিতেন যে, অতিকষ্টে অর্থ যোগাড় করিয়া পরীক্ষা দিতে আসিয়াছি। এবার পাস না করাইয়া দিলে তাহার পুনরায় পড়া হইবে না। আবার কেহ কেহ লিখিত, এবারে পাশ করিতে পারিলে তাহার চাকরী নিশ্চিত, নতুবা অকূলে ভাসিবে। এইরূপ আরও কত কি। উত্তর-পত্র পরীক্ষায় এ সব কথা অনেক সময় পরীক্ষকের মনের উপরে ক্রিয়া করে বটে, কিন্তু উত্তর চলনসই হইলে পাস করা আটকায় না। তবে অনেক সময় আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবের মূলে পরীক্ষার্থীর অক্ষমতায় তাহা বুঝা যাইত।

উত্তর-পত্রের হাতের লেখাও বিচিত্র। বিপুল ধৈর্য সহকারে ইহা পড়িতে হয়। বিচিত্র ধরণের পাণ্ডুলিপি পড়া যাহাদের অভ্যাস তাহাদের নিকট ইহা পড়া কষ্টকর ঠেকিত না। কিন্তু এমন অনেক পরীক্ষক ছিলেন বা আছেন, যাঁহারা পাণ্ডুলিপি পড়ার কৌশল জানেন না, পড়িতে গিয়া খুবই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। হস্তলিপি ভাল হইলে পরীক্ষক খুসিই হন, ফলাফল কিছু বেশি হইলেও পরীক্ষায় উৎরাইতে তেমন আটকায় না। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, হস্তলিপি যাহাদের ভাল তাহারা প্রশ্নের উত্তর দিতে একেবারে অপটু হয় না। লেখার অভ্যাস না থাকিলে হস্তলিপি ভাল হয় না। এই অভ্যাস মানেই ত অনুশীলন। বই বারবার পড়া এবং প্রশ্নোত্তর বারবার লেখা ইহার ফলেই ত বিষয়টি মনে ধরিয়া যায়। অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি হাতের লেখা ভাল হইলে উত্তর একেবারে বেমালুম হয় না। তবে ইহাও দেখিয়াছি হাতের লেখা যাহাদের একেবারে বিশ্রী তাহাদের মধ্যেও অনেকে প্রশ্নের বেশ উত্তর দিতে পারে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে হস্তলিপি প্রায়ই ভাল দেখিয়াছি। প্রথমবারে দেখিয়াছি দুই একটি মেয়ে ছাড়া প্রায় সব মেয়েরই হাতের লেখা ভাল। মনে হইত তাঁহারা হাতের লেখার উপর বেশ নজর দিয়া থাকেন। তাহাদের এই ট্রাডিশান বহু বৎসর যাবৎ অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষের দিকে দেখিতাম, তাহারাও কেমন যেন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। আগে যেরূপ মানসিক ধৈর্য লক্ষ করিতাম ঐ সময়ে তেমনটি আর দেখিতাম না। মনে হইত বিভিন্ন "ইজম" বা মতবাদের ছোঁয়া তাহাদিগকেও লাগিয়াছে। তখন আর তাহাদের এরূপ সামান্য কাজে হয়ত মতি নাই। বাহিরের চাপে আসল কাজটি ভুলিতে বসিয়াছে। সুন্দর হস্তলিপি লিখনে মেয়েরা পটু, ইহার প্রত্যয় দেখিয়া বড়ই বেদনা অনুভব করিতাম। হাতের লেখা উত্তর-পত্রের

বহিরঙ্গ মাত্র, তথাপি ইহার কার্যকারিতা ঢের। সম্পাদক রামানন্দবাবু প্রায়ই বলিতেন, আগে দর্শনধারী পিছে গুণবিচারী। হাতের লেখা বেশ ভাল হইলে যে কোন রচনা প্রথম দৃষ্টিতেই আমাদের মনকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

এখন আরও গুরুতর কথায় আসা যাক। প্রশ্নের উত্তরগুলি মোটামুটি ঠিক হইয়াছে কিনা পরীক্ষক তাহা পরখ করিয়া দেখেন এবং উত্তরের মানের উপর নম্বর দেন। ঠিকমত উত্তর হইলে বেশি নম্বর পাওয়া যাইবে ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। কতকগুলি প্রশ্ন এমন থাকে যাহার উত্তর লিখিলে কিছু না কিছু নম্বর পাওয়া যায়। কোন প্রবন্ধ গল্প বা কবিতার উপরে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থী অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি তাহার যথাযথ চিত্র করিতে না পারিয়া উদ্ধৃত রচনাটির সারাংশ লিখিয়া থাকে। আমাদের উপর নির্দেশ ছিল, এ রূপ ক্ষেত্রে উত্তরের ভাষার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে অন্ততঃ কিছু নম্বরও দেওয়া চলিবে। তবে যে পরীক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক লিখিবে সে তাহার উপর অবশ্যই বেশি নম্বর পাইবে। এইরূপে দেখিয়াছি খুব কম ছেলে বা মেয়ে শেষ পর্যন্ত পাস নম্বরের কম পাইয়া থাকে। বলিবেন না, বাংলা নম্বরেই আমি বলিতেছি।

তবে একটি কথা। বানানে ভুল বেশি হইলেই বিপদ। চারিটি ভুলে এক নম্বর কাটিবার সাধারণ রীতি আছে। ইহা যথাযথ মানিয়া লইলে বেশি সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা বৈতরণী পার হইতে পারে। কিন্তু খুব সাধারণ বা পরিচিত শব্দের বানান যদি ভুল হয় তাহা হইলে পরীক্ষকের বিরূপ হইবার কথা। শেষ দিকে দেখিতাম 'রবীন্দ্রনাথ' বানানেও ভুল হইতেছে! একটি উত্তর পত্রে 'আমরা' কথাটির বানান 'আমারা'। কতকগুলি এমন ভুল দেখিতাম তাহাতে মনে হইত ছেলে মেয়েরা খুসি তাল করিয়া বর্ণপরিচয়ও পড়ে নাই। সংযুক্তবর্ণে এ ভুল হইতেই, সাধারণ বানেও বিস্তর ভুল বানান করা হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধুসূদন ও বিভীষণ এই দুইটির কথা উল্লেখ করিতেছি। এই দুইটি শব্দের কত রকমের বিচিত্র বানান হইতে পারে তাহা উত্তর-পত্রে দেখা যাইত। আরও যে কত রকমের ভুল হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখন সবটা মনেও নাই। বানান ভুলের মত বাক্য রচনায়ও বড় ভুল লক্ষ্য করি। কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম অনেক সময় যোগ থাকিত না। ইহার কারণ এই যে বিদ্যালয়ে তাহাদের রচনায় উপর জোর দেওয়া হয় না বা বাক্য রচনায় তাহারা পটু হইতে পারে সে দিকেও কেহ দৃষ্টি দেন না।

আর এক রকমের ব্যাপার দেখিতাম। আমাদের উপর নির্দেশ থাকিত, বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর উত্তর পত্রে একই রকম উত্তর পাওয়া গেলে উভয়, অবশ্য ভুল উত্তর, পাওয়া গেলে নকল করিবার অভিযোগে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে হইবে। কোন কোন সময়ে দেখিতাম দশ বারটি ছেলে প্রশ্নের একই রকম উত্তর লিখিয়াছে। অবশ্য তাহাতে কাহারও বানান ভুল বা বাক্যরচনার ভুল কিছু কম বা বেশি। এজন্য কি পরীক্ষার্থীরা দণ্ডনীয় হইবে? জানিতাম পল্লীগ্রামের গরীব ছেলেরা হয়ত চাঁদা করিয়া কোন একখানি "মূল্যবান" নামের বই কিনিয়াছে এবং পালাক্রমে তাহা হইতেই উত্তর পাঠে রত রহিয়াছে। প্রত্যেকের ভিন্ন রকমের নামে বই কিনিবার সঙ্গতি বা সামর্থ নাই। একখানি পড়িয়াই অনেককে পড়া থাকিতে হইত। এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীরা যে দণ্ডনীয় হইবে প্রধান পরীক্ষকও কখনও এমন নির্দেশ দেন নাই। তবে কোন কোন পরীক্ষক যদি নিজ বিচার বুদ্ধিতে বিপরীত কার্য করেন তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা।

উপরে একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। বিশ্ব-বিদ্যালয় যুগে পরীক্ষকদের পরীক্ষা কার্যে গণ্ডি

দেখা গেলেও পরবর্তীকালে ইহা সংশোধনের কতকটা ব্যবস্থা হয়। হয়ত এই ব্যবস্থা পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রসূত। উত্তর-বিশ্ববিদ্যালয় যুগে পরীক্ষক সংখ্যা বেশ বাড়িয়া যায়। পরীক্ষকদের মধ্যে কিছু খাতায় সংখ্যা হ্রাস পায়। দেখিয়াছি যেখানে এক একজন পাঁচশত সাড়ে পাঁচশত উত্তর-পত্র পাইতেন, পরে তাঁহারা কোন ক্রমেই তিনশতের বেশি পান নাই। আর একটি বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে নির্দিষ্টসংখ্যক উত্তর-পত্র প্রধান-পরীক্ষককে পৌঁছাইয়া দিতে হইত। ফলে তদারক পরীক্ষকগণ ও প্রধান পরীক্ষক পরীক্ষিত খাতাগুলি পরখ করিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময় পান। ইহার দরুন ভুল-চুক বা দোষত্রুটির হ্রাস পাইবারই কথা। প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট হইতে বিভিন্ন বিষয়ের কিণ্ডিনত নম্বর পাইবার পর টেবুলেটরদের নম্বর সাজাইবার পালা। ইহাদের সংখ্যাও পরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই এক্ষেত্রেও ভুলচুকের অবকাশ কমিয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে।

দেখিতেছি, মোটামুটি পরীক্ষকদের মত দোষ। পূর্বেই বলিয়াছি, বড় কথায় আমি অভ্যস্ত নই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষকদের একজনরূপে যে লাভ করিয়াছিলাম তাহারই যৎসামান্য এখানে পরিবেশন করিলাম। উচ্চতরে অর্থাৎ কলেজীয় পরীক্ষা বলিতে কি কি গলদ ঢুকিয়াছে, সে সম্বন্ধে কমিশন কতকগুলি তথ্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন এবং কয়েকটি সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছেন, আরম্ভেই বলিয়াছি। বাংলাদেশে প্রবেশিকার মান পর্যন্ত এ ধরণের গলদ দৃষ্ট হইবে কি না সন্দেহ। বিশ্ববিদ্যালয় যুগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এমন এমন একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল যাহাতে আমরা লজ্জিত ও ব্যথিত না হইয়া পারি নাই। একদা ভূতপূর্ব রাজ্যপাল স্বর্গত ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে কথা উঠিলে তিনি বলেন, আমাকে সম্প্রতি কোথাইএ ইহা লইয়া কথা উঠিয়াছিল ও কেহ কেহ নিন্দাবাদও করেন। আমি কিন্তু তাহাদের মুখের উপর তুরুক জবাব দিয়াছি। ঐখানে পরীক্ষা ব্যাপারে যে কতরকম গলদ দেখা গিয়াছে একটি একটি করিয়া তাহার উল্লেখ করিলে তাঁহারা মুখ ফুটিয়া আর কিছু বলিতে পারেন নাই, নিন্দাবাদে নিরস্ত হইয়াছিলেন।" হরেন্দ্রকুমার উক্তরূপ কথা বলিলেও নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সম্যক অবহিতই ছিলেন। উচ্চতর কলেজী স্তরে পরীক্ষার উত্তর-পত্র সম্পর্কে কমিশন কথা তুলিয়াছেন ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় যে গলদ বা গলদ বা গলতি ঘুরে ছিল এবং এখন আছে হরেন্দ্রকুমারের উক্তি হইতে আমরা তাহার আঁচ্ করিতে পারি। এই গলদ কোথায় হয়ত বেশি, কোথায় হয়ত কম। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত পরীক্ষক মণ্ডলী কমিশনের উক্তির যথাযথ বিচার আলোচনা করিতে পারেন। কমিশন যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে এক অংশের অর্থাৎ পরীক্ষকগণেরই দোষ উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে যে অপর অংশের অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের দোষ ত্রুটির কথা একেবারে বাদ পড়িয়াছে এবং ইহার ফলে অন্যায় আবদার বা হুজুগী বাড়িতে পারে সে কথাটি বিবেচনা হয়ত তাঁহারা করেন নাই। ইংরেজী উত্তরপত্রের কথা তাঁহারা তুলিয়াছেন। যে বি. এ পরীক্ষার্থী "I have went' অথবা 'He do not come' লেখেন, অন্য উত্তরগুলি মুখস্থ উগলীরণ করিলেও তাহাকে পাস করাইতে পরীক্ষক মহাশয়ের মনঃই বাধ বাধ ঠেকিবে। এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিরা কিছু লিখুন ইহাই প্রার্থনা। পরীক্ষা সম্বন্ধে আমার মূল বক্তব্য পরে লিখিবার বাসনা রহিল।

সাহিত্যের প্রকৃতি

শ্রীবাসবিহারী ভট্টাচার্য

কবি সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। কারণ তিনি জানেন ভালবাসার আলোক-ক্ষেপ ব্যতীত সৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেম ও এক ধরণের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত মানব জগৎ এবং মানবহৃদয়ের গহনতর রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার নয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যান। চারিপাশের মানব সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতম হৃদ-স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান, —তাই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশ সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তাঁর সাধনা।

তেল-নুন-লকড়ির কারবার করতে করতে আমাদের অনেকেরই দিন আসে মিলিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই এবং মরি, দু-পাশের এই চরম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটা আমরা অনেকেই যে ভাবে চলি, তাতে বেশ আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতি-অভ্যাসে বদ্ধ ঝিমিয়ে আসা মনের পক্ষে আকাশ-স্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানালা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আর চেতনা এসে ঘরে পড়ে। এখানে জীবন অহরহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকিরিত করে। জীবনের এই নিরাট পটভূমিকায় জগতে এসে পাঠক এক মুহূর্তে আপনাকে বড় করে পায়।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম বেশী পরিমাণে একটি মানুষ আছে, যে নাকি স্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্ততঃ কোন কোন ক্ষণের জন্যও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মতন হয় আসক্ত,—রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া,—কথা সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতে দেশকালোত্তরিত জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তাঁর নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব উৎসুক, তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভবৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল দিক প্রধানতঃ জীবন সংগ্রামে ও রস-সাহিত্যের সাধনা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নভাবে সে আনন্দের রূপীকরণ ও পরিবেশনে, যে মূল লীলার আনন্দের প্রেরণায় জীবনের হল উৎপত্তি,—সুখ-দুঃখ হর্ষবেদনা প্রেম-কীর্তি ক্ষয় মৃত্যু সব রোগে ও সব ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ-সত্তা জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করে চলেছে, একটু একটু করে মেলে ধরছে। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী যত কথা বলেন, তার মর্ম এই যে, আমাদের পৃথিবী ভারি সুন্দর—একে বিচিত্র বললেই বা এর কতটুকু বোঝা হল।

রস-সাহিত্যের উপভোগ সামর্থের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন' সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন'-মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে তথাকথিত

'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশঃ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদ গ্রহণে পারগ হয়। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি ও ক্ষেত্রেও অধিকারীভেদ মানতে হয়। বাস্তবিক পক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে, চিন্তামূলক বা সৌন্দর্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জ বা অতীন্দ্রিয় রসের আবেদন অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তথা অনুশীলনবৃত্তির চর্চাভেদে বিভিন্ন পাঠকের মনে—প্রধানতঃ 'ইন্‌টেন্‌সিটি'র দিক দিয়ে—বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়।

যে সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রস সঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্খা, দুঃখ-বেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেল না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, খাইদিসের রোগীর মত জীবনের ঘরে বন্দিত, নয়তো সংসার-বিরাগী, উর্ধ্বাহু, মৌনী যোগীর মত সাধারণ সাংসারিক জীবনের বাইরে অবস্থিত।

যদি কোন কথা-সাহিত্যিক মিথ্যাকে আশ্রয় করে রসসৃষ্টি করেন, তা হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য—সমাজের ও জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে তার মূল্য কিছুই থাকে না।

কথাশিল্পীকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশী, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের সুখদুঃখকে বুঝতে হবে, যে বাড়ীর পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে—চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য। রুবেয়ার বলেছেন, মানুষে যা করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান। সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহু মাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে, অনেক পরিমাণে সহনীয় হয়ে তবে আমাদের গৃহ অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়।

সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয় তখনি, যখন এ অপরূপের কোন উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে, আপনার মূল সাধনা—অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়।

সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে, বাইরের পৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবন-কাহিনী তাদের অন্তর্নিহিত রসরূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতে পারে, যখন আমরা এদের একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীতরূপে আমাদের মানস চেতনায় পাই। এইজন্য আদিরসও যখন মধুর রসে পরিণত হয়, তখনই তা হয় আর্ট। কামজ প্রেমের কথা বলতে গিয়েও কবি যখন নিরাসক্ত কুতূহলে অতীন্দ্রীয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেন, তখনই তা হয় আর্ট। সঙ্কীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মাপও সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না অবশ্য, কিন্তু যে বৃহৎ কল্যাণ-বুদ্ধি আমাদের স্রষ্টার মনে তাঁর জগৎসৃষ্টির বেলায় ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, রস-স্রষ্টার ব্যাপনেত্রে তা পেতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ কি জীবনে কি সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হলে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাঁর চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হলে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে; এবং যদিও মানুষের জীবন এত বিচিত্র ও মোহনীয়রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্বলতা, পদস্খলনের কাহিনী তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও সে যেখানে বড়, সেখানে তার রূপ কেবল এইই নয়। তা ছাড়া, মহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন ও সমাজের মূল সত্তার সঙ্গে জড়িত; সাহিত্য থেকে তাকে কি বিচ্ছিন্ন করা যায়।

সংস্কৃতের মর্যাদা

শ্রীমগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন রাজ্যসরকারের প্রতিনিধিগণের দরাদিল্লি-সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম. সি, চাগলা মহোদয় বলিয়াছেন, —"আমরা জাতি হিসাবে প্রগতিশীল হইতে চাই, আমরা আধুনিক হইতে চাই, আমরা বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে চাই। কিন্তু প্রগতিশীল হইলেও আমাদের অতীতকে, আমাদের সংস্কৃতিকে বা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে ভুলিলে চলিবে না।...ভারতীয় সংস্কৃতি বহির্ভারতে বিশেষ-ভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও মধ্যপ্রাচ্যে সংস্কৃতের মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং এই ভাষার চর্চা ও প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইতে হইবে। সংস্কৃত শিক্ষকদের বেতন অন্যান্য ভাষার শিক্ষকদের বেতন অপেক্ষা কম হইলে চলিবে না।"

সাম্প্রতিক কালে আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে কাশ্মীর প্রসঙ্গে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় ভারতরাষ্ট্রের প্রকৃত মনোভাব জগতের কাছে সুষ্ঠুভাবে তুলিয়া ধরিয়া ভারতবাসী মাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। দরাদিল্লির অধিবেশনে সংস্কৃতের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া ও তিনি যে খাঁটি ভারতীয় নাগরিকের বলিষ্ঠ প্রত্যয় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৎসাহসের সাক্ষ্য ও পরিচয় বহন করে। পরলোকগত আমাদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট গুণগান করিয়াছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয় তো হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত উপাধিপ্রাপ্ত। বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী কে. এন. কাটজু মহাশয় বরাবরই সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও সংস্কৃতের সমাদর দিন দিন বাড়িতেছে। দুঃখের বিষয় সংস্কৃত ভাষার প্রধান কেন্দ্র এই বাংলাদেশেই উপযুক্ত আদরের বর্তমানে অভাব —আলোর নীচেই অন্ধকার!

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসিয়া অধিকাংশ বাঙ্গালীছাত্র নাস্তিকভাবাপন্ন হন, স্বদেশের সবই যেন তাঁদের বিতৃষ্ণার বিষয় মনে হইত। ভিক্টোরিয়া যুগের বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক মেকলে ভারত-বিদ্বেষী ছিলেন, ঐতিহাসিক টয়নবিও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত ভাষাকে প্রাচীন মিশর, ক্রীট ও বাবিলনের ভাষার সহিত তুলনা করিয়া মৃতভাষা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বর্তমানে দেশ স্বাধীন অথচ সেই ভাষাদুষ্টার মোহাচ্ছন্ন ভাব শতাধিক বৎসরের পরেও কাটে নাই, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। সংস্কৃত ভাষাকে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড তো কোণঠাসাই করিয়াছেন। কিন্তু পরাধীন ভারতেও ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত সংস্কৃত আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক উভয় পাঠ-ক্রমেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা মুখে সকলেই বলিতে ত্রুটি করি না—সংস্কৃত ভাষা ভারতের অধিকাংশ ভাষার জননীস্বরূপা। জননীর গৌরবতা না হইলে সন্তান সন্ততির শ্রীবৃদ্ধি হয় কিরূপে? মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইয়া বিদেশী প্যাক্ করা গুঁড়া দুধের স্নেহ কি বেশী হইতে পারে?

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও সহানুভূতি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ ব্রাহ্মণসভার পণ্ডিতমহোদয়গণ সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিবেন না আশা করি। সর্বস্তরের ১১ শ্রেণী

পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র সংস্কৃত ভাষা অত্যাবশ্যক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হইলে, সংস্কৃত চর্চা লোপ পাইতে বসিবে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, অধ্যক্ষ ষতীন্দ্রবিমল চৌধুরী মহোদয়গণকে। আজ তাঁহারা জীবিত থাকিলে এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করিতেন না।

শুনা যায় পৌরাণিক যুগে সংস্কৃত ছিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা। সত্ত লোক-গণনায়ও মাত্র শতকরা ০·৩০১ জনের কথ্য-ভাষা সংস্কৃত। কিছুকাল পূর্বে কলিকাতার পার্কে পার্কে আর্য্যসমাজের প্রচারকগণ সহজ সংস্কৃত ভাষায় সাধারণের বোধগম্য বক্তৃতা করিতেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বিতর্কসভায় বাজেটের মত জটিল ও নীরস বিষয়ের উপরও অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সরস ও দীর্ঘ বক্তৃতায় প্রমাণ করিয়াছেন যে—সংস্কৃতে যে কোন বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্ক চলিতে পারে। ভারতের সর্বত্র হিন্দুদের জন্ম হইতে মৃত্যুর পরেও গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় ক্রিয়াকর্মে পূজার্চনায় সংস্কৃতমন্ত্র দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যতদিন ভারতে হিন্দুধর্ম থাকিবে ততদিন সংস্কৃত মৃত ভাষা হইতে পারে না। ভারতীয় ভাষার জন্ম ও সংস্কৃতির মেরুদণ্ড সংস্কৃত।

———

শিক্ষায় ছড়ার প্রাধান্য (২)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথের ছড়ার ছন্দ নিয়ে আলোচনা করা কতটা নিরাপদ জানি না; কিন্তু তাঁর ছন্দ যে ত্রুটি বিবর্জিত নয় তা অনেকেই স্বীকার করবেন। তবে তাঁর ছন্দ বা কাব্য-দোষ শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশীর কথায় বলতে গেলে 'হর্ষের কলঙ্ক' মতোই।

তাঁর একটি বিসদৃশ বা সৌন্দর্যের ত্রুটি উল্লেখ করতেই হয়। তিনি এইসব ছন্দে মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দকে কোন সময় হুবহু কোন সময় বাংলা করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষে, আমার মনে হয়, বেমানান এই কৃতিত্ব। কারণ, 'বিয়ের উপহার' প্রভৃতিতে এই রীতির প্রচলন বহু আগে থাকেই দেখা যায়। লঘু বা হালকা রসের কবিতা লিখতে হবে বলেই এইরূপ পদ্ধতি নিতে হবে—এমন ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা বোধ হয় চাই না, তা সে যতই বাস্তবতা হোক না কেন :

(১) পয়লা নম্বর knave, idiot কেবল liar সে, humbug, cad unspeakble

(২) এখনি পাঠানো চাই Wim বিল্‌ডেনেতে

(৩) ঘুমরিয়ে দিল তার মুল্‌ফি,
মাপিত আদায় করে full fee.

এগুলো সবই জানুয়ারী ১৯৪০ থেকে ডিসেম্বর ১৯৪০ এর মধ্যে লেখা। ছড়ার ছবিতেও (১৩৪৪ বাংলা সন) মাঝে মাঝে এমন ব্যাপার ঘটে গেছে :

(৩) দিনমানির স্কুলে প'ড়ে, কম্পোজিটারের কাজ শিখে সে সহরেতে আয় করেছে ঢের

(৫) তাইতো সেদিন ছুটির দিনে টাইমটেবিল প'ড়ে

প্রাণটা উঠল নড়ে।

প্রশ্ন হতে পারে এগুলো যে বাংলাতে ভীষণভাবে

চালু হয়ে গেছে ; এগুলির বাংলা করলে যে আরো বিশ্রী হত। বাংলা প্রতিশব্দ গঠন করা আফিম-খাওয়া মহারসিক পণ্ডিতেরা করুন। আমি বলছি, একজন মহাকবির পক্ষে এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে ঐরকম তাৎক্ষণিক বাংলা ভাষারীতির কথা ব্যবহার করা অসম্ভব হত না। দৈনন্দিন কাজে-কর্মের কথা কবিতায় ব্যবহার করতেই হবে এমন কথা হয়ত রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করবেন না। ফলে এই হয়েছে—এসব কবিতা পড়তে যেমন কাঁচার মতো বেঁধে, অতিক্রম করতেও তেমনি শুকনো চবা-মাটির ঢেলায় হোঁচট্ খাওয়ার অবস্থা।

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য হয় ধরতে পারেন নি, না হয় উপেক্ষা করেছেন। উপেক্ষাই হয়ত করেছেন, কারণ তিনি আধুনিক বাংলার সৃষ্টি কার্যে বিশেষ প্রয়াস করেছেন। তাতে হয়েছে এই, ছড়ার প্রাকৃত মাধুর্যটি বিনষ্ট হয়েছে—আর কবিতাগুলি কৌতুককর হয়ে পড়েছে। সুকুমার রায়ের জোর পড়েছিল শিশুর কৌতূহল ধর্মের উপর, রবীন্দ্রনাথের পড়েছে কৌতুকের উপর। আর এই কৌতুক কখনও শিল্পক্ষেত্রে আনা যায়ই না। অন্যত্র যায় কিনা, এ প্রসঙ্গে সে আলোচনা অবান্তর।

প্রাকৃত বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য, সে শব্দের প্রথমে 'র' ফলাটি স্বীকার করে না। রবীন্দ্রনাথ 'র' ফলা তো এনেছেনই, এমনকি ইংরাজীর 'র' ফলা (প্রিপেরিটার)। 'ন'-ফলা সম্বন্ধেও একই কথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন—"স্নেহের রাগে রাঙিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।" 'ঋ'-কার প্রথমে পরিবর্তিত আকারে ব্যবহার করা গেলেও দ্বিতীয় অক্ষরে চলা কঠিন (বক্তৃতা—'বক্তৃতা করেছিল হরিহর শিকদার')। দুটি তালব্য বর্ণ স্বর বা অর্ধস্বর প্রকৃতির ব্যবধান না নিয়ে যুক্তভাবে ব্যবহার করা অসুবিধার ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন :

(১) দুয়োদেশে তার আপন অন্ন, নিজেরই বাছুরে
তাদের বেলা কাটে।

(২) বিচ্ছেদ নেই বাটুনিতে, শোকের গায় ধা কাঁক।

এ দিক দিয়ে প্রাচীন তামিল ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের ছড়াতেও দেখা যায়। তবে প্রাচীন তামিল এসব ব্যাপারে আরও ব্যাপক আরও রক্ষণশীল ছিল। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী বলেন, Conjunct consonants do not commence a word in Tamil as in Sanskrit, so also were the sounds ṭ, ṛ, & ḷ in old Tamil could not commence a word in Sanskrit. আবার 'ঞ্' প্রথমে বা শেষে ব্যবহৃত হত না (কন্নড-ভাষাতে এই লক্ষণ আরও স্পষ্ট, তেলেগুতে একটা অনুস্বার প্রয়োগ করে নেয়)। তবে আধুনিক তামিল ভাষায় 'ঞ' কে বদলে 'ন্'-কার করে নিয়েছে। তাতে আর একটা পরিবর্তন মাঝে মাঝে ঘটে যায় তা হচ্ছে শেষের অঘোষ বর্ণ (তালব্য) উঠে গিয়ে তালব্য ঘোষ বর্ণ রূপ নিয়েছে। বাংলায় ঞ্-কে আমরা 'ন্' করে ব্যবহার করি। কিন্তু ঝগড়াট শব্দটিতে তখনও পূর্ণ 'ন্' ধ্বনি প্রয়োগ করে উঠতে পারা যায় নি। তার প্রধান কারণ কথাবার্তার সুর কবিতার সুনির্বাচিত অক্ষর শব্দের সঙ্গে লাগানো কষ্টকর। অক্ষর শব্দের ভিন্ন বিন্যাস কবিতাটিতে যদি প্রযুক্ত হয়, তাহলে হয়ত বা সম্ভব। এক্ষেত্রে 'ঞ' ব্যবহার না করে নিতান্তই ব্যঞ্জনান্ত 'ন' দিলে সুবিধের হয় ঠিকই, কিন্তু সেখানেও 'ঝাট্'-এর আকারটি বেশ দীর্ঘ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তারসাম্য রাখতে পেরেছেন 'ঝাট'-কে ব্যঞ্জনান্ত না ক'রে খরান্ত করায়। এই পরিবর্তন নতুন যুগের, কিন্তু প্রাকৃত বাংলার নয়। রবীন্দ্রনাথ ছন্দের সম্রাট, তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু প্রাকৃত বাংলার বর্ধকে

অসুর তিনি রাখেন নি। তিনি ছড়ার ধর্মকে যখন বিশ্লেষণ করেছেন তখন নিখুঁতভাবে দেখেছেন কিন্তু প্রয়োগ করতে গিয়ে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলা-ধ্বনি এবং তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে। তবে এই ব্যাপারে তিনি যুক্তি প্রয়োগ ক'রে তাঁর প্রক্রিয়াই যে ঠিক তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যেমন 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকাতে লিখেছেন, "এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক মাপ; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার কষিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে কথা নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।"

'রোলার' আর 'নালিশ' বা 'অর্থলোভী' শব্দ তিনটির শ্রুতিতে পরিহাস ছাড়িয়ে বিদ্রূপ এমন আছে যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে মনে করি তিনিই ঠিক বলেছেন, ছড়ার ছবি-তে ঠিক লিখেছেন।

কিন্তু একটু ভলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারব 'রোলার' কথাটা অহেতুক। 'নালিশ' কথাটা পাঠ্যপুস্তক ছাড়া উঠতে পারে না, অর্থের প্রতি লোভ তিনি অন্যত্রে চেয়েছেন বলেই তাঁর ছড়া ছেলেমানুষ ছেলেদেরও তেমন স্বাধীনভাবে আকৃষ্ট দিতে পারেনি। আর 'সুরের' কথায় বলব রবীন্দ্রনাথের ছড়ায় সুর প্রয়োগ চলে না, কারণ ছড়া রচনায় রবীন্দ্রনাথ ছড়ার সুর ঠিক ধরে নেন নি। অর্থের দিকে লোভী করতে চেয়েছেন যখন পড়ি,

(১) চিনির বলদ লোভে এসে
সকল মিটিং-কমিটি
চোখের জলেই লোনতা হবে
বাংলা দেশের অমিটি।
রোদার হাতে থাকবে লোনা
মিঠের হাতে মিটি
সাহিত্যে বা পাকশালেতে
এরেই বলে কৃষ্টি।

অর্থ না বুঝে ছেলেরা এ ছড়া পড়তে চাইবে কি না জানি না, তবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বড়দের মতো লাগবে।

(২) খবরের কাগজেতে Shock দিল বঙ্গে,
প্যারাত্রাকে ঠোকর লাগে তার চক্ষে।

(৩) তার ছিল কোনদিন প্রশ্নের ধাক্কায়
পার্লিয়ামেন্টের হাওয়া পাছে পাকখায়।
এডিটর বলে, এতে পুলিসের পাকেলি।
পুলিস বলে যে, চলো ঘুরে ঘুরে পা চলি;
তাহল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
এসব ফসল ফলে কম্‌গ্রেসি শস্যে।

এসব স্থান যদি ছেলেরা নালিশ না ক'রে না বুঝে পড়তে চায় তবে বলতে হবে লেখাপড়া করার মতো মনোভাব নিয়ে ইস্কুলে যোগ দেয় নি, অথবা তাদের মনের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোন্ ছেলেদের জন্য যে কবি এই ছড়া লিখেছেন তাও বলতে পারা যাচ্ছে না।

(৪) কালেজপাড়ায় সিংহাস ঘোড়াই
অশ্ব কলুর গিন্নি।
কটকে ছোঁড়া চটকে যায়
মত্যপিয়ের সিন্নি।

এখানে অসংলগ্ন চিত্রকল্প জুড়বার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের মনটাকে বার দিতে পারেন নি। 'কটকে ছোঁড়া' ইত্যাদি পড়ে যে বয়সের ছেলে আনন্দ পাবে বলে মনে হয়, সে বয়সের ছেলে 'কলেজ' সম্পর্কে কবির বিদ্রূপটুকু বুঝে উঠতে পারে না, ওটার কোন ছবি তারা জানে না। অশ্ব কে, কলু, না, কলুর গিন্নী? রবীন্দ্রনাথ গিন্নিকেই অশ্ব করে নেয়ালে তাড়ানোর পরিহাস পরিস্ফুট করতে চান হয়ত। অবশ্য এটি আমার অনুমান। রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল-কলেজ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন তাই থেকেই অনুমান করছি।

'ছড়া' পুস্তকের '৬' নম্বর কবিতাটি বিচিত্র ছড়া। 'খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে।' ছড়ার বর্ষ নিয়ে এটি রবীন্দ্রনাথের নিপুণ ছড়া।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। প্রথমত পাঁচটি যুদ্ধ তবক দিয়ে ছড়াটি। অপূর্ব আকর্ষণ ছড়াটিতে। যুদ্ধ তবকের প্রথম অংশ খাঁটি ছড়ার ছন্দ এবং ধর্ম মেনে লেখা, দ্বিতীয় অংশে ঐ সময়ের যুদ্ধের ছবি যেমন :

(১)

সর্দে যে চাই মন দু'তিনেক বোলে কালে ঘাটমাস,
কানুবাবু তারই খোঁজে গেলেন বেয়ে পাটনায়
বিষম বিদ্যে করল চুরি রাম ছাগলের দুধ,
তারই সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গরুতাড়ানির খুদ।
ঐ শোনা যায় হেডিয়োতে বোচা খোকের হুমকি ;
দেশ বিদেশে শহর গ্রামে গলা-কাটার ধুম কি।
খাঁচায় পোষা চন্দনাটা কড়িতে পেট ভরে ;
সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে।

এই ছড়াটির একমাত্র ত্রুটি যে, বড় দীর্ঘ। নতুবা এর গুণের দরুণ এটিকে ছড়া না বলতে পারলেও ছড়া-কবিতা (?) বলতে পারা যায়। বাক্যগুলো যেমন দীর্ঘ, কবিতাটিও দীর্ঘ। তবু এর আকর্ষণ আছে। আদিবাসীদের বা আদিম সঙ্গীতের এ যেন এক নব মেঘদূত। কবিতাটির আবৃত্তিতে একজন মূল গায়েন থাকবে, যে প্রথম অংশ (তবকের) বলে যাবে আর দ্বিতীয় অংশ বলবে একদল দোহার। তবে তাদের আগে থেকে প্রস্তুতি থাকা চাই। কারণ দ্বিতীয় অংশ দুবার বলো। একই কথার আবৃত্তি নয়, প্রত্যেক তবকে ভিন্ন ধরণের পদ। এ ধরণের ছড়াকে আমরা 'মালাসঙ্গীত' (Chain Song) বলতে পারি। কেউ কেউ এই ধরণের কবিতাকে (যদি লোক-সঙ্গীত হয়) Cumulative Song বলে অভিহিত করেছেন। আমার মনে হয় 'মালাসঙ্গীত' বা Chain Song কথাটিই এইরূপ কবিতার পক্ষে ভালো। কারণ ঘুরা যদিও নেই, তেমনি কোন একটা ধর্ম-সঙ্গীতও এটি হয়ে ওঠে নি, ভাবেরও ঐক্য নেই। আজকাল বহু বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানের সময় May-Pole অনুষ্ঠান করে। তার চেয়ে এই ধরণের ছড়াকে রূপ দেওয়াতে সেখানে যা আবৃত্তি করালে মনে হয় ছেলেদের খুব উৎসাহ দেওয়া যাবে। দুঃখের বিষয় এ ধরণের ছড়া-কবিতা রবীন্দ্রনাথ এই একটিই বোধ হয় লিখেছেন। 'বোশেখদা' ছড়াটি এই ধরণের হতে পারত। কিন্তু সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল,

ভূগোল হত উলটো-পালটা, কাহিনী আজগুবি,
মজা লাগত খুবই।

আর ভূগোল কতটা উলটো-পালটা হয়েছে তাই বোঝাতে তিনি এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে ছেলেরা মজার চেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেশি।

বস্তুত 'ধাপছাড়া' থেকে বাছাই করে নিলে যা কিছু ছড়া পড়ার আনন্দ পাওয়া যায়, নতুবা ছড়ার ছবি আর ছড়ার প্রায় সব কবিতাই ভারিক্কি। কবিতার ধৈর্য্য বড় বেশি বাধা অন্যায়। মনে হয় ছড়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ছড়ায় যে অসংলগ্ন ভাব বা চিত্রকল্প আছে সেই লক্ষণটির উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। আর তাতেই তাঁর ছড়া ব্যর্থ হয়েছে। 'এ হল মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অর্ধ সত্য। 'প্রলাপ' যদিও হয় তবে তা 'ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপ', বয়স্কদের নয়। আর এই অসতর্কতার দরুণই তিনি বুঝতে পেরেছেন, "অল্প এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সব চেয়ে কম সহজ।"

বাইরের দিক দিয়ে ছড়া যতই অসংলগ্ন কথার সমষ্টি হোক না কেন, তার মধ্যে দুটি ঐক্য আছে। একটি সুরের ঐক্য, প্রাকৃত সুরের ঐক্য; অন্যটি মায়ের নিজের এবং শিশু সম্পর্কে এক অনুভূতি—সে কথা আগে বলেছি। রবীন্দ্রনাথ এই দুটি ঐক্যকেই এড়িয়ে গেছেন, আর তাইতে তাঁর ছড়া এমন দীর্ঘ হয়ে পড়েছে।

সুরের ঐক্যই সঙ্গীতকার বা কবিকে ছন্দ এবং স্তবক সম্পর্কে ধারণা দেয়। আদিবাসীদের কবিতা যেখানেই পাওয়া গেছে সেখানেই এই লক্ষণটি দেখা গেছে। সিংহলের ভেড্ডা, মালয়-এশিয়ার সেমাঙ্, টাসমানিয়া বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী, আন্দামানীয়, বুশম্যান, এস্কিমো, খোমোন বা টিয়েরাডেল দুহ্রেসোর আদিবাসী প্রত্যেকের গানেই এই সুরের ঐক্য থেকে ছন্দ এবং স্তবকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা গেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক আমাদের দেশের পালকী-বেহারার গান। বলা বাহুল্য এগুলো Work-Song বা কর্মসঙ্গীত নয়। কর্মকে কেন্দ্র করে কথার এবং চিত্রকল্পের যে ঐক্যসাধন হয় এখানে তা নেই। এখানে সুরকে কেন্দ্র করে কথা সাজানো আছে, কিংবা অর্থবিহীন সুরকে অর্থযুক্ত করবার জন্যই শব্দ এবং চিত্রকল্প ব্যবহার। আজানের ধ্বনির মধ্যেকার তিনবার 'আল্লা হো আকবর' তিনসুরে যে বলা হয় তা-ও একটি সুরের ঐক্য ঠিক করে দিয়েছে। আনন্দের প্রকাশ হলুধ্বনিকে অর্থযুক্ত করলে 'উলু উলু নাদারের ফুল' ছড়াটি পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। পুরোহিতের আরতি-মুহূর্তে এবং চাকের বাজনাকে শব্দ বা ছন্দে রূপায়িত করলে শঙ্করাচার্যের স্তোত্র (শিবাদে শিবাদে প্রমাদে প্রবাসে .....গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি) পাওয়া অসম্ভব নয়। শিবের পূজারীর অনুষ্ঠান-প্রক্রিয়া এবং প্রদক্ষিণ ছন্দ—

কস্তূরিকাচন্দন লেপনায়ৈ,
শ্মশান ভস্মাঙ্গ বিলেপনায়,
সৎকুণ্ডলায়ৈ কণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।

স্তোত্রটি রচনায় স্তবক এবং ছন্দ নির্ণয়ে সাহায্য করে থাকতে পারে। অর্থাৎ, অর্থবিহীন সুর অর্থযুক্ত কথায় সৃষ্টি করল, ছন্দ তখন একটি বা দুটি বাক্যে সীমাবদ্ধ। পরে নৃত্যের ছন্দের পুনরাবৃত্তি কাটাতে স্তবক আরও যুক্ত করা হল। আরও পরে বাদ্য এবং নৃত্যভঙ্গীকে বাদ দিয়ে কথার সুর নিয়ে স্তবক সৃষ্টি করা হোল। পরবর্তীকালে বাদ্যসঙ্গীতের সুরাবলম্বনে সুরারোপ রেখে স্তবক সৃষ্টি করা হোল বটে, কিন্তু কর্মভঙ্গী এসে জুটল।

বাউলেরা যখন গান করেন তখন তাঁদের একতারা ঠিক করে দেয় বক্তব্য এবং মনের ভাব ছাড়া তাঁদের নৃত্যভঙ্গী। হাত পেটানোর গান কর্ম-সঙ্গীত, কিন্তু ছন্দ নির্ণয় করে দিয়েছে মিস্ত্রীদের কর্মভঙ্গী। মাঝিমাল্লারা এই কর্মভঙ্গী থেকেই তাদের গানের ছন্দ আর স্তবক-দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে নেয়। এস্কিমোদের নৃত্যভঙ্গী থেকে এই রকম ছন্দোবদ্ধ পদ্য বা গান নির্ণয় করতে দেখা যায় (বলা বাহুল্য এস্কিমোদের গান তৈরীতে খ্যাতি আছে, যেমন সিংহলের ভেড্ডাদের মায়ের ছড়ার খ্যাতি)। তাদের ভাষা থেকে বাংলাতে অনুবাদ করা কঠিন কিনা জানি না, তবে ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে যখন তখন বাংলাতেও হতে পারে। ভেড্ডাদের বা গ্রীকদের মেয়েদের ছড়া যদি এমনি কেউ বাঙলাতে অনুবাদ করেন তবে ছড়া সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আসতে পারে। নতুবা অভিজাত কবিতা এবং কেবল বাংলার মেয়েদের ছড়ার মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখলে বাংলা ছড়ার নতুন ধারা আসা কঠিন। আমাদের বাংলা কবিতা সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের সান্নিধ্যে এসে নতুন মোড় নিয়েছে একথা যদি সত্য হয়, তবে অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমার এ প্রস্তাব এখানে করতেও পারি।

যাই হোক, ছন্দ এবং স্তবক দৈর্ঘ্য নির্ধারণ এই স্বাভাবিক পথেই হয়ে থাকে। ঐ সুর আর বিভিন্ন ভঙ্গীই হচ্ছে একমাত্র উৎস। রবীন্দ্রনাথ, বাঙলা যে ভঙ্গীবহুল ভাষা তা স্বীকার করেছেন, এই ছড়ার যে সুর আছে তা অনুধাবন করেছেন, এবং ছড়ার ছন্দটি যে পৌনঃপৌনিকের দাবিদার তাও বুঝেছেন, অথচ তিনি তা ব্যবহার করেন নি। ঐ যে

যেঁষাঘেঁষি হয়েছে ওটি পরিণতি কিন্তু আসলে সুরের কাঠামো বা নকসা (Pattern)-ই সেই অবলম্বন যেখ। এ ব্যাপারটি কিন্তু আমরা পয়ার ছন্দের বেলা যেন বুঝতে পেরেছি। পয়ার ছন্দেরও ঐ ধর্ম। সুরের প্যাটার্নকে ভরতে গিয়েই ছন্দের মাত্রা বাড়ে কমে। এই ধর্মটি কবিতার বা গানের আদি আবার প্রত্যেকটিরই বৈশিষ্ট্য। বয়াতিতলে কি, বয়াতিক্রমে জানি না, বাঙলাদেশে পয়ারটি জনসঙ্গীতের সঙ্গে থেকেছে বলে, এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের অভিমানের জন্য সংস্কৃত ছন্দ পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি বলে, আমরা পরবর্তী কালে তাই একমাত্র পেয়েছি। শুধু পয়ারের বৈশিষ্ট্য নয়, যে-কোন ভাষারই আদি-বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত কবিতার কথা বাদ দিলেও আমাদের পয়ার ছন্দও যে লাইন টিড়োতে চেয়েছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে। কাশীরামদাসের একটি কবিতার কথা তো এখানেই মনে পড়ছে—

"কনকের মৎস্য, তার নাসিক নয়ন।
সেই মৎসচক্ষু হেলিবেক যেই জন।
সে জিবেক মোর তন্ত্রী ভ্রূপর দুহিতা।"
এত ভাবি জলে দেখে পার্থ ধনুর্ধর;

কাশীরাম দাস যদি ছড়ার আকারে লিখতেন তাহলে কথ্যভঙ্গীতে সুরের পূরণ ঘটাতেন তবে তাঁকে বাক্যভঙ্গীই চতুর্থ লাইনটিকে 'একাকী' রাখতে অর্থাৎ নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখতে দিত না। কিন্তু তিনি সাধু- জনের পন্থা অবলম্বন করতে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'সাধুভাষার ছন্দে অন্ত্য বাঙালি চলতে পারে না, তাকে চলিতে হয়, বলতে তার নিষেধ, বলিতে সে বাধ্য।' আমার মনে হয় সুরের সঙ্গে সাধুভাষা চলতে পারে না, চলে না যে তা নয়—তবে স্বাভাবিক নয়। আর স্বাভাবিক না হলেই অসহ্যবি ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ সুরের সেই স্বাভাবিকত্ব পরিহার করেছেন বলেই ছড়াগুলি 'ছন্দ ছাড়া' হয়ে গেল, যার বিস্তার থাকল, সমে এসেও, শান্ত হল না। আর এই সুরের প্যাটার্ন বা মাসীর ছিল বলে শিশুকে আদির করবার দোলা দেবার ভঙ্গী আছে বলে, তাঁদের ছড়া অবশ্য পরিমিত হয়েছে। দোলার চালিয়ে তাঁরা ছন্দের এবং স্তবকের মাপ ঠিক করে নেন নি। রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক কাব্যছন্দের ঝোঁক এবং বড়দের কবিতার সুর, মৃত্যুতন্ত্রী-বাঙ্ক-অনুষ্ঠান-আধিমনুর বিবর্জিত আধুনিক বাংলার বাক্য পঠনের সুরকে তিনি ভুলতে পারেন নি বলে ছড়ার ছন্দে কবিতার পংক্তি, ভাবের গাম্ভীর্যের হাতছানি এবং ছড়া গ্রন্থের কবিতার স্তবকের ঐক্য অমন বেদামাল হয়ে পড়ছে। হয়ত একবার ভেবেছেন একে সংযত করবেন কিনা, কিন্তু শিল্পী তাঁর শিল্পের নতুন রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে 'দোলার চালানোর' মতো কৃত্রিম অবস্থাকে ব্যবহার করলেন না। দোলায় না চালিয়ে ভালো করেছেন, কারণ আমরা এখানে কবিকে পেয়েছি তা সে ছড়া নাইবা পেলাম।

রবীন্দ্রনাথের ছড়া সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম এই আশায় যে, অন্যান্য কবির ছড়া আলোচনা সংক্ষেপে করতে পারব।

অন্যান্য কবির মধ্যে ছড়া রচনা করে থাকেন প্রধানত অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর 'উড়কি ধানের মুড়কি' বড়দের জন্য ছড়া। অন্নদাশঙ্করের 'রাঙা-ধানের খৈ' ছোটদের জন্য ছড়া ও নাটিকার সঙ্কলন; আর একটি 'ডালিম গাছে মৌ'।

বিশেষজ্ঞেরা লোকসঙ্গীত আর জনসঙ্গীত দুটো ভাগে ভাগ করে থাকেন। লোকসঙ্গীতকে ইংরেজীতে বলে Folk Song, আর জনসঙ্গীত হচ্ছে Popular Song. লোকসঙ্গীতের সুরকে আশ্রয় করে কিছু কিছু তার প্রসিদ্ধ কলিকে নিয়ে নতুন সৃষ্টিভঙ্গী আর বিষয় সন্নিবিষ্ট করে জনসঙ্গীত লেখা হয়। অনেক সময় লোকসঙ্গীতের মধ্যে জনসঙ্গীত এসে ঢুকে পড়ে। জনসঙ্গীতের সব

কবির নাম পাওয়া যায় না। কতগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা, তদানীন্তন কালের প্রসিদ্ধ প্রসঙ্গ প্রভৃতি দিয়ে জনসঙ্গীতকে চেনা যায়। কিন্তু কালের ব্যবধানে এই জনসঙ্গীতও লোকসঙ্গীত রূপে প্রতিভাত হয়। উপরের তলার মার্জিত ছড়া কালক্রমে সাধারণ লোকের মধ্যে চালু হয়েও পড়ে। এইগুলি আবার সাহিত্যিকদের হাতে মার্জিত হয়ে নতুনরূপ নেয়। বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই দুয়ের পার্থক্য ধরা কঠিন। আলেকজান্ডার ক্রেপ বলেন, The distinction between folk-song and popular song is therefore accidental rather than inherent in the two genres. জনসঙ্গীতের গঠনপ্রকৃতি অনেকটা নিয়মবদ্ধ, কি রচনায় কি বিষয়বস্তুতে। কিন্তু লোকসঙ্গীত এতটা দৃঢ়বদ্ধ বা অপরিবর্তনীয় নয়। পরিবর্তন-কালের পুরনো ছড়া নয়। তার সুরটি প্রধান, কিন্তু কথা বা বিষয়বস্তু নয়। সুরের ঔদার্যই এতদূর দাবী। লোকসঙ্গীত এইজন্য লোকপ্রিয়ও যেমন হয়েছে, তেমনি মৌলিক লৌকিক ছড়া পাওয়াও কঠিন। বাংলার একটি ছড়ার কথাই ধরা যাক—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।

মোহিতলাল এই ছড়াটিকে 'নদী এল বান' বলে জোর দিয়েই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'নদের এল বান' বলে নবদ্বীপের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তিনি 'নদী'-কে 'নদে' বলে গাঙকে দেশে রূপান্তরিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই শুনেছেন। অর্থাৎ ছড়াটি নানাভাবেই বদলে গেছে। ছড়ার অর্থকে বাদ দিয়ে যে সত্যধার অর্থকে স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছে তাদের পক্ষে এই পরিবর্তন অনুবিধার হয় নি। রূপকথার প্রসঙ্গে একটি ছড়া 'সাত ভাই চম্পা জাগোরে'—যখন জনসঙ্গীতে আদরার চেষ্টা করা হল তখন ঐ ছড়ার ভাষাটি নতুন গীতিকারকে 'সাত ভাই'এর সর্বনাম 'তোমার'—অর্থাৎ একবচনে রাখতে বাধ্য করেছে। খুব সাধারণভাবে দুয়ের পার্থক্য ধরাও যায়।

লোকসঙ্গীতের কাঠামো বা গঠন অত্যন্ত সরল। তিনটি লাইন বা তার কিছু বেশী। দুপদ থাকে। প্রথমে থাকতে পারে, শেষেও। ছন্দ-ধ্বনি যথাযথ, তবে অন্ত্যানুপ্রাস ও বা দুই লাইনের মিল সব সময় মার্জিত শ্রুতি মেনে চলে না। সুর-যে মৌলিক বা লোক-প্রচলিত হবেই এমন কথা নয়, অনেকসময় প্রসিদ্ধ গীতিকার বা প্রসিদ্ধ কবির সুরটিকে দিতে পারে। যাত্রাগান থেকে, কথকতা থেকে, কবিয়াল থেকে সুর আমদানী করে থাকতে পারে। পরবর্তীকালের লোকসঙ্গীত, বা জনসঙ্গীতের লেখক কিন্তু প্রাচীন সুরটি নিতে চান। তাঁরা দুপদকে সরিয়ে আর-একটি কৃত্রিম সাহিত্যভঙ্গী দিয়ে পুষিয়ে নেন।

লোকসঙ্গীতে গীতিধর্মিতা বেশি, অর্থাৎ নিজের অনুভাবনা। বিষয়বস্তুটা তাদের গভীর, রবীন্দ্রনাথের কথায় 'হালকা' মোটেই নয়। হালকা শোনার কারণ এই যুগে বসে তাদের ভাষাটা হালকা বলে মনে হয়। যেমন পূর্ববঙ্গের ভাষা, বা উড়িয়া ভাষা আমাদের রসিকতা বলে মনে হয়। নাটকে যত হাসির খোরাক তা এককালে পূর্ববঙ্গের বা উড়িয়া ভাষা দিয়ে যোগান হত। সাহিত্যভঙ্গী নেই, অলঙ্কার কম, কিন্তু বক্তব্য স্পষ্ট আর জোরালো। অনুভূতির বা অনুভাবনার সূক্ষ্ম দিক বড় কম, আবেগের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করা হয় নি, 'পাটি' কালীঘাটের পটুয়ার মতো মোটা তুলির টান, বামিনীরায়ের সেই ধরণের মার্জিত ছবির মতো সংস্কারমুক্ত অথচ সূক্ষ্ম বাসনা বা ঘুরোনো দৃষ্টিভঙ্গী সেই। স্মৃতির অনুষঙ্গগুলি ভাবসংক্রামক নয়, ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রত্যক্ষ ধাপের অনুষঙ্গ (association of impressions)। চলনটি দ্রুত, চাল-টি সহজ। জীবনের কঠোর দিকের আভাষ দেয়, তিক্ততার আভাষও দেয়, অভিনাটকীয়ও হয়, ইমোসন বা

প্রক্ষোভ আছে, সেন্টিমেন্টালিটি বা রসাবিষ্টও হয়ে পড়ে, কিন্তু কোনটিও জটিল নয়। কোন সমস্যা নেই, দ্বন্দ্ব নেই—আত্মজিজ্ঞাসা বা বিশ্লেষণ তো নেইই। সুরটি মেয়েলি, কারণ মেয়েদের কাছ থেকেই প্রথম উৎসারিত হয়েছে।

আলেকজান্ডার ক্রেপ এইভাবেই লোকসঙ্গীতের প্রকৃষ্ট লক্ষণ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর কথা যে কেবল ইয়োরোপীয় লোকসঙ্গীত বা ছড়ার বেলাতেই সত্য তা নয়, সর্বদেশের বেলাতেই সত্য। সি. এম. বাওরা কিছু কিছু ভিন্নকথা বললেও মোটামুটি একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। মেয়েদের গানকে ক্রেপ সাহেব বলেন, Women's songs are (or, more prudently, perhaps were) the cradle songs. It is quite likely that they developed out of the burden or refrain, or merely out of a humming melody, somewhat akin to the French Plough song, and the most texts we possess are literature rather than folk-lore. পরে বললেন, "With the well-known division of the Greek household into into the masculine and the feminine side, the latter condemned to silence, one can hardly expect a different style of affairs."

ক্রেপের কথা মোটামুটি সত্য হলেও অন্ত সমাজে যেখানে মেয়েদের চুপ করবার হুকুম ছিল না সেখানেও ছড়ার উৎস নিতান্তই শিশু-পরিচর্যা। আমাদের ছড়ার মতো ঘুমপাড়ানীই নয়। যেমন ভেদ্দাদের মায়ের একটি ছড়া (অধ্যাপক সি. এম. বাওরা তাঁর গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন),

Darling, darling,
There you see the wind and the
rain coming
From outside the seven seas.
See the two of them.
See, brother, thunder and lightning
coming from toward the sea.
It is getting bad.
My body is losing strength.
Let us two go to the Rajawala cave.

বৃষ্টি বজ্রপাতে ছেলেমেয়েরা ভয় পেয়েছিল, বা তাদের সাহস যোগাচ্ছেন। অথবা ঘুমপাড়ানী ছড়া,

My beautiful baby.
What do you cry for, my child?
Child, it is for the UYILA yam.
I will give you the whole of it.

অধ্যাপক বাওরার বই থেকে আমাদের ঘরের কাছের ভেদ্দাদের ছড়া যদিও তুলে দিলাম, তবু একথা মনে রাখবই যে, ছড়া খাঁটি খাঁটি সেই ভাষায় না শুনলে রাদুর্য ধরে ওঠা যায় না। অনুবাদ করতে হলেও মুখের আবৃত্তি এবং আবৃত্তির ভঙ্গী শুনতে এবং দেখতে হয়। তবে আমাদের বক্তব্য অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। কারণ, আমরা বলতে চেয়েছি—মৌলিক ছড়ার উদ্দেশ্য, তার আবেগের সহজ দিক, অলঙ্কার বর্জিত তার দৃঢ় আর স্পষ্ট ভাষাই যে প্রধান সেই কথা।

অন্নদাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনির্মল বসু, যোগীন সরকার, সুকুমার রায় সবাই ছড়ার সুরকে আশ্রয় করলেও উদ্দেশ্যকেই নতুন করে নিয়েছেন। অসীমুদ্দিন পরিবেশকে রাখতে চেয়েছেন উদ্দেশ্য মৌলিকের মতোই তাঁর। পরিবেশ রাখতে চাইলে তাঁরা অনেকটা পুরনোর মতো রাখা যেতে পারে, কারণ কবি তখন মৌলিক ছড়ার স্বাভাবিক কল্পিত পরিবেশে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু উদ্দেশ্য বদলে গেলে সেজাজ, ভাষা, বক্তব্যের সারল্য, পরিবেশ সব কিছুই বদলে যায়, থাকে শুধু ছন্দটি। ছন্দ আর পুরনো পরিবেশের আভাষ দেয়—এই রকম অবস্থা

আমাদের এইসব কবিতার আকৃষ্ট কিছু কিছু করেও থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ পদাবলীর বা মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের ভাষা আমাদের প্রাথমিক আবেশ দেয় বৈষ্ণব যুগ এবং কাহিনীর। ছড়াকে অবলম্বন করবার উদ্দেশ্য আর একটি থাকতে পারে তা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের সব কিছুই মিষ্টি শোনায় তাই অপ্রীতিকর কথা ছড়ার মাধ্যমে বলা যেতে পারে, জ্ঞানবিজ্ঞানের কথাকে সরল করা যেতে পারে, লেখাপড়ার নিয়মবদ্ধতার থেকে একটু সরিয়ে আনা যায়। পাগলের ভূমিকায় যেমন নাট্যকার (পূর্বে ছিল বিদূষক) অতি স্পষ্ট দিক তুলে ধরতে পারেন। তবে তার ফলশ্রুতিতে দেখি এ অবস্থায় কোন বক্তব্যই গভীরে রেখাপাত করে না, আসল বিষয় থেকে, প্রধান উদ্দেশ্য থেকে শ্রোতা দূরে পড়ে থাকে। মনে হয়, আবৃত্তিরই বোধহয় এ এক দোষ। আবৃত্তি নাকি বোধ থেকেও শ্রেষ্ঠ। জানিনা 'আবৃত্তি' সেখানে কি বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু হামেসা দেখা যায় আবৃত্তির দরুণই কবিতার বা বক্তব্যের ধার নষ্ট হয়ে যায়। মহাপুরুষের কথা যখন অন্য পুরুষ আবৃত্তি করেন, উপনিষদের শ্লোক যখন মাষ্টারমশাই আবৃত্তি করেন তখন তার ধার আর থাকে না, অনেকটা মুদ্রাদোষ হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের, স্বামীজীর (অর্থাৎ বিবেকানন্দের), মহাত্মাজীর অনেক উক্তিই এখন মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। এরূপ হওয়ার একমাত্র কারণ, আবৃত্তি প্রধানত উপলব্ধি বর্জিত হয়ে পড়ে। 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে' কথাটি প্রথম যখন যোগীন সরকার ব্যবহার করলেন, কিংবা 'হারাধনের দশটি ছেলে' দিয়ে বিয়োগ অঙ্ক শেখাতে চেয়েছিলেন—তখন প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে বলে ওতে মনোযোগ ছিল। কিন্তু আজ আর তা নয়। ওঁকে অনুকরণ করতে করতে অভেরটি অবহেলিত হয়েছে ওঁর নিজেরটিও। এখন ছড়া বলে, হরফ চেনে না। যোগীন সরকার নিজেরই অনুকরণ করতে গিয়ে বিয়োগের সঙ্গে যোগ অঙ্ক শেখাতে যখন ঐ ছাড়া পালাদায় লিখলেন তখনও তার ধার কমে গেল। এখন হাসি আছে, মজা আছে, শেখায় খুশি নেই।

অন্নদাশঙ্করের খুকু ও খোকা ('তেলের শিশি ভাঙলো বলে') মার্জিত ছড়া হিসেবে-তেমনি উত্তীর্ণ। উদ্দেশ্য পৃথক বলে মেয়েদের প্রচলিত ছড়া বা লোকসঙ্গীতের ধর্ম থেকে সরে এসেছে। অলঙ্কার একটি এসেছে—

তাগাতাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির লুট
তার বেলা?

কিন্তু এ অলঙ্কারটি প্রাচীন প্রথা থেকেই নেওয়া হয়েছে। তবে 'ঘেড়ে খোকা' কথাটি প্রাচীন শব্দ হলেও আধুনিক অর্থ বা 'ভাল'। সুরটি সামগ্রিক ভাবে ঠিক করা হয়েছে বলে এ ছড়াটি কোথাও বেমানান হয়ে পড়েনি। এ সুরটি ভঙ্গী-প্রধানও বটে। অন্নদাশঙ্কর অধিকাংশ ছড়াতেই ছড়ার ভাষার ভঙ্গিমা রাখতে পেরেছেন। এইজন্য বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানাদিতে বা অনুষ্ঠানগত পাঠ্যক্রমে এ সব ছড়ার মালা সঙ্গীতধর্মী আবৃত্তিসুন্দর হয়। অবশ্য যে-সুর অন্নদাশঙ্কর জুড়েছেন তা নতুন নয়। পূর্বে উল্লিখিত যে-কৌশল জনসঙ্গীতের বেলায় বলেছি, অর্থাৎ পুরনো প্রচলিত সুরের সঙ্গে নতুন পদযোজনা—সেই ধারাটিই অন্নদাশঙ্কর অনুসরণ করেছেন এখানে। এই সুরেরই আর একটি কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছ থেকে পেয়েছি:

এক যে ছিলো অ্যাত্তিবা
আত্তিকালের বুড়ি;
রোগ ছিলো তার খাই-খাই, আর
কিসের হুড়হুড়ি,
—কিসের কে জানে!

কিন্তু সুর ছন্দ সমস্ত কিছু ঠিক থাকলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনাটি ছড়া থেকে কবিতা হয়ে

পড়েছে। মনে হয় সেইজন্যই তিনি তাঁর কবিতা-গ্রন্থ 'ফেব্রুয়ারী কৌজ'-এ এই কবিতাটির স্থান দিয়েছেন।

কিন্তু অন্নদাশঙ্কর ছড়ায়, বিশেষ ক'রে এইসব ছড়ায় উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে নিয়েছেন বলে সময় উদ্দেশ্যই তাঁকে ছড়ার ধর্ম থেকে সরিয়ে দিয়ে গেছে। বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৭১) তে তাঁর এই আত্মসমর্পণ দেখতে পেলাম :

বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর
পথে এলো বান
পথের মাঝে অথই জল
দাঁড়িয়ে গেল যান।
মোটর মোটর করেন যে
মোটর এখন ফটর
এখন, দাদা, সবাই মিলে
ভাজুন হরিমটর
বৃষ্টিপাতে বৃষ্টিপাত !!
রাত্রে আজ নেইকো ভাত !

বাস্তব জীবনের অতি সাধারণ বাক্‌ভঙ্গীমার সুর আর কথা, তবু ছড়ায় সেই মোহ সৃষ্টি করতে পারে নি। কারণ সেই সংবেদ নেই, ছবিতে সেই মন্ত্রতা নেই।

অন্নদাশঙ্করের আর একটি ছড়া,

মরনারে মা মধুমতী
মরনা তোমায় কই ?
মরনা পেয়ে কুটুমবাড়ী
গাছের ডালে ওই।
কুটুম কুটুম কুটুম
মাথাটি তার খুতুম
আঁধার রাতের চৌকিদার
দিলে বলে খুতুম।

এ ছড়াটিও ভঙ্গীতে ঠাসা। কিন্তু ভঙ্গীর সঙ্গে কথা আসে নি, কথারই ভঙ্গী এসেছে। তাছাড়া 'গাছের ডালে ওই' বাক্যটি আধুনিক কালের গদ্য-ভঙ্গী। প্রাক্তন বাংলায় ওভাবে বাংলা বাক্য গঠন করতে দেখা যায় নি। কথার ভঙ্গী নিয়ে ছড়া করা অন্নদাশঙ্করের এক বৈশিষ্ট্য বলেই মনে হয়। মার্জিত ভাষায় আধুনিক কবিদের এই বৈশিষ্ট্য এসে পড়েই। কারণ তাঁরা ভঙ্গীকে পরিস্ফুট করতে কথা ব্যবহার করবার মতো অভিজ্ঞতা খুব একটা পান না, একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। অন্য কবি কথার মধ্য থেকে ভঙ্গী আদায় করেন। অন্নদাশঙ্করের 'আর্তনাদ' 'ঝুমঝুমি' 'ঘ্যানঘ্যানানি' 'পুতুল' 'ব্যাঙের ছড়া' 'পার্বতীর ছড়া' 'বমন বারণ মন্ত্র' সবই এই ধরণের কথার ভঙ্গীতে লেখা। কিছু কিছু তাঁর রঙ্গ আবৃত্তির মতো ছড়া আছে। এ ধরণের একটি সার্থক ছড়ার কথা মনে পড়ছে :

তোমরা শুধু খাও জোগাও
আমরা শুধু খাই
আজকে যেটা রাখলে ঘরে
কালকে সেটা নাই।
হুঁ-হুঁ হুঁ দাদা।

এইখানে অন্নদাশঙ্কর যে ভঙ্গী দিয়েছেন এটি অপূর্ব। ভঙ্গীকে পূরণ করতে যে-যুগে ছড়া বা লোকসঙ্গীত রচনা করা হত সে-যুগেও এই অভিনব ভঙ্গী আর কথা নিরোপা পেত নিশ্চয়ই। এই ধরণের ছড়া ছাড়া ছড়ানাট্য ও তিনি কিছু লিখেছেন। মনে হয় উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে এইসব আবৃত্তি ইস্কুলের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দও যেমন দিতে পারে, শব্দের উচ্চারণে তেমনি সাহায্য করতে পারে। অন্নদাশঙ্কর ছড়ায় সুর দিয়েছেন, বাংলা কথায় বাস্তবভঙ্গী দিয়েছেন, গল্প দিয়েছেন, সংবাদপত্রের ভারও দিতে চেয়েছেন। বাস্তবভঙ্গী আনতে তিনি পুরনো থেকে নতুনের দিকে ঝুঁকেছেন। সব ক্ষেত্রেই যে তিনি সার্থক হয়েছেন তা নয়, তবে গ্রামের পরিবেশ না দিয়েও যে ছড়া রচনা করা যায় তা তাঁর ছড়া পড়লে

কিছুটা বোঝা যায়। অর্থাৎ তাঁর ছড়া খাঁটি একেলে ছড়ার প্রথম দিকের একটু পথ। তিনি যদি পরিবেশ ঐ শিশুমহলের মধ্যেই রাখেন মনে হয় এই পথটি আরও দীর্ঘ হতে পারবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছড়ার ছন্দ পেয়েছি, ছড়া বিশেষ পাইনি। যে-কয়টি পেয়েছি তা কবিতা হয়ে গেছে। একটি পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, দ্বিতীয় একটির কথা মনে পড়ছে 'হাসলহাসা লাফিয়ে চলে' তৃতীয়টি বার্ষিক শিশুসাথীতে (১৩৭১) 'মিষ্টি মেঘ' নাম দিয়ে। এগুলো সবই কবিতা। আবৃত্তি করবার মতো। কঠিন বিষয় সহজ ক'রে আনবার কৌশল।

জসীমুদ্দিনের ছড়ায় ছড়ার ছন্দ আর গ্রাম-পরিবেশ। গ্রামের উপর নির্ভর ক'রে গ্রামের বিষয় নিয়ে। গ্রামেরই মতো একটা অপরিচয়ের মিষ্টতা আছে। সুরটাও প্রাচীন। এই সুরের জন্যই প্রাচীন ছড়া বা লোকসঙ্গীতের মাধুর্য আনে।

যোগীন্দ্র সরকার অনেক আগে লিখেছেন। তিনি শিশুপাঠ্যকে একঘেয়েমির হাত থেকে সরিয়ে আনবার জন্যই লিখেছেন, কাজেই তাঁর উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। অতি স্পষ্ট চিত্র, কিন্তু আধুনিক ভাষার বড় উৎকট। যেমন :

কড়িং বাবুর বিয়ে।
বাদের পাতা লুচি হল ভাজা শিশির-ঘিয়ে,
দই সন্দেশ তৈয়ার হল মাটিতে জল দিয়ে,
ব্যাঙের ছাতার বীচে সবে খেতে বসল গিয়ে।
আরে, কড়িং বাবুর বিয়ে!

ছেলেদের খেলাঘরের কল্পনা, রূপক প্রয়োগ। যোগীন্দ্র সরকারের বড় গুণ হচ্ছে তিনি শিশুদেরকে নানা জীবজন্তু কীট-পতঙ্গের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে বেঁধে দিতে চেয়েছেন। ছোটদের আনন্দ দেওয়ার চাইতে ছোটদের প্রতি বাৎসল্য খুব বেশি। যেন, ধরণী শিক্ষকের ভূমিকায় তিনি আছেন।

সুবির্মল বসু শিশুদের কবিতা লিখতেন। কিন্তু ১৩৫৯ সনে শিশুদের জন্য একটি ছড়ার বই লেখেন 'আমার ছড়া।' সত্যি এগুলি তাঁর ছড়া। কিন্তু এই ছড়াগুলো খাঁটি ছড়াই হতে চেয়েছে। সেইরকম সাময়িক সুর নিয়ে কথা সাজানো, সেই সুর অনুসরণ করে তরকের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য, সেই রকমই শব্দের চেহারা। কিন্তু প্রচলিত ছড়ার অনুকরণ বলে অধিকাংশ ছড়াতে feeling বা অনুভূতি যেমন করে গেছে, তরঙ্গও তেমন মিলিয়ে নয়। এই বইয়ের প্রথম ছড়া :

উড়কি ধানের মুড়কি,
ইঁদুর চাটে গুড় কি?
চিকৃটিকিটা বানায় বাড়ী,
কড়িং ভাঙে সুরকী।
নেমাছিরা বসুর লোভে
বাজে মধুপুর কি?

প্রথম দিকে যে-তরঙ্গ তিনি আরম্ভ করেছিলেন তা শেষের পংক্তি দুটির কল্যাণে বেমালুম মিলিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তরঙ্গ রেশ থাকল না।

মাঝে মাঝে আধুনিক বাক্যযোজনা ব্যাঘাত যে না জন্মিয়েছে তা নয় :

(১) ইতল বিতল তামা পিতল ;
বইছে কেবল বাতাস শীতল,

'বাতাস শীতল' নিতান্তই আমাদের যুগের সাধারণ কবিতার অংশ।

(২) আট্‌চালাতে ঘুমায় গুরু
নাকটি ডাকা এবার সুরু।

'গুরু' কথাটি যত প্রাচীন-পন্থীই হোক, এখানে একেবারে বেমানান।

(৩) গালেতে হাত ভাবছে খুকু,
শেষ হোলো তার আমোদটুকু ;
কাল পুতুলের খেলাঘরে
বে' দেবে হায় কেমন ক'রে?

এই মানসিক চিন্তা বা Conflict কিংবা চিন্তার ঝড় প্রাচীন ছড়ায় সাধারণত দেখা যায় না।

(৪) ইতির হিতির গিতির
প্রজাপতি ধনশো পাশে
খুকুর মাথার সিঁথির।

এই ব্যক্তভিন্না নিতান্তই অপরিণত কবির হাতের বলে মনে হয়।

(৫) বীরাষন ভোতা রে
যাস্ তোর কোথা রে?
আয় পাখী ছুটিয়া
বাম হাতে খুঁটিয়া;

সুকুমার রায়ের 'বাবুরাম সাপুড়ের' সুরে এবং ছন্দে যে এ-লেখা তা পড়লেই ধরা যায়।

তবু বলতে হবেই যে, সুনির্মল বসুর কানে ছড়ার সমস্ত বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে ছিল। সাহিত্যের অনেক প্রভাবের মধ্যে থেকেও সেই যে সংহত ছড়ার রূপটি দিতে চেষ্টা করেছেন—তাই থেকে মনে হয় প্রাচীন ছড়া কেবল রবীন্দ্রনাথকেই নয় অনেককেই মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। সেই জন্যই বোধ হয় ছড়াকে আমরা ভুলেও ভুলতে পারি না। সুনির্মল বসুর ছড়ার একটি বাংলা যা, তা ঐ প্রাচীন ছড়ারও। অর্থাৎ ঘরের কোণে একান্তেই এই ছড়া আবৃত্তি করতে হয়। ইস্কুলের আওতায় আসা কঠিন। ইস্কুলের আওতায় ছড়া তালসঙ্গীতধর্মী হবে, কিংবা কাহিনীমূলক হবে, অথবা অর্থপ্রধান হওয়া চাই।

সুকুমার রায়ের কবিতা এই জন্য ছড়ার রূপ নিয়ে এল, ছেলেদের মধ্যে, বিদ্যালয়ে এমন জনপ্রিয় হল। তাঁর কবিতায় আধুনিক ভাবার চঙ-ই আছে, তাকে ছড়া বলা কঠিন; কিন্তু শিশুদের কৌতূহল, শব্দের চমৎকারিত্ব, অদ্ভুত সৃষ্টির (re-combination & re-construction) চমক-কেবল যে শিশুদেরই আনন্দ দেয় তা নয়, বড়দেরও। এই যে বড়দের আমোদ উপরি-পাওনা, এই উপরি-পাওনাই ছোটদের মধ্যে আবার সঞ্চারিত করে। সাধারণ ছেলেমেয়ে বিভিন্ন রচনারই শত্রুহীন হয়। সুকুমার রায় কম না লিখলেও খুব বেশিও লেখেন নি, তবু যা লেখেন নি তাও যেন পড়তে পারছি বলে মনে হয়। এই প্রভাবের হাত থেকে জসীমুদ্দীন, সুনির্মল বসু, অন্নদাশঙ্করের মতো কবিরাও রেহাই পাননি।

আমরা এতক্ষণ ছড়ার ধর্ম এবং আধুনিক কালের কবিদের রচনা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বেশি অংশই আছে লৌকিক বা মুখপাড়াসী ছড়ার আলোচনা, এবং তাকেই মাপকাঠি করে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবির রচনা নিয়ে আলোচনা করেছি। মাপকাঠিতে যে-ত্রুটিটুকু মনে হয়েছে তা যথাসম্ভব স্পষ্ট করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই মাপকাঠিতে ত্রুটি ধরা পড়লেও, স্বাধীন রচনা হিসেবে সমস্ত আধুনিক ছড়াই যে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা মনে করা যায় না। বরং এই স্বাধীন ছড়া রচনার বৈশিষ্ট্য বা মার্জিত ছড়াই আমরা ইস্কুলের পাঠনায় ব্যবহার করতে পারি। মাঝে মাঝে সেই পাঠনার কথা বলেছি। সুবিধার জন্য সেইগুলো গুছিয়ে আমার প্রবন্ধের উপসংহার করতে চেষ্টা করব।

প্রবন্ধের প্রথম দিকে আমি বলেছি সাধারণ-ভাবে বা শিক্ষণ ব্যবহারিকায় যে ছড়ার বর্গীকরণ করা হয়েছে তা পঠন-পাঠনের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

বর্গীকরণের প্রথমেই আমরা ভেবে নেবছড়ার বৈচিত্র্য বা স্বভাবের কথা। লৌকিক ছড়া বা প্রাচীন বলে আমরা আপাতত মনে করি, রবীন্দ্রনাথের ছড়া, সুনির্মল বসুর ছড়া, অন্নদাশঙ্করের, যোগীন্দ্র সরকারের, জসীমুদ্দীনের প্রেমেন্দ্র মিত্রের এবং সুকুমার রায়ের রচনার ধর্মকে আমরা সহজ করে প্রথমে ঠিক করে নেব। তারপর কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ বয়সের ছেলেমেয়েদের কিভাবে অভ্যস্ত করানো—তা ঠিক করে নিতে হবে।

ইস্কুলের কাজকর্মকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। শ্রেণীকক্ষের সাধারণ কার্যক্রম এবং অনুষ্ঠানগত কার্যক্রম। ইস্কুলের কর্তব্যেরও বিভিন্ন

দিক আছে—(১) সমাবোজন মূলক (২) সমন্বয় মূলক (৩) পৃথকীকরণ (মানসিক দিক দিয়ে) (৪) উত্তর পাঠমূলক (৫) নির্বাচন মূলক এবং (৬) নির্দেশ এবং সন্ধান সম্পর্কীয়। এগুলির মধ্যে শেষের তিনটি ছড়া পড়ানোর আমাদের লাগছে না, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান কর্তব্য সেগুলি। কিন্তু প্রথম তিনটি শিশু বিদ্যালয় থেকে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্তব্যের মধ্যে ধরা পেছে। সমাবোজন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের সাধারণ নিয়মের সঙ্গে (সমাজের এবং শারীরিক) পরিচয় অভ্যাস গঠন করা হয়। এ সময়ে নিয়মবদ্ধ পড়াশুনা তেমন থাকে না। সমন্বয় সাধনের প্রধান দিক শিশু ব্যক্তিকে অন্য শিশুদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা এবং মিলে মিশে কাজ করতে শিক্ষা দেওয়া। পৃথকীকরণ দিকটাতে শিশুদের আবার দলের মানসিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার নিজের বিশেষ শক্তি ঘটানোর চেষ্টা আছে।

ছড়া যদিও বাংলা ভাষা তবু এটি ভাষা শিক্ষারই একমাত্র উপকরণ নয়। সমাজের জন্য যোগ্য হয়ে উঠবার পথে মাতৃভাষা যেমন দরকার তেমনি এইসব লৌকিক দিক।

কিন্তু লৌকিক বা মেয়েলি ছড়া বাড়ীর মা-মাসি দিদি ছাড়া শিশু চিত্তে জাগানো সম্ভব নয়। শিশু বিদ্যালয়ের খোলা মাঠের খেলা ধূলায় শিক্ষক শিক্ষিকা সেক্ষেত্রে ছড়ার ভঙ্গী অনুযায়ী খেলার সৃষ্টি করে সুনির্মল বসুর ঐ যে বেতাল অর্থের নয় ঐ গুলি বাড়ীতে শোনা ছড়ার স্মৃতি জাগাতে সাহায্য করে। বৈচিত্র হিসাবে অন্নদাশঙ্করের ছোট ছোট ছড়াগুলিও ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ শিশুরা বাড়ী থেকে ছড়ার মাধ্যমে পেয়েছে সুর, সেই সুরকেই অবলম্বন করে যে সব ছড়া আছে তার মধ্য দিয়ে আমাদের পরবর্তীকালের কাহিনী, অর্থযুক্ত ছড়া, বর্ণনায় যেতে হবে। সুর শোনা এবং মুখের আড়ষ্টতা এই বয়সে দরকার।

পড়তে শেখার ঠিক একটু আগে এবং পরে যোগিক ব্যবহারের ছড়া ব্যবহার করা যায়। আগে দরকার কারণ তার নাম এবং নিয়মের সঙ্গে পরিচয় আসুক, তারে দরকার কারণ যা শিখল তাকে আবার আর্থায় মতো করে মনে রাখুক। এই সঙ্গে আর একপ্রকারের অনুষ্ঠানগত কার্যক্রমের দরকার।

অনুকরণ প্রক্রিয়া শিশুচিত্তে বিভিন্নে বসেছে, যখন ভাষা শিখেছে। সব ব্যাপারের কাজের পর চিন্তা ব্যাপারটি ঘটেছে, কিন্তু এখনও বড় রকমের চিন্তা বা কল্পনা করতে শেখেনি, যা দেখছে তাকেই বেয়ে বেয়ে যেটুকু করবার উৎসাহ। অথচ যে সব প্রক্রিয়া পূর্বে ঘটেছে তা মেনে গেলেও তার স্থান গৌণ নয় বরং সেগুলি ছবির পৃষ্ঠপটের মতো অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আছে। তাইতো তারা কর্মের প্রেরণা অনুভব করে, অভিনয় করতে চায়। অথচ বারাবাহিক ধারণাও তারা করতে অক্ষম। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কিছু ছড়া, অন্নদাশঙ্করের ছড়া-নাট্য বা রঙ্গ ছড়ার সঙ্গে জোরালো সুরের ভঙ্গী যুক্ত নিয়ে অভিনয় করতে দিলে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তৃপ্তি পায়। এরই মধ্যে ছড়াকে গানে রূপ দিয়ে সুকুমার রায়ের কিছু কিছু রচনা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই যে মালা নাট্য-সঙ্গীত ছড়া তা ইস্কুলে দ্বিতীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে সাহায্য করে।

এই স্তরের পরের ধাপ ব্যক্তিগত দিক। শ্রেণী-কক্ষেও হয় বাইরেও হয়। এখানে যেসব ছড়া কাহিনীমূলক বা কবিতা হতে চাইছে সেইগুলি ব্যবহার করা দরকার। শ্রেণীকক্ষের এই পাঠমালা রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ আছেন বলে মনে হচ্ছে না। নানা চরিত্র বা ছড়ার মধ্যে যা ছোট কবিতার মধ্যে কবি লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেই সব রচনা বাপছাড়া থেকে নির্বাচন ক'রে শিক্ষা দেওয়া যায়। আর ছোটরা যখন কবিতা পড়বে বা পড়তে যাবে তখন তাঁর ছড়া থেকে প্রাসঙ্গিক চিত্রকল্পগুলি ব্যবহার করলে ভাষাশিক্ষার একটি বড় দিক সমাধা

করা যায়। অহম শিক্ষাতেও রবীন্দ্রনাথের এইসব চিত্রকল্প বড় প্রয়োজনীয়। একদিকে চিত্রকল্প অন্যদিকে চরিত্রের archetypation বা বর্ণনা ঘটিত নির্মাণ এ দুটি রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই সম্ভব হয়। এই পদ্ধতি এবং উপকরণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চস্তরেও ব্যবহার করা যায়। অবশ্য উঁচু ক্লাসে আমরা আরও অনেকের রচনার সাক্ষাৎ পাব। রবীন্দ্রনাথের পরই সেখানে সুকুমার রায়কে পাব। বৈচিত্র্য হিসাবে বিশেষ পরিবেশমূলক রচনা যেমন ভগীরথীদের এবং অনুপ্রাসঙ্করের ব্যবহার করতে পারি। এরই মধ্যে কবিতা পাঠের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথের ছড়াও ছবি এবং প্রেমের মিত্রের ছড়া-কবিতা ব্যবহার করতে পারি।

এই স্তরের অনুষ্ঠানগত কার্যক্রমে নামাজাতীয় ছড়াই আমরা ব্যবহার করতে পারি। ব্যক্তিগত আবৃত্তি, দলগত আবৃত্তি, আবৃত্তি নাট্য বা রঙ্গনাটিকা (অবাক জলপান প্রভৃতি) অতি সুন্দর। তবে সব সময় মনে রাখা দরকার, ভঙ্গির সঙ্গে কথা আর কথারই ভঙ্গী, চরিত্রের কথা আর কথার চরিত্র, ঠিক ঠিক যন্ত্রে যেন ব্যবহার করার মতো পরিচালকের দক্ষতা থাকে।

পরিশেষে সংক্ষেপে এই কথাই বলব সুর শব্দ কথা বা বাক্য, ভঙ্গী, কাহিনী, বর্ণনা, চিত্রকল্প, ভাব এবং কবিতা—এই কয়টি স্তর পরপর অতিক্রম করতে পারাই ছড়া শেখানোর প্রাথমিক কর্তব্য। তাই ইস্কুলে ছড়াগুলিকে সেই ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা দরকার। আর বয়স অনুযায়ী সেই সেই জাতীয় ছড়াকেই আমাদের চেষ্টা করা উচিত বলে মনে হয়। প্রয়োজন বোধে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেরাও ছড়া রচনা করেন, রচনা করতে হয়। এমন অনেক ছড়া ইস্কুলের এলাকায় আছে। কখনও যদি সেগুলি সংগৃহিত হয় (হওয়া উচিত) তবে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। সেরকম দিন কবে আসবে জানি না, আসা উচিত ছিল বলে মনে হয়। স্বাধীনোত্তর কালে মৌলিক দিকের শিক্ষা, ব্যাপারের কত জিনিস সংগ্রহ করা হচ্ছে। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত স্থাপিত হল, শুধু এখনও কোন প্রকাশক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে হাত দিলেননা।

৪নং ফরম

(৮নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশের স্থান—কলিকাতা

২। বৎসরে কতবার প্রকাশিত হয়—
মাসে একবার

৩। মুদ্রাকরের নাম—
শ্রীঅজিতকুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক
২৭।৩বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৪। প্রকাশকের নাম—
শ্রীঅজিতকুমার বসু, ভারতীয় নাগরিক
২৭।৩বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৫। সম্পাদকের নাম—
শ্রীবর্ণপ্রভা সেন, ভারতীয় নাগরিক
১নং ডোভার লেন, কলিকাতা ২৯

৬। সংবাদপত্রের মালিক—
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, ভারতীয় নাগরিক
১নং ডোভার লেন, কলিকাতা-২৯

আমি, শ্রীঅজিতকুমার বসু এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরি লিখিত বিবরণগুলি আমার বিশ্বাস অনুযায়ী ও জ্ঞানানুসারে সম্পূর্ণ সত্য।

স্বাঃ শ্রীঅজিতকুমার বসু

CALCUTTA UNIVERSITY

শিক্ষা

মহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতির্ভাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৭১ | ৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষক-বেতন

ওদিকে সকল স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে গূঢ় অসন্তোষ, এবং ওদিকে সরকারের অর্থব্যাপারে অপ্রাচুর্য ও শিক্ষকদের দাবি পূরণে অক্ষমতা উভয়ে মিলিয়া যে ঘটিকার সূচনা করিয়াছিল, তাহা দূর হওয়াতে আমরা অতিশয় আশ্বস্ত বোধ করিতেছি। দিনের পর দিন শিক্ষক ধর্মঘট আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল, শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া শিক্ষকসমাজ ও সরকার উভয় পক্ষকেই বিরোধের প্রথম পদক্ষেপেই নিরস্ত করিল, ইহা খুবই আশ্বাসের কথা। আসন্ন পরীক্ষা পিছাইবার প্রশ্ন আর উঠিবে না। অবশ্য যবনিকা শেষ পর্যন্ত পড়ে নাই, তাহা হইলেও ঠাণ্ডা মাথায় সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব, একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। শিক্ষা চালু থাকিলে তবে তাহার মান উন্নয়নের কথা উঠিবে। অচল অবস্থা সৃষ্টি করা এজন্য কাহারও অভিপ্রেত নহে। ধর্মঘট ব্যাপারটা আবার সংক্রামকও বটে। দেশের বর্তমান অবস্থায় সাধারণ লোকের মনে এমন একটা ভাব জাগা অস্বাভাবিক নহে যে, 'ধর্মঘট' না করিলে কিছু পাওয়ার জো নাই। দয়ক্ষোভায় কাহারও মনের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আমাদের ধর্মঘটে যে ধর্মের ভাব কিছু থাকে না—সেকথা ভুলিলে চলিবে না। শিক্ষায় বিরতি সে তত জাতির পক্ষে মহতী বিনষ্টি।

বঙ্গীয় সম্মেলন

সম্প্রতি ভারত সেবক সমাজের আহ্বানে কলিকাতায় তিনদিন ব্যাপী বঙ্গীয়হিন্দীদের যে সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে আর্থিক উন্নতি ও অধিকার এবং দায়িত্বের কথাই উঠিয়াছিল, কার্য-বিধির মধ্যে কোথাও শিক্ষার উন্নতির কথার উল্লেখ করা হয় নাই। অথচ পরাধীনতা ও অজ্ঞতা হাত ধরাধরি করিয়া চলে। সমাজসেবকের এখানে হিতসাধন করিবার বিপুল সম্ভাবনা। কলিকাতা কর্পোরেশনে ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা কত কম, এবং সেগুলিতেও আবার স্থান কত কম, তাহা যে কেহ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন। এই সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষার কথাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতে পারিতেন। বাংলায় শিক্ষার মান উঠাইতে হইলে

এখন হইতেই এবং এই সকল দিকেই মন দিতে হইবে। এখন তো কাউন্সিল ও এসেম্ব্লীর সভ্যদের মাসিক ও দৈনিক বৃত্তি বাড়িতে চলিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা ঐ অর্থের সামান্য অংশ দিয়াও সম্মিলিতভাবে দলনিরপেক্ষ হইয়া অন্তত পক্ষাশটি বাস্ত বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া জনগণের হিতসাধনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিতে পারেন। সদস্যেরা মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া সাহায্যে করিলেও একটা পথ দেখাইবে। অবশ্য সদস্যগণের আর্থিক সাহায্য পাওয়া চাই, শক্তিরভাবে পরিচালনার যোগদান করা চাই।

নূতন সহযোগী (?)

'শিক্ষা ও সমীক্ষা' নামে এক নূতন সহযোগী তাঁহার উদ্যোগপত্রে আভাষ দিয়াছেন যে শিক্ষা পত্রিকা গল্প কবিতা দিয়া ভরাইয়া দেওয়া হয়, তাঁহারা সে পথ বর্জন করিয়া শুধু শিক্ষাসংক্রান্ত পত্রিকা চালাইবেন! বলা বাহুল্য, আমরা গত ২৩ বৎসর ধরিয়া এই পথই অবলম্বন করিয়া চলিতেছি। সে কথা আমাদের পাঠক ও গ্রাহকেরা জানেন। সুতরাং.....

আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসনের প্রারম্ভিক অভিভাষণ

প্রেসিডেন্ট জনসনের এই অভিভাষণটি অনেক দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার বর্তমান অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলা বা লেখা হইলেও আমাদেরও শিখিবার ও মনে রাখিবার অনেক কথা ইহাতে আছে। তিনি বলিয়াছেন: "বিদ্যালোচনার দেশে শিশুদের লেখাপড়া শেখানো অবশ্য কর্তব্য। In a land of learning, young people must be taught to read and write. আমাদের সঙ্গীতে দেশমাতাকে বিদ্যাদায়িনী বলিয়া প্রণাম জানাই, কিন্তু লেখাপড়া শিখাইতেই হইবে, সরলভাবে এই কথা কয়টি বলিবার ও পথ বাহিয়া লইবার দৃঢ়তা কোথায়? জনসন পূর্বসূরী জনৈক নেতার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন আমাকে এখন জ্ঞান বুদ্ধি দাও যাহাতে আমি বাহিরে গিয়া এই জাতির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি, কারণ এই জাতির বিচার করিবে কে? এই জাতি এত মহান যে ইহার বিচার করিবার ক্ষমতা চাই। Give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before this people for who can judge this people that is so great?

ভারতের পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার মান উন্নয়ন

ভারতের পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার মান উন্নয়নে আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্র মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন। আমেরিকার রাজদূত চেষ্টার বাউলস্ ঘোষণা করিয়াছেন যে ২০৮ কোটী টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হইল। ভারতবর্ষে শিক্ষার নবযুগ আনিতে হইলে আরও উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তকের প্রবর্তন করা চাই, শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা চাই, শিক্ষক-বেতন বাড়ানো চাই, পল্লী অঞ্চলে প্রায় ৬ হাজার বিদ্যালয় গড়া চাই, উপযুক্ত সরঞ্জাম থাকা চাই, এবং ২ লক্ষ ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থাও চাই।

সবই ঠিক, কিন্তু আমাদের মাথা এখনও পরিষ্কার হয় নাই। আমাদের শক্তি বাড়া দরকার, কিন্তু অন্যের দানে যে শক্তিবৃদ্ধি, তাহা কি প্রকৃতই বৃদ্ধি? আমেরিকার প্রস্তাব এবং কার্যক্রমের দোষ ধরিতেছি না। কিন্তু আমাদের মন হইতে একথা যায় না যে, সর্বমাত্মবশং সুখং সর্বং পরবশং দুঃখম্।

অশিক্ষিত

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

অনেকদিন আগের কথা, সাল তারিখের হিসাব নাই, আমাদের হাজারীবাগের বাড়ীতে একটি আত্মীয় সপরিবারে বেড়াতে এসেছিল, তার নাম সমীর, সম্বন্ধে আমি তার দাদা।

একদিন বিকেলবেলা সমীর বল্ল "চলুন দাদা, জঙ্গল দেখে আসি।" সমীর শহরে মানুষ, বয়স চব্বিশের কাছাকাছি, পায়ে হেঁটে চলাফেরা করা অভ্যাসই নাই। বল্লাম "জঙ্গল কাছে নয়, পথ উঁচুনীচু, যেতে কি পারবে?" উৎসাহী সমীর বল্ল "কেন পারবনা, আমি এখনও অথর্ব হইনি দাদা।" তর্কের অবসান হয়ে গেল, হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এমন সময় সাত বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র খোকা এসে বাবার হাত ধরে বল্ল "আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।" সমীর বল্ল "আমরা জঙ্গলে যাচ্ছি, সে অনেক দূর, তুমি হাঁটতে পারবে না।" খোকা মাথা নেড়ে জবাব দিল "আমি হাঁটতে পারবো।" সমীর বল্ল "জঙ্গলে বাঘ আছে।" খোকা জবাব দিল "আমি বাঘ দেখবো।" এবার সমীর ধমক দিল "না যেতে পারবে না।" বাবার হাত ছেড়ে খোকা আমার হাত ধরে বল্ল "আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো জেঠামশায়।" পিতাপুত্র কেউই জঙ্গল পর্যন্ত যেতে পারবে না জানতাম তাই সমীরকে বল্লাম "চলুক না।" ছোটাধিকা দেখে সমীর আর আপত্তি করলো না।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমরা বেঠোপথ ধরলাম। উঁচুনীচু মাঠ, চারিদিকে অসংখ্য বুনো ফুলের ছোট ছোট ঝোপ, দূরে দূরে এক একটা নিঃসঙ্গ আম বা মহুয়া গাছ। মাঠে ঘাস নাই, কাঁকর আর পাথর ছড়ানো। চলতে চলতে আমরা মাঠের এক প্রান্তে এসে পড়লাম। সেখানে একটা প্রাচীন বট গাছ আর তার নীচে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে একখানা মানুষ সমান উঁচু পাথর। সেই পাথরের নীচে থেকে ক্ষীণধারায় জল বেরিয়ে আসছে। কতকাল থেকে এমন হচ্ছে কেউ জানে না। বর্ষার জল বেশী বেরোয়, শ্রাবণে কমে যায়, শুকোয় না কোনদিনই। সুন্দর জায়গাটি। খোকা প্রশ্ন করলো "এ জল কোত্থেকে আসছে জেঠামশায়?" বল্লাম "গঙ্গা থেকে।" শুনে সমীর হেসে উঠলো। খোকা আশ্চর্য হয়ে আবার প্রশ্ন করলো "গঙ্গা থেকে কেমন করে আসছে?" বল্লাম "এই মাঠের নাম হচ্ছে গঙ্গাটাঁড়। এ দেশের লোক বলে এক সময় এই বটগাছের নীচে এক সাধু থাকতেন। একবার এদিকে গ্রীষ্মকালে এমন গরম পড়ে যে কুয়ো, পুকুর, এমন কি নদীর জলও শুকিয়ে যায়। মানুষের বড় কষ্ট হোলো, পশুপক্ষীর কষ্ট হোল আরো বেশি। তখন সাধু শিবের আরাধনা শুরু করলেন। আশুতোষ তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন, বল্লেন "বর চাও।" সাধু বল্লেন "মানুষ, পশু, পক্ষী জলকষ্টে মারা যাচ্ছে, প্রভু জল দাও।" শিবঠাকুর বল্লেন "জল পাবে।" তিনি অদৃশ্য হলেন আর সঙ্গে সঙ্গে পাথরের নীচে থেকে জল বেরোলো, মানুষ পশুপক্ষী বাঁচলো। লোকে বলে শিবের আদেশে গঙ্গাই এখানে প্রকাশ হয়েছেন। শুনে সমীর আবার হাসলো, বল্ল "গঙ্গা টঙ্গা কিছুই নয়।" খোকা প্রশ্ন করলো "তাহলে কি বাবা?" সমীর বল্ল "মাটির নীচে জল থাকে, কুয়ো খুড়লে বা টিউবওয়েল বসালে জল বেরোয় দেখেছ তো? বৃষ্টির জল মাটির নীচে গিয়ে এমন এক স্তরে পৌঁছোয় যেখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, তা জমতে থাকে, অফুরন্ত সে জল। ভূমিকম্পে বা অন্য কোন কারণে মাটি ফেটে গেলে নীচের সেই

জল পথ পেয়ে বেরিয়ে আসে। এ হচ্ছে তাই, প্রায় টিউবওয়েলের মতই।" বিজ্ঞানের আঘাতে গল্পটাঁড়ের রহস্য বিদায় নিল। এগিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখলাম গল্পটাঁড়ের সাধু নাই, শিবঠাকুর নাই, মা গঙ্গা নাই, আছে মাটি আর পাথরের স্তর আর একটা টিউবওয়েল। মনটা কেমন করে উঠলো।

সামনেই নদী, আমরা নদীতে গিয়ে নামলাম। নদীর বুকজুড়ে নানান আকারের বড় বড় পাথর পড়ে আছে, তাদের পাশ কাটিয়ে জলস্রোত বহু যুগের বয়ে চলেছে। দেখে খোকা তারি খুশী হোলো। এক পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফালাফি করে বেড়াতে লাগলো। আমাকে বল্ল "জেঠামশায়, এত পাথর কোথা থেকে এল?" এবার তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম না, চুপ করে থাকলাম। লোকে বলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মরা সৈন্য, অশ্ব গজ, রথ জলে ভেসে এসে এখানে পাথর হয়ে রয়েছে। পাথরগুলো কোনটা মানুষের মত, কোনটা ঘোড়ার মত, কোনটা হাতির মত দেখতে। পাড়ের ছেলেরা পাথরের উপর ছুটোছুটি করে আর বলাবলি করে 'এ মানুষটার মুণ্ড নাই, ও ঘোড়ার ঠ্যাং নাই, এ হাতিটার শুঁড় নাই যুদ্ধে কাটা গেছে।" ভাবছি খোকাকে এ সব তথ্য বলবো কিনা? এমন সময় সমীর বল্ল "পাথরগুলো আদেনিরে, এইখানেই চিরকাল আছে। পৃথিবী কেবল মাটি দিয়ে তৈরি নয়, ভিতরটা গলিত লোহা, তার উপরে একটা একটা করে অনেকগুলো স্তর আছে। পৃথিবীর উপরের স্তরটা ধুলো বালি মাটির, তার নীচে পাথরের স্তর। এখানে জলস্রোতে মাটি ধুয়ে নীচের পাথর বেরিয়ে পড়েছে।" বিজ্ঞানের আর এক ধাক্কায় আর এক বিশ্বাস ভেঙে পড়লো।

নদীর পাড়ে একটা উঁচু অর্জুন গাছ, আমরা তার নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। খোকা এর আগে পাহাড় দেখে নাই, অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। আমার বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো, এই বুঝি খোকা প্রশ্ন করে "পাহাড় কি জেঠামশায়?" কি উত্তর দেব আমি? এদেশে যেদিন প্রথম এসেছি সেই দিন থেকে ঐ পাহাড় দেখছি। পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু মাথাটা দেখতে যেন কুঁকে পড়া বুড়োর মত, তাই ওর নাম বুড়া পাহাড়। কত গল্প শুনেছি পাহাড় সম্বন্ধে, ও যেন আমাদের মতই প্রাণবন্ত, ও যেন এক বুড়ো সর্দার, ওর আশ্রয়ে পশুপক্ষী মানুষ চিরকাল বাস করছে, কত সুখদুঃখে ও সকলের সঙ্গী। বিজ্ঞানের আর এক আঘাতে আমাদের বুড়ো সর্দারের মৃত্যু ঘটবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। খোকা কোন প্রশ্ন করলো না, নদীতে ছুটোছুটি করে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, আমার হাত ধরে বল্ল "জেঠামশায়, বাড়ী ফিরে চলো।" আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, খুশী হয়ে বল্লাম "তাই চলো।" সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে দেখে ফিরে যাবার প্রস্তাবে সমীর আপত্তি করলো না।

আমরা মাঠের পথ ধরে বাড়ীর দিকে ফিরে চল্লাম। একটু পরে দশমীর চাঁদ আকাশের মাঝখানে ঝলমল করে উঠলো। মাঠ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে গেল। খোকা আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠলো। চাঁদ দেখিয়ে বল্ল "দেখ জেঠামশাই চাঁদ উঠছে।" সত্যিই দেখবার মত দৃশ্য। খোকার কৌতূহলের সীমা নাই। শিশু মনের চিরন্তন প্রশ্ন সে জানালো "চাঁদের মধ্যে কি আছে জেঠামশায়?"

আমি কিছু বলবার আগেই সমীর জবাব দিল "চাঁদ আমাদের পৃথিবীর মত নয়, ওখানে জল নাই, বাতাস নাই, গাছপালা পশুপক্ষী মানুষ কিছুই নাই। ওখানে আছে মরুভূমি আর পাহাড়। জ্যোৎস্না হচ্ছে ধার করা আলো।" চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম চাঁদ ম্লান হয়ে গেছে। কোথায় গেল তার রহস্য, কোথায় গেল তার সৌন্দর্য! চাঁদ কেবল মরুভূমি আর পাহাড়। এই ভেবে দুঃখ হোলো

যে সুন্দর মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা আর দেওয়া চলবে না।

মাঠ পার হয়ে গ্রামের কাছে এসেছি এমন সময় খোকা বলে "আমি আর হাঁটতে পারছিনে জেঠামশায়।" দশীর ধমক দিলে "আসেই বলেছিলাম হাঁটতে পারবি নে, এখন কে তোকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে?" আমি বললাম "তোমো না, গ্রাম থেকে কাউকে ডেকে নেব, খোকাকে কোলে করে বাড়ী পৌঁছে দেবে। গ্রামের প্রান্তে লছমন সিং-এর বাড়ী। সেখানে গিয়ে দেখি ঘরের সামনে লছমন সিং-এর মা তার ছোট নাতিটিকে কোলে নিয়ে আদর করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "লছমন বাড়ী আছে গো?" সে বলে "বেটা হরিদুর্গীর বাড়ী গেছে, এখনই আসবে, তুমি একটু দাঁড়াও বাবু।" আমরা দাঁড়ালাম। লছমনের মা তার নাতিকে নিয়ে আবার খেতে উঠলো, চাঁদ দেখিয়ে বলতে লাগলে "বল বেটা বল, চাঁদ মামা ইদুরা যে।" খোকা চুপি চুপি আমাকে বলে "জেঠামশায়, এরা অশিক্ষিত, চাঁদকে মামা বলে।" মুহূর্তে আমি বুঝলাম আমিও অশিক্ষিত, মনে আবার শান্তি ফিরে এল।

শিক্ষক ও অভিভাবক

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

আপনার ছেলেটি স্কুলে পড়ে।

যখনই আপনি আপনার ছেলের স্কুল, তথা স্কুলের শিক্ষকদের কথা ভাবেন, তখন আপনার কি মনে হয়? স্কুলে ছেলেটার কিছু হচ্ছে না; মাষ্টার মশাইরা শুধু বসে বসে মাইনে নেন, ছেলেদের দিকে আদৌ নজর দেন না। বাড়ীতে গৃহশিক্ষক রেখে যতটুকু হয়—তাও মশাই, আজকালকার দিনে কম টাকায় ভাল মাষ্টার মশাই তো পাওয়াই যায় না। আবার ভাল দেখুন, ইস্কুলের মাষ্টার মশাইদেরই রাখতে হবে, নইলে ছেলেটাকে পাশ করানো যাবে না—ইত্যাকার আক্ষেপ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় না কি? যদি বলি, কেন মশাই, আপনি আমিও তো স্কুলে পড়েছি, তখন তো গৃহ শিক্ষকের বালাই ছিল না—পাস্‌টাস্ করিনি কি? উত্তর পাব—তখন দিনকাল আলাদা ছিল মশাই। যদি আরও বলি,—ওই দেখুন না, সতুবাবুর ছেলে এবারে স্কুল ফাইন্যালে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পাস করে বেরুল, ওর তো গৃহ শিক্ষক ছিল না বলে শুনেছি। আবার দেখুন, ওই পাস মশায়ের ছেলেরা। পাস মশাই দু'টিকা রোজগার করেন, তাতে তাঁর সংসার যাত্রা-নির্বাহ কঠিন। ছেলেদের জন্য গৃহ-শিক্ষকের কথা তাঁর পক্ষে উঠতেই পারে না। ছেলেগুলো স্কুল কলেজে বিনা বেতনে পড়তে পাচ্ছে বলে পড়াশুনা চালাতে পারছে। অথচ দেখুন, কেমন টুক্ টুক্ করে তারা রেজাল্ট দেখিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। —তখন উত্তর পাই, ওসব exceptional merit-এর ছেলে মশাই, আপনার আমার ছেলের মত তো নয়। ওদের কথা আলাদা। ফলতঃ, যখনই আপনি আমি নিজের ছেলেমেয়েদের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিদ্যালয়ের কথা ভাবি, তখনই যেন খানিকটা অভিযোগ, খানিকটা বিরক্তি, খানিকটা বিতৃষ্ণার ভাব মনে আসে।

হয়তো এসব অভিযোগের কিছুটা ভিত্তি আছে।

আজকাল গলিতে গলিতে এতো রকমের বিদ্যালয় গজিয়ে উঠছে যে, দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই যেমন না, আমাদের পাড়াতে এক মাইলের মধ্যে —সরকারী এবং বেসরকারী অনুমোদিত দু'-দুটো ইস্কুল আছে। আরও আছে পৌর সংস্থার প্রাথমিক বিদ্যালয় দু'দুটি তার উপর আছে—ধাত্রাম, আন্ডুলে শুনতে শুরু করি—এক, দি গ্রেট ইস্টার্ন ন্যাশনাল এণ্ড কসমোপলিটান ইউনিভার্সিটি—এখানে প্রাইভেট হায়ার সেকেণ্ডারী, অমুক জায়গায় ম্যাট্রিক, তমুক জায়গায় ইন্টারমিডিয়েট ও বি-এ, হিন্দী প্রভাকর ইত্যাদি ইত্যাদি পড়ানো হয়, টাইপ ও সর্ট হ্যাণ্ড শেখানো হয়, নিজস্ব লেবরেটরী আছে এবং মেয়েদের আলাদা ক্লাস ; দুই. দি সিউ হলুগ পল্লী কমার্শিয়াল কলেজ—এখানে ওই ওই পড়ানো হয়,- কেবল নিজস্ব লেবরেটরীর কথা লেখা নেই ; তিন, দি কলিকালদ্ব টিউটোরিয়াল হোম—last minute suggestion এবং no pass, no fee ভিত্তিকর্মক সংস্থা। ইত্যাদি. ইত্যাদি —আর কত নাম করব ? অবশ্য সব ব্যবসার দিদি নিষেধ আছে. লাইসেন্স আছে. বাধ্যবাধকতা আছে, তবু বোধ হয় বিস্তার ব্যবসাতে এসবের প্রয়োজন নেই।

তারপর, সত্যিকার স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যার আধিক্য। যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বেড়েছে, সে অনুপাতে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সংস্থা বাড়েনি, বিদ্যালয় তো নয়ই। কাজেই প্রত্যেক স্কুল কলেজে ছাত্রসংখ্যা আর সীমিত রাখা যাচ্ছে না। এ জন্য আগেকার দিনে শিক্ষক মশাইরা ছাত্রদের জন্য যতখানি সময় দিতে পারতেন, এখনকার দিনে আর তেমন পারেন না,—সম্ভব নয় বলেই পারেন না। ওই যে ব্যাঙের ছাতার মত বিদ্যার দোকানগুলি গজিয়ে উঠছে, বলা বাহুল্য, এও লোকসংখ্যা, তথা ছাত্র সংখ্যার আধিক্যের ফল। তার উপর, আজকাল শিক্ষক মশাইদের প্রশাসনিক কাজে এত সময় ব্যয় করতে হয় যে পড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়ের অনেকখানি তাতেই ব্যয় হয়ে যায়।

কিন্তু তবুও অভিযোগগুলো সর্বাংশে সত্য নয়। যদি শিক্ষক মশাইরা নিজেদের কাজের বিষয়ে এতই উদাসীন হতেন, তাহলে বছরের পর বছর এত ভাল ভাল ছেলে নিশ্চয়ই বেরুত না। আসল কথাটা হচ্ছে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মধ্যে ভাল সংযোগ নেই। ফলে সব সময়েই তাঁদের অভিভাবকদের বিচার-বিশ্লেষণের বিষয় এবং তাঁদের বিরাগ ও অসন্তোষের হেতু হতে হচ্ছে।

শিক্ষক মশাইদের উচিত, এগিয়ে এসে অভিভাবকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এই বিশ্বাস ও অহেতুক অভিযোগের অঙ্কুরে বিনাশ করা। কিন্তু একাজ বলা যতটা সোজা, করা ততটা সোজা নয়। শিক্ষককে ভাবতে হবে, তিনি অভিভাবক হলে নিজে কি ভাবতেন, এবং শিক্ষক হিসাবে এর কি যোগ্য উত্তর হতে পারে। এইভাবে নিজেকে একবার অভিভাবক ভেবে এবং একবার শিক্ষক ভেবে জিনিসটার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে হবে। এইভাবে আত্মদর্শন করতে করতে অভিভাবকদের চিন্তাধারার ত্রুটি যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে, তেমনি শিক্ষকের নিজের-ই বা কোথায় ত্রুটি তাও ধরতে পারা যাবে। ত্রুটি সংশোধনের উপায় ভেবে তার কাজ করা এমন আর কি শক্ত ব্যাপার ? তখন তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অভিভাবকদের অভিযোগের মোকাবিলা করতে পারবেন।

এই মোকাবিলা করতে গেলে শিক্ষক মশাইদের কাছে আরও কয়েকটা জিনিস চাই। তাঁকে হতে হবে ধৈর্যশীল এবং সহানুভূতিপরায়ণ। একথা খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে যে ছেলেপিলেদের ভাল করবার উগ্র বাসনার ফলে অভিভাবকরা খুঁৎ-খুঁতে হয়ে ওঠেন এবং বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের

দোষ খুঁজে বেড়ায়, নইলে শিক্ষক মশাইদের সঙ্গে তাদের কোনও বিরোধ নেই। ছেলেমেয়েদের জন্য অভিভাবকদের এই যে উৎকণ্ঠা, এটাকে শিক্ষকের শুধু স্বীকার করলে চলবে না, এর যথাযথ মূল্যও দিতে হবে। অভিভাবক যদি বুঝতে পারেন, শিক্ষক মশাই তাঁর মত তাঁর সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠিত, তাহলে তাঁর সুর আপনা থেকেই নরম হয়ে আসবে এবং মনোভাবও অনুকূল হয়ে আসবে। তখন শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন, স্কুল তাঁর সন্তানের জন্য কতখানি করছে। শুধু স্কান করা হচ্ছে, তা নয় করা হচ্ছে এসব উড়ো উড়ো কথা নয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে —যাকে ইংরেজীতে বলে objectively—বুঝিয়ে দিতে হবে কি করা হচ্ছে, আর এটা বুঝিয়ে দিতে হবে খুব ধৈর্য এবং সহানুভূতির সঙ্গে।

মানছি, সমস্ত দিন ছেলেপিলেদের চ্যাঁ ভাঁ শুনতে শুনতে শিক্ষক মশাইদের আর ধৈর্য থাকে না। তার ওপরে যদি অভিভাবকরাও এসে ঘ্যানঘ্যানানি জুড়ে দেন তো মাথা ঠিক রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু তা বললে তো চলবে না! যখন শিক্ষক এই বুত্তি অবলম্বন করেছেন, তখন আপনাকে এত সহজে মেজাজ হারালে চলবে না। খুব ধীর ভাবে না এগুলে শিক্ষকের সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। তাঁকে শুধু ছাত্রদের শিক্ষক হলে চলবে না। এসব ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ও শিক্ষক হতে হবে।

অনেক অভিভাবকদের অভিযোগ এই যে, তাঁদের সময়ে যেরকমটি পড়ানো হত, আজকাল আর তা হয় না। মশাই, আজকাল ছেলে-পিলেগুলো ব্যাকরণ শেখে না, বানানে যা তা করছে, হাতের লেখা দেখলে মূর্ছা যেতে হয়। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য আমাদের যুগে যেরকম পড়ানো হত আজকাল তা হয়ই না। এখনও মশাই ম্যাট্রিকুলেশনের সিলেবাসটি হড় হড় করে মুখস্থ বলে যাব। সাধারণতঃ, শিক্ষকরা এর যোগ্য প্রত্যুত্তর খুঁজে পান না। পড়াশুনার অতিরিক্ত অনেক বিষয় ছেলেদের শেখানো হয় এবং আমাদের দিনের সীমাবদ্ধ শিক্ষার ক্রম এখন আর চলে না, এসব বলে জিনিষটা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। সত্যি বলতে কি, Co-curricular activities এবং প্রগতিশীল শিক্ষা বলে যে কথাগুলি আজকাল খুব চালু হয়েছে, সেটা এ সময় খুব কাজে লাগে। এগুলো এত ভাবে ব্যবহার করা হয় যে, এই কথাগুলোর অন্তর্নিহিত আসল উদ্দেশ্য বোধ হয় লোপ পেতে বসেছে। ফলে, অভিভাবকরা যদি এগুলোকে ধাপ্পা বলে মনে করেন, তা হলে খুব বেশী দোষ বোধ হয় তাঁদের দেওয়া যায় না। শিক্ষকের উচিত হবে, অভিভাবকদের জিনিষটা ঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া, আসল জিনিষটা তুলে ধরা, মনে ভারী কথা দিয়ে ধুম্র আবরণ সৃষ্টি না করা। সে যুগের বিদ্যালয় কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তনটা যুগধর্ম অনুযায়ী ভাল না মন্দ এটা অভিভাবকদের ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে—এ যুগের বিদ্যালয় ও তার কার্যধারার নিখুঁত ও নির্ভুল ছবি এঁকে ধরতে হবে। কেন এই পরিবর্তন হয়েছে, এর কতখানি যুগ পরিবর্তনের ফল আর কতখানি যুগের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে পরিবর্তন করতে হয়েছে, হচ্ছে বা হবে, তা যদি অভিভাবকদের ভাল করে বুঝিয়ে না দেওয়া যায়, তো তাঁদের অভিযোগ থেকেই যাবে।

বিদেশী শব্দের ব্যবহার

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

ভাষান্তরে শব্দের উচ্চারণ বিকার নানাকারণে হয়। ভাষাভেদে উচ্চারণের spirit বিভিন্ন, তাদের বর্ণমালাও পৃথক। ফলে ভাষান্তর করতে গেলে শব্দিকভাবে লিপ্যন্তর করা যায় না। বাংলার সর্বদাধর্মভুক্ত ত, দ, ড এবং আরও কয়েকটা বর্ণের (letter) উচ্চারণের ব্যবহার ইংরেজীতে আদপে নেই, তাই ইংরেজী বর্ণমালাতেও এ সকল বর্ণ স্থান পায় নি। অতএব এদের প্রকৃত ধ্বনি পরিস্ফুটিত বর্ণমালা দিয়ে লিপ্যন্তর করতে গেলে বিকৃত না হয়ে পারে না। ইতিহাসের পাঠক অবশ্য জানেন যে, আরবী ভাষার কয়েকটি ধ্বনি ফার্সী ভাষায় অজ্ঞাত। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় লিপ্যন্তর করতে গিয়ে বহু তালব্য, মৌখিক ও অন্যান্য শব্দ কী ভাবে বিকৃত ও রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। বাংলার 'কলকাতা' ইংরেজীতে হয় ক্যালকাটা, ফরাসীতে কালকুতা। ইংরেজী London-এর প্রকৃত ধ্বনি বাংলা বর্ণমালায় দেখানো যায় না, আমরাও বিকৃতভাবে উচ্চারণ করি। Cat শব্দের a ধ্বনি আমরা ব ফলা + আকার দিয়ে দেখাই, তাতে কাজও চলে, কিন্তু Part শব্দের a উচ্চারণ পার্ট—যার সঙ্গে পাট শব্দের ধ্বনির উচ্চারণের কোন তফাৎ হয় না, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। রামচন্দ্র ঘোষ মহাশয় রোমক লিপিতে যথাযথ ঠিকভাবে তাঁর নাম সই করলেন Ram Chandra Ghose. কিন্তু ইংরেজী উচ্চারণের নিয়ম অনুসারে ইংরেজ পাঠকের কণ্ঠে ধ্বনিত হল র‍্যাম চান্দ্রা ঘস্। এমনই Dinapur (i কেন তাদিয়ে) উচ্চারিত হল ডাইনাপো (ইংরেজের মুখে শব্দের শেষের r ধ্বনিটি প্রায়ই অনুচ্চারিত থেকে যায়)। এ ছাড়াও এক রকমের "সাহেবী" উচ্চারণ রীতি আছে যেটা ফিরিঙ্গিদের মুখে শোনা যায়,—যেমন (বামবাদ) Dhanbad হয়ে যায় চ্যাম্‌ব্যাড।

অনেক নতুন বিদেশী শব্দ বাংলাভাষায় আমদানি আর হজম হয়ে যাচ্ছে। তা হওয়াই উচিত। কারণ এটা ভাষার জীবন শক্তির লক্ষণ। জীব ও জড়ের মধ্যে যেমন একটা পার্থক্য আছে জীবিত আর মৃত ভাষার মধ্যেও তেমনি আছে।

যে সমস্ত বিদেশী শব্দের অশুদ্ধ রূপ বাংলায় বহুপ্রচলিত হয়ে আছে (যেমন ইংরেজী টেবিল, ইস্কুল ইত্যাদি) সেগুলির আর প্রতিকার সম্ভব নয়। এখনও বহুল প্রচারিত নয় এমন সব আগন্তুক বিদেশী শব্দগুলি বিকৃত মিশ্রী ও দ্রুতিকটু রূপে বাংলা ভাষার অন্তর্গত যাতে না হয়ে যায় সেদিকে গোড়াগুড়ি থেকেই বাংলার লেখকদের উদ্যোগী হওয়া উচিত। বানানের নিয়ম সংকলয়িতারাও সে চেষ্টাই করেছেন। এমনি কতকগুলি সহজে উচ্চারণক্ষম শব্দ স্থূল উচ্চারণে সাময়িক সাহিত্য এবং অধুনা প্রকাশিত পুস্তকে বহুল ভাবে আজকাল প্রচারিত হচ্ছে।

দু'একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

মূল অর্থে ইংরেজী date শব্দ বাংলায় খুব চলে। কিন্তু স্থূল উচ্চারণে চলে—ডারাট বা ডেইট রূপে। হওয়া উচিত গোড়াগুড়ি—ডেস্। যেমন—রামবাবু ডেসের উপর বসিয়া ছিলেন।

Mayor শব্দটা তো এখন বাংলারই অন্তর্গত। কিন্তু শব্দটা কখনি মেয়র বা মেঅর নয়। এই শব্দের উচ্চারণ মেয়ার। দোটকী Mayo (উচ্চারণ মেয়ার) শব্দের সঙ্গে Mayor-এর উচ্চারণে কোন তফাৎ নেই। যেমন,—উচিতরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অধুনা কলিকাতার মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

Senate শব্দ প্রায়ই 'সিনেট' রূপে পরিবেশিত হতে দেখি। কিন্তু বলা ও লেখা উচিত—সেনেট।

Motor লেখা উচিত মোটর (মটর নয়)। Job শব্দে যেখানে একটা কাজ বোঝায় সেখানে উচ্চারণ জব। দামের উচ্চারণ জোব।

Thomas—টমাস (টমাস্ বা থমাস নয়) Hardinge—হার্ডিং, হার্ডিঞ্জ নয়। গল্পের নায়কেরা অনেক সময়ে "হার্ডিঞ্জ" হস্টেলে থাকে এবং "ফুটবলাদি" করে। তাদের ফুটবলাদি করা উচিত।

"কাদুঁনে গ্যাস" বা Tear gas-এর প্রতিশব্দরূপে সাময়িক পত্রে ও রোড়িওতে প্রচারিত হয় তা হওয়া উচিত "কাঁদানে গ্যাস।"

মহাজ্ঞানী মহাজন

শ্রীশ্রুতি মুখোপাধ্যায়

ঐহিক জীবনে ভারতবাসীকে ইংরেজই প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টিদান করেছে। আজ আমরা ধীরে ধীরে চারপাশের সব কিছুরই ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠ্‌ছি। উনবিংশ শতাব্দী থেকেই আমাদের শিক্ষাধারার ইতিহাস রক্ষিত হয়েছে। এখন 'শিক্ষা' (Education) বিভাগের পঠন তালিকায় একটি অভিনব বিষয়। তাতে শিক্ষার ইতিহাসটাকেও (History of Education) বিস্তৃত ভাবে জানতে হচ্ছে।

সাহিত্যের ইতিহাস ধারায় বিশেষ গ্রন্থ যেমন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে—সেই রকম গ্রন্থকার বা সাহিত্যিকও স্পষ্ট হয়ে ওঠেন। তেমনি শিক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাসে যথার্থ শিক্ষকও জন মানসে অনায়াসে আসন স্থান করে নিচ্ছেন। আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এই রকমই একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। সেদিন শাসক যদি বিদেশী না হতো তবে হয়তো তাঁর নামই প্রথম জাতীয় শিক্ষক (National Professor) রূপে চিহ্নিত হতে পারতো।

বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর নব উন্মেষের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকেরই সৃষ্টি চেতনার মূলে "সবাসাচী" সুলভ সংস্কারের অভ্যাসটি সেদিন সুপ্ত ছিল। রবিন যুগপুরুষ ছিলেন—তাই তাঁর সত্তার প্রকাশটিকে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি স্পষ্ট করলেও সকলের ক্ষেত্রেই তার অল্পবিস্তর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যুক্তিতর্কের আশ্রয় বিস্তার করেই হোক বা উপন্যাস-নাটক-কাব্যের মাধ্যমেই হোক জনমানসে চেতনার জোয়ার আনার উদ্দেশ্য থেকে সেদিন কারোরই চিন্ত-যুক্তি ঘটেনি সৃষ্টি প্রেরণার মূলে আনন্দ দানের বাসনাকে অতিক্রম করে।

সেই পর্বের নগর দম্পতি যে মানুষটির আবির্ভাব ঘটলো—যুগোপযোগী উত্তরাধিকার নিয়েই তাঁর পরিপূর্ণতা। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। বরং বিপরীত পক্ষে তার সহকারে হতে চাইলেন নিজে এবং তার ব্যাখ্যাকে সঞ্চালিত করে দিতে চেষ্টা করেছেন সাধ্যমতো। বিজ্ঞান যে নবযুগের বার্তা

নিয়ে এলো তারই সাহিত্যায়ণ করলেন দার্শনিক টীকা সহযোগে। বিজ্ঞান শেষ কথা হলেও অশেষ কথার সন্ধান আছে দর্শনে—এ উপলব্ধি তাঁর ছিল বলেই তিনি সমন্বয়বাদী আধুনিক যুগের পুরুষোত্তম এবং তাঁরই ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি আচার্য। সর্বাঙ্গীন বিচারে তিনি ছিলেন সুসম্পূর্ণ শিক্ষক। আজ শতবার্ষিক স্মরণিকায় সেই পরিচয়টিকে যথার্থ রূপে উদ্ঘাটন করা গেলে সেটাই সম্ভবতঃ হবে তাঁর প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মেধায় ও পেশায় আচার্য সুন্দর ছিলেন একজন যুগোপযুক্ত শিক্ষক। পাণ্ডিত্য ছিল অতলান্ত। মনীষী এ্যাসকুইথ এই বিশেষজ্ঞের যুগে বহুমুখী প্রতিভাধরের বিচিত্র দক্ষতার হ্রাস প্রাপ্তি সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন এমন একজন সর্বজ্ঞ ব্যক্তি যাঁকে সহজেই ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়ের চলন্ত বিগ্রহ বলতে পারা যায়। কৃতিত্বময় ছাত্র জীবন সমাপনান্তে কর্ম ক্ষেত্রের বিভিন্ন আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে অবশেষে রিপণ কলেজের অধ্যাপকের পদকেই অন্তিমক্ষণ জানালেন। অধ্যাপক থেকে অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ ত্রিবেদীর প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য চাপা রইলো না—১৯১৭ সালের স্যাডলার কমিশনও তাকে স্বীকৃতি দিলেন। তাঁদের কার্যক্রমে তাঁর পরামর্শের যথেষ্ট মূল্যবান বিবেচিত হলো। আর নিজের কলেজের সামগ্রিক উন্নতির দিকেও ছিল তাঁর সদা প্রস্তুত জাগ্রত দৃষ্টি। কি ছাত্র, কি সহকর্মী কি বন্ধু-বান্ধব সকলেরই জীবনে শিক্ষালাভের সহায়ক রূপে নিজেকে নিযুক্ত রেখেই ছিল তাঁর পরম আত্মতৃপ্তি। অন্তপক্ষে সেটা কলেজের প্রত্যেকটি বিভাগীয় অগ্রগতির সাহায্যকারীও হলো নিঃসন্দেহে।

তদতিরিক্ত ছিল তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টা। অর্জিত জ্ঞানকে বিদ্যা রূপ দিয়ে দিলেন বিভিন্ন ধরণের আলোচনার মাধ্যমে। বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক যে প্রশ্ন তাঁর হৃদয়ে জেগেছে এবং তার যে সমাধানে তিনি এসেছেন সব জানালেন। শুধু তাই নয়—সাহিত্যের কথা, ব্যাকরণের কথা, পরিবার সমাজ ও জাতির কথাও তিনি বিস্মৃত হন নি। সেই সকল সূচিন্তিত সুখ্য অথচ স্বচ্ছ মন্তব্য রয়েছে তাঁর বিচিত্র রচনা সম্ভারে। স্পষ্টতই তার প্রাঞ্জলতা ও সরলতা পাঠককে আবিষ্ট করে।

এতো গেল তাঁর ব্যক্তি জীবনের সাফল্যময় চরিতার্থতার অধ্যায়। কিন্তু আমরা কি পেয়েছি? সংঘর্ষময় জাতীয় ঐতিহ্যে সংযোজনের বৈশিষ্ট্যই তো তাঁর স্থান নির্দেশ করবে আমাদের মনে। সেই অবদানই তো পাথেয় রূপে আমাদের জীবনের দিক নির্ণয়ে সহায় হবে।

মুনো রামনাথের গল্প দৃষ্টান্ত রূপে না হয় নাই তোলা হলো। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আরো যে সব শিক্ষাব্রতীর সাক্ষাৎ মেলে—তাঁদের জীবনাদর্শের মেরুদণ্ডটিকে অন্বেষণ করলে কিন্তু একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেটি হলো, সন্তোষ (Contentment)। জ্ঞান জিনিষটি নির্বিচারে ঐহিকতার ঊর্ধ্বে—তার অর্চনায় তাই পার্থিব জীবনের প্রতি উদাসীনতাই হচ্ছে মূলধন। মানসিক সন্তোষ এই উদাসীনতা লব্ধ সম্পদ। কিন্তু পৃথিবীর এই অশান্ত ঘূর্ণির পাকে সন্তোষ আসবে কেমন করে? ভারতীয় ভাবাদর্শের দীক্ষা-বলে? সংযমের সাধনায়? সংযমের রূপান্তর অনাসক্তিতে। আসক্তির জ্বালায় কণ্ঠাগত মানুষকে এ কথা বুঝতেই হবে—নইলে মুক্তি নেই। রামেন্দ্র সুন্দরের পূর্বাপর জীবনালোচনা করলে দেখা যাবে যে একমাত্র সন্তোষের সহায়তায় তিনি বিজ্ঞান দর্শন ও সাহিত্য, এই ত্রিমার্গে সাধনা করেছেন—প্রাপ্তির দিক থেকেও তাঁর জীবনে তাই অমীর সমাহার,—সত্য শিব ও সুন্দর।

আচার্য রামেন্দ্রের জ্ঞানসাধনা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই আপন পথ কেটে চলেছে

এবং চলবেও। কিন্তু তাঁর জীবনের পাদ প্রদীপের আলোয় আজকের শিক্ষার্থীগণের 'সম্বোধ' প্রাপ্তির রাস্তাটি চিনে নেওয়াটা একান্তই বাঞ্ছনীয়। জীবনের মূল্য বোধের ধারায় নিঃসন্দেহে বিবর্তন এসেছে—তবুও শাশ্বত যা তার অম্লান জ্যোতি হারিয়ে যেতে পারে না। হয়ত তা আপাত দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে পারে মাত্র। কিন্তু জীবনের কোলাহল হতে পৃথক থেকে আচার্য দেবের জীবনের সব মূল্যায়নের দ্বারা ঐ অমূল্য হারামণিকেই পেতে হবে। এটাই হবে আজকের শিক্ষকের প্রথম শপথ।

শিক্ষাই সংস্কৃতির ধারক বাহক এবং পরিচালক। সেই শিক্ষা বিতরণের কঠিন দায়িত্বটি কিন্তু একমাত্র শিক্ষকের হাতে। মৌলিকতাকে আচ্ছন্ন করে প্রথাবদ্ধ অনুকৃতি আজ এই শিক্ষক-কুলের স্বকীয়তাকে বিনষ্ট করতে বসেছে। শিক্ষক দিবসের অধ্যায়ে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর তাই নবযুগের ধ্রুব জ্যোতিষ্ক।

শিক্ষায় ছড়ার প্রাধান্য

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

ছড়ার আলোচনায় ধ্বনিতত্ত্বের একটি বিশেষ দিক আলোচনা করতে হয়। সেটি হচ্ছে, হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ। রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধ সেন, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল প্রমুখ ব্যক্তি ছন্দের আলোচনায় ছড়ার এই কবি বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর কাব্য-জীবনে বারবার ঘুরে ফিরে এই ছন্দের অনুসরণ এবং সংস্কার করতে চেয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাই সেই আলোচনাটুকু করে নিই।

আমি যে কয়টি (৬০টি) ছড়া নিয়ে আলোচনা করেছি তার মধ্যে হসন্ত ব্যঞ্জন নিয়ে শব্দসংখ্যা (ক্রিয়াপদ সমেত) পেয়েছি ৫৪২ থেকে ৫৫০ (অর্থাৎ ৫৪৭টি)। এর মধ্যে কতকগুলো বিশেষ অন্ত্য বর্ণও ধরা হয়েছে (৩০টি)। এগুলি—আর, সই, তাই, বাব, আড়াই, কই, মাই (-তে), খই প্রভৃতি। আমার মনে হয় এগুলি এক একটি 'অক্ষর' বর্জিত বলে এগুলোকেও হসন্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ধরা ভালো (হসন্ত ধ্বনিতার জন্য)। 'ও' কার বা 'উ' কার প্রভৃতির একাক্ষর শব্দ আমি এর মধ্যে ধরতে চাইনে। অর্থাৎ উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় 'সম্মুখ ভাগের স্বরবর্ণযুক্ত একাক্ষর শব্দগুলির সঙ্গে হসন্ত ব্যঞ্জনের কোথায় যেন মিল পাচ্ছি। অবশ্য যখন এরা ব্যঞ্জন থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে তখনই। সুনীতিবাবুও এইরূপ অনুমোদন করেন—সন্ধ্যক্ষরাত্মক অক্ষরকে বিশ্লেষ করলে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষররূপে গ্রহণ করা যায়। তবে আমি এ থেকে উ এবং ও কে বাদ দিয়েছি। এই শব্দের মধ্যে যে ব্যঞ্জন বা স্বরের যেরূপ স্থান পেলাম তা নীচে লিখছি;

সবরূপান্ত ও অন্যান্য 'র্' দিয়ে—৩০·৭৭%; 'ন্' দিয়ে—১৪·১১%; 'ল্' দিয়ে—১২·৮০%; 'ম্' দিয়ে—১০·৩৮%; 'স্বরবর্ণ' দিয়ে—৫·২১%; 'ক্' দিয়ে—৫·২০%; 'ত্' দিয়ে—৪·৬০%; 'ভ্' দিয়ে—৩·০%; 'স' প্রভৃতি দিয়ে—২·৪%; 'হ্' দিয়ে—১·৪৮%; 'অ' ইত্যাদি দিয়ে—১·৪২%, 'ভ্'—১·৪২%; 'খ্'—১%; 'গ্'—১%; 'চ'—১%; 'ট্'—১%; 'ব্'—১%; 'প্'—৮%;

'ম'—২%; 'ঘ'—মাত্র ১টি; 'ঝ্'—১টি; 'ঠ্'—১টি; 'ড্'—১টি; 'ধ্'—১টি; 'ধ'—১টি; চ্, ফ্, ঙ্, এবং হ—নেই। ('নেই' মানে এ নয় যে, বাংলা ভাষাতেই নেয়; ভাষাতে আছে 'লাঞ্চ' 'লাম্ভ' প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানে আমি হলন্ত-গুলির প্রসঙ্গেই বলছি)।

উপরের ছবিটি দেখলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় ন্-ল্-ম্-র্-ঙ্-ণ্ এর হার বেশী; এবং 'ক' এবং স্বরবর্ণের সমান সমান। মহাপ্রাণ বর্ণের মধ্যে-হ-খ-শতকরার হারে কিছু স্থান পায়; কিন্তু ঘ্-ঝ্-ঠ্-ধ্-ভ্ নগণ্য (ত-বর্গের দুটি মহাপ্রাণ বর্ণেরই স্থান কম); প-বর্গের মহাপ্রাণ বর্ণের কোনটি নেই; ট-বর্গের একটি নগণ্য অন্যটি নেই; হ-এর কথাই ওঠে না। অবশ্য একথা বলছিনা যে, ঐসব ধ্বনি শব্দে নেই; বলছি শুধু হলন্ত বর্ণে নেই। আরও সরল ক'রে বলা যায়, ক আর চ বর্গেরই অঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ হলন্তের খেলায় আসছে। অর্থাৎ কণ্ঠ আর তালুর পরে মহাপ্রাণ নিয়ে জিহ্বা যেন থাকতে চায় না।

উষ্মবর্ণ কম হলেও একেবারে 'হেলা-ফাল্গুনে' করা যায় না। নাসিক্য বর্ণের সবই দৃঢ়তার সঙ্গে আছে কিন্তু চ-বর্গেরটি সরে গেছে, যেন সে ধ্বনিতেই নেই। শুধু-একটি হলেও, ক্রম বললে 'ঙ' এর মধ্যে তার স্থান কম নয়।

হলন্তবর্ণ বাদ দিলেও, সাধারণভাবে যদি বলা যায় তবে সুনীতিবাবুর মতে সমগ্র ধ্বনীর মধ্যে বাংলা ভাষায় শতকরা হারে সবচেয়ে বেশী র (৪·১৪) তারপর ক (৪·১৫), ন (৪·১৪), তারপর ত (৩·৮০) এবং শ ষ স (৩·৬৪); কিন্তু এদের ছাড়িয়ে স্থান আছে ক্ক, ণ, ম (৪·৯৭); আর সবার উপরে 'সত্য' হচ্ছে র (৭·০১)। এবং তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "Some common suffixes of Modern Bengali—the plural and the genitive—have 'r' this certainly has helped the high frequency of this sound in the language." আমাদের এখানেও সেই অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু 'ল' এর বেলাতেও আমরা অতীত কালের রূপটা ধরিনি (আমাদের হলন্ত ধ্বনির জন্য ঐ ধ্বনিটি ধরা যাবে না) তবু তার তাগুও কম নয়। তবে নাসিক্য বর্ণের মধ্যে সম্মানার্থে 'ণ' প্রয়োগটি ধরতে হয়েছে।

ক-ল কে অর্ধস্বররূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। নাসিক্য ধ্বনির এমন স্থান দেওয়া যায় না। তবে উচ্চারণতত্ত্বের প্রধান সহায়ক জিহ্বা এখানে কাজে লাগে বলে মনে হয় না। ব্যঞ্জন এবং স্বরকে একটু রঞ্জিত করে মাত্র। চন্দ্রবিন্দুকে নাসিক্য স্বরবর্ণ বলি। সেক্ষেত্রে ম্-ন-ণ-ঙ নাসিক্য ব্যঞ্জন বটে, কিন্তু নাসিক্য (স্বর এবং ব্যঞ্জন সমেত)-কে যদি পৃথক জাতের স্বর বৈচিত্র্য বলে ধরি তবে খুব অন্যায় হয় না।

এই সিদ্ধান্ত যদি মেনে নেওয়া যায় তবে হলন্ত ন্-ল্-ঙ্-ন্-ণ্-ম কে আমরা যে-অক্ষরের সহায়ক অর্থাৎ অন্তে থাকে তারই অন্তর্ভুক্ত করে উচ্চারণ কাল বা মাত্রা নিরূপণ করে ছন্দ নির্ণয় করব। এদেরকে পরবর্তী অক্ষরের আদিতে টেনে না নিলেই ভালো হয়। অর্থাৎ এরা যুক্ত ব্যঞ্জন বা বর্ণ তৈরী করে না, এরা শ্রুতির সাহায্য করে মাত্র। আর প্রথমে এদের কেউ যদি থাকে (অক্ষরে প্রথমে) অর্থাৎ স্বরবর্ণের সাহায্যে যদি উচ্চারিত হয় তবে এরা নিশ্চয়ই ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরূপ পায়। লাউ, কাল, কোড়াল—এই তিনটি শব্দের 'ল' একটু অনুধাবন করলেই তিন রকমের মনে হবে। মনে হচ্ছে Daniel Jones তাঁর একখানা বইতে, লিখেছিলেন, ইংরেজির Leaf এবং Feel এই দুটি 'L' এর উচ্চারণ যে স্বতন্ত্র তা তাঁকে এক বিদেশী ভাষাবিদের কাছ থেকে জানতে হয়েছিল।

হলন্ত সাধারণত দুরকমে হতে পারে। মূল-ধাতু এবং প্রত্যয়—উভয়ের মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্য বজায়

রাখা বা রাখার উপর, এবং শব্দ মধ্যেকার এবং অন্তের কোন স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণের লুপ্তির ফলে। যেমন সুনীতি বাবু দেখিয়েছেন লিপ্-ত হল লিপ্ত (প্রাচীন ইন্দো-আর্য যুগে) তারপর লিত্ত। 'প্ত' এর স্বতন্ত্র ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনরূপ পরবর্তী কালে থাকল না বোধ হয় অস্ফুট হয়ে পড়েছিল 'প' ধ্বনিটি, যেমন পূর্বেকার লিপ্ এবং 'ত' এর উচ্চারণকাল দ্রুত হয়ে গেল তার নিজেরই বেলায়।

বাংলা ভাষায় আমরা সমীকরণও যেমন করিনি তেমনি কালপরিমাণ দ্রুত করে যুক্ত ব্যঞ্জনও করি নি। বরং পূর্বের দীর্ঘকালের আভাসটুকুই যেন পাই। বাক্যান্তর্গত এই হসন্তধ্বনিযুক্ত বা ব্যঞ্জনান্ত শব্দ উচ্চারণে বাক্যের অর্থ এবং ঝোঁকের উপর নির্ভর করে বসে আছে। কাল দীর্ঘ হবে কি দ্রুত তা পরবর্তী অক্ষর, বাক্যের অর্থ এবং আবৃত্তিকার বা বক্তার মানসিকতাই ঠিক করে দেয়।

এই কারণগুলিই প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। কিন্তু আর একটু ঠাহরে বিচার করলে দেখা যাবে যে, মৌলিক শব্দের কোন্ কোন্ ধ্বনি লুপ্ত হয়েছে, কোন্ কোন্‌টি কোনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে—তার স্মৃতি বা জিহ্বার অভ্যাসও এই হসন্ত নিয়ন্ত্রণ এবং এবং কাল পরিক্ষণে অনেকখানি কাজ করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ম'-টিকে নেওয়া যাক :

(১) কাছিম, হাতিম, সিদীম

(২) মিম, জাম, কদম

(৩) কুমার, কুমীর, খামার

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে প্রথম নমুনের ম্ যেন অনেকটা অস্ফুট থাকতে চায়, যেমন ঘোষ আর অঘোষ বর্ণের মধ্যে তফাৎ তেমনি, কিন্তু দুই নমুনের ম পূর্বের থেকে একটু জোরালো; তিন নমুনটির মধ্যে একটি মহাপ্রাণ বা হ্-ধ্বনি পাওয়া যায়। অঞ্চল বিশেষে তাই তিন নমুনের উচ্চারণে স্বাতন্ত্র্য এসে পড়ে। কোন অঞ্চলে কু-মীর্ বলবে, কোন অঞ্চলে কুম্-হীর্ (যেখানে হ্ এর উপস্থিতিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল)। এই রকম মহাপ্রাণ অংশের শুধু ধ্বনি বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়লে ধ্বনির কালের যেমন পরিবর্তন হয়, শব্দ উচ্চারণের সুরের বদল হয়ে ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনির স্থান ভেদ ঘটিয়ে থাকে। একটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করলে স্পষ্ট হতে পারবে। 'ভাত' শব্দটির উচ্চারণ বাংলা-দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকটা নীচের ধরণে পাওয়া গেছে :

(১) ভাত্ (পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রাঞ্চলে)

(২) ব্-হাত্ (পদ্মা-মধুমতীর উত্তরাংশে)

(৩) হ-বাত্ (ঐ পূর্বাংশে)

(৪) বা'ত্ (শ্রীহট্টের দিকে)

এই তারতম্য, যত কীণই হোক্ শব্দের ঝোঁকের যে স্থান বদল হয়, স্বরের যে পরিবর্তন হয়, হসন্ত স্থানে যে ধ্বনি-বৈচিত্র্য আসে সে কথা না মেনে বোধ হয় উপায় নেই।

এ কথা স্বীকৃত যে, বর্তমানকালে বাংলা ভাষায় শব্দের প্রথমে ঝোঁক পড়ে। এবং সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে আধুনিক কবি স্বরবৃত্ত ছন্দ শিরমিত করতে চেষ্টা করেছেন। ছড়া আবৃত্তিতে আমাদের সেই আধুনিক ঝোঁক প্রবণতা এসেছে। এ অভ্যাসকে পিছিয়ে টেনে নেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের এই আধুনিক অভ্যাসকে ছড়া রচনাকালের মৌলিক অভ্যাস বলে মনে করলে সর্বত্র ঠিক হবে না। কারণ বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের কেন্দ্রস্থলের উচ্চারণে আদিতে ঝোঁক থাকলেও সমগ্র বাংলার বেলায় এ কথা তো ঠিক নয়। বিশেষ ক'রে পশ্চিমরাঢ়ে এবং উত্তরপূর্ববঙ্গে এই নিয়মের ব্যতিক্রমই দেখতে পাওয়া যায়। অনেক-স্থলে যে সব সংস্কৃত শব্দ সা সহা হয়ে ওঠেনি (not fully naturalised) সেগুলির আদিতে ঝোঁক থাকে না। সাধারণত সেগুলির প্রথম দীর্ঘ অক্ষরে অথবা শেষ ব্যঞ্জনান্ত শব্দের আগে ঝোঁক পড়ে। সুনীতিবাবুর আর একটি অভিমত

তুলে দিচ্ছি : "But judging from the general trend of pan-Bengali phonology, it seems that a strong non-initial stress was prevalent all over Bengal in the formative period of the language and gave to Bengali as a whole some of its distinctive features in vowel phonetics."

ছড়ার ছন্দে এই প্রভাব থাকলে দেখা যায় অনেকগুলি বাড়তি পর্ব কোন ঝোঁক না নিয়েই চুকে যায়। যেমন—

(১) তারা যাই বলুক চষে
তারা হাটের দাঁত ঘষে

উপরের ছড়ার মধ্যে 'তারা' যে ধর্ম নিয়েছে সেই ধর্মই নীচের ছড়াতে পাই। যেখানে ঐ ধর্মটি নিয়েছে সেই অংশ আমি চিহ্ন দিয়ে বোঝাতে চাইছি :

(২) আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে তরা দিয়ে
না' নিয়ে গেল বোয়ালে মাছে
তাই না দেখে তোঁদড় নাচে

(৩) খোকা যাবে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ 'নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে'
মাছ 'নিয়ে গেল' চিলে।

'ও' অক্ষরের অংশে অনেকে 'কোলা'-র উপর জোর বা ঝোঁক দিতে চান; কিন্তু তা বোধ হয় একটু সাজানো-গোছের (Sophisticated) হয়ে পড়ে। এইরকম মিশ্রিত ঝোঁক দিয়ে লিখতে গিয়েই সত্যেন্দ্রনাথ ছড়াকে সংশোধন করে একদা প্রাণ মাত্রাবৃত্তের কবিতা লিখলেন।

(৪) দাদা গো দাদা শহরে যাও
তিন টাকা ক'রে সাইনে পাও।

'ও' অক্ষরের ছড়াটির প্রথম দুই পংক্তি স্বাভাবিক উচ্চারণে 'শহরে' আর 'সাইনে'-র আগে ঝোঁক নেয় না; কিন্তু এই ছড়ার পরবর্তী অংশে মিশ্রমিত ঝোঁক মিলছে :

দাদার গলায় তুলসীমালা
বউ বরণে চন্দ্রকলা।

(৫) এলের পাত বেলের পাত
বল্‌লে মায়ের চোকা
উড়ে বসে পোকা।

এখানেও 'এলের পাত বেলের পাত'-এ হয়ত কোথাও ঝোঁক পড়ে না। প্রথম অক্ষরে ঝোঁক দিলে মানিত হয় বটে, কিন্তু ছড়ার বক্তব্য-গতি তাতে সায় দেয় না। এ রকম ক'রে পড়লে শেষে 'চোকা' আর 'পোকা'-র উপর ঝোঁকটি পড়ে না। ছড়া ঠিক মাপ-জোঁক করা কবিতা নয়; ছড়ার মধ্যে নিতান্তই কথার ভঙ্গি থাকে আবার ছন্দ-ও থাকে। অর্থাৎ কথার যাদু আর যাদুর কথা উভয়েই মিলে যায়।

মনে হয় এই রকম অবস্থার সম্মুখীন হয়েই প্রবোধচন্দ্র সেন বলতে বাধ্য হয়েছেন, "কিন্তু স্বভাবতই ছড়াসাহিত্যে কোন ছন্দেরই আদর্শ সর্বত্র সমানভাবে অনুসৃত হয় না; ঘন ঘন ছন্দের রূপ বদল হয়, নানা আদর্শের মিশ্রণ ঘটে, ধ্বনি সন্নিবেশে ত্রুটি ঘটে এবং আবৃত্তির ভঙ্গিতে সে ত্রুটিকে মার্জনা করা হয়।"

আমার মনে হয়, ছড়াতে এরূপ হওয়ার বিশেষ কারণ থাকতে পারে। একটি কারণ অনুমান করে বলছি। ছড়া যখন আবৃত্তি করা হয় বা রচনা করা হয় তখন সামনের ব্যক্তি থেকে মন এবং দৃষ্টি সরে গিয়ে একটু দূরে যায়। এই দৃষ্টি আর মনকে টেনে বারবার উপলক্ষ্য ব্যক্তিটির দিকে আনতে হয়। ঠিক এইরূপ ক্ষেত্রে ছন্দ-তাল-মাত্রার রকম ফের হতে বাধ্য; অনেক সময় সাধারণ

কথার সুর লেগেও যেতে পারে। যাকে বলে পড়বার কাব্য বা গান শোনানোর কাব্য, তা এই ছড়া নয়। ছড়ার স্বাভাবিকতাই অন্যান্য কাব্য-সঙ্গীত রচনা থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এই স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে মার্জিত শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ছড়া আবৃত্তি করা কঠিন।

আমরা সেই জন্য ছড়ার মধ্যে ব্যবহৃত তর্কিমালা, রক্ত ছুটেছে, ছন্দকলা প্রভৃতিকে যুক্তাক্ষরের (যুক্তব্যঞ্জনের) ধ্বনি দিয়ে পড়ে বলি। এমন কি এসব তফাৎ আমাদের সব সময় নজরে পড়ে না। দেখাতেও নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই :

শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল
সোনার তরী।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাংশটি বোঝাতে গিয়ে প্রবোধ বাবু লিখছেন, "আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমস্ত কবিতাটির মধ্যে ওই 'শূন্য' শব্দটি ছাড়া অন্য কোথাও একটি যুক্তাক্ষর নেই।" যুক্তাক্ষর বললে প্রথম শব্দ 'শ্রাবণ' বোধ হয় বাদ যায় না। অজ্ঞাতসারে এরূপ ঘটবার কারণ বোধ হয় এই যে, 'শূন্য' বলতে আমরা ধ্বনির যে-বৈশিষ্ট্য সহজেই প্রত্যক্ষ করি 'শ্রাবণ' বলতে সে বৈশিষ্ট্যটুকু নজরে পড়ে না, কারণ প্রাথমিক ঝোঁকের সঙ্গে ঐ প্রথম মিশে যায়।

'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বাংলা তরঙ্গওয়ালা ভাষা। ভাবপ্রকাশের এমনতর সাহিত্যিক রীতি অন্য কোন ভাষায় আমার জানা নেই।" বাংলাভাষার ধ্বনি-মাত্রা-সুর-ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ যেমন নিখুঁত ভাবে দেখতে পেয়েছেন এমন আর কেউ পারেননি। এই জন্যই তাঁর রচনা এমন জীবন্ত আর বিচিত্র হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তাঁর বড় সহায় হচ্ছে তাঁর সঙ্গীত এবং নৃত্য সম্পর্কে জ্ঞান। এই দুটি দিক আয়ত্ত না করলে লৌকিক ভাষা বোঝা একেবারেই অসম্ভব।

এই তরঙ্গওয়ালা ভাষার ভাবপ্রকাশ অনেকভাবে ঘটে। মন-মুখ-শরীর প্রবৃত্তির আন্দোলন বা সঞ্চালনে একভাবে আর অর্থের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ঝোঁক আর মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়ে আর একভাবে বিশেষ করে। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পংক্তিতে 'জল' এর প্রাক্ হসন্ত স্বরটি যে দুই মাত্রার হবেই এমন কোন কথা নেই। যদি এই বাক্যের ক্রিয়াপদে ঝোঁক দেওয়া যায় (যা বলাই স্বাভাবিক নয়) তবে 'জল' এর প্রাক্ হসন্ত স্বরটি দীর্ঘ হয় না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রাক্ হসন্ত স্বরটি না ধরলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ পয়ার ছন্দের বেলাতে প্রাক্ হসন্ত স্বরটি দুই মাত্রার না ধরলে চলে বলে স্বীকার করেছেন :

তব চিত্ত গগনের দূর বিহারীনী
বেদনার রাঙা মেঘে পেয়েছে মহিমা।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "এখানে বিশ্ব শব্দের ব্ হসন্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে একমাত্রার পরিধি দেওয়া গেল। নিশ্চিত জানি, পাঠক সেই পরিধির সম্মান যতই রক্ষা করে চলবেন।"

রবীন্দ্রনাথের ঐ 'যতই' কথাটা প্রণিধান যোগ্য। শুধু পয়ার কেন ছড়ার মধ্যেও প্রাক্-হসন্ত স্বর ঐ 'জল' শব্দেই একমাত্রার পাওয়া যায় :

(১) আয় রে আয় নদীর জল, ঝাঁপ দিয়ে পড়ি,
(২) পা ধুইতে জল দিয়েছি, খেয়ে ফেলেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'জল পড়ে পাতা নড়ে' বাক্যে জলটি প্রথমেই আছে। কাজেই বিশেষের উপর জোর দেওয়ার জন্যে যেখানে প্রাক্-হসন্ত স্বর দীর্ঘ মাত্রার পেয়েছেন। কিন্তু 'নদীর জল' বলতে জ এর আগে আর একটি হসন্ত পাচ্ছি, আর 'নদীর জল' শব্দটি কথার একটি ছাঁচ বা

প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্নকে রাখতে গিয়ে পরবর্তী হসন্ত শব্দ 'ঝাঁপ' এর উপর সমস্তটা জোর পড়ে যাওয়ায় 'ঝাঁপ'-এর 'আ'কার এবং প-এর হসন্ত বেশ শব্দের সঙ্গে ভঙ্গী নিয়ে আসে। আর তাইতে 'জল' শব্দের প্রাক্-হসন্ত এখানে একমাত্রারই থাকে, 'হসন্তের ক্ষতিপূরণ' করবার সুযোগ পায় না। ২ নম্বরের পংক্তিতে আরও একটি বিচিত্র ঘটনা যে, পূর্বতনী দুইটিতে আর পরবর্তী দিয়েছি শব্দমধ্যেকার স্বরবর্ণ অনেকখানি উচ্চারণের সতর্কতা আর তরল চায়। এইজন্য 'জল' এর প্রাক্-হসন্তস্বর দীর্ঘ করে পড়লে অস্বাভাবিক বোধ হয়।

কলত শুধু উচ্চারণ নিয়েই মতভেদ আছে। 'শ্রাম' শব্দটি দিলীপ রায় 'শ্রাম্' বলেন বলে রবীন্দ্রনাথ ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে 'প্রাকৃত বাংলায় যেসব শব্দ অতি প্রচলিত তাদেরই উচ্চারণে এই রকম স্বরলুপ্তি সহ্য করা চলে।' এ সমস্ত বিতর্কই নির্ভর করে উচ্চারণের কাল নিয়ে। ছন্দটার যখন দেশ নির্ণয় করা যাচ্ছে না তখন কোন অঞ্চলের উচ্চারণ প্রভাবে যে রচনাতে আছে বলা কঠিন। তবু সাধারণ নিয়ম কিছু আছে। সেই সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করলাম। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মেও কলহ রয়েছে প্রচুর।

রবীন্দ্রনাথ হসন্ত র কে 'রেফ'-এর পর্যায়ে এনে বাংলা ছন্দের মাত্রা নির্দেশ করতে চাইছেন। তিনি একটি ছড়াকে নিম্নরূপ বসড়ায় ফেলতে চান :

এ পার্গলা ও পার্গলা মধ্যখানে চর
তারি মধ্যে বসে আছে লিলু সদাগর।

তিনি বলেছেন, "এটা পয়ার কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ বিশ্লিষ্ট বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না।" সেই জন্য 'রেফ দিয়ে হসন্ত র-কে বোঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ধরে নিয়েছেন এটি পয়ার, দ্বিতীয়ত তাকে চোদ্দ অক্ষরে আনতে গিয়ে উচ্চারণের হসন্ত ধর্মিতাকে বদলে দিয়েছেন। হসন্ত ধ্বনি পরের ধ্বনিকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু নিজে স্থান বদল করে না। কারণ হসন্তের পর কিছুটা কাল ব্যবধান থাকে। রেফ হলে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কাল ব্যবধান থাকে না। এমন কি কবি নিজেই এই রেফকে পয়ারের চেহারা দেখাতে গিয়েও 'আছে· লিলু' করায় পয়ারের যতি (৮ অক্ষরের পর) অগ্রাহ্য করে লুপ্ত করে দিয়েছেন। অক্ষরবৃত্তে যেমন পূর্বেকার কবি হসন্ত দেখিয়ে কানকে ফাঁকি দিতেন, এখানে তেমনি যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। হসন্ত বর্ণের ধর্মে দেখি যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে হসন্ত হতে পারে, কিন্তু হসন্ত বর্ণ ভুড়ে যুক্তব্যঞ্জন হয় না। রবীন্দ্রনাথ র আর ম যদি না পেতেন তবে ঐ রকম রূপ বদল করতে অসুবিধা বোধ করতেন। এ বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদারের বিশ্লেষণ সত্যিকারের স্বভাব-অনুসারী। তিনি বলেন,

"এই ভাষার যুক্তাক্ষরের কোন বিশেষ মূল্য নাই—সকল বর্ণই যুক্ত, কেহ যুক্ত নয়।..... ঐ মধ্যস্থ অন্ত অক্ষরের স্বরকে সংকুচিত বা প্রসারিত করেনা, তাহার শ্বোক বা উচ্চারণ ক্রিয়ার জোরকে বর্ধিত করে মাত্র—ইহাকে accent বা স্বরবৃদ্ধি, Stress বা চাপ, বলা যাইতে পারে।" দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন,

"'বিষ্টি পড়ে'র 'বিষ্‌টি'তে যুক্তাক্ষর নয় হসন্তই বর্তব্য, তাহার ফলে, পূর্ব অক্ষরে যাহা ঘটে, তাহাকে আমি 'স্বর বিস্ফোরণ বলিব এবং ইহাতেও একরূপ ব্যঞ্জন সংঘাতই ঘটিয়া থাকে। সাধুভাষার স্বরের প্রাধান্য থাকায় 'বৃষ্টি' এই শব্দটির উচ্চারণ -বু-ষ-টি (স্বর প্রসার*) এবং বু'ষ+টি (স্বর সঙ্কোচ)—এই দুই প্রকার হইতে পারে।

কিন্তু এই ভাষার উচ্চারণে 'বিষ্টি'-র 'ষ' পূর্ব অক্ষরের স্বর-বিস্ফোরণের ফলে যেন ছিটকাইয়া উঠিয়া দুই দিকের ব্যঞ্জনধ্বনিকে সংঘটিত করিয়া তোলে, যথা—

'বি ষ্‌ টি' ; সাধুভাষার উচ্চারণে দুই ব্যঞ্জনের মধ্যে যে ফাঁকটুকু থাকে এখানে তাহা থাকে না।"

মোহিতলালের এই অনুভূতি এবং বিশ্লেষণ অতি সূক্ষ্ম আর সত্য। তাঁর এই বিশ্লেষণী শক্তি ছড়ার হসন্ত বর্ণের উচ্চারণকে স্বস্থানে আনতে পেরেছে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী বাংলার সমালোচনা সাহিত্যকে কুলীন ক'রে দিয়েছে।

তবে তাঁর শেষ বাক্যটি একটু ভাববার মতো। ছড়ার ভাষা যদিও তরাট তবু বলতে হয় মোহিতলাল উপযুক্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন বলেই দুই ব্যঞ্জনের মধ্যে কোন ফাঁক পান নি। তাছাড়া শব্দের মধ্যেকার হসন্ত বর্ণ সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য হতে পারে, শব্দের শেষে যে হসন্ত থাকে তারপর যত সামান্যই হোক, কাল ব্যবধান থাকবেই। রবীন্দ্রনাথ 'রেফ্‌' প্রয়োগ করতে গিয়ে সেই কাল ব্যবধানকে রাখেন নি। এবং তাতে যে অসুবিধা হয় তা আমরা পূর্বে বলেছি। মোহিতলাল যাকে স্বর-বিস্ফোরণ বলেছেন তা অনেকটা বাঁকের মতো। সোজা না চলে একটু চেউয়ের মত দীর্ঘ নিয়ে এগিয়ে গেল। ঐ বাঁক যোজনায় কিছু সময় লাগেই। তবু আমার মনে হয় শব্দ মধ্যস্থিত হসন্তবর্ণের বেলায় মোহিতলালের কথাই ঠিক, সময় বা ফাঁক নেই বললেই হয়। আসল কথা, যুক্তাক্ষর আর হসন্তবর্ণের চলনই আলাদা। মোহিতলালের কথার প্রথমটি গন্তব্যগামী, দ্বিতীয়টি ভেক-প্রদক্ষী। বেন্তের লাফানোর আগে পিছনে আছে, গন্তব্যগমনে স্থিতি এবং পরবর্তী চলন আছে :

কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে.....
রক্ত তিলক ললাটে পরাল

এর ভেতরের কণ্ঠ মন্থ রক্ত নিজেদেরই যুক্ত উচ্চারণের মাত্রা-গুণ নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে। অন্য কারও প্রভাব নেই। কিন্তু,

গলায় ভাদের ভক্তিমালা, রক্ত ছুটেছে

এর মধ্যেকার যুক্তধ্বনি নিয়েছে পূর্বের ও পরের ধ্বনি প্রভাবে, বাক্‌ভঙ্গীর প্রয়োজনায়। পূর্বে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতা পংক্তি দুটিতে 'কণ্ঠ' আর 'মন্থ' এই প্রভাবে চলতে চেয়েছিল, ছড়ার ধ্বনির রূপই নিতে পারত, কিন্তু সমগ্র কবিতার চাল-এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তা ধরে ওঠে নি ; বিশেষ করে 'রক্ততিলক' এর 'রক্ত' কোন প্রভাবই নিল না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কথায় কোন শব্দের চলনই নয় কবিতার চালকেও স্মরণে রেখে আমাদের কবিতা বিশ্লেষণ করতে হয়। এইরূপ না করলে সত্যেন্দ্রনাথের 'স্নানের কবিতাটিকে হসন্তবহুল বলে স্বরবৃত্ত বলতে ইচ্ছে হবে :

যুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিহরে বঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে-বরদ বঙ্গে।

অমূল্যধন স্পষ্টতই বলেছেন "স্বরবৃত্তে ইহার ছন্দোবিভাগ মিলান যায় না, সুতরাং মাত্রাবৃত্ত বলিতে হয়।" অমূল্যবাবু ছন্দোবিভাগ আর জাতি এই দুইটি নিয়ে দুয় আলোচনা করতে চান। তার মধ্যে ছন্দোবিভাগকেই প্রাথমিক কার্য বলতে ইচ্ছুক। আমার মনে হয়, ছন্দোবিভাগ আর জাতি এর চেয়ে রবীন্দ্রনাথের চাল আর চলন অনেক বেশি ভালো কথা। কারণ ছন্দোবিভাগ আর জাতি নির্ণয় ব্যাপারে ভাষার গতি শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গী নজরে পড়ে না। স্বভাব বা way ও না ধরে অঙ্কের ফল বা result ধরলে সাহিত্যের বিচারে ত্রুটি থাকতেও পারে। এই ত্রুটি নিরসনের জন্য অমূল্য-বাবু একটি মাত্র মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন সেটি হচ্ছে Beat and Bar theory অর্থাৎ পর্ব-পর্বাঙ্গ ভেদ। এই সিদ্ধান্তে তিনি এসেছেন, বাংলা ভাষারীতি বিভিন্ন কবির বিশেষ ছন্দ-গঠনে অমিশ্র বা 'বর্ণসঙ্কর' ছন্দ ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে দেখে। মনে হয় ছন্দোবিচারে এইটিই মূলকাঠি হওয়া উচিত। অবশ্য এতে ভাষারীতি ধরা একটু

কঠিন। এবং সেইজন্যই অন্য রসোরসিকেরা এমন কি রবীন্দ্রনাথও এত কলহ তুলেছেন। তাঁরা ভাষার প্রাণশক্তিই ধংসে চেয়েছেন। তবে এ ব্যাপারেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু ধার স্বীকার করেছেন। তিনি বাংলাভাষার হসন্ত এবং ঠেসটুকু দেখতে পেয়েই সেটিকে তার কাব্যরচনার কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তাতে ভাষা কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। হসন্ত বর্ণে রূপ দিতে পারলেই তা প্রাকৃত ছন্দ হয় না। এইজন্য তাঁর উদ্ধৃত কবিতা পংক্তি কয়টিতে যুক্তাক্ষরকে হসন্তে ভাঙবার প্রয়াস সত্ত্বেও স্বাভাবিক বাংলার কথ্যরীতি বা ভঙ্গী গ্রহণ করতে পারে নি।

এই প্রসঙ্গে আমার চার রকমের বাজনার কথা মনে পড়ে। ঢাক, ঢোল, তবলা আর পুরোহিতের ঘণ্টাধ্বনি। ঢাক, ঢোল আমি এক পর্যায়ে ফেলেছি, কারণ উভয়ই কাঠি বা ছড়-এর সাহায্যে বাজানো হয়। ঢাক একদিকে দেয় মন্দ্র ধ্বনি তোলে, বড় বেশি থামে, আবার ছোট ছড়টি শুদ্ধুর শুদ্ধুর আওয়াজে শব্দের কালপরিমাণকে একেবারে কমিয়ে ফেলি। ঢোল অত বেশি মন্দ্র যেমন নয় তেমনি অত দ্রুতও নয়। ছড়ার ছন্দে এবং হসন্ত প্রয়োগে একদিকে ঢোলের এই দুয়ের কালপরিমাণ যেমন আছে তেমনি ঢাকের ছোট ছড়ের দ্রুততাও আছে। দ্রুততা সম্পাদনার কালে ঝোঁক এবং হসন্ত বর্ণ মিলিয়ে এমন হয়ে যায় যে, সাধারণ কথার মতো কতগুলো পংক্তি এসে পড়ে (পূর্বে বলেছি)। তবলা অঙ্গুলীর সাহায্যে বাজানো হয়, একটি বোল্ থেকে অন্য বোলটিতে যাওয়ার সময় স্পষ্ট কাল পরিমাণ বজায় রেখেও দ্রুততা ঘটায়; 'তেরে কেটে তাক্' বোল্‌টি তুলবার সময় অঙ্গুলী সঞ্চালন এবং দ্রুত ধ্বনিটি লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়। ছড়ার শব্দের মধ্যকার হসন্ত-ধ্বনি অনেকটা যেন এই রকম। কিন্তু বাঁয়াতে যখন হাতের তালু আর মধ্যমার সাহায্যে ধ্বনি তোলা হয় তখন যেন যুক্তাক্ষরের হসন্ত ভাবটির কথা মনে হয়। পুরোহিতের ঘণ্টাধ্বনি একটি দোলকের সাহায্যে ঘটে। একদিকের স্পর্শ অন্যদিকের স্পর্শে ফিরিয়ে দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের হসন্ত প্রাণ মাত্রাবৃত্ত বা হসন্ত প্রয়োগ অনেকটা যেন এই পুরোহিতের ঘণ্টাধ্বনির মতো যান্ত্রিক। সংঘর্ষ বা স্পর্শ-স্পন্দনের অবকাশ নেই। মোহিত-লালের কথায়,

"তিনি দীর্ঘ-হ্রস্বের এইরূপ হাস্যকর প্রমাদ না ঘটাইয়া হসন্তবর্ণের পরিবেশ-কৌশলে, একরূপ গুরু-লঘু মাত্রাভেদ ঠিক করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও সংযুক্ত ছন্দের পরভাগ না নামিলে, এবং হসন্তপূর্ব স্বরগুলিকে একটু সাবধানে উচ্চারণ না করিলে, ছন্দ বজায় রাখা যায় না—বাংলা ঘরে ও সুরে পড়িলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়।"

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এসব স্থানে যাদুকর। তিনি হসন্তবর্ণটিই কাজে লাগাতে চান নি, তিনি ওরই মধ্যেকার মাত্রাগুণ কর্ষণ করে যুক্তাক্ষরকে সেই মতো কবিতার চালে চলন জুড়েছেন। এবং এই দিক দিয়ে তিনি ব্-ন্-ণ্ ম্,-ড্ কে বেশি লক্ষ্য করেছেন। আর তাই তাঁর কবিতায় এইগুলির প্রাধান্য দেখতে পাই (এই বর্ণগুলির ধর্ম পূর্বে আলোচনা করেছি)।

চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

প্রবোধ সেন বলেছেন, "ওই বন্ধন কথাটিই সর্বপ্রথমে বাংলা ছন্দে অক্ষরগণনার বন্ধনপাশ ছিন্ন করেছে।" বর্ষামঙ্গল কবিতাও তাই,

নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর
যে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চকিত হরিৎ,
অংকুর তার কিরীর মঞ্জীর।

'অঞ্জন ঘন' উচ্চারণে দাঁড়াবে অনুজন (অ) ঘন (অ)। অর্থাৎ দুরকম ধ্বনি, স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত একসঙ্গেই ব্যবহার করেছেন। ব্যবহার করেছেন ব্যঞ্জনান্ত ভঙ্গিই নয়, প্রয়োগ করেছেন বাংলা রীতিতে হসন্তবর্ণের কাজকে যুক্তাক্ষরে ব্যবহার করি। বাংলা ভাষার হসন্তবর্ণই তাঁকে এই দৃষ্টি দিয়েছে, সংস্কৃত উচ্চারণ-ভঙ্গী নয় বা সাধুভাষার ধ্বনিপ্রয়োগ নয় তবে তিনি যুক্তাক্ষর থেকে এই বর্ণটি আকর্ষণ করে নিয়ে বাঙালীর কানে পরিচিত ধ্বনি তুলেছেন। ভাষারীতির দিক দিয়ে এটি কিন্তু মিশ্ররীতির। মাত্রার দিক দিয়ে সমীকরণ করেছেন মাত্র। এইজন্য কবিতার চালে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে আমরা প্রাকৃত রীতি থেকে সরে এলেও তা উপলব্ধি করতে পারি না :

প্রশ্নর ভেঙ্গে খোঁকে উত্তর
গড়িত ভাষা নিয়ে।

প্রশ্নর শব্দে মাত্রা নিয়মিত হয়েছে, কিন্তু মৌলিক ভাষা রীতি সম্মত হয়নি। অথচ আমাদের কোথাও বাধে না। এখন এই চালকে বুঝে যদি ছন্দোবিভাগ করতে চাই তবে একে মাত্রাবৃত্ত বলা ছাড়া উপায় কি?

রবীন্দ্রনাথও এই মাত্রা কর্ণধার যে ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন, হসন্তবর্ণ প্রয়োগে তেমন উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ঐ 'ন' বর্ণ নিয়েই তাঁর ছড়ার ছবি গ্রন্থের অলঘাত্রা কবিতাটির একটুখানি বিচার করতে বলছি :

সেখান থেকে বাহুড়ঘাটা আন্দাজ তিনপোয়া,
মধুঘোষের দোকান থেকে নেব বইয়ের মোট।

এখানে 'আন্দাজ' শব্দটি হসন্তবর্ণ সত্ত্বেও কেমন যেন টলে গেল; যেমন গোরুর গাড়ীর একটি চাকা নীচের টিলাটিতে গড়িয়ে হোচট খায় তেমনি। অথচ সেই 'ন'-ই অন্যত্র সুন্দর খেটে গেছে :

সেরিয়ে যাব চন্দনীঘি' মুন্সিপাড়া দিয়ে,
মাসি যাব, পুঁটুকি সেথায় থাকে মাসি ঝিয়ে

এই কবিতারই অন্যত্র আর একটি বিপর্যয়,

কিনব যেগুন পটোল মুলো, কিনব সজনে ডাটা।

এখানেও সজনে শব্দ ঠিক প্রাকৃত ছাঁদে আসতে একটু চলকে ওঠে যেন ভরা কলসীর জল খানিটুকু কানায় এসে আছড়ে পড়ে। খাটুনি কবিতায়

একলা বোধায় বসে আছে, কেই বা জানে ওকে-
আপন ভোলা সহজ তৃপ্তি রয়েছে ওর চোখে।

এখানেও তৃপ্তি খটকা লাগায়।

রবীন্দ্রনাথ এই অসুবিধা নিজেও বুঝতে পেরেছেন, তাই ভূমিকাতে লিখেছেন "অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল, সেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সব চেয়ে কম সহজ।" তাঁর ভূমিকা পড়ে আমার মনে হল তিনি 'ছড়ার ছবি' কে ছেলেদের জন্য ছড়া বললেও তিনি প্রধানত ছড়ার ধ্বনিত সুর, কাব্য সৌন্দর্য এবং ক্রিয়াপদের চলিত রূপটিই প্রয়োগ করতে চেয়েছেন হসন্ত প্রধান ধ্বনি প্রয়োগে প্রচলিত ছড়ার মতো সর্বত্র সফল হন নি।

কিন্তু পরবর্তী কালের ছড়া বইয়ের কবিতাগুলি এই দিক দিয়ে সম্পূর্ণতা এনেছে। এমনকি 'র'-ফলাটি পর্যন্ত বেমালুম মিলিয়ে গেছে :

আমরা আছি হাজার বছর ঘুমের ঘোরের পাঁয়ে
আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের পেওলা ঘেরা নাবে

একটু শিক্ষিত ছেলেদের জন্য এইসব ছড়া। প্রচলিত ছড়ার ধ্বনিতে যদি তারা অভ্যস্ত হয়ে এই পড়তে যায় তবে আরও বিস্ময়কর ধ্বনি সমন্বয় পাবে,

আজ থেকে প্রত্যহ রাত্তির পোয়ালেই
বলবে প্রেপরিটরি ক্লাস এই গোয়ালেই।
তৃণ বুচা দুই বেলা খড়-কুটি ঘাসটায়
ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুল যাত্তার।

কিন্তু ছন্দ বা হসন্ত প্রধান ধ্বনির দিক দিয়ে সার্থক হলেও এগুলি ছড়া না হয়ে কবিতা হয়ে পড়েছে। তবে সে কথা বলতে গেলে বিষয়বস্তু নিয়েও আলোচনা করতে হয়।

আমরা সামনের সংখ্যায় এই বিষয় ও অন্যান্য কবিদের ছড়া সম্পর্কে আলোচনা করব।

অননুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

শ্রীমগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরামর্শ দাতা পর্ষদের বাদানোর অধিবেশনে অননুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি শাস্তিমূলক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। প্রত্যেক আইন প্রণয়নের পূর্বে ভূয়োদর্শন গ্রহণ না করিলে সরকারকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়, উদাহরণ অনাবশ্যক।

অবৈধ সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দেওয়ার ব্যবস্থা যাহারা করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর ব্যবস্থা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাদানে সহায়তাকল্পে যে সকল অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, উহাদের উপযোগিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেশে এমন হাজার হাজার পরীক্ষার্থী আছে যাহারা অনুমোদিত স্কুল-কলেজের ছাত্র হইবার সুযোগ না পাইয়া এক্সটারন্যাল, প্রাইভেট বা নন-কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হিসাবে কোচিং জাতীয় অননুমোদিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যে পরীক্ষা পাসের যোগ্যতা দেখাইয়া থাকে। তাহাদের শিক্ষণ ব্যবস্থায় এই সকল অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানের স্থান পূরণ করিবার জন্য সরকার কি দায়িত্ব লইবেন? তাহা যদি না হয়, তবে তাহার পূর্বে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধন কোন মতেই উচিত নয়। উহাতে মঙ্গল অপেক্ষা সমাজের বিস্তর অনিষ্টের প্রসার ব্যাহতই হইবে। উহাদের স্থানের পরিপূরক যোগ্যতর বিকল্প-ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত, এইরূপ আইনের বিধান দেশের ক্ষতিই করিবে। প্রাইভেট এক্সটারন্যাল বা ননকলেজিয়েট পরীক্ষার্থী ছাড়া যাহারা অনুমোদিত স্কুল কলেজের ছাত্র; তাহারাও কি স্কুল কলেজের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায়—বিদ্যালাভের পাথেয় কতটুকু সঞ্চয় করে। অথবা, উহা অর্জন করিবার জন্য তথাকথিত অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়, তাহার হিসাব সরকার করেন কি? রাখিলে হঠাৎ উহা লইয়া এত মাতামাতি করিবার কারণ ঘটিত না। সর্বাগ্রে যেটা করণীয় সেটি হইতেছে, অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা-বৃদ্ধি করা, যাহা দ্বারা আশুতোষ করিতেন এবং স্বল্প-সংখ্যক ছাত্রের সীমা নির্দেশের সাহায্যে যথার্থ টিউটোরিয়াল রীতিতে শিক্ষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় ভাবে গড়িয়া তোলা; যাহাতে অননুমোদিত বা কোচিং জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দরজায় গিয়াই পরীক্ষা পাসের পাথেয় সংগ্রহ করিতে না হয়। বিনা স্বার্থে কোন মূর্খও টাকার কড়ি ব্যয় করে না। যে সকল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতার বহু পূর্ব হইতে কাহারও কপর্দকের সাহায্য না লইয়া বহুকাল ধরিয়া যথার্থ সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, অথচ অর্থাভাববশতঃ সুপরিসর-গৃহ আসবাবের আড়ম্বর ও সুপরিবেশের অভাবে সরকারী অনুমোদন লাভের অনুপযুক্ত, সেই সকল যথার্থ উপযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি বিধানের জন্য সরকারের স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহাদের বিনাশ না করিয়া বরং পুষ্টি বিধানের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করাই শ্রেয়ঃ। প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ১৯৪০ সালে ২রা জানুয়ারী পরমারাধ্য পিতৃদেবের স্মৃতিকল্পে 'চন্দ্রকান্ত ইনষ্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করি। ১৯৪২ সালের এপ্রিল

যাসে ইত্যাকুয়েশনের সময় প্রাসাদোপম বাড়ী ছাড়িয়া বর্তমান ক্ষুদ্র বাড়ীতে স্কুল স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হই। বোমা, ধর্মঘট, আগষ্ট আন্দোলন, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা প্রভৃতির মধ্যে বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছি। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার ৪টি সরকারী স্কুলে মর্নিং স্কুল খোলার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদিগকে আহ্বান জানাইলেন, তখন আমি স্বামীর ইংরাজি বাংলা দৈনিক গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়মকানুন একটু শিথিল করিয়া অনমুমোদিত স্কুলগুলিকে সাময়িকভাবে অনুমোদিত করিয়া লইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। এমন কি বহুল প্রচারিত দুপ্তাহের পত্রিকা ১৩৫৪, ২৪শে মাঘ তারিখের সম্পাদকীয়তে উক্ত বিষয়ের উপরে আমার প্রস্তাবের সমর্থনে মন্তব্য করিয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গতঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে আমার স্কুলের উপযুক্ত বাড়ীর জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ চিঠির কোন জবাব পর্যন্ত মিলে নাই। "দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কিসে?" বর্তমানে সরকারের আদেশ "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"-এর মত। তবে প্রত্যারণামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহার দ্বারা বিদ্যার ফসল কিছুই ফলিতেছে না, কিন্তু সার্টিফিকেট বা ডিগ্রোমার ভোজবাজীর মেলা অবাধে চলিতেছে, যে সকল প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ-ব্যবস্থায় সুস্থ জ্ঞান-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই আপত্তি করিবেন না, বরং উহাকে স্বাগত জানাইবেন। সরকার যদি কমিশন বসাইয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, অন্য রকমের প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের শিক্ষা প্রসারের জন্য কি ত্যাগ স্বীকার, কি উপকার করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে তাঁহারা সরকারের নিকট হইতে শাস্তির পরিবর্তে প্রশস্তিই পাইবার যোগ্য হইবেন, আশা করি।

Victor Hugo যথার্থই বলিয়াছেন 'he who opens a school, closes a prison. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন বিধান তৈয়ারী করিবার সময় এই কথাটি স্বতঃই মনে আসে।

"গোড়ায় গলদ"

হক কথা। শিক্ষা, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা। এই শিক্ষাস্তে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে হলে চাই উপযুক্ত শিক্ষক। উপযুক্ত শিক্ষক পেতে হলে চাই উপযুক্ত অর্থ—অর্থাৎ টাকা। যে কোন একটা সুন্দর জিনিষ দেখলেই বুঝতে হবে—এই সুন্দরের পেছনে নিশ্চয়ই কোন না কোন অর্থ ব্যয় হয়েছে।

উপযুক্ত শিক্ষক পেতে হলে চাই টাকা! এ আবার কি প্রশ্ন? কেউ কেউ বলবেন উপযুক্ত শিক্ষিত, আদর্শ এবং উচ্চ মন না থাকলে—টাকায় কি ওসব পাওয়া যায়? হয়তো যায়। কারণ আজ যদি কোন প্রাথমিক শিক্ষক (তিনি সর্ববিষয়ে পণ্ডিত) টাকার কথা চিন্তা না করে, পারি-পার্শ্বিকের প্রতি লক্ষ্য না করে "নিজের কাজ" চালিয়ে যান—বাড়ী ফিরে গিয়ে হয়তো তাঁর স্ত্রী তাঁকে খেতেই দেবেন না। অর্থাৎ দেহের পুষ্টিকর খাদ্য দিতে পারবেন না।

ঢাক বাজানো কথা—"প্রাথমিক শিক্ষাই উচ্চ

শিক্ষার ভিত্তি—শিক্ষক গড়ে তুলতে হবে—ছাত্র গড়তে হবে—বিদ্যালয়ের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি একান্ত দরকার—পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেন সর্বসুন্দর হয়।" আরও কত কি! কিন্তু হয় কি করে? পথ কোনখানে?

দেশকে যদি বাঁচাতে হয়—শিক্ষা ছাড়া তা হতে পারে না। শিক্ষাকে যদি বাঁচতে হয়—শিক্ষককে বাঁচতেই হবে। ক্ষুধিত পাষাণের মত শিক্ষকের আজ কিছুই নাই। অর্থের তাগিদে ওঁকে ভুলতে হয়—ওঁর কাজ—ওঁর আদর্শ। আমরা বড়ই কেবল চেঁচাই না—শিক্ষককে গড়তে হলে চাই উপযুক্ত অর্থ।

কিন্তু পুরোপুরি বলতে পারি না যে, মূল কাইভাদে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ শিক্ষকগণের সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞান আছে। হয়তো তাঁদের অনেকেই অশুভকর্মা। তাঁরা হয়তো যথেষ্ট ভুল করেন। অনেক কিছু হয়তো করে উঠতে পারেন না। এঁদের বিচার করবেন কর্তৃপক্ষ।

১. আজকাল শিক্ষককে সমাজ সম্মান দেয় না।

২. ছাত্রও শিক্ষককে সম্যক শ্রদ্ধাসনে চিন্তা করতে পারে না। শিক্ষকও ছাত্রকে শিষ্যজ্ঞানে গ্রহণ করতে পারেন না।

এ সবের কারণ জানতে হলে—একান্ত এবং শেষ চিন্তা করলে দেখা যাবে—বিষ ঠিক এক জায়গায় রয়েছে। বিষ হলো সেই টাকা—অর্থ। অর্থের অভাব যত গোল।

কর্তৃপক্ষ যদি এই অর্থের অভাব দেখান—তাহলে তাঁর গলায় দড়ি। আমরা সাধারণ মানুষ যা জানি বা যা বুঝি তাতে যে কর্তৃপক্ষের কোন আর্থিক অভাব আছে তা বুঝি না। এবং তা স্বীকার করি না। কারণ—ওঁকে কিসে কিসে টাকা সাহায্য করতে হয় সে কথাই জানতে চাই। আমরা কি দিই না? আমরা সমস্ত অর্থই ঘরে নিয়ে চলেছি—অথচ আমাদের শিক্ষায় অর্থাভাব পড়বে কেন? একমাত্র জানি হাসপাতাল আর প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতেই যা লাভহীন যজ্ঞ করতে হয়। তাছাড়া সব জায়গাতেই বিনা লাভে যজ্ঞ করতে হয় না। তথাপি যদি একটা দেশ—একটা জাতি —প্রাথমিক শিক্ষা সম্যকরূপে চালাতে না পারে তবে তাকে দেশ বা জাতি বলি কোন লজ্জায়?

শিক্ষকের সম্মান? মর্যাদা? প্রতিষ্ঠা? এসবের মূল কোথায়? এ কথা সকলেরই জানা উচিত—"সারে ধান অর্থে মান।" সার দিলে জমিতে ফলন বাড়ানো যায়—অর্থ থাকলে মানুষের সম্মান বাড়বেই। প্রহ্লাদ রাজাকে আমরা কি করে অবহেলা বা অপ্রমাণ করি? তবে যেমনি একটা প্রস্তরময় ভূখণ্ডে বিনা কর্ষণে, পাথর উৎপাদন না করে যতই সার ঢালা হোক না কেন ফলন কোন দিনই হবে না—০০০। তখন ফলনের কথা উঠলেই —হয় পাথরকেই বলতে হবে না মশাই আমার দ্বারা সার খাওয়া হবে না কিংবা সারদাতাকে মিলে থেকেই বলতে হবে আর সার দেওয়া হবে না।

হয়তো বলা যায় না—এই একটু কথার মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত গূঢ়ার্থ নিহিত রয়েছে।*

* জনৈক পাঠকের লেখা। যার একাশ করেননি।—সা

গান্ধী প্রয়াণ দিবসের আত্মচিন্তা

শ্রীকামদা গোপাল বাগচী

আজ সত্তের বছর হল গান্ধীজী পরলোক গমন করিয়াছেন। জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর তাঁহাকে আন্তর্জাতিক কলহলিপ্ত প্রধান দুইটি সম্প্রদায়কে লইয়া বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। পূর্বতনদের সূত্র ধরিয়া এবং অন্যান্যদের সহকারীতায় তিল তিল করিয়া ভারতকে তিনি গড়িয়া তুলিতেছিলেন। ভয়-বিহ্বল বৈরাশ্যজনক রাজনৈতিক পরিবেশে তিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম দেশের উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলকেই এক সংযোগ সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। ভয় পরিহার করিয়া দীর্ঘদিনের অবসাদ অবতরণের মধ্য দিয়া সমস্ত জাতিকে বন্ধু হইতে, নির্ভীক হইতে ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে শিখাইয়াছিলেন। এগুলি এক দিনে হয় নাই। গোপনতা পরিহার করিয়া উন্মুক্ত রাজনীতির যে পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন সত্যাগ্রহের সঙ্গেই তাহার তুলনা চলে। শ্রীগৌরাঙ্গের এই সত্যাগ্রহ সীমিত ক্ষেত্রে সাময়িক প্রয়োজনে আবদ্ধ ছিল, ফল যদিও সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। গান্ধীজী কিন্তু তাঁহার আন্দোলনের আওতায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক জীবনই নয় সমগ্র মানবের পরিপূর্ণ দিনচর্যাকেও আনিয়া ফেলিলেন। এই বিষয়টি আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। রাজনীতির জন্য রাজনীতি অথবা পেশাগত রাজনীতির একটা ধারা পৃথিবীর বহুদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার নিজস্ব একটি মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। সেই ধারার আশ্রয় লইয়া গান্ধীজীও ভারতে পেশাদার রাজনৈতিকদের একটি শ্রেণী গড়িয়া তুলিতে পারিতেন, যাহাদের সাহায্যে তাঁহার আন্দোলন পরিচালনা আরও সহজসাধ্য হইত। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের করায়ত্ত হইলে ও তাহারা বিপথগামী হইলে দেশের অবশিষ্ট জনগণ যদিও তাহারা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ—সেই বিপথগামী সঙ্ঘকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। ইহা ভিন্ন আরও একটি অসুবিধার কথাও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছলে বলে বা কৌশলে যদি রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে আয়ত্তে আনিতে পারে, অবশিষ্ট দেশবাসীর তখন প্রতিরোধ করিবার মত কোন পথ থাকিবে না, তাই তিনি গণ-আন্দোলনের পথ বাছিয়া লইলেন।

ঐ পথ বন্ধুর, পূর্ব দৃষ্টান্তবর্জিত ও অগণিত নরনারীকে লইয়া অসহযোগে পরিক্ষেপিত। অসীম ধৈর্য, বিপুল উদ্যম ও অনমনীয় অধ্যবসায় লইয়া জনগণকে উন্মুক্ত সংগ্রামের পথে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, এই পরীক্ষা যখন বহুদূর আগাইয়া গেল, যখন হইল স্বাধীনতার স্পৃহা অন্য সকল আশা আকাঙ্খাকে তুচ্ছ করিয়া বহু দূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, ঠিক সেই সময় গান্ধীজী ভারতবাসীর কাছে চরম আঘাত পাইলেন। ১৯৩০-৩১-এ আমাদের পথরোধ করিয়াছিল জাতিভেদ, ১৯৪৬-৪৭-এ দুস্তর প্রাচীর হইয়া দেখা দিল সম্প্রদায় বিভেদ। গান্ধীজীর একান্ত বিশ্বাস ছিল, ভারতবাসী—তা সে যে কোন সম্প্রদায়েরই হোক না কেন—কতকগুলি মূল ভিত্তির উপরে জীবনকেপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—পঞ্চশীলের ভিত্তি।

সে কাহাকেও ঈর্ষা করিবে না, কাহাকেও আঘাত করিবে না। পর-দ্রব্যে লোভ, অসত্য কথন ও পরিগ্রহ ভারতবাসীর ইষ্টের বিপরীতপন্থী। এই কাঠামোতে গড়িয়া উঠা ভারত সন্তান হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসিক বা অপর কোন ধর্মাবলম্বী, একে অন্যকে অবিশ্বাস, অপ্রীতি বা ঘৃণার চোখে দেখিতে পারে না। সৌধীন মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই যে গান্ধীজী এরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, ভারতের প্রাচীন বিপুল জনসমষ্টির সঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত একটি সংযোগ ছিল বলিয়া এই প্রত্যয়ের উপর তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে তিনি কোনদিনই আস্থার সঙ্গে দেখেন নাই, তাহাদেরই অবহেলে দৈর্ঘ্য হারাইল, ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিখণ্ডিত হইল।

শুধু ভারত নহে, গান্ধীজীর হৃদয়ও চৌচির হইয়া গেল, অন্ধকার যে রক্তা নামিয়া আসিল তাহার বর্বরতা হৃদয়ের সমস্ত কীর্তিকে ছাপাইয়া গেল, কেহ আগে, কেহ পরে,সকলেই এই তাণ্ডবে ঝাঁপাইয়া পড়িল। চোখের সামনে প্রেতের নৃত্য দেখিয়া গান্ধীজী মর্মাহত হইলেন, দিশেহারা হইলেন। নোয়াখালিতে তাঁহাকে বলিতে শুনা গেল যে, অন্ধকারে তিনি পথ দেখিতে পাইতেছেন না—আলোর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। সেই সন্ধান কিন্তু আততায়ীর আঘাতে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। এই সত্তের বছর ধরিয়া উত্তর পুরুষেরা আজও সে রশ্মি পাইলেন না। এখনও ত্যাগগত, সম্প্রদায়গত, দলগত বিদ্বেষে কখনও প্রচ্ছন্নভাবে, কখনও উদ্ধত অবস্থাতে সংঘাত বাধিয়া যাইতেছে। দিন দিন রাজনৈতিক ক্ষমতাও কুক্ষিগত সম্প্রদায়ের হাতে সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। সমাজসেবা ও আত্মিক উৎকর্ষের মান মূল হইতে মূলতর হইতে চলিতেছে। আজ তাই সংশয় জাগে গান্ধীজী যে রশ্মির সন্ধান অপূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা কি তাহা সম্পূর্ণ ক'রতে পারিব? অথচ ইহাও সুনিশ্চিত যে—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শিক্ষা

মহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৭১ | ৫ম সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষক বেতন ও দুর্মূল্য ভাতা

উত্তর প্রদেশে সাংবাদিকদের সম্মুখে অর্থমন্ত্রী শ্রীকমলাচারি নাকি বলিয়াছেন, শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা যে বড়ই শোচনীয় তাহাতে দ্বিমত নাই, কিন্তু করি কি? এই ঘাটতি পূরণ করিব কোথা হইতে? না হইলে আমার কোনও আপত্তি থাকিত না। কিন্তু কথাটা খুব মনে ধরিতেছে না। যদি প্রয়োজন হয় তবে পূরণ করিতেই হইবে। রাজ্যের হিতার্থে টাকার জোগাড় করিতেই হইবে। কোথা হইতে আসিবে তাহা কর্তাদের বিবেচনা সাপেক্ষ। রাজ্য যাহারা পরিচালনা করিতেছেন তাঁহারাই দেখুন।

সঙ্গে সঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন, দুর্মূল্য ভাতার মূলোচ্ছেদ হইতেছে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী বলিতে পারি, জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যাইতেছে ও আরও কমিবে। সুতরাং দুর্মূল্য……

শিক্ষা কমিশনও নাকি এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।

স্মরণে

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যিকদলে শুধু নয়, শিক্ষকদলেরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সাহিত্যে তাঁহার কাব্য শক্তির পরিচয় যেমন স্পষ্ট এবং আন্তরিক উৎসারিত অকাতর ছিল, আবৃত্তিও ছিল তদনুরূপ, মধুর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাহার একটা সামঞ্জস্য ছিল। Imitation of Christ তিনি বহুপূর্বে অনুবাদ করিয়াছিলেন ইসলামী ভারত সরকারের মহায়া গান্ধীর লেখাবলী অনুবাদেও তাঁহার যোগ ছিল। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন। এবং সেদিনের স্মৃতিকথাও আমাদের শিক্ষার মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

সাবিত্রীপ্রসন্নের সহযোগিতা হইতে শিক্ষা বঞ্চিত হইল, কিন্তু তাঁহার উদার মনের স্পর্শ শিক্ষাকে জীবনের স্বাদ দিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরস্পর আলাপে বুঝিয়াছি, আদর্শবাদী সাবিত্রীপ্রসন্ন আমাদের শিক্ষার মনের অনেক নিকটেই আসিয়াছিলেন। এ জীবনের কঠোর ভিক্ততা তাঁহার মনের মাধুর্য নষ্ট করিতে পারে নাই।

অতঃ কিম্

শিক্ষক দৈনন্দিন অবসান হওয়ায় পরীক্ষাধি দিবিয়ে হইতেছে, ইহা অতিশয় আশ্বাসের কথা। এখন সকল পক্ষেরই দেখা উচিত, জাতীয় জীবনের এই দুর্লক্ষণ আর যেন না দেখা দেয়। শিক্ষার অনেক সংকট আছে—উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব, ভাষার মাধ্যমের অসুবিধা, প্রাচীন ও বর্তমানের সমন্বয়ে ব্যর্থতা, রুগ্ন ছাত্রছাত্রী ও ভগ্ন স্বাস্থ্য শিক্ষক লইয়া শিক্ষাকার্য পরিচালনা, তাহার উপর এই দুর্ঘট-সংকট আসিয়া সমস্যাগুলি আরও জটিল করিয়া তোলে। এ তো দুর্দৈব নয়, একেবারে শিক্ষাবিরতি! সুতরাং হাওয়া অনুকূল ভাবে বহিতেছে, এ কথাই আমরা জানিতে ও বিশ্বাস করিতে চাই।

সুলভে পাঠ্যপুস্তক

আমাদের বহু পুস্তক পরিপ্লাবিত দেশে সুলভে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার কোনও ব্যবস্থা ছিল না, যদিও তাহার প্রয়োজন অত্যধিক। পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরী দিয়া কোনও কোনও অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান পত্তন দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইল সংগ্রহ ও বিতরণের কাজ। রচনা ও প্রকাশ করিয়া পাঠ্যপুস্তকের মূল্য সুলভতর করা আরও কঠিন কাজ এবং নূতন কাজ। এদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আমাদেরই সাহায্যে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা মোটের উপর সুলক্ষণ। প্রশাসন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, রসায়ন, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের এবং যুক্তরাষ্ট্রের ও ভারতবর্ষের বিশেষজ্ঞের দ্বারা যুক্তভাবে সমর্থিত পুস্তকগুলি উভয় দেশের যুক্ত চেষ্টায় সুলভমূল্যে বিক্রয় হইবে।

কত সুলভ, তাহা অঙ্কের ব্যাপার। যেমন, ভূতত্ত্ব বা Geology—৩১৮ পৃঃ ও ৪২৮ পৃঃ দুই খণ্ড ১০৲ হিঃ। আমেরিকান সংস্করণ ১ম খণ্ডের দাম সাড়ে সাত ডলার, ২য় খণ্ডের নয় ডলার। মোট সাড়ে ষোল ডলার। সাড়ে চার টাকা ডলার হিসাবে ৭২৲। বাহাত্তর টাকার বই কুড়ি টাকায় পাওয়া যাইবে।

সংযুক্ত রাষ্ট্রের "শান্তির খাত" বরাদ্দ অর্থ ভাণ্ডার হইতে কিছু পরিমাণ সাহায্য করিয়া এইরূপ ধরে পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে ব্যয় সঙ্কোচ এই ধারে সম্ভব হয় নাই। ১৭টি ভারতীয় প্রকাশন সংস্থার এই পরিকল্পনায় যোগ দিয়াছে। পূর্বাঞ্চলের মধ্যে (উড়িষ্যা, আসাম, বিহার ও বাংলা দেশের) শতাধিক পুস্তক ভাণ্ডারের সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে। এই উদ্যম প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। পূর্বাপুরি ভারতীয় হইতে পারিলে আমরা আরও সুখী হইতাম। আমেরিকার সুপরিচালন উদ্যম হইতে আমাদের শিখিবার অনেক কিছু আছে—ইহা তাহার মধ্যে একটি।

অভিনন্দন

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার শিক্ষায় বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বিহারের মজঃফরপুর জেলায় এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করিয়া পড়াশুনা ছাড়েন নাই, বরং আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলায় তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক আছে। ভাষাতত্ত্বেরও উপর অধিকার আছে। তাঁহার ঐতিহাসিক চার্চ পূর্বেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এতদিন পরে তিনি নূতন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সসম্মানে পাস করিতে পারিয়াছেন, এমন কি যাহাতে আরও পড়িতে পারেন এবং গবেষণাও করিতে পারেন, সেজন্য বৃত্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি অকৃতদার, অন্য কোনও বালাই নাই, মাতা সরস্বতীর অর্চনায় নিবেদিতপ্রাণ। তাঁহার আদর্শের ও সাধনার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার সারস্বত জীবন সফল হউক।

শ্রীঅরবিন্দ ও কর্ম সাধনা

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

একটি যুবককে কোনো বেসিক কলেজে ভর্তি হতে সাহায্য করেছিলাম। সে গ্রামের স্কুলে লেখা পড়া ক'রে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করে। তার পিতা গ্রামের একজন ক্ষৌরকার। ছেলেটি শৈল্পিক ব্যবসায় শিখেছে। তার সঙ্গে আমার কথাবার্তায় দাঁড়ালো: সে কলেজ থেকে বেরিয়ে মাষ্টারি করবে কিন্তু আজ ব্যবসায়ে ইস্তফা দেবেনা। কলেজে সে ভর্তি হোলো। একবার এসে আমার চুলও ছেঁটে দিয়ে গেল। পরের বারে দেখলাম, চুল ছাঁটতে ছাঁটতে এ-দিক ও-দিক ঘন ঘন চাইছে। তার কলেজের কয়েকজন সহপাঠিনী আমার বাড়ীতে আসছে। তাদের কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়। কাঁচি খুব দ্রুতবেগে কাজ করে চলেছে। কাজটা বোধ হয় চক্ষের নিমেষে শেষ করলে বাঁচে। দাড়ি কামাতে গিয়ে গালে তার হাতের একটু আধটু ঠেলাও খেলাম। আগের সেই সমর্পণের ভাবটা যেন নেই, পরিবর্তে এসেছে একটা সঙ্কোচের ভাব।

কলেজে পড়ার অর্থ কি তা হ'লে নরসুন্দর সম্বন্ধকে বদলেছে? গ্রামে এখানে ওখানে সে স্বচ্ছন্দচিত্তে কামিয়ে বেড়াতো। এখন সে বোর্ডিং-এ বাস করে, তরুণী সহপাঠিনীদের সঙ্গে বসে অধ্যাপকদের কাছে পাঠ নেয়, সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে দিন কাটায়, কলেজের নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তার বিদ্যা কতখানি আগিয়েছে, বলতে পারিনে। তবে বিদ্যার অভিমান এসেছে বলে মনে হোলো। এখন তার সহপাঠী আর সহপাঠিনীদের সামনে কাউকে ক্ষুর ধরে কামিয়ে দিতে সে রীতিমতো একটা লজ্জা অনুভব করে। সে তার প্রতিশ্রুতি ভুলেছে। আমার সঙ্গে আর তার দেখা হয় না।

ভ্রমের মহিমা আমরা মঙ্গলের বুদ্ধি দিয়ে হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছি, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে এখনও সঞ্চারিত হবার, বোধ হয় বিলম্ব আছে। এখনও আমাদের দৃষ্টিতে সেই স্বচ্ছতা আসেনি যে-স্বচ্ছতা এলে আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নুইয়ে পড়বে মাঠের চাষীদের পায়ে। কাস্তে আর কুড়ুল, কর্ণিক আর করাত, কোদাল আর গাঁইতি নিয়ে যারা পৃথিবীতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে গাড়ী চালাচ্ছে, বাড়ী তুলছে, পাহাড় কেটে পথ বানাচ্ছে, অরণ্যকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফসলের প্রচুর্য আনছে—তারাতো আমাদের এই নয়া পৃথিবীর সৈনিক। এই সৈনিকেরাই তো, এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর William Jamesএর ভাষায় Our Sustaincre, the very parents of our life. বিখ্যাত মার্কিন কবিক শ্রেষ্ঠ যাঁকে ভাষায় যা বলেছেন মার্কিন কবি হুইটম্যান I hear America Singing কবিতায় কাব্যের ভাষায় সেই একই কথা বলেছেন! মুজনেরই কণ্ঠে শ্রমের মহিমা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

গান্ধী বনিয়াদী শিক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁর দেশবাসীদের তিমিত জীবন ধারায় আমূল চেয়েছিলেন একটা বিরাট কর্মচাঞ্চল্য। জীবন্মৃত গ্রামগুলিকে তিনি করতে চেয়েছিলেন এক-একটা প্রাণচঞ্চল মৌচাক। কিন্তু বিগত বিত্তাগ্নী দারিদ্র্য কেমন ক'রে রূপান্তরিত হবে সম্পদের প্রাচুর্যে যদি 'শিবস্তং কুরু কর্ম্ম ত্বং' গীতার এই বাণীকে জীবনে আমরা অনুসরণ না করি। সমাজের সম্পদ উৎপাদনের মহাযজ্ঞে আমরা প্রত্যেকেই যদি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকি তবেই শুধু সমাজ উৎপন্ন সম্পদরাশিতে প্রত্যেককে অংশ দিতে পারে।

আর কোন সর্তেই দারিদ্র্যকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা সম্ভব নয়।

অবশ্যই শ্রম বলতে শুধু কায়িক শ্রম বোঝায় না। মানসিক শ্রমও শ্রম এবং তার মূল্যও প্রচুর। কেজো লোকেরা যাই বলুন না কেন, "this world is after all absolutely governed by ideas" —এবিষয়ে সত্যদ্রষ্টা মনীষীরা একমত। পৃথিবীকে বার্নার্ড শ' বলেছেন The home of the slaves of reality. মর্ত্যভূমির মানুষ আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণার দাস, দেহের ধর্ম পালন না করে আমাদের উপায় নেই, ক্ষুধা চাবুক মেরে আমাদের স্বপনচারী মনকে বাস্তবে টেনে আনে, মাঘের রাতে প্রচণ্ড শীতের কাপুনিতে আমরা ঈশ্বর-চিন্তা ভুলে যাই, দাঁত কন্‌কন্ করতে থাকলে রবি ঠাকুর ভালো লাগে না। খালি পেটে ধর্ম হয় না—যুগের কানে এই কথাটি উচ্চারণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যের বস্তুতান্ত্রিকদিগকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ক্ষুধার্তের অর্ঘ্য ভারতবর্ষের হাতে চরকা দিয়ে আদর্শবাদী গান্ধীও নিজেকে বাস্তবধর্মী প্রমাণিত করেছেন। চরকার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে গীতার কর্মবাদেরই জয় গান ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। চরকা-চালানোর মধ্যে রয়েছে কায়িক শ্রম। সেই শ্রমে যে সুতা উৎপন্ন হচ্ছে তাতে বাবলম্বী পরিবারের নগ্নতা ঘুচছে। কবির আশ্রয়ে যদি কুশিবৃত্তি হয় এবং যদি নিজের আশ্রয়ে যদি বস্ত্র সমস্যার সমাধান করতে পারি তবেই তো মন বাস্তবের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে উচ্চতর চিন্তার আকাশে ডানা মেলতে পারবে! পৃথিবী যতদিন পৃথিবী থাকবে এবং মর্ত্যের ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত, শীতার্ত মানুষ যত দিন বস্তুর দাসত্ব করবে ততদিন বেঁচে থাকার নিষ্করুণ তাগিদে কায়িক শ্রমকে স্বীকার না করে আমাদের গত্যন্তর নেই।

কিন্তু শুধু বাঁচার জন্যে বেঁচে থাকার একটা জান্তব অস্তিত্বের মধ্যে আমাদের চিত্ত দিনে দিনে শুধু ক্লান্তিই জমিয়ে তোলে। মৃত্যুর ছায়ায় আমাদের ভোগের দৌড় আর কতদূর পর্যন্ত সম্ভব। জীবন নিশায় একটা স্বপন, সবটাই যেন একটা তোলবাজি —এই রকমের একটা অনুভূতি আমাদের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত হয়ে যায়। ক্ষণভঙ্গুরের কীর্তি-নাশার কূলে দাঁড়িয়ে আমরা স্বতঃই তখন বাহুবৃত্তিকে বাড়িয়ে দিই এমন কিছুর পানে যাকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারেনা, যা অনন্ত। আমাদের মর্মের গভীরে এই অনন্তের জন্যে রয়েছে একটা নিবিড় আকুতি। উৎকৃষ্ট কাব্যে অন্তরের এই গভীর আকুতির পরিতৃপ্তি। সেক্সপীয়ারের বা ইবসেনের নাটকগুলি অথবা রবীন্দ্রনাথের বা ব্রাউনিং-এর কাব্য-গুলি পাঠ করবার সময়ে শক্তির সুষমাময় প্রাচুর্যের পরিচয়ে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। আনন্দের একটা নূতনতর বিস্তার, ভাবের একটা অভিনব রাজ্য আমরা আবিষ্কার করি। উচ্চস্তরের সাহিত্যের সংস্পর্শে অনন্তের একটা অনুভূতি আমাদের মর্মের গভীরে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কবির মর্মের গভীরতম অনুভূতির অভিব্যক্তি প্রকাশ ভঙ্গিমার যাদুকে আশ্রয় ক'রে মানুষের চিরকালের সম্পদে পরিণত হয়। সে কাব্য আমাদের অবগুণ্ঠিত আত্ম-কেন্দ্রিক জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে মহাজীবনের কল্লোলধ্বনি বহন করে আনেনা, আমাদের প্রাচীর-ঘেরা সত্তাকে দিগ্‌দিগন্তে সম্প্রসারিত ক'রে দেয় না, মানুষের আসক্তি মোচনে সহায় হয় না সেই কাব্য খড়ের আগুনের মতোই দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে খপ করে নিবে যায়। 'ফাল্গুনী' নাটকে কবিশেখর কবিদের জীবনব্রতের ইঙ্গিত দিয়ে মহারাজকে বলছে: হ্যাঁ মহারাজ, আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য। 'আত্ম পরিচয়' গ্রন্থে এই কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে কবি বলেছেন, মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে···।

তবেই হোলো। খুব উৎসাহের সঙ্গেই আমরা

জীবন—চর্চার ব্রতী হবো। দৈহিক সত্তার একটা বিরাট মূল্য আছে। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্ এই সংস্কৃত বাক্যের উৎপত্তি মানুষের অভিজ্ঞতা থেকেই। সমস্ত উচ্চতর সাধনার ভিত্তি হচ্ছে দেহ। শ্রীঅরবিন্দ The Renaissance in India-তে ঠিকই বলেছেন: It is a great error to suppose that spirituality flourished best in an impoverished soil with the life half-killed and the intellect discouraged and intimidated. জীবন যেখানে পঙ্গু অভিনন্দ, প্রাণের বহ্নিশিখা যেখানে তিমিত সেখানে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ কেমন ক'রে সম্ভব? তাই শ্রীঅরবিন্দ আবার বলেছেন: There was never a national ideal of poverty in India as some would have us believe. ভারতবর্ষে দরিদ্রচর্চা কখনো জাতীয় আদর্শের গৌরব পায় নি। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে: অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ব্রতম্।

কিন্তু শারীরশ্রমের মহাত্ম্যের কথা লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ মানসিক শ্রমের কথা এসে পড়লো আর সেই সূত্রে জীবননাট্যে কবিদের ভূমিকার কথাও। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির কথা মনে রেখে এখন শারীর-শ্রমের শাস্ত্রীয় ভিত্তি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের একটা মূল্যবান মন্তব্য দিয়ে উপসংহার করতে চাই। তাঁর চিঠি-পত্রগুলি পড়তে পড়তে গ্রন্থমালার ষষ্ঠ খণ্ডের Sadhana Through Work অধ্যায়ে একটা চমকপ্রদ মন্তব্যে এসে আমার মন থমকে দাঁড়ালো। আর ঐ মন্তব্যই আমাকে এই প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করেছে। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন:

Of course the idea of bigness and smallness is quite foreign to spiritual truth. Spiritually there is nothing big or small. Such ideas are like those of the literary people who think writing a poem is a high work and making shoes or cooking the dinner is a small and low one. But all is equal in the eye of the Spirit—and it is only the spirit within with which it is done that matters. It is the same with a particular kind of work, and there is nothing big or small.

"অধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে কাজের বড়ো ছোট নেই। সাহিত্যিক লোকদের ধারণা একটা কবিতা লেখা কাজহিসাবে উচ্চস্তরের; পক্ষান্তরে জুতো তৈরী অথবা রাঁধুনিগিরি নিম্ন পর্যায়ের কাজ। কিন্তু আসলে পরমাত্মার দৃষ্টিতে সব কাজই সমান। কি রকম মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করি—সেইটাই হোলো বড়ো কথা। একটা নির্দিষ্ট কাজেরও মূল্য বিচারের মাপকাঠি হওয়া উচিত আমাদের মনোভাব। কাজের ছোট অথবা বড়ো ব'লে কিছু নেই।"

অরবিন্দ বলেছেন: যে-কাজই আমরা করিনে কেন, ষোলো আনা মন দিয়েই করা উচিত। কাজে সর্বপ্রথম দরকার নিষ্ঠা—সে অর্থোপার্জনের সাধনাই হোক অথবা ঈশ্বর লাভেরই সাধনা হোক্। ছোটো বড়ো সব কাজেই সেই পরম পুরুষকে সর্বদাই স্মরণে রাখাই গীতার নির্দেশ। কাজের মধ্যে যেন ফাঁকি ও আমার ভাবটা প্রবল না থাকে। পরিবর্তনের জন্যে আমরা যেন কাজ না করি। আত্মপ্রচার যেন কিছুতেই কাজের লক্ষ্য না হয়। ঈশ্বরের জন্যে, তাঁর আদেশ শিরোধার্য ক'রে আমরা কাজ করবো এই রকমের কাজই শুধু আধ্যাত্মিক দিক থেকে আমাদিগকে নির্মল রাখতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ এবং গান্ধীজীর চিন্তাধারার এইখানেই একটা বিরাট মিল খুঁজে পাই। টলস্টয়ের এবং রাস্কিনের শিষ্য ও গীতার পরম অনুরাগী কর্মযোগী গান্ধীর কাছে কাজের কোন ছোট-বড়ো ছিলনা। নিষ্কাম কাজ হ'লে সব কর্মই ঈশ্বরের পদপ্রান্তে আমাদিগকে পৌঁছে দিতে পারে। শ্রীঅরবিন্দও গীতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে একখানি চিঠিতে লিখেছেন: Any work can be done as a field for the practice of the Spirit of the Gita.

দিনের পর দিন

শিক্ষক শিক্ষিকাদের দিনের পর দিন কেটে যায়। কেমন করে কেটে যায়? বাড়ির থেকে ইস্কুল। ইস্কুলের কয় ঘণ্টার পর আবার বাড়ি। সেখানকার পরিবেশ—'তেল, নুন, লকড়ি'র হিসাব সবই তাদের রাখতে হবে। কারও জীবন, যে স্তরেই লোক হউন না কেন, শুধু বড় বড় কাজের ভাবনা দিয়ে এবং 'বড়' কাজ করেই কাটে তা তো নয়। জীবনের কোনও পথেই "শিখর হইতে শিখরে চরিব" না। চড়াই উৎরাই সব কাজেই আছে। শিক্ষকতারও তাই

একজন শিক্ষিকা, মনে করা যাক মেয়েটির নাম লক্ষ্মী, বয়স ২৫। শিক্ষক বৃত্তি স্বেচ্ছায় সে বরণ করে নিয়েছিল। শিক্ষিকাই সে থাকবে এই ছিল তার ভরসা বা আশা। প্রতিভার খরদীপ্তি না থাকলেও তার বুদ্ধি শুদ্ধি কম নয়, ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়াতে ও তাদের সঙ্গে থাকতে তার ভালও লাগে, ধৈর্যচ্যুতি হয় না। মাধ্যমিক স্কুলে কাজ সে বেছেই নিয়েছিল। বড়লোক হবে কি প্রভাব বেশি হবে এমন ভাবনা তার মনের কোনেও ছিল না। বারো থেকে ষোল বৎসরের মেয়েদের সে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতে ভালবাসতো।

বাড়ি ফিরে গিয়ে দিনের কাজকর্মের চিন্তা অনেকে ঝেঁটিয়ে ফেলেন। লক্ষ্মী কিন্তু তা করে না। সে সমস্ত হয় তার অবসরের সঙ্গী, মনে করে রাখার মত। সে সব চিন্তা তার ভাল লাগে।

পাঁচ বৎসর আগে তার বাবা তাদের ছেড়ে গেছেন। বিধবা মা ও ছোট ভাই—এঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব লক্ষ্মীর। বিয়ে তার হয় নি। লক্ষ্মী আশা করে আছে—করে তার ভাই মোহন বড় হবে, ভাল হবে, উন্নতি করবে, দশজনের একজন হয়ে পরিচয় দেবে? এখনও তার দাড়িগোঁফ হয় নি, বয়স হলে নিশ্চয় হবে।

মায়ের বয়সও হয়েছে, সম্প্রতি এক ধাক্কা রোগের আক্রমণ সামলিয়ে উঠেছেন। ইস্কুলে যাওয়ার আগে লক্ষ্মীকে গেরস্থালীর কাজ করতে হয়, রান্নাতেও হাত লাগাতে হয়। রান্না করতে তার ভালই লাগে। বড় পিটপিটে সে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তার খরদৃষ্টি। ইস্কুলে রওনা হওয়ার আগে সে ভাল করে দেখে নেয়, হেঁসেল ঠিক পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে কি না।

সকাল সকাল সে ইস্কুলে পৌঁছায়। বন্ধুরা, সহকর্মীরা, ছাত্রীরা সব জমায়েৎ হলে একটি প্রার্থনা ও একটি গান দিয়ে দিনের কর্ম আরম্ভ হয়। তার পর যে যার শ্রেণীতে চলে যায়—হয়া যাক, তার আজ সাড়ে চার ঘণ্টা পড়াতে হবে।

সর্বপ্রথমে তার ৭ম শ্রেণী নিতে হবে—মেয়েদের বয়স প্রায় বারো বছর। সকলেই বেশ চট্‌পটে, তাদের পড়াতে লক্ষ্মীর ভালই লাগে। তারা আবার ক্লাসে গণ্ডগোলও করে খুব, আজ লক্ষ্মীর খুব মাথা ধরেছিল বলে এতটা গণ্ডগোল ভাল লাগছিল না। কিন্তু সে কাউকে কিছু বলছিল না। যদি গণ্ডগোল থামাতে গিয়ে তাদের চোখে আনন্দের দীপ্তিটাও কমে যায়। ইংরেজীতে লেখা একখানি বই হল পাঠ্য, তার পক্ষে বইখানি নূতন নয়, এর আগেও সে দুই বৎসর এই বই পড়িয়ে এসেছে আর ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের মেয়েদের পক্ষে এই কাব্য-চয়নিকা বেশ সুখপাঠ্য। একটি কবিতা সে বেছে নিয়ে নিজে পড়ে, এবং পরে সে সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, মেয়েরা ঠিক ঠিক

উত্তর দিলে তার খুব ভালও লাগে। যারা ধীর তাদের একটু খাঁতানি দিতে হয় বৈকি। এই শ্রেণীতে যে ৪৫ মিনিট কেটে যায়, তা কাজের বলে মোটেই মনে হয় না। পড়াবার আনন্দই তার পুরস্কার।

তারপর দু মিনিটের ছুটি। এবার অষ্টম শ্রেণী। ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াতে হবে। স্টুয়ার্টদের রাজত্ব কাল। এখানে অনেক কয়টি বড় বড় মেয়ে আছে, গত বৎসর পরীক্ষায় পাস করতে পারে নাই, প্রাণ নাই, একতানে। লক্ষ্মীর চেহারার আর অন্ত নাই, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট প্রাণপাত পরিশ্রমের পরেও স্টুয়ার্ট রাজারা ভারতবর্ষের বহুদূরে ছিল তত দূরেই রইল! একটুও কাছে এল না। লক্ষ্মীর কেবল মনে হতে লাগল, এ সব মেয়েদের আর উচ্চস্তরে নিয়ে কি লাভ? পড়িয়েই বা কি লাভ?

তারপর ১৫ মিনিটের এক ফাঁক। টিফিনের ঘণ্টা—লক্ষ্মী সঙ্গে করে এনেছে স্যাণ্ডউইচ—আর ইস্কুলে পেয়ে গেল গরম গরম এক পেয়ালা কফি। স্যাণ্ডউইচ সকাল বেলায় নিজেই তৈরী করে এনেছিল।

এখন তার নিতে হবে একাদশ শ্রেণীর মেয়েদের—১৫।১৬ বছর বয়সের মেয়েদেরই। মোট ৩০ জন মেয়ে। তার ছাত্রীদের কথা ছেড়ে দিলে যে ৫।৬ জন অতি অনভ্যস্ত ছাত্রী তাদের জন্যই লক্ষ্মী বেশি ব্যস্ত।

তারপর তাকে যেতে হয় দশম শ্রেণীতে, ভারত ইতিহাসে মোগল যুগের কথা পড়াতে। তারা শাহজাহানের সময় পর্যন্ত এসেছে। লক্ষ্মী সপ্তদশ শতাব্দীতে দিয়ে যায়। আর মনে মনে ভাবে, মোগল যুগ যে একেবারেই আধুনিক সে কথা লোকে কেন বোঝে না?

এরপর বাকি থাকে আর একটি ঘণ্টা। দশম শ্রেণীতে ইংরেজি ব্যাকরণ। ব্যাকরণ তো কারো রোচেনা। লক্ষ্মীও দেখে, পদ-পরিচয় ও বিশ্লেষণ পড়িয়ে কোনও আনন্দ নাই। দিনশেষে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে মেয়েরাও, অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণে সকলকেই হটে যেতে হয়।

লক্ষ্মীকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, শিক্ষক হওয়ার সৌভাগ্য কেমন লাগছে? তবে সে নিশ্চয় আরও দুই ঘণ্টা পড়ানোর কথা কি রাত জেগে ১৫০ জন ছাত্রীর অনুশীলনী সংশোধন করার কথা তেবে উল্লসিত হয়ে না। কিন্তু পরদিন ভোর হতে না হতেই কাজে লেগে যাবে।

শিক্ষকতার পথে গোলাপ ফুল ছড়িয়ে নাই—কাঁটাও আছে বিস্তর, কিন্তু জীবনের কোন পথেই বা নাই? রস ও নীরসে—কর্তব্য ও আনন্দে—সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে শিক্ষকের জীবন। ঐ লক্ষ্মীর জীবনেরই মত।

———

পরীক্ষা—২

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পূর্ব প্রবন্ধে পরীক্ষকের গলতি সম্বন্ধে বড়-কর্তাদের 'আবিষ্কারের' কথা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কলেজী পরীক্ষার কথা, কাজেই অধ্যাপক-পরীক্ষকবৃন্দ এ বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইলে ভাল হইত। কেহ কিছু আলোচনা করিয়াছেন কিনা জানি না। বড় কর্তাদের নিকট তাঁহাদের হয়ত টিঁকি বাঁধা, কাজেই হক কথা বলিতে বা লিখিতে তাঁহারা অগ্রসর হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহা ছাড়া এখন ছোট কথায় আসি।

ছোট কথাই বটে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা, হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা—এই সব কথাই বর্তমানে নিবদ্ধ রাখিতে চাই। হয়তবা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি কৌতুককর কলেজী কথাও আসিয়া পড়িবে। এখন আর কিছু দেখিতে পাই না। শুনিয়াই যাহা কিছু আহরণ বা অর্জন করিতে হয়। পরীক্ষার কথা যতই শুনি গা-বমি বমি ভাব ততই জমিয়া উঠে। বিকাশ কি এইরূপই দাঁড়াইবে? উচ্চতর, উচ্চতর স্তরে দুর্নীতির ছড়াছড়ি। খবরের কাগজে এই দুর্নীতির কথা ছড়াইয়া পড়িতে এতটুকুও বিলম্ব হয় না। দুর্নীতি দমন বা বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুর্নীতির কথা এমন ফলাও করিয়া সাধারণের নিকট পরিবেশন করিলে ইহার প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ বোধ হয় যাহে না, এই সব কথা ক্রমে গা-সহা হইয়া যায়। মন তেমন তিক্ত-বিরক্ত হয় না। সাধারণে যদি বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় তাহা হইলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিপ্রধান-পরিচালিত সরকার বা শাসন প্রতিষ্ঠান কি করিতে পারে। তবে উপায় কি? তাহাই আলোচনার চিন্তাশীল লোকদের ভাবনা। উপরিতলে যখন দুর্নীতি, নিম্নতলেই বা তখন তাহা ছড়াইয়া পড়িবে না কেন? দেখিতেছি নিম্নতলেও এই দুর্নীতি যেন মহামারীর মত অতি দ্রুত পক্ষপুট বিস্তার করিতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় আধুনিক কালের পরীক্ষা। কথাটি বড় গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর অর্থব্যঞ্জক। মানুষ শৈশব হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়—তার যে-সে পরীক্ষা নয়, কঠোর হইতে কঠোরতর, কঠোরতম পরীক্ষা। সামান্য ভাবে বলিতে গেলে স্কুলের পরীক্ষাও এই পর্যায়ে পড়ে।

পরীক্ষা—কিসের পরীক্ষা? এতদিন আনিতায় ছেলেমেয়েরা পাঠ্য বই পড়ে। কিছু সময় অন্তর অন্তর উহার উপর তাহাদের পরীক্ষা হয়। বৎসরের শেষের যে পরীক্ষা তাহাই তাহাদের সমস্ত বৎসর কালের পঠন পাঠনের নিরিখ বা হিসাব নিকাশ। নিম্ন হইতে উচ্চশ্রেণীতে উঠিবার ক্ষমতা ইহার দ্বারা নির্ণীত হয়। স্কুলে এতদিন যাহা পড়িলাম তাহার শেষ পরীক্ষা সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানে—পূর্বে ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার একজন সাধারণ পরীক্ষকরূপে মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে পরীক্ষা গ্রহণের ভোল একেবারে পাল্টাইয়া ফেলা দরকার। আর এই ধারণা এখনও আমার মনে বলবৎ রহিয়াছে। তখন যে কারণে এই ধারণা জন্মিয়াছিল এখনও তাহা ঠিক রহিলেও নূতন কারণ মাথা উঁচাইয়া উঠিতেছে। সুতরাং যদি কর্তা-ব্যক্তিরা পরীক্ষা গ্রহণ রীতি না পাল্টান তাহা হইলে শিক্ষার মূলে তো কুঠারাঘাত করা করা হইবেই: অধিকন্তু, ভাবিতে দুঃখ হয়, ছেলেমেয়েরা জীবনের

বৃহত্তর ও কঠোরতর পরীক্ষার আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।

আজ অনেক বিষয়ই নূতন ঠেকিতেছে। জগৎ পরিবর্তনশীল। নিত্য নূতনের আবির্ভাব হইতেছে, আজ যাহা নূতন কাল তাহা পুরাতন হইবে। ইহা শাশ্বত রীতি। চৈনিদলের কথা আপনারা অনেকেই জানেন: "Old order changeth, yeilding place to the new" ইহা যেমন চিরন্তন সত্য তেমনি আরও চিরন্তন সত্য আছে। সত্যকথা বলা একটি রীতি। পূর্বেও এই রীতি ছিল, আজও ইহা আছে, পরেও থাকিবে। এই চিরন্তন রীতির ব্যত্যয় ঘটিতে দেখিলে কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে না বিষাদ জন্মিবে? চোখের সামনে যখন ছেলেমেয়েরা ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে দেখে—মিথ্যার জয় এবং সত্যের পরাজয়—তখন তাহারা কি ভাবিতে পারে? দুর্বাসার আদিকা হইয়াছে; আগে পাপে পূর্ণ ঘট ভরিয়া উঠিলে তবে তাহা ফাটিবার কথা শুনি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অধিকারীরা নাম-কা-ওয়াস্তে তদন্ত করিয়া যায়, থানা কোর্ট কাছারিতেও ইহা গড়ায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায়ই দেখা যায় কিছুই হইল না। প্রথমে পাড়া প্রতিবেশীর ধিক্কার ওঠে, কিন্তু এতাদৃশ বিপরীত পরিণতি দেখিয়া তাহারাও নির্বাক হইয়া যায়। কিশোর চিত্তের উপর এই সব ঘটনার প্রভাব কিরূপ পড়ে তাহা কেহ ভলাইয়া দেখিয়াছেন কি? ছেলেরা যখন দু'দশ জন মিলিয়া জটলা করে তখন তাহা শুনিবার জন্য গতি খানিকটা মন্থর করি যেরূপ আলাপ আলোচনা শুনি তাহাতে মনে হয় পাপের প্রতি ঘৃণা' যেন অবিলম্বে বাতুলের উক্তি বলিয়া গণ্য হইবে!

এ তো সাধারণ ভাবে কিছু বলিলাম। কিন্তু এই 'অসাধারণত্ব' পরীক্ষার ব্যাপারেও আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। আগে জানিতাম পরীক্ষা—অতীত বিষয়ের পরীক্ষা; এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় আজিকার দিনের পরীক্ষা—কে কত নকল করিতে পারে তাহার পরীক্ষা। এখানে একটি কথা কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিয়া লই। আমি দোষ ত্রুটির কথাই উল্লেখ করিতেছি; 'ভাল' ছেলেও আছে—হয়ত তাহাদের সংখ্যাই বেশী। দুর্নীতি এখনও তাহাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে' পারে নাই। যেমন তুমি, ইহাদেরও সমূহ বিপদ উপস্থিত। যাহারা পরীক্ষাকে অতীত বিষয়ের পরীক্ষা বলিয়া গ্রহণ করে (এবং অধিকাংশই, এখনও বিশ্বাস করি এই দলে) তাহারা নকল করার পরীক্ষায় ফেল ছেলেদের নিকট যেন হার মানিতেছে। দুর্বৃত্তেরা দলে ভারি নয়, কিন্তু তাহাদের জোট বেশি। কাজেই অনর্থক বেশি করিয়া ঘটায়। তাই তাহাদের কথাই আমরা সচরাচর অধিক শুনি। কিন্তু এই দুর্বৃত্তের দমন যা হইলে সমাজ রা কাড়ে না। 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' শুনিতে পুরাতন কথা হইলেও আজিও মনে হয় সত্য।

নকল করার হিড়িক বর্তমানে বড় বেশি আরম্ভ হইয়াছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা কেন্দ্র খুলিতে অনুরুদ্ধ হন এবং এই অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পারেন না। কেননা তাহা হইলে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ চটিয়া যাইবেন। আবার পর্ষদেরই বা দোষ কি। বিভিন্ন স্কুলেতো পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা চাই। কলেজ তো এখন সম্পূর্ণ আলাদা—উহার আওতার একেবারে বাহিরে। ওদিকে পরীক্ষার্থীরা ক্রমশই অসন্তোষের সৃষ্টি করিতেছে। তাহাদের দাবাইয়া রাখা আজ যেন স্কুল কর্তৃপক্ষের আর সম্ভব হইতেছে না। তাঁহারা দুই নৌকায় পা দেওয়ার ফলে অথৈ জলে যেন হাবুডুবু খাইতেছেন। কিছুকাল পূর্বে যেখা যাইত হলে বাদিয়াই ছেলেরা, অন্তত কতক দোট বাঁধা ছেলে সব তছনছ করিয়া দেয়। পরে তাহারা রাস্তায় বাহির হয়, ক্রমে দলে ভারি হইয়া এ-কেন্দ্র ও-কেন্দ্র চরাইয়া বেড়ায় এবং পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দানের বিঘ্ন ব্যাঘাত ঘটায়। সম্প্রতি ইহার খানিকটা প্রতিকার হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রেই

কিছু সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকে। বাহিরের অনধিকারীরা এতাদৃশ উপদ্রব করিতে আর ভরসা পায় না। কিন্তু বাহিরের ঐরূপ উপদ্রব বন্ধ হইলেও উহার রকমফের কিছু কিছু ঘটিতেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহিরে কতকগুলি ছেলে, এখন শুনিতেছি মেয়েও ভিড় করে, হল্লা করে, মনে হয় যেন বাজার বসিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কি?

আগে জানিতাম, এখনও শুনি, প্রশ্নপত্র বিলির দশ পনর মিনিটের মধ্যেই ইহা পুরা বা অংশ বিশেষ হল্লাকারীদের মধ্যে পাচার হইয়া যায়। তাহারা, তাহাদের তিনচারজন এক একে দিয়া উত্তর লেখায় এবং লিখিত কাগজের মধ্যে পাথর-কুচি চুকাইয়া ভারি করে ও সুতা দিয়া বাঁধিয়া ঢেলার মত হলের দিকে ছুড়িয়া মারে। শুনি তাহাদের নাকি নামের একটি কোড্ আছে যেমন যাহার নাম সুশীল তাহাকে ক্যাংলা বলিয়া ডাক দিয়া উহা ছোড়া হইল। মনে রাখিবেন মিনিট মাফিক একঘন্টা পরে এইরূপ ছোড়াছুড়ি সুরু হয়। যে সব স্কুলের চারিপাশে কম্পাউণ্ড বা ফাঁক আছে তাহাদের বালিকটা রেহাই। কিন্তু যে সব স্কুলবাড়ি একেবারে রাস্তা হইতে উঠিয়াছে তাহাদের তো নাজেহালের অন্ত নাই। সুষ্ঠু শান্তভাবে পরীক্ষার্থীর উত্তর পত্র লিখিবার অবকাশ কোথায়? শুনি একটি কম্-পাউণ্ড ওয়ালা স্কুল বাড়ির বাহিরে চারিদিক হইতে এত ঢেলা ছোড়া হইয়াছে যে, বরাবর কয়েকজন লোককে তাহা কুড়াইবার জন্য মোতায়েন রাখিতে হয়। আর পুরা দুই ঝুড়ি কাগজ বাঁধা ঢেলা কুড়াইয়া জড় করা হইয়াছে শুনিলাম। একটি ঘরের প্রকাশ্য এই সব হৈ হল্লোড়ের জন্য কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে!

বাহিরের হৈ হল্লোড়ের কথা প্রসঙ্গে আর দুই একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারি না। কেন্দ্রের কিছু দূরে শুনিয়াছি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ইংরেজী প্রশ্নপত্র লইয়া বসিয়া আছেন। ছেলেরা যা ঠিক ঠিক বলিতে গেলে কোন কোন পরীক্ষার্থীর অন্যায়ারি এক্সেন্টরা তাহার নিকটে বসিয়া উত্তর লিখাইয়া লইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু বরাদ্দ দুই টাকা বা তারও বেশি দিয়া যাইতেছে। অনেক কৌতূহলী ছাত্র ইহা দেখে এবং তাহার অভিভাবকের নিকট বলে। আরও শুনি কমার্সের একটি প্রশ্নপত্রে তিনটি অংক আসে এবং তিনটিই বড় কঠিন। একজন কমার্স বিশেষজ্ঞ কাছে পিঠে কোথাও বসেন আর এই অংকগুলি কষিয়া পাচার করিয়া দেয়। কমার্স বিভাগে ঐ কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দুইই কম। কাজেই কষা অংকগুলি পর পর চালাচালি হইতে বেশি অসুবিধা হয় নাই। ঐ বিশেষজ্ঞ পুরস্কার কি রূপ কি লইয়াছে বলিতে পারি না। বয়স্ক, প্রৌঢ়, প্রবীণ যাহারা তাহারা যদি এইরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত হয় তাহা হইলে অন্য পরে কা কথা।

পরীক্ষা কেন্দ্রের হল বা ঘরগুলির মধ্যেও বিপদ। বাহিরে তো ঐ হৈ হল্লোড়, ভিতরে কাগজপত্র চালাচালি, বইয়ের পাতা উল্টান, আলাপ আলাপন প্রভৃতির শব্দে কোন কোন ঘর সরগরম ও মুখর! এক একটি ঘরে দুই জন করিয়া 'ইনভিজিলেটর' বা তত্ত্বাবধায়ক থাকেন। তাহাদের উপর যে ভার তাহা যথাযথ পালন করিতে হইলে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। কখন কখন, পত্রিকায় পড়িয়াছি, কাহার কাহার জীবন সংশয় পর্যন্ত উপস্থিত হয়। কানি ছোড়া, দুর্বাক্য বলা, বাহিরে গিয়া শাসান এসব ত হামেশা ঘটিয়া থাকে। তাই মনে হয় আজ বহু তত্ত্বাবধায়ক হলে নিয়মমাফিক কর্তব্য করিতেও ভরসা পায় না।

এবার কোন কেন্দ্রের একজন তত্ত্বাবধায়ক সম্বন্ধে বড় কৌতুককর একটি ব্যাপার শুনিয়াছি।

কৌতুককর বলিদানে কিন্তু মারাত্মকও বটে। কমার্স বিভাগের পরীক্ষার্থীদের ভারি বিপদ। বড় বড়া তত্ত্বাবধায়ক তাহাদের ঘরে। প্রথমার্ধের পরীক্ষায় তো এই বিপদ হইল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের বেলায় যদি এইরূপ ঘটে তাহা হইলে পাশ করিব কিরূপে? অতিদূরে গিয়া একটি উদ্যোগী পরীক্ষার্থী বা তাহার "বন্ধু" ফুসে ফোন করিয়া দিল—"অমুক বাবুর স্ত্রীর কলেরা, সত্বর আসুন।" এই সংবাদে উক্ত তত্ত্বাবধায়ক হতদন্ত হইয়া দু এক টেলন দূরে বাড়ি ছুটিলেন। কিন্তু গিয়া দেখেন স্ত্রী তো পূর্ববৎ সবল সুস্থই আছেন। তাহাদের কেহ ওরূপ ফোন করেন নাই। তত্ত্বাবধায়ক ফিরতি গাড়ীতে চাপিয়া পুনরায় ঐ কেন্দ্রে আসেন এবং সব কথা কেন্দ্রাধ্যক্ষকে বলেন। শুনিয়া সকলেই তো অবাক। কে এই দু-কর্ম করিয়াছে খোঁজ পড়িল। শুনিলাম তাহার হদিস নাকি পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুষ্কৃতকারী তখনও তো ধরাই নাই এখনও সগৌরবে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। কলেজের পরীক্ষা-কেন্দ্র। কলেজ তিনটি ল্যাভেটারি বা শৌচাগার। অতিজ্ঞ কেন্দ্রাধ্যক্ষ প্রশ্নপত্র বিলির পরই রোজ শৌচাগারগুলির দিকে নজর দিয়া যান। এদিন দেখেন দুইটি খোলা কিন্তু একটি বন্ধ। প্রথমটা তেমন সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু প্রথম ঘণ্টা শেষ হইবার কয়েক মিনিট পূর্বে তিনি পুনরায় আসিয়া যখন দেখেন শৌচাগারটি ঐ সময়েও ভিতর হইতে বন্ধ তখন তিনি কড়া নাড়িলেন। ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল—"যাচ্ছি। একটু সবুর।" এবার জোরে কড়া নাড়া হইলে ভিতরকার নরপুঙ্গব দরজা না খুলিয়া পারিল না, বাহিরে আসিয়াই দেখে এক বর্ষীয়ান মুসলমান ব্যক্তি। দেখিয়া থ হইয়া গেল। ইনি কেন্দ্রাধ্যক্ষ, তৎক্ষণাৎ পুলিশের হেপাজতে এই ব্যক্তিকে রাখিয়া দিলেন। যুক্তি করিয়া কেন্দ্রাধ্যক্ষ একজন বেয়ারাকে ভিতরে রাখিয়া গেলেন। এবং তাহাকে দরজা বন্ধ সেখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিতে বলিলেন। প্রথম ঘণ্টা বাজিবার পরই পরীক্ষার্থী উপস্থিত এবং যথাযোগ্য উত্তর পাইবার আশায় দরজায় ধাক্কা দিল। কিন্তু হা হরি, খোলা হইলে দেখে অন্য লোক। বেয়ারা তাহার হাত খপ করিয়া ধরিল এবং পূর্ব নির্দেশ মত কেন্দ্রাধ্যক্ষের নিকট লইয়া গেল। এই রকম তো ব্যাপার! নকল করার ব্যাপার তো অহরহ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু অভিনবত্ব আছে বলিয়া এটি এখানে উল্লেখ করিলাম।

আরও কি বিপদ দেখুন। 'সিক বেড' বা রুগ্ন শয্যা বলিয়া একটা বস্তু আছে। যে সে পরীক্ষার্থী রুগ্ন তাহাদের জন্য কোন ঘরে আলাদা করিয়া বিছানা পাতিতে দেওয়া হয়; ইহার উপর শুইয়া বসিয়া পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্র লিখে। যাহাদের জলবসন্ত তাহাদের তো কথাই নাই। মশারী খাটাইয়া তাহার মধ্যে শোয়ান থাকে এবং উত্তর পত্র লেখে। একবার একটি কেন্দ্রে একজন পণ্ডিত শিক্ষাব্রতী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থী হইয়া 'সিক বেডের' আশ্রয় লইলেন। স্থানীয় লোকেরা অনেকে তাহাকে চেনেন। বলাবলি করিতে লাগিলেন, ইনি তো রোজ নিজে বাজার করেন, সময় অসময়ে বাহিরে ঘোরাঘুরি করেন—কিন্তু তিনিও 'সিকবেডে'। শুনি, যে দিন যে বিষয়ের পরীক্ষা সে দিন সেই বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক সেখানে গার্ড দিতেছেন। পরীক্ষার্থী শিক্ষক অংকে বড়কাঁচা। তাই অংকের দিন সকল অংকই তাহার জন্য কষিয়া দেওয়া হয়! এ কি কথা! শিক্ষক—শিক্ষাব্রতী তাঁহাদের যখন এই গর্হিত আচরণ তখন ছেলে পরীক্ষার্থীরা কি করিবে? আদর্শ আজ যে ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে তাহার মূল অতি গভীরে।

আরও অনেক কথা, কিছু কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। এখন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছেলে বুড়ো দুইই দেখিতে পাওয়া যায়। মূলে রীতিমত

পড়াশুনা করিয়া টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যাহারা পরীক্ষা দিতে আসে, পূর্বদের ভাষায় তাহারা রেগুলার; যাহারা ইরেগুলার তাহাদের টেষ্ট পরীক্ষায় বসাই নাই, কোন রকমে অতিরিক্ত ফের কিস্ জমা দিলেই পরীক্ষায় বসিবার অনুমতি পায়। শুনি যাহারা শেষোক্ত পর্যায়ের তাহাদের মধ্যে এই নকল করা অপকর্ম বেশি চালু। বেশি চালু হইতে পারে মানি। কিন্তু যাহারা স্কুলের রীতিমত পড়ুয়া তাহাদের মধ্যে নকল করার প্রবৃত্তি ক্রমশ এত অধিক বাড়িয়া যাইতেছে কেন? ইহার কারণ বিজ্ঞজন নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করিবেন। এখন আর একটি কৌতুককর ঘটনার কথা উল্লেখ করি।

একজন ঘুরন্ত তত্ত্বাবধায়ক হালিকটা কড়া। কিছুতেই দ্বিতীয় পর্যায়ের বয়স্ক পরীক্ষার্থীরা মুখ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। একজন তো আসন ছাড়িয়া হল ঘরের মাঝে আসিল এবং মুরুব্বি তত্ত্বাবধায়কের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, আপনি এবার বাঁচান, নহিলে আমার প্রমোশনের আশা নাই।

নকলকারীদের আর দুই একটি কীর্তির কথা বন্ধুবর আমাকে বলিলেন। আমি পূর্বেও ইহার কিছু কিছু শুনিয়াছি। যেমন ধরিবেন ফাইনাল পরীক্ষা নয়, ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষা। অংকের পরীক্ষায় অ্যালিজির ইনট্রুমেন্ট বক্সের সঙ্গে একটি স্কেল প্রত্যেক ছেলেই লইয়া যাইবার অধিকারী। একটি ছাত্রের মুখে শুনি, জনৈক পরীক্ষার্থী স্কেলের সাদা পিঠে খুব ছোট অক্ষরে পাঁচ ছটি উপপাদ্য, প্রতি পাদ্য টুকিয়া লইয়া যায়। সে ধরা পড়িয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে উক্ত ছাত্রটি নিজে ইহা দেখিয়াছে। এখন বন্ধুবরের কথায় আসি। ইতিহাসের প্রশ্ন কিরূপ সূক্ষ্ম-ধরণে লেখা যায় তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। ইহাতে যে সময়, পরিশ্রম ও সতর্কতা দরকার হইয়াছে তাহার সিকি অংশে এটি টাকা মুনফা করা যাইতে পারিত। একবার একজন পরীক্ষার্থী জনৈক নকলকর্ম পটিয়সী যুব ছাত্রের কথা বলে। সে নাকি তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টি এড়াইয়া নকল করিতে খুবই ওস্তাদ। ইতিহাসের দুই একটি প্রশ্নের উত্তর লেখা যখন বাকি তখন তাহার উপর তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টি পড়ে। যেমিল বেগতিক। তখন দু-এক মিনিটের মধ্যে কাগজপত্র গুছাইয়া উত্তর পত্র জমা দিয়া হল ঘর পরিত্যাগ করে। মধের উপরে লেখা, পায়ের তলায় লেখা এরূপ অনেক লেখা দায়। বন্ধুবরের আর একটি কথা শুনিয়া আশ্চর্য না হইয়া পারি না। জনৈক পরীক্ষার্থিনীর শাড়ীর আঁচলের নিম্নাংশে কতকগুলি অংক পেনসিল দিয়া কষিয়া আনা হইয়াছে। দেখিতেছি মেয়েরাও নকল কর্মে কম যান না। যাইবেনই বা কেন? মেয়েদের এতদিন সুনাম ছিল পারতপক্ষে তাহারা নকল করে না। কিন্তু এ সুনামও এখন সুদূরে চলিয়া যাইতেছে।

একবার জনৈক শিক্ষাব্রতীকে শুধাই, "মশাই, পরীক্ষার্থীরা নকল কর্মে এত পটু হয় কেমন করিয়া?" উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই—ছাত্রেরা নিচের ক্লাস হইতেই নকল করা শিখিতে থাকে। তাহাদের কোন অংক দিব, কেহ কেহ অপরের খাতা হইতে উত্তর টুকিয়া লয়। বুঝিয়া টুকিলে ক্ষতি থাকে না। কিন্তু ইহা করে ক'জনা। ট্রান্সলেশান ও অন্যান্য ব্যাপারেও এই রকম। শিক্ষক মহাশয় খেয়াল খুশি বলে হয়তো কখন কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিতে দিয়া বাহিরে গেলেন। অমনি বই খুলিয়া অনেকে তাহার উত্তর লিখিতে বসিল। ত্রৈমাসিক ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষাও নকলকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

সম্প্রতি আমার কর্ণে এই ধরণের আরও কিছু কিছু সংবাদ পৌঁছিয়াছে। মেয়েদের স্কুল। উপরের কোন একটি ক্লাসে পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকরণ ঘটিত প্রশ্নের উত্তর লিখিতে দিয়াছেন। তিনি

হয়ত চোখ বুজিয়া আছেন বা বাহিরে গিয়াছেন অমনি কতকগুলি মেয়ে ব্যাকরণ বই খুলিয়া উত্তর লিখিয়া ফেলিল। শুনিলাম যে, নম্বর নাকি তাহারাই বেশি পাইয়াছে! পণ্ডিত মহাশয় ইহাতে সন্দেহও প্রকাশ করিয়াছেন। আর একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিতেছি। এক শীরিয়ডের মধ্যে বাংলার পরীক্ষা। শিক্ষাব্রতী প্রশ্ন দিয়া ছাত্রীদের উত্তর লিখিতে বলিলেন। হয়ত উত্তর লিখিতে আধ ঘণ্টার মতো সময় লাগিবে। তিনি বসিয়া বসিয়া কি করিবেন? কমনরুমে চলিয়া যান। সকলের মহড়া পড়িয়া গেল। কতকগুলি ছাত্রী বই খুলিয়া উত্তর লিখিতে থাকে। ঘণ্টা পড়িবার আগে হাসনীরা শিক্ষাব্রতী ঘরে ঢুকিলেন এবং ছাত্রীদের নিকট হইতে উত্তরপত্র লইয়া গেলেন। মনে রাখিবেন, আমি এখানে ছাত্রদের মত ছাত্রীদের সকলকে দোষী করিতেছি না। ছাত্রছাত্রী উভয়ের মধ্যে ভাল মন্দ রহিয়াছে। দুরবোধও অনেকের মধ্যেই প্রবল। তবে নকলকারীরা কিরূপে এই দুষ্কর্ম অভ্যস্ত হইয়া থাকে তাহারই কথা বলিতেছি। শিক্ষয়িত্রীর কানে গেল যে, কতকগুলি মেয়ে নকল করিয়াছে। উত্তরপত্র দেখিয়াও তাহার মনে এই ধারণা দৃঢ়তর হইল। কিন্তু করিবেন কি? ভাল লেখায় ভাল নম্বর! এইরূপে প্রথমে হাতে খড়ি তারপরে তালপাতা কলাপাতা কাগজ এই রকম ধাপে ধাপে এই দুষ্কর্মের অনুশীলন চলে।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়ে গিয়াছি। একস্থানে বসিয়া আছি। সম্মুখেই কয়েক হাত দূরে চায়ের দোকান। ছেলেরা বসিয়া আড্ডা জমাইতেছে। একটি ছেলে বলিল, অমুকে এবার নির্ঘাৎ দ্বিতীয় বিভাগে পাস করিবে। শুনিলাম বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র। ছেলেটি বলিতে লাগিল—এমন ভাল করিয়া বইদেখিয়া লিখিয়াছে তাহাতে এবার তাহার দ্বিতীয় বিভাগে পাস হওয়া কেহই আটকাইতে পারিবে না। নকল করা বই দেখিয়া লেখা ইত্যাদি যে অপরাধ এই ধারণা ছাত্র ছাত্রীদের মনে যেন আজ আর দানা বাঁধিতেছে না। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই নকল করে না। কিন্তু সাধারণের মনে উরূপ মনোভাব বিস্তারলাভ করাতেই ভয়ানক জটিল অবস্থা সৃষ্টি হইতেছে। দুষ্কৃতকারীরা জব্দ থাকে তখনই যখন আসে অপর অধিকাংশ লোকের নিকট হইতে তাহারা সায় বা সমর্থন তো পাইবে না, তাহাদের ভাগ্যে ধিক্কার নিন্দা ভর্ৎসনা মিলিবে। কিন্তু তাহাদের এই ভয় আজ যেন সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। সাধারণের মনেও অপরাধের গুরুত্ব তেমন আর ধরা দিতেছে না। এইখানেই তো আসল সমস্যা। ইহার প্রতিকারের উপায় কি? পরীক্ষা রীতির গতানুগতিক হালচালের আজ পরিবর্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বন্ধুবর হয়ত বলিবেন, ভাল ছেলে, নীতিজ্ঞান সম্পন্ন ছেলেও তো আছে। হাঁ, নিশ্চয়ই আছে। ভাল কেন, ভাল মন্দ মাঝারি সব রকমের মধ্যেই নীতিজ্ঞান সম্পন্ন ছেলে বিস্তর রহিয়াছে, এবং পূর্বে যেমন বলিয়াছি তাহাদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু আজ এই সব ছেলের কি মিলল! জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইলে নকল কারীরা মাতা টানিয়া লইতে ছাড়ে না। ছলে অনবরত গোলমাল করে। মাঝে মাঝে পরস্ব হইয়া গুরু তত্ত্বাবধায়ককে ধাওয়া করে। তিনি আর কি করেন 'যাক মান থাক প্রাণ' ভাবিয়া 'সে ছুট।' কেন্দ্রের অধ্যক্ষ যেখানে থাকেন সেখানে খাদি পরীক্ষার ঘরের কোন কোনখানি হইতে নিশ্চয়ই তাহা ঘুরে। তাঁহার কানে সংবাদ পৌঁছিতে এবং সিঁড়ি ভেঙে তাঁহার যাইতে যে সময় লাগে উহার মধ্যেই হয়তো হট্টগোল থামিয়া যায়। নকলকারীদের সাজা হয় না। কিন্তু যাহারা নকল করে না তাহারা এই সব কারণে বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ হামেশা হইয়া থাকে, কিন্তু কোন প্রতিকার হয় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি। বড়

দুঃখের কথা কিন্তু না বলিয়া পারিলাম না। কোন কলেজের অধ্যক্ষ একদিন দুষ্কৃতকারীদের কথা প্রসঙ্গে বলেন, ছেলেদের কথা বলিব কি, কৃতবিদ্য আই. এ. এস্ পরীক্ষার্থীদের মধ্যেও নকল করার প্রবৃত্তি চাড়া দিয়া উঠিয়াছে! যাহারা শাসক গোষ্ঠীর শীর্ষ স্থানে থাকিবে তাঁহাদের মধ্যেও এতাদৃশ নীতিজ্ঞান হীনতা। কি দুর্দৈব আজ দেখিতেছি। শিক্ষকে রক্ষা করিবার উপায় শিথিল হইয়া পড়িতেছে কাজেই দুষ্টের বল বৃদ্ধি হইতেছে। হয়ত বলিবেন চোখ নাই, আপনার এত ভাবনা কেন। চোখ নাই বটে কিন্তু মনটা তো আছে। আজিকার দুর্নীতির কথা যখন ভাবি তখন গা ছম্ ছম্ করে। আশু প্রতিকারের সম্ভাবনা বোধ হয় নাই আসিয়াও এই সব লিখিয়া নিজেকে খানিকটা হাল্কা করিয়া লই। তবে আশু না হইলেও হয়তো প্রতিকারের দিন বেশিদূরে নয় এই আশাই হৃদয়ে পোষণ করি।

সাঁওতালের সহপাঠী

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর আগেকার কথা, বোধ হয় ১৯১৮ সাল। আমাদের দেশে তখন ম্যালেরিয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপ, ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার হয়েছি। বছরছয় বয়স, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, বাড়ীর কর্ত্তারা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমন সময় একদিন আমার দাদামশায় আমাকে দেখতে এলেন। দাদামশায় বিখ্যাত ডাক্তার, লোকে বলে ধন্বন্তরি। যে রোগ কেউ সারাতে পারে না সে রোগ তারিণী ডাক্তারের নাম শুনলে নাকি পালায়। দাদামশায়ের কালকর্মে একটা মৌলিকতার ছাপ থাকতো। আমাকে দেখেই তিনি বল্লেন "অষুধ পত্তর কিছু খেতে হবে না, ওকে হাজারীবাগ পাঠিয়ে দাও, একমাসেই ভাল হয়ে যাবে।"

বিজয় চন্দ্র রায় হচ্ছেন আমার মামা। বিংশ শতাব্দীর সবে বছর খানেক বয়েস হয়েছে এমন সময় একদিন তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে অমেক নদীনালা বনজঙ্গল শহর বাজার সমেত গোটা পশ্চিমবঙ্গ উপকে বিচারের হাজারীবাগ যাবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন। সেই যে গেলেন আর দেশে ফেরবার নাম করলেন না। আমি একবার মাত্র তাঁকে কলকাতায় দেখেছিলাম। গত শতাব্দীর ওদেশে থেকে মামার চেহারা বদলে গেছে, কথা বদলে গেছে, খানাপিনা বদলে গেছে, তাঁকে আর চেনা যায় না।

হাজারীবাগ যাওয়াই ঠিক। মামাকে চিঠি লেখা হোলো। পুজোর পর একদিন হাওড়া থেকে রাত্রের গাড়ীতে রওনা হলাম—একাই। হাজারীবাগ রোড ষ্টেশনে। যখন এসে পৌঁছলাম তখনও ভোর হয় নাই। সঙ্গে সামান্যই জিনিষপত্র, একটা ট্রাঙ্ক, বিছানার বাণ্ডিল একটা, পুঁটুলিতে খাবার কিছু, কুলী ডেকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে নেওয়া। ষ্টেশনে বেশীলোক নামলো না। ট্রেণ ছেড়ে যাবার পরেই প্ল্যাটফর্ম খালি হয়ে গেল। নীচু প্ল্যাটফর্ম, আলোর ব্যবস্থা নাই, অন্ধকারে জিনিষপত্র নিয়ে বসে থাকলাম। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মকে প্ল্যাটফর্ম বলে মনে হয় না, নির্জ্জন অরণ্যলোক বলেই মনে হোলো।

ধীরে ধীরে পূবের আকাশ স্বচ্ছ হয়ে উঠলো,

অন্ধকার হালকা হয়ে গেল, দেখলাম ছোট্ট ষ্টেশনের পিছনে কয়েক খানা খোলার ঘর, একপাশে মস্ত একটা বটগাছ, তার নীচে একটা ইঁদারা। আশা করেছিলাম মামা ষ্টেশনে থাকবেন, এতক্ষণ তাঁকে না দেখে কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো। একটু পরে ভোর হয়ে গেল, সোনালী আলোয় চারিদিক ঝলমল করে উঠলো। আমি কি করবো ভাবছি এমন সময় মাথায় মস্ত পাগড়ি, হাতে লম্বা লাঠি, লোহার নাল লাগানো কড়া নাগরা জুতোর ঠক ঠক আওয়াজ করে কুতকুতে কালো, রোগা আর বেঁটে একটি লোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখছি আর ভাবছি এই কি মামা? তা যদি হয় তাহলে একি ভীষণ পরিবর্তন, মামা কালো ছিলেন আরো কালো হতে পারেন কিন্তু অমন লম্বা আর মোটা মানুষ এমন রোগা আর বেঁটে হলেন কেমন করে? ভাবছি এমন সময় লোকটি বল্ল "খোকাবাবু, তুমি কি কলকাতা থেকে এসেছ?" বল্লাম "হ্যাঁ, এসেছি।" মাথা নেড়ে হেসে সে বল্ল "ঠিক চিনেছি। বাবুজী তোমাকে ডেরা নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার নাম বৈজনাথ সিং।" মুহূর্তে সব ভাবনা দূর হয়ে গেল—এ তাহলে মামা নয়, মামার চাকর। বৈজনাথ কাছে এসে বসলো, বল্ল "গাড়ীর সময় ষ্টেশনে পৌঁছতে পারি নাই, তকলিফ্ তো কিছু হয়নি খোকাবাবু?" বল্লাম, "না"। বৈজনাথ খুশী হয়ে, বল্ল "তাহলে চলো ঐ বটগাছের নীচে, আমাদের গরুর গাড়ী রয়েছে, ওখানে গিয়ে বসবে। তার পরে কিছু খেয়ে নিয়ে রওনা হব।" জিনিষপত্র তুলে নিয়ে বৈজনাথ আমাকে বটগাছের নীচে এনে বসালো। সেখানে দেখলাম আমাকে নেবার জন্যে একখানা গরুর গাড়ী প্রস্তুত রয়েছে। বৈজনাথ বল্ল "কিছু খেয়ে নাও খোকাবাবু।" প্রশ্ন করলাম "কি খাব?" বৈজনাথ হেসে জবাব দিল "কেন, খাবার অনেক জিনিষ পাওয়া যায়, ছাতু, চুড়া, গুড়, কি খাবে বলো, কিনে আনি।" শুধু সহযোগে ছাতু চুড়া কখনো খাই নাই। তাই তা খেতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করলাম না, পরে অবশ্য ও জিনিষের বিশেষ ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। সঙ্গে যা খাবার ছিল তাই খেয়ে গরুর গাড়ীতে উঠে বসলাম।

গাড়ী চলতে শুরু করলো। ষ্টেশনের পাশেই ছোট একখানা গ্রাম, সেখান ছাড়িয়ে পথ বাঁকর-ময় উঁচুনীচু মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে। মাঠময় ছোট ছোট ঝোপ। কাছে গিয়ে দেখি সেগুলো কুলের গাছ—কুলও ধরেছে অনেক। এত ছোট কুলগাছ আমি আগে দেখি নাই; তারি মজা লাগলো—এক কৌচড় কাঁচা কুল তুলে ফেল্লাম। মাঠের পথ শেষ হতে চায় না, কখনো উঁচুতে উঠছে কখনো নীচুতে নামছে। ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছি। মাঝে মাঝে দু একটা গাছ, তার আঁকাবাঁকা ডাল আর বড় বড় পাতা। কি গাছ চিনতে পারলাম না, বৈজনাথ বল্ল "মহুয়া গাছ।" ঘুরে ফিরে পথ ক্রমে ঢালু হয়ে একটা নদীতে গিয়ে নামলো। নদীর একপাশে একটু জল আর সবটাই বালু আর পাথর। নদী পার হয়ে ওদিকের উঁচুপাড়ে উঠবার সময় গাড়ীখানাকে যথেষ্ট ঠেলাঠেলি করতে হলো।

নদীর পাড়েই একখানা গ্রাম, ভাবলাম মামার বাড়ী এসে পড়েছি। গাড়ী কিন্তু থামলো না, গ্রাম পেছনে ফেলে এগিয়ে চল্ল। চারিদিকে হালকা জঙ্গল, কোন গাছই আমি চিনি না। একটা নতুন গাছ দেখি আর বৈজনাথকে তার নাম জিজ্ঞাসা করি। বৈজনাথ বলে যায় "ওটা পলাশ, ওটা শাল, ওটা পিয়ার, ওটা আমলকী।" আমি ঢেউএর মত কখনো উঁচু কখনো নীচু, গাড়ী কখনো আস্তে আস্তে উঠছে, কখনো হড়মুড় করে নেমে যাচ্ছে।

বন ক্রমে গভীর হয়ে আসছে। পথের দুপাশে কেবল গাছ আর গাছ। ঘণ্টাখানেক চলে গেলাম তবু বন শেষ হয় না। কত পাখী আর কতরকম

তাদের ডাক। শিউরে আমাদের বনের রহস্যে ডুবে গেল, কোথায় এলাম, আর কতদূর যাব এ সব কথা মনে উঠছে না। ঘুমভেঙ্গে দিয়ে হঠাৎ বৈদ্যনাথ আমাকে বল্ল "দেখ খোকাবাবু, ওদিকে পাহাড়।" পাহাড়! সেদিকে চেয়ে দেখি কালো মেঘ মাটিতে এসে মিশেছে। গাড়ী এগিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে পাহাড় কাছে আসছে—আরো স্পষ্ট হচ্ছে। এবার গাড়ী ঘুরে গিয়ে সোজা পাহাড়ের দিকে চল্ল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড় নজরে পড়ছে। আরো কাছে এসে পড়েছে, পাহাড়ের গায়ে যেসব গাছ তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

এখন আর বাঁধাধরা রাস্তা নাই, একটা পায়ে চলার পথ ধরে আমাদের গাড়ী এগিয়ে যাচ্ছে। খানিক দূর যেতেই দেখতে পেলাম দশঘরার খানা ছোট ছোট খোলার ঘর। আমাদের গাড়ীর আওয়াজ পেয়ে সেই সব ঘর থেকে কয়েকজন মেয়ে পুরুষ ছুটে বেরিয়ে এলো। দেখলাম কষ্টিপাথরের মত মত কালো তাদের গায়ের রং, সুঠাম তাদের দেহের গড়ন। মনে হলো তারি সুন্দর তো—এরা কারা? গাড়ী একটা মোড় ঘুরে আর একটু এগিয়ে গেছে, বৈদ্যনাথ বল্ল "খোকাবাবু, দেখ, জেল্লা পৌঁছে গেছি।" চেয়ে দেখি সামনে খুব উঁচু আর বড় একখানা মাটির বাড়ী, তার চারিদিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ঠিক যেন প্রাচীন যুগের একটা দুর্গ।

দুর্গের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন মামা, দেখামাত্র চিনলাম, যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনি আছেন, লম্বা আর মোটা। গাড়ী থেকে নেমে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। মামা হেসে বল্লেন "কেমন আছিস কমল?" বল্লাম "ভাল আছি মামা।" দেখলাম মামা আমার নামটা ভুলে গেছেন।

(ক্রমশঃ)

পাঠ্যক্রম ঃ একটি দার্শনিক সমস্যা

শ্রীকালিদাস বসু

শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত থাকলেও প্রত্যেক শিক্ষাদর্শনে জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষককে যথার্থ করে তুলতে শিক্ষকের যেমন একটা ভূমিকা রয়েছে, পাঠ্যগ্রন্থেরও তেমনি একটা ভূমিকা আছে। পাঠ্যগ্রন্থকে যেমন কেবল বিষয়বস্তুর সমষ্টি বললে ভুল করা হয়, তেমনি ভুল হবে পাঠ্যক্রমকে কেবলমাত্র পাঠ্যতালিকা ভাবলে।

শিক্ষার্থী তার বিদ্যালয় জীবনে যে সব জ্ঞান, ধারণা, নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, প্রবণতা এবং মানসিক, শারীরিক তথা আত্মিক শক্তি অর্জন করে সেই সমস্তই হবে তার পাঠ্যক্রমের অঙ্গীভূত। এক কথায় 'The curriculum may be defined as the totality of subject matter, activities and experience which constitutes a pupil's school life.'

জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক যে নিবিড় এ বিষয়ে কোন তর্ক ওঠে না—শিক্ষাকে জীবনের প্রতি সদা জাগ্রত থাকতে হবে, তাকে হতে হবে জীবন-ভিত্তিক। শিক্ষা মাত্রেই তার একটা লক্ষ্য নির্দিষ্ট থাকে, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে চাই একটা সুচিন্তিত সুষ্ঠু পরিকল্পনা—পাঠ্যক্রম শিক্ষাক্ষেত্রে সেই প্রয়োজন নিত্য করে। শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তার পাঠ্যক্রমও পরিবর্তিত হতে বাধ্য। যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবন দর্শনের যেমন রূপান্তর ঘটেছে, শিক্ষাদর্শনও তেমনি রূপান্তরিত হয়েছে সমাজ মানসের চাপে।—এই অর্থে পাঠ্যক্রম জীবন দর্শন তথা শিক্ষাদর্শনের প্রতিবিম্ব।

বর্তমান শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য ও সমাজ পরিবেশ অনুসরণ করেই পাঠ্যক্রম রচিত হওয়া উচিত। পাঠ্যক্রমের এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হয়েছে বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগোচিত শিক্ষার পরিবর্তিত লক্ষ্য অনুসরণ করে—কারণ সমাজের আদর্শ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হবে শিক্ষার আদর্শ, সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার কৌশল পাঠ্যক্রম নির্ধারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

কাজেই পাঠ্যক্রম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ—এই বিচারে পাঠ্যক্রমের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন নানা দিক থেকে। এক, শিক্ষার্থীকে কোন্ কোন্ বিষয় এবং কি কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হবে তা আগে থেকেই নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। দুই, পাঠ্যক্রম শিক্ষককেও নির্দেশ দেয়। কোন্ বিষয় কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করতে হবে তা পাঠ্যক্রমের সাহায্যেই জানা সম্ভব। তিন, সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি আনতে হলে প্রত্যেকের সামাজিক উদ্দেশ্য এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা পরিকল্পনায় সামান্য থাকলে প্রত্যেকের সামাজিক উদ্দেশ্য একমুখী হতে পারে—কারণ শিক্ষা মানুষের মধ্যে সামাজিক সংহতি-চেতনা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। তাই প্রত্যেক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য—পাঠ্যক্রম শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই দিক থেকে বলা চলে পাঠ্যক্রম একটি দেশের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এইবার মূল দার্শনিক প্রস্তাবে আসতে হয়।

শিক্ষাতত্ত্বে পাঠ্যক্রম নির্ধারণের নীতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিকের কাছে শিক্ষার আদর্শ এবং লক্ষ্য বিভিন্ন, তাই তাঁদের পাঠ্যক্রম নির্ধারণের প্রণালীতেও দেখা দিয়েছে বিভিন্নতা। এ যাবৎ যত রকমের দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হয়েছে এই পাঠ্যক্রম নির্ধারণের নীতিকে ভিত্তি করে তাদের, মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :—এক, একদল দার্শনিক পাঠ্যক্রম রচনার ভিত্তিতে স্থাপন করতে চান শিক্ষার্থীর চাহিদাকে। দুই, আর একদল কেন্দ্রমূলে প্রতিষ্ঠা করতে চান জীবনের কার্যকরতার বিশ্লেষণকে।

এই দার্শনিক বিতর্কে স্বাভাবিক নিয়মেই একটি প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন ওঠে—ব্যক্তি বনাম সমাজ প্রাসঙ্গিকতার নীতির প্রশ্ন। অর্থাৎ, একদিকে ব্যক্তির চাহিদা অন্য দিকে সমাজের দাবী—পাঠ্যক্রম নির্ধারণ প্রসঙ্গে এই দুইয়ের আনুপাতিক সার্থক সমন্বয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রশ্নটির মীমাংসা। কারণ, 'Child interest versus social demand in curriculum selection is a philosophical question.'

পাঠ্যক্রম রচনা করতে গেলে, তার নীতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন এসে হাজির হয় যেমন,—কাকে শিক্ষা দেওয়া হবে; কি শিক্ষা দেওয়া হবে; কেন শিক্ষা দেওয়া হবে; কখন শিক্ষা দেওয়া হবে; কেমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে; অর্থাৎ, কে, কি, কেন, কখন, কেমন ভাবে—এই পাঁচটি মৌল প্রশ্নের মীমাংসার মধ্যেই পাঠ্যক্রম রচনার মূল সমস্যার সমাধানের বীজ নিহিত রয়েছে। এই উপাদানগুলিকে বস্তুগতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে পাঁচটি স্তর পাওয়া যাবে—পাঠ্যক্রম নির্ধারণের নীতি প্রসঙ্গে এগুলি অবশ্য বিচার্য—লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এরা পরস্পর সংশ্লিষ্ট আন্তর-নির্ভর।

এবারে মূল প্রশ্নগুলি একে একে বিচার করা যেতে পারে। এক, কাকে শিক্ষা দেওয়া হবে—এ প্রশ্নের উত্তর বিনা দ্বিধায় বলা যায়, শিশু। কাজেই পাঠ্যক্রম রচনা প্রসঙ্গে শিশুর ব্যক্তিসত্তা চাহিদা, তার বুদ্ধিবৃত্তি ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলি এসে পড়তে বাধ্য। দুই, কি শিক্ষা দেওয়া হবে—অর্থাৎ, শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে। শিক্ষার বিষয়সূচী নির্ধারণ করা অনিবার্য কারণে তাই পাঠ্যক্রম রচনার অন্যতম একটি প্রধান দায়িত্ব। এখানে বিষয়বস্তু বলতে বোঝায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমানা নির্দেশ। তিন, কেন শিক্ষা দেওয়া হবে—এ প্রশ্ন নিঃসন্দেহে শিক্ষাদর্শনের। এই দার্শনিক প্রশ্ন শিক্ষা দর্শনের আদি এবং মৌলিক প্রশ্ন—সূচনা থেকে আজ অবধি এই কূট তর্কের কোন মীমাংসা সম্ভব হয়নি, সম্ভবত ভবিষ্যতেও কোন দিন এ তর্কের সমাধান হবে বলে মনে হয় না। তথাপি বিতর্ক এড়িয়ে 'এই কেন'-র উত্তরে এইটুকু বলা চলে যে, শিক্ষা দেওয়া হবে সার্থক অভিযোজন তথা আচরণের উন্নতি বিধানের জন্যে। চার, কখন শিক্ষা দেওয়া হবে—অর্থাৎ, পাঠ্যক্রম রচনার ব্যাপারে কালচেতনাকেও বিচার করতে হবে। এই প্রসঙ্গে শিশুজীবনের ক্রম-পরিণতি ও তার পরিণত মনের আলোচনা এসে পড়ে স্বভাবতই। পাঁচ, কেমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে—এক্ষেত্রে শিখন-প্রক্রিয়া ও শিক্ষাদান পদ্ধতির কথা আসে। প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম (অর্থাৎ, কে, কখন ও কি ভাবে)—এই প্রশ্ন তিনটি শিশু ও শিক্ষা-মনস্তত্ত্বের আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে: দ্বিতীয় (অর্থাৎ, বিষয় বস্তুর) প্রশ্নটি জ্ঞান শাখার একিয়ারে আসে, আর তৃতীয় প্রশ্নটি হল শিক্ষা-দর্শনের।

পাঠ্যক্রম সংগঠনের ব্যাপারে আর একটি মৌলিক সমস্যা হল: জ্ঞানের তর্ক-শাস্ত্রসম্মত ভিত্তির সঙ্গে শিখন-প্রক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বিশেষত্বের

মধ্যে দ্বান্দ্বিক বিধান করা (...'standing opposition between the logical organisation of knowledge and the psychology of the learning process.') পাঠ্যক্রম সংগঠনার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি দুটি বিপরীত দার্শনিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে। একটিতে বিষয়বস্তুর ওপর, তার তর্ক শাস্ত্রসম্মত সংগঠনের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ধরণের পাঠ্যক্রম সংগঠনের ভিত্তি হল বিষয়বস্তুর একক অর্থাৎ, যুক্তিনিষ্ঠ তর্ক-শাস্ত্রসম্মত সংগঠন। অপরটির মূল লক্ষ্য হল অভিজ্ঞতার ওপর, শিক্ষার্থীর মৌল সামাজিক দিকটিতে অর্থাৎ, এই জাতীয় পাঠ্যক্রমের একক হল অভিজ্ঞতা—এর ভিত্তি হল পরিবর্তন কার্যকারিতা—শিক্ষার্থীর মৌলিক ও সামাজিক প্রয়োজন। এই রকম পাঠ্যক্রমের সংগঠন মনস্তত্ত্ব নির্ভর।

পাঠ্যক্রমের ব্যাপকতা আজকের পাঠ্যক্রম রচনার বাস্তবনীতি হিসাবে স্বীকৃত। বিদ্যালয় জীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাই আজকের পাঠ্যক্রমের পরিধি। ব্যক্তিগত রুচি, সামর্থ্য ও বৈষম্যের সঙ্গে পরিবর্তনশীলতা তথা স্থিতিস্থাপকতা, জীবনোপযোগিক জীবনের সঙ্গে যথার্থ সংযুক্তি আজকের পাঠ্যক্রমের দাবী। আজকের পাঠ্যক্রম তাই 'All the experiences that a learner has under the guidance of the school.'

গ্রন্থপঞ্জী :—

১। Curriculum : 19th century Year Book.

২। Principles of Modern Education : Thomas & Long.

৩। Universal Problems in Education C. I. E. Record (April, 1962)

৪। Curriculum Educational Research : ed., W. Harris.

শিক্ষাব্রতী রাজনারায়ণ বসু

শ্রীদয়াময় ভট্টাচার্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে সকল মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও রাজনারায়ণ জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন "আমার বাল্য বয়সের বাঙালীত্ব; আমার কলেজে শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলেজের জ্ঞান উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই।" [আত্মচরিত] পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী সমাজকে রাজনারায়ণ বয়সের প্রকৃতির হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং আজীবন জাতির সভ্যতার উন্নতির পথ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মাতৃভাষার অনুশীলনে তাঁহার প্রয়াস সর্বজনবিদিত। বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে ইহার 'জীবন ও কর্ম' আলোচনার চেষ্টা করা হইতেছে।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬ খৃঃ রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশপরগণা জেলার বোড়াল গ্রামে বাল্যজীবনে ইনি প্রথমে পাঠশালায় পরে ইংরেজী শিখিবার জন্য 'নন্দু বাইটারের স্কুলে ভর্তি হন। পরে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন।

রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী হইতে তৎকালীন শিক্ষা সমাজের এক নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। হেয়ার সাহেবের স্কুলটির নাম ছিল School Society's School. হেয়ার সাহেব ছাত্রদের বক্তৃতা শক্তি ও রচনা শক্তি উন্নত করিবার অভিপ্রায়ে একটি বিতর্ক সভা (Debating Club) সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাহাতে Whether Science is Preferable to Literature এই বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হেয়ার সাহেবের প্রশংসা ভাজন হন। তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পিতা), উমাচরণ মিত্র. রাধামাধব যে অন্যতম। প্রধান শিক্ষক উমাচরণ Scott's Ivanhoe, Pope's Poems, Henry to Emma ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ উত্তমরূপে পড়াইতেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্যমান্য মনীষীবৃন্দ।

রাজনারায়ণের মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "আমাদিগের উচিত সর্বস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি, বেকন ও লক, নিউটন ও ল্যাপলাস, কুভিয়র ও হ্যাবলট প্রভৃতি সর্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আমভাষাতে আনিত করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট উচ্চতম বিদ্যাসকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্ব বিষয়েতে দেশ ভাষার বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে।...উৎকৃষ্ট বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ইহাতে উৎসাহের সহিত দৃষ্টি হওয়া নিতান্ত কর্তব্য, কারণ এতদ্দেশকে বিদ্যাদান রাজকার্য্যের প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যা বিতরণে কিরূপে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হইবে—জ্ঞানের বিমল

জ্যোতিতে শিক্ষার মন বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের মৃত্যু সংসারে তাহার কেন যত্ন হইবে ?...কিন্তু বাঙলা পাঠশালা অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালায় শিক্ষিত তাহারদিগের কিঞ্চিৎ যত্ন হইতেছে, বাস্তবিক প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য রাজার যত্নপর হওয়া কর্তব্য, তাহারা তাহার সহস্র অংশের এক অংশও করিতেছেন না।...ইংরেজ রাজা যদি দেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ উপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন —আমারদিগের সর্বস্বের পরিবর্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করা উচিত বোধ করেন তবে ভারতবর্ষের সর্বস্থানে পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষাদান করুন।...ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থসকল অনুবাদ করা এবং দেশভাষার উপযুক্ত শিক্ষকসকল প্রস্তুত করা এ বিষয়ের মূল সাধন হইতেছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন এবং সম্যক যত্নপূর্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষসকল নিযুক্ত করুন। যখন তাহারা দিন দিন কৃতকার্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক।"

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার নিকট অল্পবিস্তর ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার নিকট ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরের সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। এখানে তিনি আঠারো বৎসর শিক্ষকতা কার্য করিয়া ১৮৬৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণের প্রযত্নে তখন মেদিনীপুরের এত উন্নতি ও খ্যাতি হইয়াছিল যে, দরিদ্র ছাত্রগণ বিনা বেতনে পড়িতে না পিয়া এখানে আসিয়া ভীড় জমাইত।

রাজনারায়ণের আগমনে মেদিনীপুর স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সাহিত্যাদি আলোচনার জন্য বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল, ছাত্রদের পরীক্ষার ফলও ভাল হইতে লাগিল। ইহা ছাড়া (১) পাঠ্যপুস্তক ব্যতিরেকে প্রতি ছাত্রকে অন্তত কোন বিদেশী পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া হইত এবং পুস্তকের বিষয় বস্তুর উপর পরীক্ষা লইয়া তাহাতে নম্বর প্রদত্ত হইত। (২) ছাত্র ও শিক্ষকগণ মিলিয়া একটি দরিদ্র ভাণ্ডার খোলেন। বৃদ্ধ ও অসমর্থ লোকদের ইহা হইতে সাহায্য করা হইত। (৩) রাজনারায়ণের সম্পাদনায় ভদ্রমহিলাদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত একটি 'নাইট স্কুল' সংস্থাপিত হয়। (৪) ইহা ছাড়া একটি ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মবিদ্যালয়ও রাজনারায়ণ বসুর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়।

বস্তুতঃ সুদক্ষ শিক্ষাব্রতী ও দূরদর্শী সমাজসেবী রূপে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার চিন্তাধারা সম্পূর্ণ নিজস্ব ও কালোপযোগী। তিনি বলিয়াছেন—"ইউরোপে এত শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, এদেশে কেবলমাত্র এক চাকরী দ্বারা কি এত ভদ্রলোকের জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে? বস্তুতঃ জগৎ গুদ্ধ লোক কখনও কি কেরাণী অথবা মুন্সী নাজীর অথবা উকীল হইতে পারে? শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া কেহ পথ চলে না। অনেকে ব্যারিষ্টার অথবা সিভিলিয়ান হইবার জন্য বিলাতে যাইতেছেন কিন্তু কয়জন সেখানে শিল্প অথবা বস্তুবিদ্যা শিখিতে যান? শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগ জন্য দিন দিন আমরা দীন হইয়া পড়িতেছি।"—জাতীয় চেতনার এত বড় অধঃপতনকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং কিরূপ বেদনার্ত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি।

'হিন্দু বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে তিনি তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষার ফল সম্পর্কে এক সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল এখনও ফলে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন ইংরেজদিগের ন্যায় আমরা শারীরিক বল লাভ করিব, সাহসী হইব, অধ্যবসায়শীল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইব, এবং স্বাধীনতা প্রিয় হইব। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন আমরা স্বাধীনরূপে কলেজ সকল সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইব, খ্রীষ্টান মিশনরিদিগের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীন স্বীয় শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিব, করিয়া ও উপন্যাস ইংরাজী অনুকরণে পরিপূর্ণ না করিয়া আমাদের নিজের প্রকৃতিগত ক্ষমতাকে স্ফূর্তি প্রদান করিব, স্বাধীনরূপে বিজ্ঞান শাস্ত্রের গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া করিতে সক্ষম হইব, স্বাধীনরূপে উপজীবিকা আহরণ করিব অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইব, ইংরাজী রীতিনীতি অন্ধভাবে অনুকরণ না করিয়া জাতীয় প্রথা যতদূর রক্ষা করিতে পারি তাহা রক্ষা করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হইব এবং কেবল গবর্ণমেণ্টের নিকট বালকবৎ রোদন না করিয়া আমাদিগের হাত এমন ভারী করিয়া তুলিব, যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের আবেদন কখনই গ্রাহ্য না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হার্বার্ট স্পেন্সারের "শিক্ষার উদ্দেশ্য" ইহাতে প্রতিধ্বনিত হইয়া একটি নূতন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্যে যে জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি তাহা স্বাধীন ও সার্থক ইহা রাজনারায়ণ কখনই ভুলেন নাই।

রাজনারায়ণ বসু জাতীয় শিক্ষক। তিনি বুঝিয়াছিলেন "জাতীয়তা সৌধ গড়িতে হইলে স্বদেশীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, শিল্পসম্পদ প্রভৃতির মূল ঠিক রাখিয়া প্রত্যেকটির উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক।" "মেদিনীপুরে তাঁহার শিক্ষকজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় এবং মেদিনীপুরবাসীরা তাঁহার শেষ জীবনে অসুস্থ অবস্থায় অবসর গ্রহণে কাশীপুর অবস্থান কালে তাঁহাকে যে মানপত্র পাঠাইয়াছিলেন (১৮৬৯, ২৯শে মার্চ) তাহা তাঁহার জীবন ও কর্মের একটি গৌরবময় অধ্যায় প্রকাশ করিয়াছে।

———

শিক্ষা ও ভাষায় হিন্দীর স্থান

শ্রীসুশীলকুমার দাশগুপ্ত

শিক্ষায় হিন্দী ভাষার স্থান লইয়া দেশে বহু বাকবিতণ্ডা অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়াছে। ফলে যে শিক্ষার বিপর্যয় ঘটিতেছে তাহা স্বাধীন ভারতের কলঙ্কই বলিতে হইবে। আমরা অনেকে মনে করি আমার ভাষাই থাকিবে, অন্য কোন ভাষার স্থান এখানে হইবে না। অন্য ভাষা যাহারা বলে আমাদের ভাষা বলে না তাহাদের স্থানও এখানে হইবে না। ইহা মনের সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক। ভারতে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে, তাই মনের সংকীর্ণতা থাকিলে চলিবে না। এই সংকীর্ণতা বিদূরিত করিতে হইলে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে একতা ও সংহতি স্থাপন করিতে হইলে, ভাবাত্মক একতার সংস্থাপন করিতে হইলে এমন এক ভাষাকে গ্রহণ করিতে হইবে যাহা ভারতের অধিকাংশ লোকের ভাষা, যে ভাষায় অধিকাংশ লোক কথা বলে, উপলব্ধি করে, যে ভাষা শিক্ষা করা সহজ। সকল দিক বিবেচনা করিতে গেলে হিন্দী ভাষাই গ্রহণীয়

বলিয়া যুক্তিসংগত মনে হয়। হিন্দী ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার নিবিড় সম্বন্ধ, বাংলা ভাষার সঙ্গে অনেকটা মিল রহিয়াছে, ইহা খুব সরল ভাষাও। বাংলা ভাষার গণ্ডির বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, বাংলার বাহিরে যে কোন স্থানে গেলে বেশীর ভাগ লোকের মুখে হিন্দী ভাষাই বলিতে শুনা যায়। শুধু তাহা নয়, হিন্দী ভাষার সাহায্যে ভারতের অনেক প্রদেশেই স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া আসা যায়। তবে এই ভাষা না শিখিবার ও বলিবার বিপক্ষে কি বা যুক্তি থাকিতে পারে। এই ভাষাকে মুখ্য ভাষারূপে গণ্য না করিবারই বা কি অর্থ থাকিতে পারে? আমরা যদি ইংরাজী ভাষাকে, যাহা একটি বিদেশীয় ভাষা তাহা অম্লানবদনে গ্রহণ করিতে পারি তবে আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রদেশের ভাষাকে শিখিতে এত আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে। তাছাড়া ইংরাজী আয়ত্ত করিতে যে পরিমাণ প্রয়াস ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, হিন্দী ভাষা শিখিতে তাহার সিকি পরিমাণ পরিশ্রম ও চেষ্টার দরকার হয় না। হিন্দী অল্প পরিশ্রমে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। তবে আমরা রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না কেন? তাহার কারণ আমাদের মাতৃভাষার প্রতি দরদ। মাতৃভাষাকে আমরা অনেক বড় করিয়া মনে করি। তাবি, আমাদের বাংলাভাষার মত এত ঐশ্বর্যশালী ও সমৃদ্ধশালী ভাষা আর নাই। কিন্তু হিন্দী ভাষাও কি কম সমৃদ্ধশালী? তুলসীদাস প্রভৃতি বড় বড় কবি এই ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দী এক বহুল প্রচারিত ভাষা। পথে ঘাটে সর্বত্র এই ভাষার প্রচার। হিন্দীকে উত্তর ভারতের প্রতিটি স্থানীয় ভাষা বলা যাইতে পারে। আমাদের পারস্পরিক কথাবার্তায় প্রথমতঃ ইহার প্রচার দরকার। তবে ইহাকে এখনই একেবারে বাধ্যতামূলক করা হইবে না। হিন্দীকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে রাখিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়, ইংরাজী ও মাতৃভাষাকে এখনই একেবারে তুলিয়া দিয়া হিন্দীকে আবশ্যিক ভাষা করা উচিত হইবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যেও ইহাকে আবশ্যিক বিষয় করা ঠিক হইবে না। যদিও হিন্দী সুবৃহৎ জনগণের মাতৃভাষা, অহিন্দীভাষী জনগণের উপর আবশ্যিক শিক্ষার ভাষারূপে চাপাইয়া দেওয়া বিধেয় নহে। এখনও ইংরাজী ও স্ব স্ব আঞ্চলিক মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দিলে লোকের বিক্ষোভের কারণ থাকিবে না। তারপর ইংরাজী ভাষার মতই ধীরে ধীরে একদিন হিন্দী ভাষা প্রাধান্য আপনিই লাভ করিবে। তখন আর অহিন্দীভাষীদের আপত্তি হইতে হিন্দী ভাষাকে মুখ্য ভাষারূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি থাকিবে না। ইংরাজী ভাষার প্রসার আমাদের মধ্যে একদিনে হয় নাই। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষার এদেশে প্রসার লাভ করে নাই। ইংরেজ আগমনে ধীরে ধীরে এই ভাষার প্রচলন হয়। বিদেশী শাসক গোষ্ঠী রাজাইয়া এই ভাষা আমাদের উপর চাপাইয়া দেয় ও মুখ্য ভাষারূপে শিক্ষার বাহন করে। কিন্তু আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ। জনমত এখানে প্রবল। ইংরেজদের ইংরাজী ভাষা জোর করিয়া চাপানো যত সহজ হইয়াছিল বর্তমান স্বাধীন জনগণের উপর কোন ভাষা জোর করিয়া চাপানো তত সহজ হইবে না। বরং তাহার দ্বারা দেশে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। এখন আমরা যেমন চাহিতেছি বিদেশী ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় ও সরকারী কার্যে থাকুক, এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা হিন্দীকেও সেইরূপ মর্যাদা দিতে শিখিব ও পারিব। তবে এত তাড়াতাড়ি এমনই একেবারে অহিন্দীভাষীদের উপর চাপাইলে ব্যর্থ হইতে হইবে। তাই স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "যতদিন পর্যন্ত অহিন্দীভাষী লোকেরা আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে

হিন্দীকে না মানিয়া লইতেছে, ততদিন পর্যন্ত মুখ্যতঃ ইংরাজী থাকুক, যাহারা ইংরাজীতে নিজেদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে পারিবে না তাহারা নিজ মাতৃভাষাই ব্যবহার করিবে। কারণ বহুভাষী ভারতকে একসূত্রে বাঁধিবার উপযোগী ভাষা এখনও হয় নাই। যতদিন পর্যন্ত বহু ভাষী ভারতের একসূত্রে বাঁধিবার ভাষা না মিলিবে ততদিন ইংরাজী রাখিতে হইবে।" এই প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর উক্তিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "হিন্দীকে তৈয়ারী করিতে হইবে। হিন্দী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষার ভূমিকা গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই উহাকে আরো অনেক উন্নত হইতে হইবে এবং ইহা গ্রহণের জন্য অহিন্দীভাষীদের আরও সময় দিতে হইবে।" তিনি আরো বলেন, হিন্দী সম্পর্কে অহিন্দীভাষীদের ভীতির কোন কারণ নাই। ইংরেজী শিখিতে পারিলে হিন্দী ভাষা না শিখিতে পারার কোন হেতুও খুঁজিয়া পান না। তবে ইহা ঠিক হিন্দীকে সর্বভারতে গ্রহণযোগ্য করিতে হইলে অবশ্যই এই ভাষার আরো সমৃদ্ধি প্রয়োজন। হিন্দীকে আমাদের জাতীয় ভাষা করিতে হইবে। সুতরাং শিখাইয়া যাওয়ার কোন কারণ নাই। ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য ১৫ বৎসর সময় দেওয়া হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ ১৫ বৎসরের মধ্যে কেন্দ্র, হিন্দীভাষী রাজ্য অথবা অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলি এই সিদ্ধান্তকে কার্যে রূপ দিতে পারেন নাই। তাই ইহা স্বাভাবিক অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলিকে হিন্দীভাষা রপ্ত করিতে সময় দিতে হইবে। কোন একটি বিশেষ ভাষা (হিন্দী) অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে এই মনোভাব থাকা উচিত নয়। এই সময় কেন্দ্রীয় সরকার এবং হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিকে ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের ঐক্য ও সংহতি যাহাতে কোন ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলা তাই স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন, হিন্দী কাহারও উপর "চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। এবং একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে ও শিক্ষা দানের মাধ্যম হিসাবে কখন গ্রহণ করা হইবে তাহা স্থির করার ভার থাকিবে অহিন্দী-ভাষী রাজ্যগুলির উপর।" অহিন্দীভাষী এলাকা-গুলির শুরুত্ব হিন্দীভাষী রাজ্যগুলির চেয়ে যে কোন অংশে কম নয় এ ধারণা অহিন্দীভাষী এলাকায় অবশ্যই অবশ্য কর্তব্য। দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজ্য হিন্দীকে গ্রহণ করিতে সাধ্য মতই চেষ্টা করিতেছেন, তবে জবরদস্তিতে চাপাইয়া দেওয়াই শুধু তাহারা সরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। যদি বাধ্য করা না হয় তবে স্বাধীনভাবে কেহ হিন্দী গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। তাই শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন, "আমরা অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলিকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতে চাই, হিন্দী জবরদস্তি চাপাইয়া দেওয়া হইবে না।" শিক্ষামন্ত্রী মনে করেন "হিন্দী ভাষার সত্যিকারের উন্নতি অহিন্দীভাষী এলাকাগুলি থেকেই হবে!... এমন কি মাতৃভাষা যাদের হিন্দী তাঁরা তাঁদেরও ছাড়িয়ে যাবে।" শ্রীচাগলা বলেন "দেশের শিক্ষানীতিতে শেষ পর্যন্ত চৌদ্দটি জাতীয় ভাষাকেই জোরদার করতে হবে, তখন স্বভাবতই একটি সংযোগ রক্ষাকারী ভাষার দরকার হবে যা সমাজের বিভিন্ন স্তরে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবে। সরকারী ভাষা হিসাবে সংবিধানে যে হিন্দীভাষার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা হিন্দীভাষী রাজ্যগুলির আঞ্চলিক ভাষা নয়, সরকারী ভাষারূপে যে ভাষা গড়ে উঠবে তা বিভিন্ন ভাষার দানে পুষ্ট হয়ে দেশের সত্যিকারের সংযোগরক্ষী ভাষার পরিণত হবে।"

———

শিক্ষা

মহি কল্যাণকৃৎ ক্ষিতি স্তপস্তিং তাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৭২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

যুদ্ধের পটভূমিকায় শিক্ষার দিক্-পরিবর্তন

কচ্ছের রান্-এ পাকিস্তানের অতিযান এবং অন্যত্র সৈন্য সমাবেশের ফলে ভারত সরকারকে প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে। শিক্ষাজগতে ইহার ঢেউ অবশ্য আসিয়া লাগিবে। সাধারণ সামরিক শিক্ষার যে সব ব্যবস্থা আছে, সে সকল ব্যবস্থা অবশ্যই পুষ্ট করিতে হইবে। বহুদিন পূর্বে অনুরূপ ব্যবস্থার কথা শিক্ষা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দৈহিক যোগ্যতা, স্বাস্থ্য তথা নয়, শক্তি চর্চা বিশেষ যত্ন সহকারে করার সময় আসিয়াছে। আর আসিয়াছে সর্বপ্রকার অপচয় বন্ধ করার সম্যক্ প্রয়াস। শুধু সামরিক বিভাগের উপরই দেশ নির্ভর করে না, অসামরিক জনগণের উপরেও দেশের নির্ভর। আর অসামরিক ছাত্র-শিক্ষক সামরিক হইতে কতক্ষণ? যে সকল সর্বাত্মক যুদ্ধের কথা আমরা শুনিয়া থাকি, হয়তো আমাদের সেইরূপ অভিজ্ঞতা অর্জনেরই সময় আসিয়াছে।

আলীগড়ে ছাত্রদের অবিনয়

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের দুর্বিনয় একেবারে চরমে উঠিয়াছে। সেখানকার উপাচার্য নবাব ইয়ার জং সাহেব ও অন্য কয়েকজন পদস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। ব্যাপার এতদূর গড়ানো উচিত হয় নাই। "ছাত্র ধারা মানিতে হবে"—ইহার বীভৎস রূপ প্রকাশ পাইয়াছে আলীগড়ে। উপাচার্য নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীনে রহিয়াছেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পদত্যাগ পত্রও পাঠাইয়াছেন। শিক্ষাবিদ্ মাত্রেরই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন, তিনি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাম্প্রদায়িকতার হাত হইতে রক্ষা করিবেন। আলীগড়ে হিন্দু উপাচার্য দিয়া এবং কাশীতে মুসলমান উপাচার্য দিয়া। এত সহজেই সাম্প্রদায়িকতার হাত হইতে মুক্তি পাইলে তো কথাই ছিল না। তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, ভগবান তাঁহার সহায় হউন। জিনিসটা ঘুলাইতে দেওয়া ঠিক হইবে না। আলীগড়ের ঐতিহ্য বিবেচনা করিয়া তাহার উপযোগিতা স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে কোথায় বাড়িয়াই চলিবে, না দুর্বিনয়

ও সাম্প্রদায়িকতার তাহা কেন্দ্র হইয়া ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলঙ্কিত করিয়া উঠিতেছে।

স্মরণে

মুরারীচাঁদ কলেজ ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮৫—১৯৬৫) সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যে ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তিনি অনেক কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখিয়া তিনি চলিতেন। ছাত্রদের সহিত এই অন্তরঙ্গতার ভাব তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের উপর একটা মাধুর্য বিস্তার করিয়া শিক্ষক জীবনের পরিপূর্ণতা বিকশিত করিয়াছিল। তাঁহার আত্মজীবনী Old memories in a New Age আট বৎসর পূর্বে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বহু চিত্তাকর্ষক কথা আছে। লেখকের অনেক সতীর্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে বহু রেখাপাত করিয়াছেন। গ্রন্থের ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী স্বয়ং এই গ্রন্থের প্রাক্-কথন বা পরিচায়িকা লিখিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার পুত্রকন্যা সকলেই কৃতী, সুতরাং তিনি পিতার কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

সুরবালা ঘোষ

মিস্ সুরবালা ঘোষ ১৯১৩ সালে লেডী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার কর্মকাল কম সময়ের। কিন্তু তাহার পর তিনি সরকারী বিদ্যালয় পরিদর্শিকার লাইনে চলিয়া যান। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শিলিগুড়িতেই জীবন কাটাইয়া দেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যুর কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কর্মময় জীবন স্মরণ করি।

মুখ্যমন্ত্রীর জাপান ভ্রমণ

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জাপান পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। জাপান স্বদেশী যুগে আমাদের আদর্শ ছিল। জাপানের যুযুৎসু শুধু নয়, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি শিখিবার জন্য এদেশ হইতে লোক গিয়াছে। আশা করি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বহু তথ্য প্রকাশ করিবেন এবং যোগাযোগের বহু সূত্র লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু একটা জাতি হইতে ভাল ভাল জিনিস শেখা সহজ নয়। শুনিয়াছি জাপানে কাজের সময় হইল ১২ ঘণ্টা, সকাল ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৮টা। আমরা যে, এতক্ষণ কাজ করার কথা ঘুরে থাকুক ছুটিকেই শিকার কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়া লই। জাপানে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের জলযোগের জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাহার প্রতি আমাদের মন দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে এমনিতেই খাদ্যাভাব, সেখানে অন্যের সাহায্য ব্যতীত আমরা আমাদের ছোট ছেলেমেয়েদের খাদ্য কতদূর জোগাইতে পারিব? পারিলে যে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে তাহা তো সুনিশ্চিত।

আর একটি মাত্র কথা। ছোট ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মায়েদেরও শিক্ষা হয়—এ দৃশ্য আমরা তার নগরে দেখিয়াছি। অধুনা মুগ্ধ ধরিণীমূর্তি প্রতিষ্ঠানের মন্টেসরী বিভাগে শিশুদের তাল শেখানোর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ শিক্ষক গিজু ভাই শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহার হল-ভরা গুজরাতী মায়েরা ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া শুনিতেছেন। নানা আন্দোলনে আমরা যে আমাদের সংস্কার ধরিয়া রাখিতে পারি না, ইহাই দুঃখের কথা।

যাহা হউক আমরা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের অভিজ্ঞতা প্রকাশনের ও এ দেশে তাহা রূপায়নের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব।

ইংরেজী পড়ানোর মান উন্নয়ন

পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত এক কমিটি সম্প্রতি ১৯৫৭ সালের স্কুল ফাইন্যাল ও ১৯৬২ সালের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মান উন্নীত হয় নাই। তথাপি ইহাকেই মাধ্যম করিলে ছাত্রছাত্রীদের যে বোধশক্তির খর্বতাই হইবে, একথাটা আমরা কেন এখনও বুঝিতে পারি না, তাহাই আশ্চর্য। পাঠ্যপুস্তক প্রায় উঠাইয়া দিয়া এবং অন্যবিধ বহু সংস্কার সাধন করিয়া আমরা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আলোচ্য কমিটির সিদ্ধান্ত দেখিয়াও কি আমাদের জ্ঞান হইবে না?

আদর্শবাদী শিক্ষক

ক্রীটো—

দীর্ঘ পথ চলে গেছে—যাত্রীদের মুখের দিকে তাকালেই অবাক হয়ে যেতে হয়—নরনারী সকল যাত্রীদের মুখেই একটা একটা নির্দিষ্ট ছাঁচ আছে। পোষাক পরিচ্ছদ প্রায় একই রকম, দীর্ঘাকৃতি মুবক্ষন্ধ, মুখের উপর একটা সৌম্য ভাব ও পরম প্রশান্তি যেন লেগে আছে।

এই যাত্রীদের মধ্যে আমরা যেন চিনতে পারি সেক্রোটিসকে—তাঁর শিষ্য ও বন্ধু প্লেটোর লেখার মধ্য দিয়ে তাঁকে জানি। চিনতে পারি সেক্রোটিসকে, তাঁর সেই মৃত্যুশয্যায়, যখন তিনি হাসতে হাসতে বিষের গ্লাস নিলেন তাঁর কারারক্ষীর হাত থেকে, আর কারারক্ষীর চোখে জল—সর্বদা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তিনি। যা ন্যায়-সঙ্গত তাই তিনি করতে বলেছিলেন। তাঁর নামে অভিযোগ করা হোল, তিনি এথেনীয় যুবাদের স্বভাব বা চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছেন। তাঁর বিচার-প্রহসনের সময় তিনি বলেছিলেন,

আপনারা মৃত্যুর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন—মেনে রাখুন, জীবনে মরণে সজ্জনের কোনও অমঙ্গল ঘটতে পারে না···আমার ছেলেরা যদি বড় হয়ে ধর্ম অপেক্ষা ধন সম্পদের দিকে ছোটে, আর যদি প্রকৃত কিছু না হয়েও কিছু হওয়ার ভান করে, তবে তাদের তিরস্কার করবেন, যেমন আমি আপনাদের তিরস্কার করেছি।...কেউ হয়তো বলবে, সেক্রোটিস, চুপ করে কেন থাকো না! বিদেশে চলে যাও, সেখানে কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করবে না। এর উত্তর আমি হয়তো বোঝাতে পারবো না আপনাদের, কিন্তু যদি চুপ করে থাকি তাহলে আপনারা আমাকে এ বিষয়ে ভুল বুঝবেন। আমি তোমা আপনাদের বলে থাকি যে ধর্মই হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, আর জীবনকে পরীক্ষা করে যাচিয়ে নিতে হবে, সে সমস্ত বলা অনর্থক হবে, সে সমস্ত বলা অনর্থক হবে, যদি আমি আপনাদের কথা শুনে মৌন অবলম্বন করি।"

সেক্রোটিস বলেছিলেন, মানুষের চাই জীবনকে পরীক্ষা করা, আত্ম পরীক্ষার মনুষ্যত্ব, যে জীবনে আত্মপরীক্ষা নাই সে জীবন জীবনই নয়। বহু শতাব্দীর পরে ফরাসী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক পাস্কালও বলেছিলেন,—মানুষ ভঙ্গুর, শরগাছের মত, কিন্তু তার চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে, আর এই ক্ষমতাই তাকে দিয়েছে মর্যাদা। মানুষের মনের রাজ্যে এমন সব জিনিষ আছে যার জন্য বাঁচা সার্থক, মরণও সার্থক- সুতরাং মনোরাজ্য কথার কথা নয়—সেক্রোটিস এ কথাও বলে গেছেন। এই কথাটাও মনে রাখা উচিত। শিক্ষকদের আদিগুরু সেক্রোটিস এই কথাটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রায় দুহাজার বৎসর চলে গেছে তবু এ কথাটা উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেমন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে আছে, বুদ্ধদেবের কথা, উপনিষদের কথা। কত পুরাতন, তবু নূতন, আমরা বলি শাশ্বত বাণী।

এই ধরণের শিক্ষক ছিলেন অ্যালকট। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর প্রতিবেশী সমাজে—তাঁর বাড়ি ছিল সংযুক্ত রাষ্ট্রের কনেকটিকাটে—বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ৩ বৎসর সেখানে শিক্ষকতার পর বোষ্টন ও অন্যান্য স্থানে শিক্ষক হয়ে যান। তিনি গতানুগতিক ছিলেন না। নতুন নতুন বিষয় পাঠক্রমের মধ্যে আনতেন। তার

একটি ছিল সাধারণ একটু জিমনাষ্টিকস। গল্প যা পড়াতেন ক্লাসে তা নাটকীয় রূপে বলতে আরম্ভ করলেন। অভিভাবকেরা চটে গেলেন—নাচ, গান, নাটক—বিদ্যালয়ে এসব কেন? রবি ও নানাবিধ শিল্পবস্তু দিয়ে ছেলেরা সাজাতে ভাল বাসতেন। তার উপর একটি নিগ্রো মেয়েকেও ইস্কুলে ভর্তি করে নিলেন। অভিভাবকদের ধৈর্য আর রইল না, তাঁরা একে একে সমস্ত ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নিলেন—অ্যালকট স্কুল থেকে চলে এলেন, তাঁর সাহসের জন্য সমস্ত হারাতে হলো।

তিলক মহারাজের কথা মনে পড়ে। ছেলেবেলায় তিনি খুবই সবল ও সুস্থ, এবং দুর্দান্ত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে চারজন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি নিউ ইংলিশ স্কুল আরম্ভ করেন। ১৯টি ছাত্র নিয়ে ইস্কুল আরম্ভ, ৫ বৎসরে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১২০০ বারো শতে। বেতন? শিক্ষকেরা মাসে ৩০।৩৫ টাকার বেশি পেতেন না, যদিও ৭৫৲ ঠিক করা ছিল। তাঁদের উৎসাহই যে ছিল আসল মূলধন।

গোপালকৃষ্ণ গোখেল ছিলেন এরূপ আর একজন শিক্ষক। পুণার ফার্গুসন কলেজে তিনি ইংরেজী ও অঙ্ক পড়াতেন। প্রয়োজন হলে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা Political Economyও পড়াতেন। বার্কের Reflections on the French revolution পড়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ও ক্রিকেট এবং বিলিয়ার্ড খেলায় নৈপুণ্য ছিল ছেলেদের পক্ষে মস্ত আকর্ষণ। রচনার সময় কখনও তিনি তাড়াহুড়া করতেন না। পড়াবার সময়ও কোন কথা এড়িয়ে যেতেন না। পরবর্তী জীবনে তিনি যখন বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ সুরু করেন তখন এই শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা খুবই কাজ লেগেছিল।

আর একজন কৃতী শিক্ষকের কথা উল্লেখ করে শেষ করবো। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার 'নিগ্রো জাতির কর্মবীর' নামক পুস্তক এঁর পরিচয় দিয়েছেন। নিগ্রো দাসীর সন্তান হয়ে তিনি আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত নিগ্রোদের জন্য হ্যাম্পটন ইনষ্টিটিউটে শিক্ষালাভ করেন। আমেরিকা সংযুক্ত রাষ্ট্রের অন্তঃ কলহে একটি নিগ্রো রেজিমেণ্টের সেনাপতি ছিলেন। বুকার টি. ওয়াশিংটন এই ইনষ্টিটিউটের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজে ১৮৮১ খ্রী: টাস্কেগীতে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরম্ভ করেন। তিনি একথা স্বীকার করেন যে সামাজিক সব ব্যাপারে নিগ্রো ও ইউরোপীয়দের মধ্যে হাতের আঙুলের মত ফাঁক থাকলেও কিন্তু পরস্পরের সহযোগিতায় একটা গোটা হাতের মতই কর্মঠ। তিনি নিগ্রোদের হাতের কাজ শেখার দিকে জোর দিতেন, তাদের চরিত্রের সদ্গুণের উপর জোর দিতেন, আজও সমগ্র নিগ্রোজাতি তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গান্ধীজীর পথে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর।

এই সব শিক্ষকদের মধ্যে দেখি শিক্ষকদের আদর্শবাদ।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিবিধ কৃতি ও বাঙালীর কর্ত্তব্য

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের (personality) কথা, তিনি মানুষটি কিরূপ, তাহার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া, যাহা করিয়াছেন তাহার কথা, তাহার কৃতির কথা বলিতে গেলে তাহাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়;—প্রথম, তিনি যাহা লিখিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার রচনাবলী (গানগুলি তাহার অন্তর্গত); দ্বিতীয় বিশ্বভারতী। এই উভয়ের মধ্যে যোগ আছে।

যাঁহারা তাঁহার এই কৃতির দুই অংশেরই গুণগ্রাহী, তাঁহাদের রবীন্দ্র জয়ন্তী করা বা তাহাতে যোগ দেওয়া পূরা আন্তরিক। যাঁহারা তাঁহার কৃতির মধ্যে অন্ততঃ রচনাবলীর বা অন্ততঃ বিশ্বভারতীর গুণগ্রাহী, রবীন্দ্র জয়ন্তীর সহিত তাঁহাদেরও যোগ অনেকটা আন্তরিক।

তাঁহার রচনাবলীর গুণগ্রাহিতার প্রমাণ দেওয়া যায় ও পাওয়া যায় যদি আমরা সেগুলি পড়ি, অধ্যয়ন করি। যত্নের প্রমাণ আরও ভাল করিয়া দেওয়া যায়, যদি ক্রয় সমর্থ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী মহিলা ও পুরুষ তাঁহার বইগুলি কিনিয়া বাড়ীতে রাখেন ও পড়েন। তাহাতে তাহাদের আনন্দ ও চিত্তোৎকর্ষ হইবে। অনেকে পান তামাক বিড়ি সিগারেট সিনেমায় খরচ করিতে পারেন, কিন্তু কবির পুস্তকগুলি কিনিতে গেলে কল্পনা করেন তাঁহাদের সামর্থ্য নাই। অথচ আমরা ইউরোপের কোন কোন হোটেলের ভৃত্যদিগকে তাহাদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বাহির অনুবাদ কিনিয়া তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর লইতে দেখিয়াছি।

কবির বহিগুলি ক্রয় করিবার আর এক দিক্ দিয়া হিতকারিতা আছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সমুদয় লাভ বিশ্বভারতী পান। বিশ্বভারতী যত টাকা পাইবেন, কবির শিক্ষা পরিকল্পনা সেই পরিমাণে বাস্তবাকার ধারণ করিতে পারিবে। সুতরাং যাহারা কবির গ্রন্থসমূহ ক্রয় করিয়া তাঁহার প্রতিভার গুণগ্রাহিতার ও তাঁহার কবিত্বের মর্ম্ম-গ্রাহিতার পরিচয় দিবেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা বিশ্বভারতীরও গুণগ্রাহিতার প্রমাণ পরোক্ষভাবে দিবেন।

বিশ্বভারতীকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেন তাহা অতি সংক্ষেপে বলি। গান্ধীজীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ১৯৪০ সালের ২রা মার্চের হরিজন পত্রিকায় বাহির হয়। সেই চিঠির মধ্যে কবি বলিয়াছেন, "Visva Bharati is like a vessel which is carrying the cargo of my life's best treasure" "বিশ্বভারতী একটি নৌকার মত যাহা আমার জীবনের সর্ব্বোত্তম ধনরত্ন বহন করিয়া চলিতেছে।" ইহা কবির একটি খেয়াল নহে। আমরা কখন ইহাকে সে চোখে দেখি নাই।

বাঙালী জাতির মধ্যে কাহারও রবীন্দ্রনাথের কৃতির গুণগ্রাহিতা নাই, আমাদের ধারণা এরূপ নহে। অগণিত লোকের আছে। আমাদের আবেদন এই যে, যাঁহাদের আছে তাঁহারা "কেজো" হউন, তাঁহাদের গুণগ্রাহিতা বাস্তবরূপ ধারণ করুক। তাঁহারা অনেকেই বিশ্বভারতীর আজীবন বা সাধারণ সভ্য হইতে পারেন, কবির রচনাবলী কিনিতে পরেন, অন্ততঃ প্রতিমাসে তাঁহার একখানি করিয়া ছোট বহি কিনিতে পারেন। যাঁহাদের এরূপ সামর্থ্যও নাই, তাঁহারা তাঁহার কোন-না-কোন আদর্শের সফলতার জন্য পরিশ্রম করুন। আমরা সকলে এইভাবে কাজ করিলে রবীন্দ্র জয়ন্তী আন্তরিকতাপূর্ণ ও সার্থক হইবে।

—প্রবাসী, চৈত্র ১৩৬৮

বয়স্ক শিক্ষায় বাক্যক্রমিক পদ্ধতি

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়

ইংরেজি ১৯৪৭-৪৮ সালে বাণীপুরে সাহিত্য কর্মশালা চলার সময়ে, বয়স্ক প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মশালার নির্দেশ-বহির্ভূত এই রচনাটি লেখা হয়। কর্মশালার সাময়িকপত্র হিসাবে ইহা প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। দুই এক জন নবীন লেখক-শিক্ষার্থী এই লেখায় সহযোগিতা করেন, কয়েকজন নিজেদের রচনা থেকে পাঠ ও সংকলন করে দেন। কাজ শেষ হলে, অন্যান্য বইএর সঙ্গে এই বাড়তি বইখানাও 'দাও' হিসাবে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত উপস্থিত করা হয় প্রকাশের জন্য, কিন্তু তালিকা-বহির্ভূত বই তাঁরা অস্বীকার করেন। এতদিন রচনাটি আমার কাছেই পড়ে ছিল। বই হিসাবে এর প্রকাশের আর কোন সম্ভাবনা নাই। তাই শিক্ষাবিদ্ পুরীদের বিবেচনার জন্য লেখাটি পত্রিকায় দেওয়া হল

বইখানি বাক্যক্রমিক। বাক্য থেকে পড়া আরম্ভ করতে হবে। বাক্যের সঙ্গে পরিচয় হবার পর শব্দ ও তার পরে অক্ষর ও স্বরচিহ্নের পরিচয়। তার পর আবার সেই অক্ষর ও স্বরচিহ্ন যুক্তে নূতন শব্দ ও বাক্যের রচনা।

কয়েকটি পাঠ আয়ত্ত হবার পর ধীরে ধীরে পুরোনো পাঠ থেকে বিশ্লেষণের কাজ আরম্ভ করা ভাল। পুরোনো পাঠের বিশ্লেষণ ও সেই বিশ্লেষণে পাওয়া শব্দ, অক্ষর ও স্বরচিহ্ন দিয়ে নূতন শব্দযোজনা ও বাক্যরচনা করা, প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একান্ত দরকার।

সংখ্যায় পাঠ-সংখ্যা বোঝাচ্ছে

স্বর

অ[১] আ[২] ই[৩] ঈ[৪] উ[৫] ঊ[৬] ঋ[৭] এ[৮]
ঐ[৯] ও[১০] ঔ[১১] ং[১২] ঃ[১৩] ঁ[১৪]

ব্যঞ্জন

ক[১] খ[২] গ[৩] ঘ[৪] ঙ[৫]
চ[৬] ছ[৭] জ[৮] ঝ[৯] ঞ[১০]
ট[১১] ঠ[১২] ড[১৩] ঢ[১৪] ণ[১৫]
ত[১৬] থ[১৭] দ[১৮] ধ[১৯] ন[২০]
প[২১] ফ[২২] ব[২৩] ভ[২৪] ম[২৫]
য[২৬] র[২৭] ল[২৮] শ[২৯] ষ[৩০]
স[৩১] হ[৩২] ড়[৩৩] ঢ়[৩৪] য়[৩৫]
ৎ[৩৬]

স্বর

পাঠ সংখ্যা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	অ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ও
	আ						ঐ	ঔ
								ং
								ঃ
								ঁ

ব্যঞ্জন

পাঠ সংখ্যা					
১	ও	ন	ত	ম	র
২	ক	খ	দ	ব	য
৩	চ	জ	ল	শ	ষ
৪	ছ	ঝ	ট	ড	ধ
৫	গ	ঘ	ঙ	স	চ
৬	ঝ	ঠ	ঞ	ঢ	হ
৭	ড	ঞ	ঋ	ক	
৮	ৎ				

প্রথম

অ আ—।

ভাত আন।

মা ভাত আন।

অন্ত ভাত খা।

মামা আম আন।

ভাই আর আম।

অমন আম না।

ত ন ও ম র

ত + অ — তা ম + আ — মা

ম + আ — মা

অত অমন আম আম আর না

তাত মা মামা

দুই

ই — ি

বই কই ?

মতি, বই আন।

বই আর খাতা আন।

মাই দিদি বই আনি।

আর আমি খাতা।

বই কই ?

বই খাই।

মমন, বই আন।

খাই তাই, বই খানি।

মা বই আন।

আমি বই আর ভাত খাই।

আর খাব আম

আতা খাব না।

ক খ দ ঘ ব

ত + ই — তি দ + ই — দি

ম + ই — মি ম + ই — মি

আতা আমি আমি কই খাই খাতা খাব

বই দিদি নাই বই তাই মই

মতি মমন যাই

তিন

ঈ — ী

ঈশান, বই কই ?

চিনি আন।

চিনি আর নদী আন।

চিনি কম।

ঈষৎ চিনি দিই।

মাসতী নদীর জল আন।

নদীর জল ভাল।

আমরা নদীর জল খাই।

আজ ভারী শীত

জামা আন।

নদী, আমি কালী যাব।

আজ যাব না।

কাল যাব।

চ জ ল শ ষ

চ + ই — চি জ + ই — জি

ল + ই — লি শ + ই — শি

ষ + ই — ষি

আমরা ঈশান ঈষৎ কম কাল কালী চিনি

জল জামা নদীর নদী যাব শীত

আনুষঙ্গিক

বর বাস করবার

দরকার কি

তিন আনা মুড়ি দিন

আচ্ছা আমি দিই।

চার

উ —

উমা মুড়ি আন।

মুড়ি আর গুড়।

আর আন কলা।

মুড়ি গুড় কলা খাব।

রুটি চাই না।

টাকা দিই।

মুড়ি ভরা মাছ আন।

রুই, কাতলা, কই।

মাছ ভাল

আমরা ভাজা মাছ আর ভাত খাব।

কাল-মাছ খাব না।

রাখাল গরু চরায়।

মধুর গরু।

বহুর বাহুর।

দুইটি পক্ষ আর তিনটি বাহুর।

চ ড ছ ঝ ব

ব + উ—বু দ + উ—দু ধ + উ—ধু

ম + উ—মু র + উ—র্, র

উষা কলা কাতলা পক্ষ চোখ বাঘ খুড়ি

টাকা তিনটি দুইটি দুধ ভাত ভাজা

ভরা বহুর মাছ মুড়ি বহুর

রাখাল রুটি

পাঁচ

উ —

উষা নূতন শাড়ি পর।

সাদা শাড়ি নয়।

লাল শাড়ি।

পরনা চাই।

কি পরনা?

রূপার পরনা।

ময়ূরটি কার?

ফুলপের ময়ূর না।

মণির ময়ূর।

বিড়ার পক্ষর দুধ ভাত।

পাতলা নয়।

গাঢ় দুধ।

আমরা গাঢ় দুধ ভালবাসি।

দুধ, মুড়ি আর শুদ্ধ ভাজা ভালবাসি

প ণ প ঝ চ ন

ব + উ—বু ভ + উ—ভু ম + উ—মু

র + উ—র্, র

উষা কার পক্ষর পরনা গাঢ় শুদ্ধ চাই

আর নূতন পর পাতলা বিড়ার

ফুলপের ভাজা ভালবাসি ময়ূর

ময়ূরটি মণির লাল

শাড়ি দাদা

ছয়

অ —

শুদ্ধ করি। ঘৃত খাই। শুদ্ধ দুধ খায়। আর ঘৃত কি জান? ঘি। ঘার করি। ঘি খাই। ভদ্র ঘি খায়। অমৃতও খায়।

যার নাম হরিণ তারই নাম মৃগ। মৃগ তৃণ খায়। তৃণ কি জান না? ঘাস। হরিণ ঘাস খায়।

ঠাকুরবাড়ি পূজা। পুরুতঠাকুর কই? ঐ যে ঠাকুরদালান। আসুন, আসুন। ঢাকী ঢাক বাজা।

খাবার আন। ডাল আন। ভাত আন। মাছ আন। মুগ ডাল। রুই মাছ। আর আম ছানা, চিনি, পায়স।

ঘ হ ঠ ড ঢ

ঘ + ক—ঘ্ ত + থ—ত্থ ম + ধ—ম্ধ

হ + ন—হ্ন

অমৃত আসুন শুদ্ধ ঐ খায় খাবার ঘাস ঘি ঘৃত ছানা জান ঠাকুরবাড়ি ঠাকুরদালান ডাল ঢাক ঢাকী তারই তৃণ ঘার পূজা পুরুত পায়স বাজা মুগ মৃগ ঘার হরিণ হৃদয়

আনুষঙ্গিক

পর ঘার করবার

দরকার কি,

নাতি তোর ভাল আছে

দেখে এসেছি।

সাত

এ — ে ঐ — ৈ

এটা লাল ফুল। সাদা ফুল নয়। তুমি ফুল নেবে? এটি পাকা আম। টক আম নয়। এই আমটা খাবে? না, ঐ আমটা খাব। খালা ভরা মিঠাই আছে। কি নেবে? ঐটে দেব। তুমি কি একা এসেছ? না, বাবার সাথে এসেছি। বটতলে ঠাকুমা বসে।

এটা বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশে নদী নালা। অনেক বড় বড় পুকুর। মিঞা ভাই, তুমি, আমি, আমরা সবাই বাঙালী।

বেলা যায়। তেল মেখে জলে ডুব দিয়ে আসি। ঐ তালপুকুরে যাইতে যায়। ঐ যে বড় তালগাছটা। তারই পাশে পুকুর। মিঞা সাহেব, যাবে না কি? এস, একটা ডুব দিয়ে কিছু খেয়ে নেবে।

খৈ আর দৈ আন
দৈ রাখ তুলে।
কৈ মাছ ভাজা খেতে
শৈল গেছে ভুলে।
হৈম শিসি দৈ পুকুরের পৈঠাটিতে বসে
শৈল দিদির সইকে ঘরে তৈল মাখায় কসে।

ঙ ঞ ণ ন

ন + এ—নে ব + এ—বে ছ + এ—ছে
ম + এ—মে ক + ঐ—কৈ খ + ঐ—খৈ
ঢ + ঐ—ঢৈ র + ঐ—রৈ

আমটা আমরা আমি আসি এই একটা একা এটা এটি এস এসেছ এসেছি ঐ ঐটে কৈ কসে খাবে খেয়ে খৈ গেছে জলে টক ঠাকুমা ডুব তারই তালগাছটা তালপুকুরে তুমি তেল তৈল খালা দৈ দিদির ঘরে সইদের যাইতে নেবে নদীনালা পাকা পাশে পৈঠাটিতে পুকুরের ফুল বাঙলা বাঙালী বড় বসে বাবার বৈ ভরা ভাই ফুলে মিঞা মাথায় মিঠাই যায় যাবে লাল শৈল সাদা সাথে সইকে সাহেব

আউ

ও — ো ঔ — ৌ

ং ঃ

ভোর হল। বোবা আসে। ও ভোলা বোবা। ঐ যে ওর পোষা গাধা। ওর পিঠে বোঝা।

ঐ কোঠাবাড়ি। ওখানে আজ বিয়ে। তাই ঢের ঘোড়া এল পাল্কি এল। এক ঘোড়া হাতি এল।

এলো এলো গৌর এলো। ওরে, দৌড়ে যা, চৌকি আন। গৌর হাতে শিশি কেন? শিশিতে ঔষধ দিতে হবে। ছেলের অসুখ। তুমি কি করে এলে গৌর? দৌড়ে। করে। কোথা থেকে এলে। গৌরীপুর থেকে। কবে এলে? পৌষ মাসে এসেছি।

হংস নাচে হংসী নাচে ঘুম ঘুম ঘুম
সোনা যাদুর তালুক নাচে ঘুম দাও ঘুম।

বাদল দিনে শহরে বাবু, ঘরে মাথায় ছাতা
গাঁয়ের লোকে মাথা বাঁচায় পরে পাতার ঠোকা।

লাঙল কাঁধে কৃষাণ যায়
রাখাল ছেলে বাঁশি বাজায়।

সিংহ মশায় সিংহ মশায়
মাংস যদি চাও
রাজহংস দিব খেতে
হিংসা ভুলে যাও।

আঃ, কি আরাম
এস দুঃখীরাম।
উঃ, কি শীত
কসে গাও গীত।

দেখ তোমাকে তো অনেককাল এদিকে বড় একটা দেখি না। বৈষয়ে এসে পড়েছ বুঝি।

উঃ, কি শীত। বেলায় শীত পড়েছে। এক পেয়ালা গরম চা দাও। আঃ, কি আরাম। শরীরটা গরম হল।

ত + ও—তো ব + ও—বো গ + ঔ—গৌ
ভ + ঔ—ভৌ হ + ং—হং ম + ঁ—মঁ
আ + ঃ—আঃ ম + ৎ—মৎ

অসুখ আঃ আজ আজকাল আরাম উঃ এক একটা এদিকে এস এসে এসেছি এসো ও ওখানে ওর ওরে ঔষধ কসে কাসে কোঠাবাড়ি করে কেন

কোথা হরিণ থেকে যাও যখন গাঁর গাড়ি পাবা
গাঁয়ের পৌর গৌরীপুর চা চাও ছাতা ছেলের
জোড়া টোকা ঢের তাই তো তোমাকে দিলে দুধ
রাম দুর্বীরাম দেখি দৈবাৎ দৌড়ে বোবা ধরে
নৌকো বাতন নাড়ে পড়েছ পাতায় পেয়ালা পোবা
পৌষ পিঠে গোবা বড় বাজায় বাদল ঘিরে বুঝি
বেমায় তোর তোলা তামুক ভুলে যাসে মাখা মাখায়
ধরায় মাংস যা যাও রায় রাজহংস লাউল
মিশি পহরে নীচ পরীহট।
সমৎ সিংহ দেরা ছাড়ি হংস
হংসী হিংসা হল

ব্যঙ্গ

মরমামতির গাড়ি পড়ে গাঁয়ের মেয়ে যায়,
তাই না দেখে গহনার পো অমাক হয়ে চায়।

গোপাল তার বৌএর চিঠি পড়াতে এনেছিল। সে কি যজার চিঠি! কত ইনিয়ে বিনিয়ে বৌটা লিখেছে যে এক জোড়া কানের দুল তার চাই-ই। নইলে সে গোপালের ঘর করতে আসবে না। গোপাল বেচারা চিঠির কথা শুনে মনমরা হয়ে গিয়েছে। একে তো বেশুনের পর পড়ে যাওয়ায় গোপাল এবার ফসল বেচে তেমন টাকা পায় নাই। তার উপর আবার বৌটা খামে টিকিট লাগায় নাই। গোপালকে দশদ চার আনা পয়সা গুনাগার দিতে হল। এক জোড়া কানের দুল কিনতে কম করেও এক কুড়ি দশ টাকা তো লাগবেই। বৌটার কি আবদার বল তো।

হাস্য

লোকে বাজার থেকে হাঁড়ি-পাতিল কেনার সময় সেটাকে টোকা দিয়ে বাজিয়ে নেয়। যাতে কোথাও এতটুকু চিড় বা ফাটা না থাকে। লোকে নূতন বৌ ঘরে আনার সময় তেমনই অনেকে ভাল করে দেখে শুনে তবে আনে। কত কথাই না বলা হয়। কত যাচাই দেখা হয়। এই ধরনের ঘটনা আমরা লেখা-পড়ার কাজেও তো দেখি। যা পড়েছি, যা শিখেছি, আমরা তা যাচাই করে নেবি। যাচাই করি কাজের ভিতর দিয়ে, কথার ভিতর দিয়ে। ছেলেমানুষের মত খাতা-কলম নিয়ে আর কারও কাছে যাচাই করাতে মন চায় না। তা নিজেই নিজেকে যাচাই করা চলে। তার অনেক উপায় আছে।

প্রণালী

সবুজ সার

কাঁচা গাছ মাটিতে মিশিয়ে দিলে তা থেকে ভাল সার হয়। তাকে সবুজ সার বলে। শণ ও কলাই-জাতের গাছকে এই কাজে লাগানো যায়। বৈশাখ মাসে দুই এক পসলা ভাল জল হলে বীজ ছিটিয়ে বুনে দিতে হয়। তার পর চারা গাছ গজাবার দেড় মাস পরে যেতে লাঙল দিয়ে গাছগুলি মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। পনেরো দিনে গাছগুলি পচে যায়। এক বিঘা জমিতে সবুজ সার করলে ষাট মণ গোবর-সারের কাজ পাওয়া যায়। সবুজ সার মাটিতে মেশাবার সময় দুটি দিকে নজর রাখা দরকার। গাছ যেন কচি ও সবুজ থাকে, কারণ বুড়ো ও শুকনো গাছ সহজে পচে না। আর মাটিতে যেন রস থাকে। মাটিতে রস না থাকলেও গাছ পচে না। এ ছাড়া সবুজ পাতা বা কচুরিপানা পচিয়েও ভাল সবুজ সার পাওয়া যায়।

ঝারো

আমাদের ছোট নদী

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।
চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।
কিচমিচ করে সেথা শালিকের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।

আর পারে আমরন, ওপারেন চলে,
খাঁয়ের বালুচরটা তারই ছায়াতলে।
তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে,
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।
সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে,
খাঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে।
বাসি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে,
বধূরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাজে।
আষাঢ়ে বাদল নামে নদী ভর ভর,
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ঘোলা খরতর।
মহাবেগে কল কল কোলাহল ওঠে,
ঘোলা জলে পাকগুলি ঘুরে ঘুরে ছোটে।
দুই কূলে রহে রহে পড়ে যায় সাড়া,
বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

ভেলো

বুনিয়াদী ধরন

দেশে এখন দুই ধরনে লেখাপড়া শেখান চলছে। এক আধুনিক ধরন, আর এক বুনিয়াদী ধরন।

আধুনিক ধরনে যারা লেখাপড়া শেখে তারা কম খাটতে চায়, বেশি আয় করতে চায়, আর সমাজে বড় বড় পদ বা বেশি বেশি মান পেতে চায়।

বুনিয়াদী ধরনে যারা লেখাপড়া শেখে তারা বেশি খাটিয়ে হয়, কম আয়ে খুশি থাকে, আর বড় পদ বা বেশি মানের উপর তাদের কোন লোভ থাকে না।

কোন ধরনটি ভাল?

ভোম্বল

চৌধুরী মশায়

চৌধুরী মশায়ের বাড়িতে মহা হৈচৈ পড়ে গেছে। চৌধুরী মশায় কাল রাতে যারা গেছেন। কিছু বলতে কিছু না, ভাল মানুষ, রাতে বিছানায় শুয়েছেন। ভোর বেলা আর উঠলেন না। দরজা খোলাই থাকে। মশারি ফেলা। পাশে ছোট চৌকির উপর জলের গেলাস যেমন তেমনই রয়েছে। ছেলেমেয়েরা এসে ডাকাডাকি করল। মশারি তুলে দেখল। চাদরে ঢাকা চৌধুরী মশায়ের কোন সাড়া নাই। একটুও নড়াচড়া নাই।

মেয়েরা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। ছেলেরা মশারিটা ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গেল। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। আপনার লোক সবাই এল। পড়শী আর কুটুমে বাড়ি ভরে গেল। সবার মুখেই এক কথা—আহা, বড় ভাল লোক ছিলেন গো।

চৌধুরী মশায়ের বয়েস হয়েছিল। বেশ শাঁসালো লোক। বিঘা-আশেক টাকা-কড়ি অনেক। অনেক দিন আগে বৌ মারা যান। তার পর থেকে চৌধুরী মশায় বড় মেয়ে-জামাইকে কাছে এনে রাখেন। আর আর মেয়েদেরও কাছাকাছি বিয়ে হয়েছে। তারাও মাঝে মাঝে কাছে এসে থাকে।

দেখতে দেখতে আর আর মেয়েরাও এসে পড়ল। শীত কাল। ভোর উঠেই মেয়েরা রোদে পা ছড়িয়ে বসে গুল্‌ বাছতে লাগল। বড় মেয়ে মনোরমা বলছে—বাবাকে তিনি কি ভালবাসাটাই বাসতেন। সেদিন ডেকে বললেন, যা কিছু তাঁর আছে সব তো আমাকেই দিয়ে যাবেন। সেজো মেয়ে অনুপমা বলছে—সে কি একটা কথা হল! সেবার বাবার অসুখের সময় যখন এলাম, আমায় সেবায় খুশি হয়ে বাবা বললেন, তাঁর সব কিছুই তো আমার ছেলেমেয়েদের দিয়ে যাবেন। তাতাই সব পাবে। এই রকম এক এক মেয়ে এক এক রকম বলতে লাগল।

এদিকে বাইরে বসে ছেলেদের আর জামাইদেরও সেই এক কথা। কে কত জমি-জমা টাকাকড়ি পাবে তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি।

চৌধুরী মশায় পাকা লোক। কে কি পাবে উইল করে তিনি ঠিক করে দিয়ে গেছেন। উকিলের

কাছে উইল। উকিলকে খবর দেওয়া হয়েছে। উকিল এল বলে।

উকিল এলে ভিতরের ঘরে সবাই ঠিকঠাক হয়ে বসল। উইলে কি লেখা আছে জানবার জন্য সবাই উদগ্রীব হতে লাগল। উইলের কাগজ বার করে উকিল পড়তে লাগল—

আমার বিষয়-আশয় টাকাকড়ি আমি কাউকে দিয়ে যাব না.....

ঘরে যেন বাজ পড়ল। সবাই একেবারে স্তব্ধ। সকলেই এ ওর মুখ চাইতে লাগল। হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়ায় মনোরমা চেঁচিয়ে উঠল—ওঁ, ওঁ, ওঁ.....

দরজায় চৌধুরী মশায় গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে। চৌধুরী মশায় বললেন—তোমরা আমাকে ভালবাস, না আমার টাকাকড়ি ভালবাস, যাচাই করে নেব বলে আমি মরার ভান করে শুয়েছিলাম। তোমাদের সবাইকে আমি এখন চিনে নিয়েছি। আমি কাউকে কিছু দেব না।

সবাই চুপ করে রইল। একজন সাহস করে বলল—টাকাকড়ি দিয়ে আপনি করবেন কি? কাউকে না কাউকে তো দিয়ে যেতে হবে।

চৌধুরী মশায় বললেন—আমি আবার বিয়ে করব।

প্রার্থনা

হে ভগবান, বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু আর বাংলার ফল ভাল হোক, ভাল হোক, ভাল হোক।

হে ভগবান, বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন আর বাংলার মাঠ ভরে উঠুক, ভরে উঠুক, ভরে উঠুক।

হে ভগবান, বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ আর বাঙালীর ভাষা ঠিক হোক, ঠিক হোক, ঠিক হোক।

হে ভগবান, বাঙালীর জীবন, বাঙালীর মন, আর বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন এক হোক, এক হোক, এক হোক।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর যে কখনও ইংরাজী, কখনও আমেরিকান, কখনও সোভিয়েট শিক্ষা প্রণালীর প্রভাব পড়িবে ঘটনাচক্রে তাহা বোধ হয় অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশের প্রয়োজন ও জাতির প্রয়োজন বুঝিয়া আমাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙালীর জগতে দাঁড়াইবার স্থান হইল শিক্ষার ভিত্তিতে। অন্নবস্ত্রের মত শিক্ষার ব্যবস্থাও দাবি করিয়া উদ্বাস্তু সর্বহারা বাঙালী প্রমাণ করিয়াছে যে, বাঙালী শিক্ষাপ্রাণ জাতি। তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে তাহার শিক্ষা প্রগতির উপর।

—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

পরীক্ষা—৩

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পূর্বপ্রবন্ধে "পরীক্ষা" ব্যাপারটি কি পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার কথা কিছু কিছু বলিয়াছি। কিন্তু প্রতিকার কি? খালি দোষ উদ্ঘাটন করাই তো যথেষ্ট নয়। ইহার নিরাকরণের উপাও আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। এই ব্যাপারটিকে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে আলাদা করিয়া দেখা হয়ত সম্ভব নয়, তবু আশু প্রতিকারকল্পে ইহার জন্য কিছু এখনই করা দরকার।

উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ের কথাই বলিতেছি। পাঠ্যবিষয়ের উপর ছেলেমেয়েদের পড়ায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বিষয়টি অজানা বা অল্প জানা থাকিলে পরীক্ষার হলে বসিয়া তাহারা হাবুডুবু খায়, চোখে সর্ষে ফুল দেখে। একজনের কথা জানি, একটি বিষয় খুবই কম পড়ার দরুণ পরীক্ষার হলে গিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া যায়, কিছুক্ষণ এটা সেটা ভাবিতে ভাবিতে ঘণ্টা হয়ে এবং ঘণ্টা দেড়েক পরে বাড়ি চলিয়া আসে। অথচ এই ছাত্রীটি অন্য সব বিষয়ে ভাল এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় ভাল পাসই করিয়াছে। পরীক্ষায় অপরাপর ছাত্রীদের চেয়ে অন্তত বেশি পাইয়া সে প্রথম কি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিত। একটু খুঁৎ থাকায় প্রমোশন পাইল বটে কিন্তু কোন স্থান লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। এমনটি কেন হয়?

পরীক্ষা বিষয়টিকে আমি দুই ভাগে ভাগ করিতে চাই—(১) ক্লাসী পরীক্ষা এবং (২) ফাইন্যাল পরীক্ষা। আজকাল দেখি বৎসরে দুইটি মাত্র পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রচলিত। যাহারা ফাইন্যাল পরীক্ষার্থী তাহাদের বেলায় শেষ দশম বা একাদশ ক্লাসে প্রি-টেস্ট নামক আর একটি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা এখন বলিতেছি না। বৎসরে পড়ার ছাত্রছাত্রীদের কিরূপ উন্নতি হইল তাহার নিরিখ বা হিসাব নিকাশ করার ব্যবস্থা এই মাণ্ডাসিক এবং বাৎসরিক পরীক্ষার মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। অনেকে মাণ্ডাসিক পরীক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত নন। যদি কোন কারণে ছেলে বা মেয়ে বাৎসরিক পরীক্ষা দিতে না পারিল তাহা হইলে মাণ্ডাসিক পরীক্ষার ফল দেখিয়াই তাহাকে উপরের ক্লাসে তুলিয়া দেওয়া রীতি। যে সব ছেলে মেয়ে প্রথম পরীক্ষাটি স্বেচ্ছায় বা সঙ্গত কারণে না দেয় তাহাদের ভাবি নিষ্ফল।

এখন বালক বালিকা উভয় বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীর কি ভিড়। কর্তৃপক্ষ ত্রৈমাসিক পরীক্ষা লন না বা লইবার প্রয়োজন বোধ করেন না। ঐ দুইটি পরীক্ষার দ্বারাই তাহাদের ভাগ্য নিরূপিত হয়। পাঠে উৎকর্ষ বা অপকর্ষের নিরিখও ইহার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। তবে ভিড়ের অজুহাতে, অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে হয়তো যুক্তি দেখান হইবে কিন্তু ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিলে ভিড় সত্ত্বেও এরূপ যুক্তি দেখান ঠিক হইবে না।

আমি পূর্বে কোন কোন প্রবন্ধে মাণ্ডাসিক পরীক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের সময়, সেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে একটি রীতি চালু হইয়াছিল তাহার পুনঃপ্রবর্তন হইলে আজিকার দিনে মনে হয় খুবই সুফল পাওয়া যাইবে। তখন এখন কোন কোন উচ্চ শ্রেণীতে কোন কোন বিষয়ে মাঝে মাঝে পরীক্ষা লওয়া হয়, কিন্তু যতদূর মনে হয় উহা প্রায়ই নামকাওয়াস্তে।

অধিকাংশ পীরিয়ডই হওয়ানে চল্লিশ মিনিটের, আগেকার মত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের নহে। বিষয় বাহুল্য ঘটিয়াছে, কটিনকারীরা কি করিবেন? এই চল্লিশ মিনিটের মধ্যে শিক্ষয়িত্রীর ক্লাসে আসিতে যাইতে কখন কখন দশ মিনিটও কাটিয়া যায়। তিনি প্রশ্ন দেন, ছাত্রেরা তাহা লেখে। উত্তর লিখিতে হয়তো পঁচিশ ত্রিশ মিনিটের বেশি সময় পায় না। এরূপ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। তবে আধা-বিচ্ছিন্নভাবে ইহা গ্রহণ করিলে ফল অবশ্যই ভাল হয় না। এই সব সামান্য ক্ষেত্রেও সকলকারীদের উৎপাতের দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদান করিয়াছি। তাহা পড়িয়া এই রকম কোন কোন বিষয়ে সাময়িক: পরীক্ষা লওয়া হয় তাহা [illegible] বা লওয়ার উপকার বা ইহার উপর শুরু না দেওয়ার উপকার দর্শিতেছে না। তাঃ [illegible] এখন আমার মূল বক্তব্য আসি।

[illegible] সময়ে, সাপ্তাহিক পরীক্ষার চল ছিল। এ সম্বন্ধে আগে [illegible] বলিয়াছি। কিন্তু প্রয়োজনবোধে পুনরাবৃত্তি অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। পাঠক পাঠিকা আমাকে ক্ষমা করিবেন। প্রতি শনিবার এক-একটি বিষয়ের পরীক্ষা হইত দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী। চার কি পাঁচ সপ্তাহে যে বিষয়ে যতটুকু পড়িতাম তাহার উপরে পরীক্ষা। শিক্ষক মহাশয় পঠিত বিষয়ের উপর এমন প্রশ্ন দিতেন যাহাতে এই সময়টা লাগিতে পারে। কাজেই ভাবিয়া দেখুন; এক মাস সওয়া মাসে বিদ্যালয়ে এক-একটি বিষয়ে যাহা পড়ান হইত তাহা আমরা এই পরীক্ষা উপলক্ষে একেবারে ঘোলত করিয়া ফেলিতাম। তখন সকলের বাসাই একরূপ ছিলই না। কারণ সকলকারীর উপদ্রব সম্বন্ধে এখন যাহা শুনি তাহা তখন আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল। একবার আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এই সাপ্তাহিক পরীক্ষাগুলির [illegible] বন্ধ করিয়া কিরূপে বাৎসরিক পরীক্ষাগুলির সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন এবং আমাদের পাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আগে বিশদভাবে বলিয়াছি। যাহারা ভাল ছেলে, এই ব্যবস্থায় তাহারা উপকৃত তো হইতই, যাহারা মন্দ ও মাঝারি গোছের, তাহাদের নিয়মিত পড়ায় বেশ চাঙ্গ আসিত।

এই প্রকার সাপ্তাহিক পরীক্ষার উপকারিতা যে কত সে বিষয়ে এখানে খানিকটা আলোচনা করা যাক। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। সপ্তম কি অষ্টম শ্রেণীর একটি মেয়েকে দেখি, সে বারখানেক বা আরও বেশি সময় ধরিয়া একটি মাত্র ইংরেজী রচনাই পড়িতেছে। কৌতূহল বশে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এই রচনাটি পাঠ্য বইয়ের মাত্র চারপৃষ্ঠা ব্যাপী। কিন্তু শিক্ষক মহাশয় ঐ সময়ের মধ্যেও পড়াইয়া উহা শেষ করিতে পারেন নাই! কোনদিন কামাই, কোন দিন আসিয়া একবার মাত্র দর্শন দিয়া যান, কোনদিন পীরিয়ডের আধাআধি সময় অন্যত্র কাটাইয়া ক্লাসে ঢোকেন এবং সাত তাড়াতাড়ি দু চার লাইন মাত্র পড়ান। এই রকমে চার পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়া গেল। মনে রাখিবেন ঐ সময় কোন দুর্ঘটই ছিল না, বড় রকমের ছুটি ছাটাও ছিল না। চার-পাঁচ সপ্তাহ অন্তর অন্তর প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা থাকিলে এমনটি হইতে পারিত না। ছেলে মেয়েরা রীতিমত পড়াশুনা করিত, শিক্ষক বা শিক্ষিকা এতাদৃশ গাফিলতি করিবার অবসর পাইতেন না। আজ শিক্ষক উত্তরের মধ্যে আজ গলতি হয়ে উঠিয়াছে। ইহার সার্থক প্রতিশেধ করে ঐ রকম ব্যবস্থা চালু করা যায় না কি?

দুর্ঘটের কথা বলিলাম। কে দুর্ঘট ডাকে, কি তার দুর্ঘট হয় ছেলে মেয়েরা (অন্ততঃ সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীরও) খোঁজ খবর রাখে না। কিন্তু দেখি দুর্ঘটের কথা শুনিলে তাহারা কতটা না উৎফুল্ল হয়। কিছুদিন আগে একটি ছেলেকে বলিতে শুনি,

কাগজে ছাত্র ধর্মঘটের কথা বাহির হইয়াছে, ভুল হইবে না: তাহার কথার সূত্রটি যেন উপটাইয়া পড়িয়াছে। খবরের কাগজে ধর্মঘটের সংবাদ বাহির না হইলে তাহারা উহা জানিতে পারিত না। সব জায়গায় ছাত্র সংঘ নাই। কিন্তু আজ অজ পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত পত্রিকার ছড়াছড়ি। অনেকদিন হইতে আমি এই ধরণের কথায় কথায় ছাত্র ধর্মঘট নিবারণের কি কোন পন্থা নাই? নেতারা ধর্মঘট করেন, তাহাতেও ছাত্রদের সহানুভূতি, এবং সাত পাঁচ না ভাবিয়া সহানুভূতি দেখাইবার জন্য ধর্মঘটে তাহারা যোগ দেয়। বয়স্ক ধর্মঘটকারীদের মধ্যে শ্রমিক আছেন, শিক্ষক আছেন হয়তো আরও কোন কোনো শ্রেণীর লোক থাকেন।

আর একটা ফ্যাসাদ এই হইয়াছে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্ব স্ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ছাত্র সমাজকে সংঘবদ্ধ হইতে প্রয়োচিত করে এবং ইচ্ছামত তাহাদের কাজে লাগায়। এই দলগুলির আরও অভিসন্ধি থাকে, অর্থ সম্বন্ধে তাহারা বিভিন্ন অপরিণত বয়স্ক ছাত্রকুলকে তাহারা নিজেদের মতানুবর্তী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। দেখে এই যে দুই চক্রের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা ছাত্র সমাজকে তো বিভ্রান্ত করিতেছেই, পরন্তু আমরা যে স্বাধীন এবং আমাদের উপরে কত দায়িত্বভার অর্পিত এইরূপ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতেও তাহারা বঞ্চিত এবং বলিতে দুঃখ হয় ইহা হইতে তাহারা ক্রমে বহুদূরে সরিয়া যাইতেছে। ছেলেমেয়েদের মৌলিক শিক্ষার ব্যাপারে ইহা যে কিরূপ বিঘ্ন ঘটায় তাহা এখন হয়তো-বা পাঠককে বেশি করিয়া বলিতে হইবে না। আমার একটি প্রস্তাব এই যে, যে কোন অবস্থায়ই হোক ছাত্র ধর্মঘটকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। যাহারা ছাত্র ধর্মঘট ডাকিবে, তাহারা যত প্রতিপত্তিশালী হোক না কেন তাহাদের দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দরকার আইন না করিয়াও পরীক্ষার্থীদের একত্র অনুরোধ করিতে পারেন, যাহাতে সমাজবিরোধী সংবাদ বা ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়া ছাত্রসমাজের ক্ষতি না করে। অর্থাৎ আমি বলিতে চাই, ছাত্র ধর্মঘটের সংবাদ কাগজে বাহির করা হইবে না।

এই বিষয়টির উল্লেখ দ্বারা আমার বক্তব্য হয়ত আরও স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে পারিব। আমি সাপ্তাহিক পরীক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতেছি। যেমন শিক্ষক শিক্ষিকার গতির কথা বলিলাম তেমনি দীর্ঘদিন ছাত্রধর্মঘট চলিলে পড়াশুনার বিষয় ব্যাঘাত ঘটে, আর ছাত্রদের সপ্তাহে সপ্তাহে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরীক্ষা গ্রহণও অসম্ভব হয়। এখানে একটি কথা স্কুল কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ করিয়া বিশেষভাবে বলিতে চাই। তাহারা নৈপিয়া প্রকাশ করিলে ইহা কার্যকরী হইবে না। বিনা সংগত কারণে কোন ছাত্রকে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকিতে দেখিলে তাহার অভিভাবকের নিকট কড়া পত্র দিতে হইবে। শুনিলাম এই নিয়ম এখনও সাধারণভাবে আছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয় প্রয়োজন হইলে অভিভাবকদের ডাকিয়া তাঁহাদের উপদেশ বা পরামর্শ দান করিতে হইবে যাহাতে ছেলে মেয়েরা নিয়মিত ঠিক সময়ে প্রতিদিন স্কুলে হাজির হয় এবং পড়াশুনায় মন দেয়। শুধু নেতিবাচক উপায় অবলম্বনই যথেষ্ট নয়, এইরূপ ইতিবাচক উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে।

আগে শুনিতাম পরীক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া উচিত নয়। ইহাতে স্বাভাবিক পড়াশুনার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষা না গ্রহণ করিয়াও যে বিঘ্ন ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি। কথায় বলে "আছে বল লইয়া বিচার।" আমি বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার চাই, আমার মতো আরও অনেকে চান। কিন্তু আমূল সংস্কার সময় সাপেক্ষ। আজ আঠার বৎসর দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষার আমূল

সংস্কার করে যে শুভদিন নির্দেশ মহাত্মা গান্ধী দিয়াছিলেন তাহা বা অনুরূপ কিছু করে কার্যে পরিণত হইবে কে জানে? পুরণো ঘাচ এখনও বলবৎ। ইহাতে বহুদিন পূর্বেই মুখ ধরিয়াছে, কিন্তু আমরা এখনও উহা আগলাইয়া আছি। পঁচিশ বৎসরে এক পুরুষ। যেমন দেখিতেছি এই এক পুরুষের মধ্যে শিক্ষার গতি ফিরিবার আশা এখনও সুদূরে। অথচ নূতন দেশ নূতন জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা পদ্ধতির দিকেই আগে নজর দেওয়া উচিত। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে তো ইহা বিশেষ প্রয়োজন। আপনি যে তাহার অগুতেই থাকুন, মুসলিমকে মুখ সংহত ও শিক্ষিত করিয়া না তুলিতে পারিলে রাষ্ট্রের মুলভিত্তিই শিথিল হইয়া পড়িবে। অযোধ্যের জীবনে চোখের সামুখে কত বিচিত্র তন্ত্রের আবির্ভাব দেখিলাম ফাসীবাদ, নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ, একনায়কতন্ত্র—তার পশ্চাতের বিভিন্ন রূপ। কামাল আতাতুর্ক, লেনিন—ষ্টালিন, মুসোলিনী—হিটলার—মুসোলিনী সকলেই এই মুলশক্তির শিক্ষার দিকে প্রথমাবধি অবহিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করুন। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা সংস্কার প্রস্তাবের মূলেও গণতন্ত্রহীন স্বাধীন ভারতের মুল শক্তির মহা উদ্বোধন। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘকাল পরেও এই বিশেষ দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় আজ সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশৃঙ্খলতা বাড়িতেছে সমাজবিরোধী দুর্নীতিও উৎকট আকার ধারণ করিতেছে। কোথায় সে সংহত যুবশক্তি যাহারা ইহার বিরুদ্ধে সার্থকভাবে দাঁড়াইবে?

পরীক্ষার কথা বলিতে গিয়া অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি। জ্ঞানই শক্তি (Knowledge is power) অতি পুরাণো কথা। কিন্তু আজিকার দিনে ইহার সত্যতা যত উপলব্ধি হইতেছে তত বোধ হয় আর কখন হয় নাই। ছেলে মেয়েদের বাল্যকালাবধি এই শক্তির আধার—জ্ঞান দান করিতে হইবে। ইহাতে বিলম্ব দেখিলে ধৈর্য ধরা যায় না। বর্তমান অবস্থায় ছেলে মেয়েদের যতটুকু সম্ভব সুশিক্ষা ও সৎশিক্ষা দিতে হইবে। ইহার ফলে জগতের বিচিত্র বিষয়ে যথাযোগ্য জ্ঞানলাভ ঘটিবে। এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই আমাদের অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

সাপ্তাহিক পরীক্ষার উপর আমি খুবই বিরূপ মন্তব্য করি আর একটি কারণে। পত্তবারেও দেখিয়াছি, এ বারেও দেখিতেছি এতদঞ্চলের প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বেই বাণ্মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইতেছে। পত্তবারে কৌতূহলী হইয়া একটি ছেলেকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করি, একটির উত্তরে শুনি ছয় কি সাত মাসের মধ্যে তাহাদের অংকের পীরিয়ড মাত্র সাতটি হইয়াছে; পাটীগণিত, বীজগণিত, এবং জ্যামিতির ক্লাস সবই ইহার মধ্যে। গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে নে মাসের মাঝামাঝি বরুন এই পরীক্ষা হয়। কাজেই জানুয়ারি হইতে ধরিলে সাড়ে চারি মাসের পড়ার উপরে এই বাণ্মাসিক পরীক্ষা। জানুয়ারি মাস দুই কিমিতে কাটিয়া যায়। আর এই মাস হইতে এপ্রিল পর্যন্ত কত আন্দোলন, বর্ষঘট (গত বারের দাঙ্গাও ধরা যায়) প্রভৃতি জনিত উৎপাত। তার অংক কেন ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান সব বিষয়ের পড়ারই ঐ একই অবস্থা। আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন বাণ্মাসিক পরীক্ষা এ অবস্থায় একটা ধোঁকা দেওয়া মাত্র। ছেলেদের ধোঁকা দেওয়া, অভিভাবকদের ধোঁকা দেওয়া, কতকটা শিক্ষকদেরও বটে। এরূপে পাঠের মান নির্ণীত হইতে পারে না, ছেলেরা পড়ায় কতটা আসাইল তাহাও বুঝা যাইবে না। তাই যদি বর্তমান অবস্থায় সাপ্তাহিক পরীক্ষা প্রবর্তন ছেলে মেয়েদের পাঠোৎকর্ষ নিধারের এবং শিক্ষক শিক্ষিকার পাঠদান ব্যাপারে গলতি বিচ্যুতির ও আশু বর্ষের একমাত্র উপায়।

সাপ্তাহিক পরীক্ষা নিয়মিতভাবে গ্রহণ সম্পর্কে বলিতে গেলে আরও কোন কোন বিষয় আমাদিগকে বিশেষভাবে ভাবিতে হয়। ইহার একটি হইল স্কুলের ছুটি। বৎসরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে অন্ততঃ ২০০টি দিন খোলা রাখিতে হইবে। বাকি ১৬৫ দিনের মধ্যে এই ছুটি নিয়ন্ত্রণ না রাখিলে আসল উদ্দেশ্য আশানুরূপ সিদ্ধ হইবার উপায় দেখি না। আকস্মিক উৎপাৎ ব্যতিরেকে আমাদের এখানে ছুটির বহর বাড়াবাড়ি। সামাজিক অবস্থা ইহার জন্য কতকটা দায়ী বটে। গুনিয়াছি, বিলাতে পড়ুয়াদের পড়া হয় দুইটি 'term'এ। অর্থাৎ এক একবারে এক নাগাড়ে চার কি সাড়ে চার মাস বিদ্যালয় খোলা থাকে ও সেখানে ছেলে-মেয়েরা রীতিমত পড়াশুনা করে। এক এক term অন্তে দুই সপ্তাহ করিয়া ছুটি। কাজেই বৎসরে তিন মাস তাহারা বেশ ছুটি উপভোগ করে। ঘুচরা ছুটির বহর বাড়াই নাই। আমাদের এখানে বড়দিনের ছুটি বরাবর নয়-দশ দিন ছিল, এখনও কলেজে এই ছুটি বলবৎ রহিয়াছে। শুনিয়া আশ্চর্য হই, যাহারা আমাদের হর্তাকর্তা ছিল তাহাদের দেশে, বিলাতে এই সময়ে মাত্র দুইদিন ছুটি থাকে—Christmas Day (অর্থাৎ 'বড়দিন') এবং নববর্ষ বা ১লা জানুয়ারি।

আমাদের এখানে বিদ্যালয়ের কার্য সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে ছুটির রকমফের হওয়া একান্ত আবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছুটির বহর বাড়াবাড়ি। ইহার মানে হয়তো এই যে, আমরা জীবনে মানুষকে আদৌ দেই না ; মারা যাইবার পর কাঁদিয়া আকুল হই। আমি ছুটির একটি পরিসংখ্যান এইরূপ দিতেছি।

১। বাদার সপ্তাহে ৫২টি রবিবার ইহার সঙ্গে শনিবারের অর্ধ ছুটি ধরিলে আরও ২৬ দিন ছুটি থাকে। এই ছুটি হইল একুনে ৭৮ দিন।

২। গ্রীষ্মের ছুটি, পূজার ছুটি এতদিন অনুন একমাস করিয়া হইত ; ইহা কমাইয়া ১৫ + ১৫ এই দুইটিতে একমাস করিতে হইবে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর দেশ আমাদের। কাজেই ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন পূজা-পার্বণ-উৎসবের জন্য কিছু ছুটি ধরিয়া রাখা দরকার। তবে ইহা সর্বসাকুল্যে তিন সপ্তাহ বা ২১ দিনের বেশি কোন মতেই হইবে না। এইরূপে আমরা ছুটির কিস্তিতে পাই ১২৯ দিন। এখন একটি বড় ছুটির কথা বলি। বাৎসরিক পরীক্ষা, ক্লাসে প্রমোশন, পুস্তক তালিকা প্রদান ইত্যাদির পর ছেলে মেয়েরা একমাস কি তাহারও বেশি এরকম বা পড়িয়াই কাটায়। এই সময়টা তাহাদের মোটামুটি মধ্যে না রাখিয়া সচ্ছন্দে ছুটি ভোগ করিতে দেওয়া উচিত। এই সময় আমি ধরিলাম ৩৬ দিন। পরীক্ষা গ্রহণ এবং প্রমোশন এই উভয়ের ব্যবধান সময় হ্রাস করিয়া একেবারে সাত দিনের মাথায় লইয়া যাইতে হইবে। শিক্ষক মহাশয়দের খাটুনি বাড়িবে। কিন্তু ইহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। আমি এইরূপ ১৬১ দিনের ছুটির, (৭৮ + ৩০ + ২১ + ৩৬ = ১৬১) হিসাব দিলাম। সাপ্তাহিক পরীক্ষা ব্যাপারে এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী কর্মসূচী গৃহীত না হইলে আসল আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। কেন বলিতেছি।

দুইশত দিনে ২৯ সপ্তাহের কিছু কম হয়। এদিকে যে রবিবারগুলি অন্য ছুটির মধ্যে পড়িয়া যায় তাহা আমি আলাদা করিয়া ধরি নাই। কাজেই আমরা কার্যতঃ ত্রিশ সপ্তাহেরও অধিকই পাইতে পারি। কিন্তু আমি এখানে ত্রিশটি সপ্তাহেই নিবদ্ধ রহিতেছি। ইহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর সম্বৎসরে অন্ততঃ পাঁচ কি পরীক্ষা সাপ্তাহিক হওয়া আবশ্যক। প্রতি পাঁচ সপ্তাহে নীচের ক্লাসে এক একটি বিষয়ের উপর এক একটি পরীক্ষা হইতে পারিবে, কেননা তাহাদের বিষয় সংখ্যা কম। যথাযথ নিয়মিত ভাবে সাপ্তাহিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলে সাপ্তাহিক কি ফল-

পরবর্তী যে কোন পরীক্ষা গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না, চাই কি, নিয়ম করিয়া ইহা একেবারে বন্ধ করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। সাপ্তাহিক পরীক্ষার ভারও হ্রাস্তাবে বিলীন হইবে।

১। ইহাকে টিউটোরিয়াল পরীক্ষার মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। ক্লাসের শেষ পরীক্ষা যে ছেলে বা মেয়ে কোন কারণে দিতে অসমর্থ হইবে পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলির নম্বরের গড়পড়ই তাহার প্রমোশনের ব্যবস্থা হইতে পারে। একটি বিষয়ে খুব দৃঢ় থাকা দরকার যে, এই গড় ধরি পাসের নম্বরের কম হয় তাহা হইলে কোন ছাত্র প্রমোশন পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে না। দ্বিতীয় পন্থা স্বরূপ আর একটি ব্যবস্থার কথা বলিতে পারি। আমার মতে ইহাই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। সাপ্তাহিক পরীক্ষার গড় এবং বাৎসরিক পরীক্ষার নম্বর উভয় মিলাইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পাস ফেলের নির্ণয় করা চলিতে পারে। গড় অর্থাৎ যদি দুই পরীক্ষার কোন বিষয়ে কেহ তিনশ নম্বর পায় তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যায় পঞ্চাশ নম্বর। বাৎসরিক পরীক্ষায় এ বিষয়ে সে একশত নম্বরের মধ্যে চল্লিশ পাইল। পূর্ব পরীক্ষার গড়ের অর্ধেক এবং বাৎসরিক পরীক্ষার অর্ধেক নম্বর মিলাইয়া সে পাইবে এক শতের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ নম্বর। ছাত্রছাত্রীদের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এই ক্রমে স্থান যাহা হইলেও ঐ রূপ গড়ের ভিত্তিতে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে প্রথমাবধি ছেলেমেয়েদের পাঠে আগ্রহান্বিত হইতে হইবে। এখন বাণ্মাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার পূর্বে ছেলেমেয়েদের পড়ার তাগিদ তুমি। মাত্র কয়েকদিন পরে এই তাগিদ কোথায় উবিয়া যায়। সম্বৎসরে সাপ্তাহিক পরীক্ষার রীতি অনুসৃত হইলে এই তাগিদ সাময়িক না হইয়া স্থায়ী হইবে আশা করি।

ছেলেদের বা অভিভাবকদের আজকাল অতি সামান্যেই তুষ্ট হইতে দেখিয়া আশ্চর্য হই। ত্রিশ নম্বর পাইলেই তো পাস। আবার দুই একটি বিষয়ে কম নম্বর থাকিলেও তাহাদের ক্লাসে উঠিতে বাধা হয় না। ইহাতেও কত উল্লাস। পাঠ অনুশীলনের মান কত নিম্নে পড়িয়া গেলে এইরূপ অহেতুকী উল্লাস হইতে পারে, কি ছেলের, কি পিতা মাতার! আমার বিবেচনায় উপস্থিত ক্ষেত্রে অন্তত পরীক্ষা বাতিল করিয়া দিয়া সাপ্তাহিক পরীক্ষার প্রথাই অবিলম্বে চালু হওয়া আবশ্যক। আজকাল তথাকথিত বাণ্মাসিক পরীক্ষা কিরূপ কালভূ হইয়া উঠিতেছে তাহা অভিভাবক, শিক্ষক, এবং ছাত্র, দরদী মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। দশ ক্লাসের স্কুলগুলি এগার ক্লাসের স্কুলে পরিণত হইতেছে। সরকারী নীতি নাকি ইহা ত্বরান্বিত করিবারই অনুকূলে। আমি যে ব্যবস্থার কথা এতক্ষণ বলিলাম তাহা প্রথম পর্যায়ের স্কুলের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য, দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও কিঞ্চিৎ রকফের করিয়া ইহা প্রবর্তন করা যাইবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তো এই ব্যবস্থা তখন অনুসরণ যোগ্য। নবম দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠক্রমে বিস্তর কারিগরী করা হইয়াছে। কিরূপ বিষয় বাহুল্য ঘটিয়াছে দেখুন। নবম শ্রেণীতে ১৫০০ নম্বর বাধিক বিষয়গুলি পড়িতে হয়, দশম শ্রেণীতে ১৩০০ এবং একাদশ শ্রেণীতে হাজার। প্রতি বৎসর যেগুলি ছাটাই হয় তাহাদিগকে বলা হয় "Core Bubjects" অর্থাৎ বিনা এগুলির পরীক্ষা পাস করিতেই হইবে।

এ যেন বস্তু তন্ত্রের মহাভোজ। কত বিষয়, কত নম্বর। তিন বৎসরের নম্বর দিলাম, বাড়পোচ্ হইয়া হাজারে দাঁড়ায়। সেও কি কম। নবম শ্রেণীতে সেতহাজার নম্বরের পরীক্ষা, তাহাকাইলে চলিবে না। আমার পূর্ব সূত্র অনুযায়ী ইহার উপরে যতটা সম্ভব সুব্যবস্থা করিতে হইবে। বিষয় বাহুল্য, পীরিয়ড সংখ্যা ঢের—এমন কি কোন কোন দিন আট পীরিয়ডও হয়। পীরিয়ডে সময় পঁয়তাল্লিশ, চল্লিশ, পঁয়ত্রিশ মিনিট। ত্রিশ মিনিটও

আছে কিনা বলিতে পারি না। এইরূপ অবস্থার সঙ্গে বুঝিতে হইবে। আসল কথা ছেলেমেয়েদের রীতিমত পড়াশুনা হওয়া চাই। কি কি কারণে পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহা পূর্বে খানিকটা বলিয়াছি, পুনরুল্লেখ করিব না। পড়াশুনার মান নির্ণয়ের পন্থা ঐ একই প্রকার অর্থাৎ সাপ্তাহিক পরীক্ষা গ্রহণ। অনেক বিষয়, কাজেই ক'সপ্তাহের মধ্যে ইহার এক একটির পালা পড়িবে ইহাই প্রশ্ন। কয়েকটি বিষয়ে দুইশত নম্বর করিয়া, এইগুলি একশতের মধ্যে আনিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করিলে মনে হয় সাতটির বেশি হইবে না। তাহা হইলে সাত সপ্তাহের মাথায় এক-একটির পরীক্ষা পড়িবে। উপায়ন্তর না থাকায় এইরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইবে। ছাত্রদের পড়ায় চাড় হইবে, শিক্ষকগণকে রীতিমত পড়াইতে হইবে — ইহাই তো চাই। এই সব ক্লাসেও সাপ্তাহিক পরীক্ষা বিষয়ে কেন জোর দিতেছি দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য হয়তো পরিষ্কার হইবে।

ধরুন ইংরেজীর পরীক্ষা। ইংরেজীর কোন পাঠ্য বই নির্ধারিত নাই, প্রতি ক্লাসে দুই একখানি বই ঠিক করিয়া দেওয়া হয়, যাহা মাষ্টার মহাশয়রা ছেলে-মেয়েদের এই তিন বৎসরে পর পর পড়াইবেন। এই বইগুলির মধ্যে আছে Lamb's Tales from Shakespeare. My Childhood Days, Treasure Island, More Tales from Tagore, । দেখিবেন ইংরাজী কবিতা ইহা হইতে একেবারে বাদ পড়িয়াছে। খোঁজ লইয়া জানি ইংরেজী কবিতার বই কোন কিছু এই রকম ঠিক করা নাই। উপরের তিন শ্রেণীতে তাই কবিতা পাঠ একরূপ বন্ধ। কি বিসদৃশ ব্যাপার ভাবিয়া দেখুন! যে সব বইয়ের এখানে উল্লেখ করিলাম ইহা কিন্তু যতদূর জানি খুব কম স্কুলেই নিয়মিত পড়ানো হয়। কোন কোন স্কুলে সে একেবারেই পড়ানো হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। দুই একটি স্কুলের বিষয় জানি এক বেতটি গল্প পড়ানো হইয়াছে। কোন কোন ক্লাসে বৎসরে তিন চার পাতার অধিক পড়ানো হয় নাই। অথচ ছেলেমেয়েদের Precis writing, Story building, Question Answering ইত্যাদি কত কি শেখানো হয়। Test Papers নামক চাউস বইখানা ঐ সব ছাত্র ও শিক্ষককে যোগান দেয়। শুনিলাম একজন শিক্ষক নাকি বলিয়াছেন এই চাউস বই আজিকার ছাত্রছাত্রীদের "বাইবেল"। ক্লাসে ইংরেজী পড়ান না, অথচ এই সব কঠিন বিষয়ের কি ছড়া ছড়ি। এতো গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা। ইংরেজী পঠিতব্য বইয়ের উপর সাপ্তাহিক পরীক্ষা গৃহীত হইতে পারে কিন্তু ইংরেজী ছাত্রছাত্রীরা শিখিবে। শিক্ষক শিক্ষিকারাও পড়াইতে বাধ্য হইবেন। ধরা যাক, কোন বইয়ের ২৪ ২৫ পাতা ডেড় মাসের মধ্যে পড়া হইয়াছে, ইহা হইতে যদি ঐ সব বিষয়ের প্রশ্ন করা হয় তাহা হইলে ছেলেমেয়েদের আর কলে হাবুডুবু খাইতে হয় না। পূর্বে যেমন বলিয়াছি এই সাপ্তাহিক পরীক্ষাই বর্তমানের ভাঙ্গিয়া এবং অবহেলার একমাত্র প্রতিষেধক। পাঠ্যক্রমে ইংরেজীর গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়াই ইহার কথা বিশেষ করিয়া বলিলাম। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। পরে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সময়-একাদশ ক্লাসী পরীক্ষাদির সঙ্গে কাইজাল পরীক্ষার বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করার বাসনা রহিল।

সাঁওতালের সহপাঠী

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশের পর)

২

বন ও পাহাড় দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। প্রথম বাড়ী ছেড়ে আসার দুঃখ, পথের কষ্ট আমি সব ভুলে গেলাম। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি গাছ, কত রকম গাছ, আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ীর পিছনে পাহাড় উঠে গেছে, তার গায় কত বড় এক একটা পাথর। যা দেখি তাই সুন্দর দেখি, তাই নতুন লাগে। প্রথম দিনেই আমি এ দেশকে ভালবেসে ফেললাম।

বিকেল হতে না হতেই পাহাড়ের ছায়া এসে পড়লো গ্রাম জুড়ে, মনে হলো যেন সন্ধ্যা নেমে এল। চারিদিকে চুপচাপ, কোথাও একটু আওয়াজ নাই। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই কেমন যেন সব-কিছুর চেহারা বদলে গেল, পাহাড় কাঁপসা হয়ে উঠলো, চারিদিকে সারি সারি অসংখ্য গাছ নিঃশব্দে দাঁড়া হয়ে থাকলো। হঠাৎ আমার গা ছমছম করে উঠলো। দিনের আলোয় যে বন ভাল লেগেছিল অন্ধকারে সেই বন দেখে ভয় পেলাম।

মামা বেড়িয়ে ফিরলেন, আমাকে দেখে বল্লেন "ভিতরে চল কমল।" প্রশ্ন করলাম "কেন মামা?" মামা পিঠের উপর হাত রেখে বললেন "এ কোল-কাতার সহর নয়, এ দামোদরীবাগের জঙ্গল, এখানে বাঘ থাকে, ভালুক থাকে, আর···।" আর কি থাকে তা শোনবার সাহস হলো না, সভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেলাম।

একটু রাত হতেই খেয়েদেয়ে মামার পাশে চারপাই পেতে শুয়ে পড়লাম। ঘুম কিন্তু এল না। মামা ঘুমিয়ে পড়লেন, বাহিরে বারান্দার বাতি চাকরও ঘুমিয়ে পড়লো. নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিল। একবার এ-পাশ, একবার ও-পাশ করতে লাগলাম। কেবলই মনে হতে লাগলো বাহির বেতালের ও-পাশে অন্ধকারে কি যেন রয়েছে। কান পেতে থাকি, যদি কিছু আওয়াজ শুনতে পাই। শুনতেও পেলাম, একবার শুকনো পাতা খড়মড় করে উঠলো, একবার কি যেন ডেকে উঠলো। কি যে চলে গেল, কি যে ডেকে উঠলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেবল কল্পনা করতে লাগলাম। অনেক রাত্রে জানিনা কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে। কানে এলো পরিচিত পাখীর ডাক, রাত্রের ভয় কেটে গিয়ে মন আবার হালকা হয়ে গেল। এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছি এমন সময় বৈজুর ডাক কানে এল "খোকাবাবু, খেতে এসো।" আবার ভিতরে গেলাম, বৈজু দুধের সঙ্গে মোটা একবাটি ছাতু চিনে ও গুড় এনে সামনে ধরলো। অনিচ্ছার সঙ্গে শুরু করেও শেষে দেখলাম প্রায় সবটাই খেয়ে ফেলেছি। বৈজুকে বললাম একটা চারপাই বাইরে দিয়ে যেতে পার, আমি পড়াশুনো কোরবো।" বৈজু বাড়ীর সামনে একটা গাছের নীচে চারপাই পেতে দিল। বাক্স থেকে বই ও শ্লেট বার করে আমি সেখানে গিয়ে বসলাম। আসবার সময় মা বলে দিয়েছিলেন, "ওখানে গিয়ে পড়াশুনো কোরো, কিরে এসে যেন স্কুলের পরীক্ষায় ফেল কোরো না।" সরল স্কুলের

খানা খুলে পড়তে শুরু করলাম—"যে জায়গা উঁচু-নীচু নয়, একেবারে সমান, তাকে সমতলভূমি বলে, মধ্যে মধ্যে ভূ-সঙ্কোচনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠ স্থানে স্থানে উঁচু হইয়া ওঠে। ছোট ছোট পাথরের ঢিবিকে পাহাড় বলে। পাহাড় বড় হইলে তাহাকে পর্বত বলে। পর্বতের চূড়াকে শৃঙ্গ বলে। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার সমতল ভূমিকে উপত্যকা বলে।"

মামা কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, মাথায় বড় পাগড়ি পায় সালঠোকা নাগরা, হাতে লাঠি। আমাকে পড়তে দেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। মামার এই চেহারা কাল দেখলে আমি কিছুতেই তাকে চিনতে পারতুম না, আমার বাঙালী মামা এখন একেবারে বিহারী মানু হয়ে গেছেন। মামা বল্লেন, "কি বই পড়ছিস?" বললাম "সরল ভূগোল পড়ছি মামা।" ভুরু কুঁচকে মামা বল্লেন "সরল ভূগোল? কি লেখা আছে সরল ভূগোলে পড়তো।" আমি পড়তে লাগলাম "যে জায়গা উঁচু নীচু নয়, একেবারে সমান তাহাকে সমতলভূমি বলে। মধ্যে মধ্যে ভূ-সঙ্কোচনের ফলে ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে উঁচু হইয়া ওঠে। এই প্রকার ছোট ছোট পাথরের ঢিবিকে পাহাড় বলে। পাহাড় বড় হইলে তাহাকে পর্বত বলে। পর্বতের চূড়াকে শৃঙ্গ বলে। দুই পাহাড়ের মধ্যেকার সমতল ভূমিকে উপত্যকা বলে।" হাতভুলে মামা বল্লেন "থাম"। আমি থেমে গেলাম। মামা আঙুল দিয়ে সিঙ্গলের পাহাড়টাকে দেখিয়ে বল্লেন "ওটা কি?" আমি বললাম "পাহাড়।" সামনে সমান জমিটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন "এটা কি?" আমি জবাব দিলাম "এটা সমতল ভূমি।" আমার হাত থেকে সরল ভূগোল খানা কেড়ে নিয়ে মামা ডাকলেন "বৈজু"। ভিতর থেকে বৈজু ছুটে এল। আমার বই শ্লেট তার হাতে তুলে দিয়ে মামা বল্লেন "নিয়ে যা, ঘরে তাকের উপর তুলে রাখ।" বৈজু আমার বই শ্লেট নিয়ে চলে গেল। এইবার মামা আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন "আর বই পড়ে সমতলভূমি কাকে বলে, পাহাড় কাকে বলে, উপত্যকা কাকে বলে শিখতে হবে না। যে কলিল এখানে আছিস্ বই খুলতে পারবি নে। সামনে রয়েছে পাহাড়, সামনে রয়েছে সমতলভূমি, রয়েছে উপত্যকা, নিজে দেখ আর শেখ।" মামার এমন অদ্ভুত কথা শুনে আমি তো অবাক।

আমার মুখের ভাব দেখে মামা হাসতে লাগলেন। হঠাৎ হাসি থামিয়ে হাঁকলেন "মিতু"। মামার সে হাক পাহাড়ে গিয়ে ঠেকলো। হাক শুনে সামনের সেই খপরার খানা ছোট ছোট মাটির ঘরের একখানা থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো। বয়সে সে আমার চেয়ে বড়। গায়ের রং কুচকুচে কালো, কিন্তু কি মিষ্টি তার মুখের ভাব, কি সুন্দর দেহের গড়ন। আমাকে দেখিয়ে মামা তাকে বললেন "এ আমার ভাগ্নে, বাংলামুলুক থেকে এসেছে। একে সঙ্গে নিয়ে পাহাড় আর বন দেখাবি।" বড় বড় চুল সমেত মাথাটা নেড়ে সম্মতি জানালো মিতু। আমি ভয়ে ভয়ে মামাকে জিজ্ঞাসা করলাম "এ কে মামা?" মামা বললেন "এর নাম মিতু, এর বাপের নাম তিতু। এরা সাঁওতাল, এরা পাহাড় জঙ্গলে বাসিন্দে, জন্মে জঙ্গলে, বড় হয় জঙ্গলে, মাথার জোটীর জঙ্গলে, সংসার করে জঙ্গলে, বুড়ো হয় জঙ্গলে, শেষে একদিন মরে জঙ্গলে।" শুনে অবাক হয়ে মিতুর মুখের দিকে তাকালাম। মামা বলতে লাগলেন "তোরা যেমন ইস্কুল কলেজে ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য পড়ে পণ্ডিত হোস্ এরা না পড়ে পণ্ডিত হয়। শুনে আমি হেসে ফেললাম। মামা ভুরু কুঁচকে বললেন হাসিস নে, সত্যিই এরা না পড়ে পণ্ডিত হয়, অনেক শহরে পণ্ডিত এদের কাছে শিখতে আসে। এরা এতবড় এই পাহাড় আর বনের বড় বাঘ থেকে আরম্ভ করে ছোট খরগোশটির নাড়ী নক্ষত্রের খবর রাখে। এরা জানে কোথায় কোন বনে কোন জানোয়ারটি থাকে কোন গাছে

কোন পাখিটি রান্না হবে, তারা কি করে, কি খায়, কখন আসে, কখন যায়। এরা অন্ধকারে বনের মধ্যদিয়ে চলতে পারে, এরা আওয়াজ শুনে বলতে পারে কিসের আওয়াজ, ডাক শুনে বলতে পারে কি ডাকছে, কেন ডাকছে। এখন বল শহরে পণ্ডিত কে এত জানে?" স্বীকার করলাম, জানে না। মামা খুশী হয়ে বল্লেন "মিতুর সঙ্গে রোজ বেড়াবি, দেখবি বনের মধ্যে কত দেখবার জিনিস আছে, কত শিখবার জিনিস আছে।"

মামা চলে গেলেন। কালো ছেলেটি এগিয়ে এসে আমাকে ডাকলো। "খোকাবাবু!" আমি বল্লাম "কি?" সে বলল "যাবে আমার সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে? কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে তীরধনুক নিয়ে যাব।" শুনে আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলাম, বল্লাম "যাব মিতু।" সেই দিন থেকে আমি হলাম সাঁওতালের সহপাঠী।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষাব্রতী রাধাকান্ত দেব

শ্রীদয়াময় ভট্টাচার্য

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ প্রবর্তিত নব্যশিক্ষা বাঙালী জীবনে নবজাগরণের সঞ্চার করে। যাঁহাদের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবও একজন। "শোভাবাজার প্রাচীন কীর্তি রক্ষায় দাঁড়াইয়া তাঁহার উপর সংস্কারের নূতন সৌধ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার কোন কোন কার্য সমসাময়িকালে নিন্দিত হইয়াছে।" আসল মানুষটিকে এখন আমরা ভুলিতে বসিয়াছি কিন্তু হিন্দু কলেজের সূচনা হইতে পরবর্তী চৌত্রিশ বৎসরের কার্য্যবিবরণ, স্কুল সোসাইটির কার্য্যবিবরণ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত পত্রাবলী ও সমসাময়িক সংবাদ পত্র হইতে তাঁহার সম্পর্কে নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

১৭৮৩ খৃঃ ১০ই মার্চ রাধাকান্তদেব কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কানিংহাম সাহেবের ক্যালকাটা একাডেমিতে ইংরাজী প্রথম পাঠ শিখেন বটে তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টায় তাঁহাকে কেহ বিরত দেখে নাই।

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা হইতে দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর তিনি ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। হিন্দুকলেজের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা ডেভিড হেয়ারের। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার নিয়ম রচনার জন্য রাধাকান্তদেব সাবকমিটির সদস্য ছিলেন। ১৮১৮ খৃঃ-এ ইনি হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর হন। তিনি এই সময় প্রতিষ্ঠানের "ছুটি, কার্য্য আরম্ভ ও পরিসমাপ্তির সময়, ছাত্রদের ভর্তি হইবার নিয়ম, মাসিক বেতন, কলেজে ছাত্রদের অনুপস্থিতি, অনুপস্থিত হইলে অভিভাবকের কার্য্য ছাত্রদের প্রতি শাস্তি বিধানের তারতম্য, প্রতিবৎসর পাঠ্যবিষয়ের পরীক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি নিয়মাবলী গঠন করেন ও ইহা পরিচালক সভা-দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লন।"

ডিরোজিও ১৮২৬ খৃঃ-এ হিন্দু কলেজের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব আনয়ন করিলেন। এই শিক্ষায় একদিকে যেমন সুফল ফলিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনই নব্য শিক্ষায় প্রথম আত্মায় প্রচলিত আচার ব্যবহারে বীতরাগ হইয়া যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ ডিরোজিওকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিলে রাধাকান্তদেব কলেজের শিক্ষক নির্বাচনে বিশেষ সতর্ক হইলেন। ১৮৪০ খৃঃ-এ রাধাকান্তদেব কলেজের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন

করিলেন ও কারণগুলি ১৮১১ খৃঃ ৫ই মার্চের ডক্টর হোরেস হেমান উইলসনকে লিখিত এক পত্রে বিবৃত করিলেন।

ইংরাজী শিক্ষা ও মিশনারী আন্দোলন এদিকে পুরাদমে চলিতে লাগিল এবং কলিকাতায় ও অন্যত্র তাঁহারা অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা-দানের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টতত্ত্বও তরুণ ছাত্রদের শিখাইতে থাকেন। ফলে নানা স্থানে ধৃষ্টান হইবার ধুম পড়িয়া যায়। সুবিধা পাইলে অল্পবয়স্ক বালকদের তাঁহারা জোর করিয়া ধৃষ্টান করিতেন। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই ইহাতে শঙ্কিত হইলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ইহাতে আন্দোলন সুরু করিলে রাধাকান্ত দেব তত্ত্ববোধিনীর অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাহায্য করিলেন। চরিত্র হিন্দু ছাত্রদিগকে যাহাতে হিন্দুবিদ্যালয় ও ঐরূপ বিদ্যালয়ে যাইতে না হয় সেজন্য হিন্দু নেতৃবর্গ অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয় ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইল। উহার নাম হইল হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় (Hindu Charitable Institution)। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। রাধাকান্ত দেব খৃষ্টান পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষাবিস্তারের সহায়তার প্রশংসা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

রাধাকান্ত দেব উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য শিক্ষা-ব্রতীদের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন প্রত্যেক ব্যক্তির মাতৃভাষা আয়ত্ত করা অবশ্য কর্তব্য। রাধাকান্ত বঙ্গসন্তানদের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাতৃভাষা শিক্ষার দিকে অবহিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, সেই অন্ধকার বিশৃঙ্খল যুগেও বঙ্গদেশে পাঠশালার অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু এসমস্ত পাঠশালায় আগেকার দীর্ঘ প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন পাঠ্যপুস্তকেরও একান্ত অভাব ছিল। যুগোপযোগী পাঠ্যপুস্তক ও সুপরি-চালিত পাঠশালার অভাব বিশেষরূপ অনুভূত হইতে লাগিল। এইজন্য ১৮১৭ খৃঃ-এ পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি গঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে দেশী বিদেশী গণ্যমান্য লোকেরা একযোগে কাজ করিতেন। স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইতেই রাধাকান্ত দেব ইহার সঙ্গে যুক্ত হইলেন।

শুধু পাঠ্যপুস্তক রচনা দ্বারাই উক্ত ধরণের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার সম্ভব নয়। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ইহা স্থাপনের অল্পকাল পরেই বুঝিতে পারিলেন, দেশীয় পাঠশালাসমূহে নব রচিত পাঠ্য-পুস্তক প্রবর্তিত করাইতে হইলে উহাদের সংস্কার সাধন আবশ্যক। তাহারা এজন্য ১৮১৮ খৃঃ-এ কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপন করিলেন। প্রথম হইতেই রাধাকান্ত দেব ইহার নেটিভ সেক্রেটারী বা দেশীয় সম্পাদকের পদে বৃত হইলেন। তিনি তখনকার পাঠশালাগুলি সুবিধাজনক করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সোসাইটির ১৮২৩ খৃঃ-এ কার্য বিবরণে তাহার নিজের লেখা বিবরণ হইতেই তাহা আমরা জানিতে পারি। রাধাকান্ত দেব নিজ শোভাবাজারের বাটীতে স্কুল বুক সোসা-ইটির পুস্তকগুলি আমানত রাখিতেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যথাসময়ে সে সব বিতরণ করিতেন। সোসাইটিভুক্ত পাঠশালাগুলির পরিদর্শকের কাজে গৌরমোহন বিদ্যালংকারকে নিযুক্ত করেন এবং তাহার কার্য বাড়িয়া গেলে কয়েকজন সহকারী নিযুক্ত করেন।

রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেও সমান উৎসাহী ছিলেন। পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই [মহিলাই] লেখা পড়া বিদিত আছেন।" ঐ সময়ে কলিকাতা রাজবাটি বলিতে শোভাবাজার রাজবাটি বুঝাইত। তখন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে অল্প হিন্দু কন্যাদের পড়াইবার রেওয়াজ ছিল না। সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া মেয়েদের পড়াইতেন। রাধাকান্ত দেব প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের পড়াইবার পক্ষপাতী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ উৎসাহ-দাতা ও সমর্থক ছিলেন এবং সময়ময়ে ও পরবর্তীযুগে এ বিষয়ে অগ্রণী বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারস্থ ভবনে স্কুল সোসাইটির ছাত্রদলের যে বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হইত তাহাতে কিশোর ভূদেবাদির সোসাইটির পাঠশালার বালিকারাও প্রথম প্রথম যোগদান করিত। ছেলেদের মত তাহাদের গুণানুসারে পারিতোষিক দেওয়া হইত, অল্পযোগাদিতেও তাহারা ভাগ লইত।

স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার মতামত কয়েকটি পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। "আমি এতদ্দেশ ও

কর্মের দ্বারা দেখাইয়াছি যে আমি স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা। ভারতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখ বৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা এখনও ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না।"

১৮২১ খৃঃ-এ যখন ব্রিটিশ এত করেও মূল সোসাইটি হিন্দু মাতাদের শিক্ষা করে কুমারী কুককে এদেশে পাঠান, তখনও প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে হিন্দু মেয়েদের প্রেরণে বিশেষ আপত্তি হয়। তখন রাধাকান্ত দেব পত্র দ্বারা এই বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহার মর্মার্থ এই যে, "শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বিবাহের পূর্বে কন্যাদের বাংলা পড়ানো সম্বন্ধে সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এখনই কোন কোন পরিবারে গৃহশিক্ষক রাখিয়া বিবাহের পূর্বে আট নয় বৎসর বয়স্ক মেয়েদের পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এইসব কারণে সাধারণের পক্ষে আমি এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, কুমারী কুকের দ্বারা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষাদান সম্পর্কে বিবেচনার্থ সোসাইটির কোন অধিবেশন আহ্বানের আবশ্যক নাই। কুমারী কুক প্রয়োজনে দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত হইতে পারেন।"

কুমারী কুককে লিখিয়াছিলেন—

হিন্দুরা তাঁহার [কুমারী কুকের] প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবে যদি দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত হিন্দু নারীরা তাহার নিকট সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ও ধার্মিক বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে। এরূপ শিক্ষিত নারী পরে হিন্দু প্রধানগণের মহিলাদের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতে পারিবেন, ইহাতে হিন্দুদের চিরাচরিত রীতির উপর আঘাত হস্তক্ষেপ করা হইবে না অথচ নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার লাভ করিবে।"

শোভাবাজার রাজ পরিবারের সংস্কৃতপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। রাধাকান্ত দেব কৈশোরে, ১৮০১ খৃঃ-এ সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ করেন। "তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্য একদিকে যেমন ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ আবশ্যক, অন্য দিকে তেমনি ব্যাপকভাবে দেবভাষা মূলতঃ সংস্কৃত এবং তাহাতে লিখিত সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চার প্রবর্তনও একান্ত দরকার এবং ইহা বুঝিয়াই তিনি যুগপৎ সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষাপ্রচারে মনঃসংযোগ করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিয়া ইহার চর্চা সহজসাধ্য ও সহজলভ্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বলিয়াছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের রেঁনেসাস বা পুনর্জন্ম লাভ হইবে। এজন্য এখন একরূপ স্বীকৃত যে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা অনেকখানি বদলাইয়া দিয়াছে। এই শতাব্দীতে দেশ-বিদেশের সংস্কৃতের অনুশীলনে রাধাকান্ত দেবের প্রচেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সংস্কৃত চর্চার ধুম পড়িয়া যায়। উইলসন, মাক্সমূলার ক্রনো প্রমুখ পণ্ডিতগণ ও রাধাকান্ত দেবের মধ্যে প্রায়ই পত্রের আদান প্রদান চলিত।

রাধাকান্ত দেবের অমর কীর্তিকে মূর্ত করিয়াছিল তাঁহার বিরচিত ও সংকলিত পুস্তকগুলি —(১) নীতিকথা (স্কুল বুক সোসাইটির পাঠশালার জন্য) (২) বাংলা শিক্ষাগ্রন্থ (ইহাতে বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা বিষয় আছে)।

রাধাকান্ত দেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে তাঁহার স্মৃতিসভায় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন প্রথম প্রমাণ করেন যে—তিনি পুরাতন পন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল নহেন উপস্থিত অনেক ক্ষেত্রে সে যুগের অগ্রবর্তী দলের প্রথম স্থানীয় ব্যক্তি।*

* সাহিত্য সাধক চরিতমালা অনুসন্ধেয়। —লেখক

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কস্তিদ্ দুর্গতির্তাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২ | ৭ম সংখ্যা

আলোচনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ যাহাতে কমে সেজন্য বর্ধমানে, কল্যাণীতে, জোড়াসাঁকোতে এবং যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, উত্তরবঙ্গেও করা হইয়াছে। শান্তিনিকেতনে তো প্রতিষ্ঠান ছিলই। তাহা বড় হইয়া বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়াইয়াছে। বরাহনগরে তথ্যপরিসংখ্যান বা স্ট্যাটিস্টিকস্ প্রতিষ্ঠানে প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান মর্যাদাসম্পন্ন আর নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানতুল্য মর্যাদার বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ও আগতপ্রায়। কলিকাতা ভিন্ন পূর্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কতখানি সার্থক হইয়াছে, তাহার বিচার বিবেচনা সংবাদপত্র মাধ্যমে চলিতেছে। বর্ধমান ছাত্রসংখ্যার এবং প্রতিষ্ঠানের সফলতায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অন্যগুলির সম্বন্ধেই প্রতিকূল মন্তব্য পড়িতেছি। কিন্তু একথাও বলা যায় যে সর্বত্রই সময় দিতে হইবে। দক্ষ উপাচার্য নিয়োগান্তে কিছুটা সময়ও দরকার। যাঁহারা এইসব প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি ধরিবার পূর্বে একটু সময় দেওয়া উচিত নয় কি? পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনে উহাদেরও পরিবর্তন হইতে পারে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির গণ্ডী সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক। ছাত্রনিবাসের সমুচিত ব্যবস্থা হউক। তাড়াহুড়া না করিয়া যেখানে যেখানে ত্রুটি হইয়াছে তাহা সংশোধন করিবার সময় দেওয়া হউক। যে অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সদুপযোগ হইল ও হইবে কি না দেখা হউক। জনসাধারণ ও সংবাদপত্র অবশ্যই অবহিত থাকিবেন। কারণ তাঁহাদের দায়িত্বও আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষেও অবশ্য কিছু বলিবার আছে। তাহার জন্য ধৈর্য চাই।

বয়স্ক শিক্ষা

আমরা পূর্বে মন্তব্য করিয়াছি, এখনও করি, আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার প্রগতি বড় কম। বয়স্কশিক্ষার যুগপ্রবর্তক কর্মী বলিয়াছিলেন, প্রত্যেকে একজনকে শিখাই, তাহা হইলেই কেল্লা ফতে। Each one, teach one. কিন্তু

তাহাতে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি? সম্প্রতি কর্পোরেশন কর্মীদের প্রস্তাব হইয়াছে—প্রত্যেক সদস্য পাঁচজন পরিচারককে শিক্ষা দিবার ভার লইবেন। একজনকে লেখানোর চেয়ে পাঁচজনকে লেখানো অবশ্যই ভাল—কিন্তু সব ভালই কাজে না হইলে কথার কথা। কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ ভাতা বৃদ্ধির খানিকটা ব্যয় করিয়াও বেশবহু বহু বিদ্যালয় খুলিতে পারিতেন। তাঁহাদের আর্থিক সুবিধা বা হিতসাধন তো হইতই, আমাদের দৃষ্টিতে কাজও অবশ্য কিছুটা হইত। বহুমুখী শিক্ষা ব্যাপক, তথাপি আমাদের দেশে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানকেই আমরা বহুমুখী শিক্ষা বলিয়া থাকি। কারণ যেখানে গোড়া বাঁধা হয় নাই সেখানে আগার কথা বলা নিরর্থক।

প্রাথমিক শিক্ষা

সম্প্রতি পুরুলিয়ার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের আবেদন হইয়া গেল। সভাপতি মহাশয়ের মূল্যবিত্ত অভিভাষণ পড়িলাম। ত্যাগের আদর্শ গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়াছেন। কিন্তু অনাবশ্যক ত্যাগ তো আমরা সকলেই করি। পল্লির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও অবশ্যই করিয়া থাকেন। কাহার ত্যাগ কতখানি তাহা ব্যক্তিবিশেষের উপর এবং অবস্থার উপরও নির্ভর করে। দ্বিতীয়ক হইলেন অন্তরায়। সে যাহা হোক, উচ্চশিক্ষার আনন্দ ও সফলতা প্রাথমিক শিক্ষায় নাই—একথা আমরা মানিতে পারি না। শিক্ষা শুধু বুদ্ধির ব্যাপার নহে, হৃদয়েরও ব্যাপার এবং শিশুহৃদয়কে যত সহজভাবে স্পর্শ করা যায় অতি উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদেরও সেরূপ পাওয়া যায় কিনা বিশেষ সন্দেহ। সভাপতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষাকেই আগ্রহ করিয়া উচ্চশিক্ষার কথা বলিয়াছেন। যুগো রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আজকালকার যুগে সম্ভব নয় তাহি, হাসিও সে কথা। সেকালেও তাহা সুলভ ছিল কি? একথাও তিনি অবশ্যই জানেন যে গান্ধীজীর হাতের শিক্ষা বৃত্তি শিক্ষা মাত্র, সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস—সকল ইন্দ্রিয় চালু ও কর্মঠ হউক, পরস্পরের এরূপ সহায়তায় ছাত্রদের মাথাও খুলিয়া যাইবে।

যাহা হউক সেনগুপ্ত মহাশয়ের ভাষণটি মন দিয়া পড়িবার মত—তিনি নিজেও শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার লেখা যাঁহারা পড়িবেন তাঁহারা সমাদর করিবাই পড়িবেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে না পারিয়াও তাঁহার যুক্তির ও রচনাভঙ্গির প্রশংসা করিতেছি। অন্ধ গোঁড়ামি ও অহিকতর অবিবেচনার দেশের ও সমাজের কোনও ক্ষতি না হয়, স্বাধীনতার সুযোগ আমরা না হারাই, সেজন্য অবশ্যই সাবধান হইতে হইবে।

স্মরণে

Dawn Society ও Dawn পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মশতাব্দী পালন করা হইতেছে। বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি বাংলাদেশের যে বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিকে পথ দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণে আশা ভরসা দিয়াছেন, সেই স্বদেশী যুগের তিনি সূত্রধার বা প্রবর্তক ছিলেন। মানুষ সে শুধু কলা শিখিবে না, শুধু বিজ্ঞান শিখিবে না। দুই-ই শিখিবে, গোটা মানুষ হইবার সাধনাই যে শিক্ষা, সে কথা তিনিই সর্বপ্রথমে আমাদের দেশে বলিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কয়জনার নাম করিব? রাধাকুমুদ, রাধাকমল, বিনয়কুমার, রবীন্দ্রনারায়ণ—সকলের প্রাগ্রহ, পাণ্ডিত্য ও ত্যাগপ্রবৃত্তি সর্বজন-বিদিত। সতীশচন্দ্রের প্রেরণা ইহাদের সকলেরই ভিতর জীবনের আরম্ভে কাজ করিয়াছিল।

জন্ম শতবার্ষিকীতে তাঁহাকে শিক্ষা পত্রিকার তরফ হইতে প্রণতি জানাই।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী

সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বদেশ সেবক সাংবাদিকমুখ্য রামানন্দ বাবুকে। তাঁহার পত্র পত্রিকায় নির্ভীক বিতর্কিত সমালোচনায় আমরা তাঁহার শিক্ষকতার কথা ভুলিয়া যাই। তিনি প্রথমে সিটি কলেজ ও পরে এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হইয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। রজনীকান্ত গুহ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুহ—গুরু শিষ্যের পরম্পরা যাহারা এই তিনজনকে একত্র দেখিয়াছেন তাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন।

তাঁহার উপদেশ ছিল, ছাত্রেরা যেন অবকাশ সময় শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করে। এই উপদেশ পালনের সময় সর্বদাই আছে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের ইহা সমুচিত সময়। রামানন্দবাবুর উপদেশ প্রতিরক্ষা ও বিকাশ—defence and development—দুই দিক দিয়াই ভাল।

শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হওয়া চাই—তাহা হইলে শিক্ষার্থীদের একটা হাতের কাজও জানা চাই, তাহা শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং নিয়মিত অভ্যাসও করিতে হইবে; তাহাতে জীবিকার সংস্থানও হইতে পারে এ কথা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, হইলে ত খুবই ভাল, কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা হইবে ও সৌন্দর্যবোধ জন্মিবে, অন্ততঃ সেই দিক দিয়া হাতের কাজ নির্বাচন করিতে হইবে।

—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কার্যক্রম

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য

প্রচলিত বিদ্যালয়ে একটা রুটিন আছে। সেই রুটিন অনুযায়ী কাজ হয়। শিক্ষনীয় বিষয়গুলি ভাগ করা আছে। তার মধ্যে কোন্‌টি সপ্তাহে কত ঘন্টা পড়ানো হবে স্থির করে কোন্ দিন কোন্ সময়ে কোন্ বিষয় পড়াতে হবে তা ঠিক করা হয় এবং সারা বৎসর এই একই ভাবে পড়ানো চলতে থাকে, তার আর বিশেষ বড়চড় হয় না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এইরকম রুটিন মাফিক কাজ করা যায় না। প্রথমতঃ শিক্ষনীয় বিষয়গুলি ভাগ করা থাকলেও প্রত্যেকটি বিষয় আলাদা আলাদা করে পড়াতে হবে এমন কোন কথা নাই। অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক বিষয় একসঙ্গে পড়ানো হয়। একটা পাঠের মধ্যে বিজ্ঞান গণিত এবং ভাষা তিনটিই থাকতে পারে। তাহলে তাই পড়ানো হবে। তার জন্য সার দিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে। এই প্রসঙ্গে সারের প্রয়োজন, বিভিন্ন প্রকার সারের উপযোগিতা, কোন্ ফসলের জন্য কোন সার কতটা দরকার, সবই আলোচনা করতে হয় এবং আলোচিত বিষয়গুলি মনে করে রাখার জন্য লিখে রাখতে হয়। এইটিই হয় একটা পাঠ। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই পাঠের মধ্যে বিজ্ঞান আছে, গণিত আছে এবং ভাষাও আছে। দ্বিতীয়তঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজকে অবলম্বন করে পড়ানো হয়। কখন কোন্ কাজ হবে সেটা মোটামুটি ঠিক থাকলে সব কাজের সময় আগে থেকে নির্দিষ্ট করে রাখা যায় না। কিছু এদিক ওদিক হয়ই। বাগানের কাজের কথাই ধরা যাক। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি-এর মধ্যে কপি লাগাতে হবে। এটা ঠিক আছে। চারাও তৈরারি করা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোন্ দিন কপি লাগানো হবে তা নির্ভর করছে তখনকার আবহাওয়ার উপর। একটা দিন কপি লাগানো হবে বলে স্থির করা হয়েছে হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গেল। আর কপি লাগানো হল না।

এইসব কারণে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের পরিকল্পনা হয় এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজকে অবলম্বন করে পড়ানোও হয়ে থাকে। কিভাবে কি করা হবে তার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। সব পরিকল্পনার যেমন, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার তেমনই, একটা লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পনা করা হয় এবং পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে যাওয়া হতে থাকে। এই পরিকল্পনার উপরেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সাফল্য নির্ভর করে। পরিকল্পনা যদি ভাল হয় তাহলে কাজও ভাল হবে, তা না হলে নয়। সেইজন্য পরিকল্পনাটা খুব সাবধানে করতে হয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ পরিকল্পনা সহজ নয়। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য ছেলেকে মানুষ করা। শুধু বই পড়িয়ে ছেলেকে মানুষ করা যায় না। তাকে মানুষ করতে হলে তার সমগ্র জীবনটাকে একটু একটু করে বদলাতে হবে। শিক্ষার কেন্দ্রই হবে ছেলের জীবন এবং এই জীবনের মধ্যে যেমন কাজ থাকবে তেমনই লেখাপড়াও থাকবে। এর কোন্‌টাকেই বাদ দেওয়া যাবে না। সমস্ত বৎসরে ছেলে কি কি কাজ করবে এবং কোন্ কোন্ বিষয় কতটা শিখবে প্রথমেই সেইটা স্থির করতে হবে। তারপর বৎসরের কাজকে ভাগ করে মাসের কাজ এবং মাসের কাজকে ভাগ করে সপ্তাহের কাজ ঠিক করতে হবে। সপ্তাহের কাজকে অবলম্বন করে

প্রতিদিনের কাজ স্থির হবে। কাজ এবং শিক্ষা বিচ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি চলবে না। দুইটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। কোন্ কাজের সঙ্গে কোন শিক্ষা কতটা পরিমাণে যুক্ত হবে সেইটা আগে থেকে হিসাব করে স্থির করতে হবে। তারপর দেখতে হবে কোন দিকে কোনটা বাদ না যায়।

প্রচলিত বিদ্যালয়ে সব বিষয়েরই বই আছে। একটা বৎসরে কোন্ বিষয় কতটা পড়াতে হবে তা বই-এই ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। বইটা ধরে পর পর পড়িয়ে গেলেই চলে। কোন ভাবনা চিন্তা করতে হয় না। সব বিষয়ের সব কয়টা বই শেষ করতে পারলেই কাজ হয়ে গেল। কোন কিছু বাদ পড়বার ভয় নাই। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই রকমের বই নাই। আর, যদি থাকে তাহলেও সে বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর পর পড়িয়ে যাওয়া চলে না। প্রয়োজন বুঝে যখন যেমন দরকার পড়াতে হয়। আগে থেকে পরিকল্পনা করা না থাকলে দুই একটা অংশ বাদ পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

সব দিকে—তার মধ্যে কাজও আছে, লেখা-পড়াও আছে—নজর রেখে কাজ করে যাওয়া কষ্টসাধ্য। একটা নিয়ম থাকলে সুবিধা হয়। এই নিয়ম খুঁটিনাটি করে মানবার প্রয়োজন নাই, না মানাই ভাল। কিন্তু একটা কাঠামো থাকলে সেইটাকে প্রয়োজন মত খুঁটিনাটি দিয়ে ভরতি করে নিয়ে কাজ চালাতে সুবিধা হয়। এইরকমের একটা কাঠামোর কথা ভেবে দেখা যেতে পারে।

ছুটি-ছাটা বাদ দিয়ে বৎসরে ২০০ দিন কাজ হবে বলে ধরা যেতে পারে। আমি এখানে একটা মোটামুটি হিসাবের কথাই বলছি, ইংরেজীতে যাকে বলে round figure। রবিবার বাদ দিয়ে ৬ দিনে সপ্তাহ ধরলে ৪০ সপ্তাহ কাজ হবে। এই ৬ দিনের ৬ দিনই সাধারণ কাজ হবে না। শনিবারটা থাকবে চলতি সপ্তাহে কোন্ কাজ কতটা চলল আর কতটা বাকি রইল তার হিসাব এবং আগামী সপ্তাহে কোন্ কাজ কতটা হবে তার পরিকল্পনার জন্য। পরিকল্পনা যে শুধু শিক্ষকই করবেন তা নয়, ছেলেদেরও করতে হবে। পরিকল্পনা শিক্ষার একটা অঙ্গ। কাজকে যদি শিক্ষার বাহন করতে হয় তাহলে শুধু হাতের মত কাজ করলে চলবে না, ভেবে চিন্তে বুদ্ধি করে কাজ করতে হবে। কেন কাজ করছি এবং কিভাবে কাজ করব চিন্তা করতে হবে। কাজের পদ্ধতি স্থির করে নিয়ে সেই পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তারপর কাজ হয়ে গেলে যে ভাবে কাজ করার কথা ভাবা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে কাজ হয়েছে কিনা, কাজের ফল আশানুরূপ হয়েছে কিনা, যদি না হয়ে থাকে তাহলে কেন হয় নাই, এইসব ভাবতে হবে, তবেই কাজ শিক্ষার সহায়ক হবে। সেইজন্য ছেলেদের দিয়ে কাজ করাবার সময় তাদের নিয়ে কাজের প্রথমে পরিকল্পনা এবং কাজের পরে ফলাফল আলোচনা করতে হবে। শনিবারটাকে এইজন্য আলাদা করে রাখাই ভাল।

শনিবার বাদ দিলে বাকি থাকে ৫ দিন। এই ৫ দিন নিয়ে হবে এক একটা unit বা একক। একটা এককও আবার দুইভাগে বিভক্ত হবে এবং তাহলে কার্যতঃ বৎসরে ৮০টা একক হবে। এই ভাগের কথাটা একটু বলি।

জীবন মানেই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলা, adjustment to environment। কখনও নিজেকে পরিবেশের মত করে নেওয়া, কখনও পরিবেশকে নিজের মত করে নেওয়া। এর জন্য পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন। এই কারণে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ environmental study, শিক্ষার একটা বড় অঙ্গ এবং এই কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশকে শিক্ষার কেন্দ্র বলে গ্রহণ করা হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায়

কাজ যেমন ঋতুগত, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে জানা চেনাও তেমনই প্রয়োজনীয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যবহারিক দিকটাকে এই হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং কাজ।

প্রতিদিনের কার্যক্রমকে এইভাবে দুই ভাগে ভাগ করলে ভাল হয়। একটা ভাগ হবে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং সেইটাকে অবলম্বন করে শিক্ষা। আর একটা ভাগ হবে কাজ এবং কাজকে অবলম্বন করে শিক্ষা। এক সপ্তাহের কাজকে একটা একক বলে ধরলে ৪০ সপ্তাহে ৪০ × ২ = ৮০ একক হবে। এক বৎসরের শিক্ষণীয় বিষয়কে ৮০ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ব্যবহারিক দিকেও ৮০ ভাগ এবং তাত্ত্বিক দিকেও ৮০ভাগ। প্রত্যেকটা ভাগের জন্য ৪দিন করে সময় দেওয়া হবে। তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে পরিবেশ পর্যবেক্ষণের একটা একক ও সেই উপলক্ষে শিক্ষা চলবে। দিন হবে এখানে একটা দিনের অর্ধেক।

সারা বৎসরের কার্যক্রমকে এইরকম ৮০টা একটে ভাগ করা খুব কঠিন নয়। বৎসরের জন্য ৮০ভাগে বিভক্ত এইরকম একটা কর্মসূচি তৈরারী করে রাখলে এবং সেই কর্মসূচি অবলম্বন করে পড়িয়ে গেলে সহজে সব কটা বিষয়েই ধারণা হবে, কোন কিছু বাদ যাবার ভয় থাকবে না।

পরিবেশ-পর্যবেক্ষণ দুইভাগে বিভক্ত হবে—প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও সমাজ-পর্যবেক্ষণ। কাজও তেমনই দুই রকম হবে—দৈনন্দিন জীবনের কাজ ও শিল্প-কাজ। দৈনন্দিন জীবনের কাজ আবার দু রকম—ব্যক্তিগত জীবনের কাজ (যেমন—দাঁত-মাজা, স্নান-করা) ও সামূহিক জীবনের কাজ (যেমন—সাফাই, ঘর সাজানো)। শিল্প কাজও প্রধানতঃ দু-রকম—বাগান করা, সুতা কাটা। তাহলে ব্যবহারিক দিকের কাজ হল—প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, সমাজ-পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত কাজ, সামূহিক কাজ, বাগান করা ও সুতা কাটা।

তাত্ত্বিক দিকের কাজ মোটামুটি চার রকম—ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, সমাজ-বিদ্যা এবং বিজ্ঞান। এর প্রত্যেকটিরই আবার দুই চারিটি ছোট ছোট উপ-ভাগ থাকবে। এর প্রত্যেকটাই একটা বা একটা ব্যবহারিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে। কোন্‌টা কার সঙ্গে কতখানি যুক্ত হবে সেটা হল খুঁটিনাটির কথা অবশ্য, এমন কোন কোন কাজ থাকবে যার সঙ্গে তাত্ত্বিক শিক্ষা যুক্ত থাকবে না। আবার এমন শিক্ষা থাকবে যেটা কাজ ছাড়াই দেখাতে হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সে কাজই করা হক না কেন তার সবেরই দুটো করে স্তর থাকবে—এক, কাজ দেখার স্তর এবং দুই, কাজ করার স্তর। বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ শুধু শিক্ষার বাহনই নয়, কাজ হিসাবে কাজের একটা নিজস্ব মূল্যও সেখানে আছে। কাজ দেখার সময়ে ছেলে কাজের সম্বন্ধে যা আনার তা জেনে নেবে। তাত্ত্বিক শিক্ষা সেই বিষয়ে সেইখানেই শেষ হল। তার পরেও কাজের প্রয়োজন থাকবে এবং ছেলে কাজ করবে। তখন তার লক্ষ্য হবে কাজই। কাজ করারই একটা শিক্ষা, একটা discipline বা শৃঙ্খলা আছে, জীবনে তার মূল্য বড় কম নয়। তাহলেও এই সময়টায় কাজকে উপলক্ষ করে কোন তাত্ত্বিক শিক্ষার সুযোগ আর থাকবে না। অন্য দিকে এমন তাত্ত্বিক বিষয় কিছু কিছু থাকবেই যেটা স্বাধীনভাবে শেখাতে হবে, নেহাৎ টেনে বুনে কাজের সঙ্গে যুক্ত না করলে যেটাকে কাজের সঙ্গে যোগ করা যায় না। সাহিত্য এই জাতীয় বিষয়ের মধ্যে পড়ে। ছেলে যে কেবল মাতৃভাষা শিখবে তাই নয়। মাতৃভাষার সাহিত্যের সঙ্গেও তার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এই সাহিত্যের রসাস্বাদে সে যাতে ছেলেবেলা থেকে উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা সকল সময় কাজকে উপলক্ষ করে করা যাবে না, এবং তার প্রয়োজনও নাই।

এইসব খুঁটিনাটির অবকাশ মূল কাঠামোর মধ্যে থাকবে। বিস্তৃত কার্যক্রম রচনার সময় এইদিকে লক্ষ্য রেখে সেখানে তাদের স্থান করতে হবে, এবং তা করাও যাবে। আসল কথা হল, সমস্ত বৎসরের কাজটাকে (আমি এখানে ৮০টার কথা বলেছি) সুনির্দিষ্ট একক (well-defined work unit)-এ ভাগ করে নেওয়া। তাহলে কাজের সুষমা বিধান অনেকটা সহজ হবে, কাজের ব্যবস্থার জন্য চারদিকে হাতড়ে বেড়াতে হবে না।

সাঁওতালের সহপাঠী

শ্রীকুমার লাল দাশগুপ্ত

(৩)

একদিন দুদিন করে এক সপ্তাহ কেটে গেল, এখানকার ভাল জল হাওয়ার গুণে আমার শরীর অনেকটা ভাল হোল, মনে আবার আনন্দ ফিরে এলো। সকালবেলা বাড়ীর কাছাকাছি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াই, কাছেই একটা পাহাড়ে নদী আছে, তার বালুর চড়ায় বড় বড় পাথর, বিকেল বেলা সেই পাথরের উপর গিয়ে বসি, কত চেনা অচেনা পাখীর ডাক শুনি।

একদিন সকালবেলা বনের পথ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি হঠাৎ দেখি মিতু চলেছে সেই পথ ধরে। ডাকতেই মিতু সামনে এসে দাঁড়ালো। দেখলাম এক হাতে তার ছোটো কুড়ুল (ও দেশে টাঙ্গী বলে), কাঁধে একগোছা তীর। লম্বা গড়ন, সবল শরীর, কুচকুচে কালো গায়ের রং, কাঁধ পর্যন্ত পড়েছে বড় বড় চুল। কি সুন্দর যে তাকে দেখাচ্ছিল! আমি বল্লাম "কোথায় যাচ্ছ মিতু?" মিতু বল্ল 'শিকার করতে।' কি শিকার করতে যাচ্ছ—"বাঘ ভালুক?" শুনে হেসে ফেল মিতু, বল্ল "না, বাঘ ভালুক নয়, যা খেতে পারি এমন পশুপাখী যা পাই। শুয়োর, হরিণ এখন পাব না, পাখী দু'একটা পেতে পারি।" বল্লাম "আমি যাব, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো।" মাথানেড়ে মিতু বল্ল, "না কমল, তুমি যেতে পারবে না, শিকারীকে বড় পরিশ্রম করতে হয়; বনে বনে ঘুরতে হয়, দরকার হলে দু'চার ক্রোশ হাটতে হয়। বনজঙ্গলে আবার পথও নেই।" যেতে পারব না শুনে আমার উৎসাহী মন ঘমে গেল, বল্লাম "মামা যে বলেছিলেন আমাকে পাহাড় দেখাতে, নিয়ে যাবে একদিন?" আমার মনের অবস্থাটা বুঝে মিতু একটু ভেবে বল্ল "আচ্ছা চলো, আজ তোমাকে পাহাড় দেখিয়ে নিয়ে আসি, আজ আর আমি শিকারে যাব না।" আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। মিতু ছোট কুড়ুল খানা আমার হাতে দিয়ে বল্ল "এটা তুমি হাতে রাখ, চালকা আছে কষ্ট হবে না। পাহাড়ে যেতে হলে একটা হাতিয়ার সঙ্গে রাখতে হয়।" আমি কুড়ুল হাতে করে সগর্বে অগ্রসর হ'লাম।

মিতু পুবে যাচ্ছিল, এখন সে দক্ষিণমুখে চল্ল। আমাদের বাড়ী থেকে পাহাড় দক্ষিণদিকে। এখান কার পাহাড়গুলো পূর্ব পশ্চিম লম্বা [illegible] শুনেছি আমাদের এই পাহাড়শ্রেণী আরম্ভ হয়েছে পূবের সবচেয়ে বড় পাহাড় পরেশনাথ পাহাড় থেকে আর পশ্চিমে মিশেছে গিয়ে গয়া জেলার গুরপা পাহাড়ে। গুরপা কথাটা হয়েছে গুরুপদ থেকে। কিংবদন্তী এই যে বুদ্ধদেব এ পাহাড়ে একবার পদার্পণ করেছিলেন। এখান থেকে রাজগির (রাজগৃহ) বেশী দূরে নয়। আগেই বলেছি আমাদের বাড়ী থেকে পাহাড় খুব কাছে। বনের মধ্য দিয়ে একটু ঘুরে গিয়েই আমরা নদীতে এসে নামলাম। এই নদীতে আমি প্রায়ই বেড়াতে আসি, এর নাম সোনাজুড়ি—মানে সোনার সুতো। নদী পার হয়ে আমরা বনঝোপের মধ্য দিয়ে চল্লাম। উঁচুনীচু পথ, মাঝে মাঝে নালা। বর্ষার সময় এই নালা দিয়ে পাহাড়ের জল নেমে নদীতে যায়। এখন শুকনো, কেবল বালি। দু তিনটে নালা পার হয়ে আমরা পাহাড়ের পায়ের তলায় এসে দাঁড়ালাম। এতদিন দূর থেকে

পাহাড় দেখতাম, তাতেই আশ্চর্য হয়ে যেতাম, কত বড় আর কত উঁচু। আজ পাহাড়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। উপরের দিকে তাকালাম, পাহাড়ের মাথা দেখতে পেলাম না, মনে হোল যেন পৃথিবী জোড়া পাথরের স্তূপ আকাশে উঠে গেছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় গাছ জন্মেছে। সবকে আরো অভিভূত করলো এখানকার নির্জনতা। মাঝে মাঝে বাতাস বয়ে যাওয়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই।

কতক্ষণ এই ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, মিতু হঠাৎ "পাহাড়ে চড়বে কমল?" বলে হেসে উঠলো। পাহাড়ের কোলে এসে পাহাড় না চড়ে কি ফিরে যাওয়া যায়? যে দিন পাহাড় দেখেছি সেইদিন থেকেই পাহাড়ে চড়বার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু পথ কোথায়? মিতু বলে "পাহাড়ে চড়বার পথ কি যেখানে সেখানে থাকে কমল, পাথরের ফাঁক দিয়ে গাছপালা ধরে চড়তে হয়। পাহাড়ের উপর থেকে গ্রামের লোকেরা গাছ কেটে যেখান থেকে নামায় ক্রমে সেইটাই পথ হয়ে যায়। এসো আমার সঙ্গে সামনের ঐ ছোট্ট পাথরের ফাঁক দিয়ে উঠতে চেষ্টা করি।"

আগে চলে মিতু, আমি তার পিছনে। মিতু পাথরে পা রেখে গাছের ডাল ধরে অনায়াসে উঠে যাচ্ছিল, আমি অনেক চেষ্টা করেও দু এক পা উঠছিলাম। আমি তখনও দুর্বল, আমার উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। মিতু আমার হাত ধরে টেনে তুলছিল। খানিকটা উঠে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মিতুকে বললাম "আমি আর চড়তে পারব না।" মিতু আমাকে একখানা পাথরের উপর তুলে দিল, আমি সেখানে বসে পড়লাম।

সেখানে বসে নীচের পৃথিবীকে কি যে সুন্দর দেখলাম তা বলে বোঝান যায় না। বহুদূর পর্যন্ত যেখানেযি গাছের মাথাগুলো সকালের রোদ্দুরে ঝলমল করছিল, কোথাও একটু মাঠ, কোথাও একটা গ্রাম, ঘরগুলো খেলনার ঘরের মত ছোটছোট দেখাচ্ছিল। আমাদের গোনাছুত নদী সুতোর মতই এঁকেবেঁকে পড়েছিল।

তন্ময় হয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় মিতু আমাকে ঠেলে দিয়ে কাণের কাছে মুখ নিয়ে বলে "ঐ দেখ নীচে ঐ নিমুল গাছের তলায়।" চমকে সেদিকে তাকালাম, দেখলাম একজোড়া বড় পাখী ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে মুরগির মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু মুরগি তো অতবড় হয় না। মিতুকে জিজ্ঞাসা করলাম কি পাখী? মিতু বলে ময়ূর। ময়ূর আমি চিড়িয়াখানায় আগেই দেখেছি, ছোট একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ, ময়ূরের পুচ্ছটা স্বচ্ছন্দভাবে ঘুরতে পারে না, কেমনে ঠেকে যায়। এখানে বনের মধ্যে স্বাধীন ময়ূর দেখে ইচ্ছে হোলো কাছে গিয়ে ভাল করে দেখি। মিতু বাধা দিয়ে বলে "না, কাছে গেলেই উড়ে যাবে।" সেখানে বসেই তাদের ঘোরাফেরা দেখতে লাগলাম। একটি নর একটা ময়ূরী ময়ূরের পুচ্ছটা মস্তবড়, পেখম দিকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বনে কেবল মিতু আর আমি আছি আর কেউ নাই, এখন চৈতন্য হোলো আমাদের চারিদিকে অসংখ্য পশুপাখি রয়েছে। তাদের দেখতে না পেলেও তারা রয়েছে, বন আর পাহাড় যে পশুপাখীরই দেশ, আমরা এখানে বিদেশী।

আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি দেখে মিতু জিজ্ঞাসা করলো "কি দেখছো কমল?" বললাম "দেখছি আর কিছু দেখতে পাই কি না।" হাসলো মিতু, বলে "এখন কিছুই দেখতে পাবে না, মানুষের সাড়া পেলে সব পালিয়ে যায়। তাছাড়া দিনের বেলা পাখীরা ঘোরেফেরে কিন্তু পশুরা গা-ঢাকা দিয়ে শুয়ে বসে থাকে।" কারা যে সব পশু কেমন দেখতে, কি তাদের নাম কিছুই জানিনা। মিতুকে জিজ্ঞাসা করলাম "এ পাহাড়ে যে আনোয়ার

থাকে তাদের তুমি দেখেছো মিতু ?" মিতু ঘাড় নেড়ে বলল "হ্যাঁ, দেখেছি। জঙ্গলে জন্তু আমাদের, জঙ্গলেই বাস করি, পশুপাখিরা আমাদের প্রতিবেশী।" ওদের সঙ্গে সব সময় দেখা হয়, ওদের আমরা ভাল করেই চিনি।" মিতুকে জিজ্ঞাসা করলাম "কোন কোন জানোয়ার তুমি দেখেছ বলো।" মিতু হেসে বলল "কোন কোন জানোয়ার দেখেছি বলবো ? দেখেছি অনেক জানোয়ার, প্রথমে ধরো বড়োবাঘ, গায়ে যার ডোরাকাটা রঙের রাজা সে, তাকে দেখেছি, তারপরে ভালুক বড় বড় কালো লোমে ঢাকা খোলমেজাজী ভালুক, চিতে বাঘ, লাফড়া (হায়না), ঘুংগা কুকুর, শেয়াল, খ্যাকশেয়াল, বন-বেড়াল দেখেছি। এরা সোল এক শ্রেণীর। এ ছাড়া দেখেছি বাঘার মত শিং শক্ত হরিণ, সীলগাই, গয়ল নয়, হরিণেরই একজাত, ছোট হরিণ, দু তিন রকম ঘুলো ভয়োর, খরগোশ, ছোটখাট আরো কত জানোয়ার।"

মিতুর হাত ধরে বললাম "এ সব জানোয়ার আমাকে দেখাবে মিতু ?" মিতু হেসে উঠলো, বলল "তুমি কি পাগল হয়েছ কমল, ইচ্ছে করলেই কি এসব জানোয়ার দেখা যায় ? তবে জঙ্গলে কিছুদিন থাকলে কিছু কিছু হয়তো দেখতে পাবে।" মনে মনে স্থির করলাম জঙ্গলে যখন এসেছি তখন কিছুদিন থাকবই আর জানোয়ার দেখবই। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

শিক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে গেলে আমরা শিক্ষার বিশ্লেষণের মধ্যে আসতে চেষ্টা করি কয়েকটি বিষয় : শিক্ষালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা-পদ্ধতি, এবং শিক্ষাবস্তু বা পাঠ্যক্রম। এইসব বিষয় যেখানে না পাই সেখানকার কথা শিক্ষা-আলোচনায় আসতে চাই না। ভারতবর্ষের কথায় ভারতের প্রাচীন শিক্ষার কথা বলতেই হয়, তাই বৈদিক যুগ, বৌদ্ধশিক্ষা, মুসলমান যুগের শিক্ষা এবং ইংরেজ আমলের শিক্ষা নিয়ে আমরা খুব মুখর। বলতে বাধা নেই, আমরা একটানে শিক্ষার মুড়িকে লাট খাইয়ে প্রাচীন শিক্ষার কথা নীচে টেনে এনে ইংরেজ আমলের শিক্ষাকে দিয়ে মুড়িটাকে আবার মহর আকর্ষণে আকাশের পরপারে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি। কারণ আর কিছুই নয়, আধুনিক যুগের সমস্যা বহুল শিক্ষাধারার সঙ্গে ইংরেজ আমলের শিক্ষার রূপপূর্ব বিশ্লেষণে স্ফূর্তি পাই।

পশ্চিমী দেশের নানা সিভিলিয়ান এবং শিক্ষা-বিদের অসম্পূর্ণ মন্তব্য যে, প্রাচীন ভারতে কিংবা ইংরেজের পূর্বে এদেশে শিক্ষা অন্ধকারে ছিল, তাকে স্বীকার করে নিয়েছি কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় এবং দেশের লোকের জাতীয় ভোটের মানসিক উৎপীড়নে আমরা বহু প্রাচীন কালের শিক্ষাকে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রসঙ্গে দাক্ষিণ্য করে আলোচনা করি মাত্র।

মন্তব্যটি দুঃসহ হলেও, অহেতুক নয়। পাঠান আমলের শেষের দিকে এবং মুঘল যুগের প্রাক্‌কালে এ দেশের শিক্ষা কিরূপ ছিল, তা আজ পর্যন্ত কোন পুথি পুস্তকে আমি দেখি নি। অথচ এই যুগসন্ধি কালের শিক্ষা রীতি শিক্ষা ইতিহাসে কি ভাবে অগ্রাহ্য হতে পারে তা বিস্ময়ের। এ আলোচনা যদি দিল্লী জৌনপুর-আগ্রা-ঔরঙ্গবাদ নিয়ে থাকে তবে মুসলমান যুগের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস মিলবে। সেই

প্রভাবকে অতিক্রম করতে হলে ভারতের আরও দূরে অকূলে সরে যাওয়া দরকার। দক্ষিণ ভারত আর বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান শাসন কিম্বা হিন্দু রাজত্ব ঐ সময়ে এই সব অকূলেই মিলবে। উত্তর হতে পারে, কেন এ্যাডাম্ সাহেবের রেকর্ড তো রয়েছে। কিন্তু সে হারংযোজিত্যম বয়ে যে আমাদের বক্তব্য বিলীন হয়ে গেছে—সেকথাও তো ভাববার।

আরও কয়েকটি আধুনিক কারণে এই যুগের শিক্ষার কথা ভাবা দরকার। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ শিক্ষাদর্শের কথা বলেছিলেন, গান্ধীজী বলেছিলেন। আমরা যুক্তিমি তাঁরা কোন ঠিক কোনবর্মে পৌঁছতে চেয়েছিলেন, তাই ছাড়িয়ে দিয়েছি। বিবেকানন্দ শিক্ষার কথা বলেছিলেন, আমরা বহু টাকার ইন্ডাস্ট্রি খুলে তার উদ্দেশ্যকে বানচাল করে দিয়েছি। আমরা শিক্ষার প্রাপ্তি বলতে 'নিপুণ কারিগর' (Skilled workers) সংখ্যাকে বুঝিয়েছি। উদ্দেশ্য আমাদের তাঁদের টাকা ছিল না, আমরা তাই অর্থবাদ করছি আমরা শিক্ষকের ট্রেড-ইউনিয়ন গঠন মেনে নিয়েছি। আর এ সব করছি আমরা ঐ সব মহাপুরুষের আশীর্বাদপুষ্ট শিক্ষাদের সহায়তাতেই। অথচ আমেরিকার মতো আমরা দাবিকারও করছি যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন হয়েছে বটে, কিন্তু ডেমোক্রাটিক শিক্ষা ঘুরে সরে যাচ্ছে; ভালো মানুষ নিষ্পীড়িত হচ্ছে, সমাজ-বিদ্রোহীরা উপকৃত হচ্ছে।

পরিতাপ করবার মূল্য একেবারে নেই, তা নয়। হয়ত এই গ্লানি কাটাতেই কোন মুসলমান পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে। মানব সভ্যতার প্রত্যুষেই আমরা যে সব স্বপ্ন কাটিয়ে উঠেছে। এ যুগেও তেমন আশা করা যায়, হিম যোগারও তা বাদা দিতে সক্ষম হবে না।

ঠিক এমনি একযুগ এসেছিল পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে। বিশেষ করে বাংলাদেশে। আর বাংলাদেশ সেই যুগকে কাটাতে সক্ষম হয়েছিল কারণ এই দেশটি দিল্লীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের বাইরে ছিল।

দিল্লীর মসনদ তৎকালীন আধুনিক এবং বাস্তবানুগ শিক্ষাকে চাপাতে চেয়েছিল। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাংলার মানুষের শিক্ষাকে তার থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

মহাপুরুষদের সঙ্গে শিক্ষাব্রতীর পার্থক্য আছে। মহাপুরুষ সমাজের কিন্তু শিক্ষাব্রতী ব্যক্তির। শিক্ষক বা মাষ্টার, শিক্ষা অধিকর্তা বা সচিব ব্যক্তির কথাই ভাবেন। মহাপুরুষ তেমন কিন্তু নন। পৃথিবীতে এসেছি যখন, তখন এই ভূমণ্ডলের যাতে আমার লোভ তাই পাব এই নীতি শিক্ষকের শিক্ষায়, কর্তৃপক্ষের আকাঙ্ক্ষায়। অর্থাৎ টাকার বিচারে পদমর্যাদা। আর, মহাপুরুষের শিক্ষায় থাকে—যা কিছু চাই তার সবই পেতে হবে এমন দুর্মর হওয়া সমাজের কল্যাণ। তাই শঙ্করাচার্য থেকে সুরু করে গান্ধীজী পর্যন্ত ব্যষ্টির কল্যাণ করতে গিয়ে সমাজের কল্যাণ করেন, আর রাজনীতিকেরা সমাজের কল্যাণ করতে গিয়ে ব্যষ্টির আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিকল্পিত মনোবিকার ঘটিয়ে থাকেন।

ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রাজা থেকে শাসকবর্গ। যে ধরণের শাসকবর্গই হোক তারা সমাজের প্রগতি বলতে 'অর্গানাইজেশন' বুঝেছেন। আর এই কাঠামোর বাঁধন-কষণ মানুষের সমাজকে চিরকালই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ঘোড়ার চোখের ঠুলির মতো। কিন্তু মানুষ ঘোড়া নয়। মানুষের চলার ক্ষমতা তেমন নেই বটে, কিন্তু সে যখন চলে তখন সমগ্র বিশ্বজগৎ তার অন্তরে বাহিরে।

এই যে সমগ্র বিশ্বজগৎ নিয়ে 'মহামানবের' যাত্রা, এই যাত্রার কোন একটি চিহ্নকেই মুছে দেওয়া যায় না। সেই চিহ্নকে পরিস্ফুট করা চলে। শঙ্করাচার্য থেকে সুরু করে (আধুনিক ভারতীয়

সভ্যতার কিছু অংশ বরবার জন্যই শঙ্করের নাম করছি) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী পর্যন্ত সেই যাত্রাকে অনুসরণ করতে চেয়ে যাত্রাপথ উজ্জ্বল করেছেন। তাই তাঁরা মানুষের আচার-রীতি, ব্যবহার এবং করণ, ঐতিহ্য এবং দর্শনকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছেন। রাতারাতি একেবারে নতুনকে অস্বাভাবিকভাবে মানুষের উপর চাপাতে চান নি। এই যে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে শিক্ষা এবং জীবন রীতি স্থির করা এইটিই হচ্ছে মানবিক সভ্যতার সুস্থতা। এই সুস্থতা না থাকলে মানুষের হাতে কল চলবে, কিন্তু কারখানার বাইরে মানুষ আর মানুষ থাকবে না।

চৈতন্যদেব শঙ্করের জীবন দর্শনকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছেন, শঙ্করের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ নয়। সাত-আটশ' বছরের ধারা যা বহে চলেছিল তাকে নতুন শক্তি দেওয়ার জন্য এবং এই ব্যাপার থেকেও প্রমাণ হয়, ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায় নতুন শাসকবর্গ এসে পৌঁছতে পারেন নি।

চৈতন্যদেবের নিজের শিক্ষা সম্পর্কে একটি বৈষ্ণব পদ ব্যবহার করছি :

দিন দিন অনুরূপ শচীর কুমার।
নিজগণ সাথ তাঁর যত আছয়
বালক-কাল ব্যবহার॥
লিখত ধরণীতল তবহু না ভাদয়ল
কা-দি বরণাবলী আর।
জামল অলপে কলাপ আলাপন
পঞ্জিকা সব শব্দবিচার॥
হরষনে অবগত অভিমত কতশত
আমি পঢ়ল অলঙ্কার
গঙ্গাদাস সঙ্গ পাণি শিখল আদি
পয়োধি অবধি তুই পার॥
বেদ বিভেদ পঢ়ি পঢ়ি খেদ করু
সকল নিগম কলসার।
পহিল বিচারে সঁপই যব জগজন
দীগ্‌বিজয়ী জগত অধার॥

পদটি অগদানন্দের। অর্থাৎ চৈতন্য পরবর্তী যুগের। তাই যত পরেরই হোক, এর মধ্য থেকে তৎকালীন শিক্ষার লক্ষ্য এবং পাঠ্যক্রমটি মোটামুটি জানা যায়। প্রথমে মাটির উপরে হাতেখড়ি, তারপর তাল-পাতায় ক-আদি বর্ণাবলী লেখা, অল্পদিনের মধ্যেই কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন, পাঁচবৎসরেই শব্দ বিচার শেষ করলেন; দর্শন পড়লেন, অলঙ্কার শাস্ত্র পড়লেন। গঙ্গাদাস তাঁর অধ্যাপক, তাঁর কাছে পালি ভাষা ও প্রাকৃত শৈলঙ্গ অধ্যয়ন করেন; বেদ এবং তন্ত্র শাস্ত্রও পড়লেন। এত পরেও তাঁর কোথাও শেষ ছিল।

চৈতন্যদেব অলঙ্কার শাস্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পড়েছিলেন কিনা বলা শক্ত। দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে বিতর্কে আমরা দেখতে পাই দিগ্বিজয়ী বলছেন,

যে কহিল সে-ই বেদ-সার।
ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পঢ় অলঙ্কার
তুমি কি বুঝিবে এই কবিত্বের সার।

চৈতন্যদেব তার উত্তরে বলেন,

নাহি পঢ়ি অলঙ্কার—করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ॥

তারপরই বলছেন,

পঞ্চদোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার॥

চৈতন্যদেবের সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্র পৃথক এক ব্যাকরণের বিভাগ হিসাবে গৃহীত হয়ে পড়েছে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের বিশেষ স্থানই হয়ে পড়েছিল। বর্তমান যুগে পাবলিক সার্ভিস কমিশন শিক্ষাই তাঁকে অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করতে পারত না। তবু দেখা যায় ভাষা, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র সব বিষয়ই তিনি ঐরূপ ধরণের শিক্ষার একটি অবশ্য হিসাবেই অধ্যয়ন করতেন। বর্তমান যুগে আমরা বাংলা পড়ি শুধু বাংলা ভাণ্ডার ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক পড়ি, অন্য ভাষা ও সাহিত্যের সংবাদ রাখতে চাই

না, হিন্দীতেও তাই, ইংরেজীতেও তাই; বড় জোর ইংরেজীর বা সংস্কৃতের প্রভাব একটু অধ্যয়ন করি। মনে হয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় এটি অসম্পূর্ণ শিক্ষা। ভাষাতত্ত্ব বা বিজ্ঞান বলে আনুষঙ্গিক হিসাবে যেটুকু পড়ি তা ঐ ভাষার পরিবর্তনটুকু বুঝবার জন্যই। এবং সেই জন্যই 'Rama is a good boy' এর অনুবাদ বা অর্থ করি 'রাম (হয়) একটি ভাল ছেলে।'

চৈতন্যদেব ঠিক এইভাবে পড়াশুনা করার পক্ষপাতী ছিলেন না: শিক্ষার সমস্ত দিক দেখবার জন্য, বিচার করবার জন্য তার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই বিষয়ে আর একটি কাহিনী উল্লেখ করা যায়:

চৈতন্যদেব কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস মন্ত্র নিতে উদ্যত। এই সন্ন্যাস মন্ত্রের প্রধান বক্তব্য 'তত্ত্বমসি'। এই মন্ত্র শঙ্করাচার্যের। জীব-ব্রহ্মে কোনওরূপ ভেদ নাই স্বয়ংই জীব ব্রহ্ম। শঙ্করের মতে সেব্য-সেবক ভাব দুয়ের মধ্যে নেই। চৈতন্যদেবের মানসিকতার বিরোধী এই ভাব। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে তাই চৈতন্যদেব অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। মুরারি গুপ্ত তখন তাঁর কাছে। তিনি চৈতন্যদেবের মনোভাব বুঝতে পেরে বলেন,

মুরারিঃ প্রাহ তৎশ্রুত্বা তন্মন্ত্রে ভগবন্ ন্যস্যন্।
ষষ্ঠী সমাসং মনসা বিচিন্ত্য দুঃ মুখা তব॥

অর্থাৎ শঙ্কর 'তত্ত্বমসি' কে সন্ধিবদ্ধ ক'রে ব্যবহার করেছেন (তৎ + ত্বম্ + অসি), মুরারি গুপ্ত পদটিকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে ব্যবহার করতে বললেন (তস্য ত্বম্)। চৈতন্যদেবের এই ব্যাখ্যায় আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বিচার এই কাঁকিতে তাঁর মন সায় দেয় নি। "তত্রোবাচ প্রভুর্বাচং তথাপি বিভ্রতে মনঃ। শব্দশক্ত্যা করিষ্যামি কিমিত্যুক্ত্বা করোদ সঃ॥" শব্দের শক্তি আছে। মানুষের মনে তার অর্থ বিভিন্নে বসে যায়। এই শক্তিসম্পন্ন শব্দের নতুন অর্থ করা আর কিছুই নয় মানুষকে ফাঁকি দেওয়া।

এই যে শব্দবিচার পদ্ধতি এর মধ্যে কেবল বিশ্লেষণ পরায়ণ মনোভাবই নেই, ভাষাসৌষ্ঠবকে স্বীকার করবার প্রয়োজন আছে। মানুষ শব্দে কিরূপ অর্থ আরোপ করে এবং শব্দ কেমনভাবে স্বাভাবিক শব্দে মানুষের চিন্তাগতিকে চালনা করে—এই দুটির সন্ধান করেই তাঁর শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল। শিক্ষা দ্বারা মনের এই দিকটিই সাধিত করতে হয়। এইটিই শিক্ষার প্রত্যয় (concept of education)। শিক্ষার লক্ষ্য (aims of education)। এই প্রত্যয়কে দৈনন্দিন কাজেকর্মে টেনে এনে মানুষকে 'শিক্ষিত কারিগর' বা 'উপযুক্ত নাগরিক' করে তুলেছে মাত্র। শিক্ষার লক্ষ্য ইতিহাসের সময়-সীমা উত্তীর্ণ হতে পারে না। শিক্ষার প্রত্যয়ে সে ক্ষমতা আছে। শিক্ষা-ইতিহাসে ইজিপ্টকে অতি প্রাচীনকাল হিসাবে ধরা যায়। সেখানকার সমাজব্যবস্থার যেরূপটি পাই তা হচ্ছে প্রভুত্বপরায়ণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শিক্ষার নীতি-নির্দেশ। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সমগ্র সমাজকে চলতে হবে। অর্থাৎ সভ্যতা এবং সমাজ অর্থ বিশেষভাবে উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলায় আসা। এই শৃঙ্খলার মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে হবে। তাদের নিয়মেই পণ্ডিত এবং নাগরিকের শিক্ষার মান স্থির করা হবে। চার হাজার খৃঃ পূর্বাব্দের কথা। তারা মানুষের মনন দিককে খর্ব করে দিয়েছিল। সেই খর্বতা আজ বৈজ্ঞানিক নিয়মে হয়। আমরা শিক্ষার মান আজ স্থির করি মানসিক অভীপার সাহায্যে। বুদ্ধির ক্রমবিকাশ এবং পরিসংখ্যান সমস্ত পথ নির্ণয় করে। বুদ্ধির সাধারণ সূত্র হচ্ছে অতি দ্রুত অভিনব পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা মানুষের মনের মধ্যে আছেই, শিক্ষা নিরপেক্ষও হয়। কিন্তু তার প্রকাশ আমরা দেখতে চাই আমাদের কল্পিত

এবং দুই কতকগুলির মধ্য পরিবেশের মধ্যে এসে। তাঁর জন্য নৈর্ব্যক্তিক (objective) অভীক্ষা। এই পরিমাপ আপেক্ষিক, (relative) আর দশজনের সঙ্গে তুলনায়, এই পরিমাপ সম্বন্ধ নির্ণায়ক (correlative), আর কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে তুলনায়। এই যে গড়নির্ণয় করে দেখা, এতে গড়ের মানটিকে তুলবে কে?

অঙ্ক কষে মানুষের স্বাভাবিক চলার পথ সেই মেরোপথকে নির্দেশ করে দেওয়া যায় না। এই পদ্ধতি জীব-বিজ্ঞানও স্বীকার করে না। সমগ্র সমাজের যানটুকু যানটুক নিয়ে 'স্ট্যাটিসটিক্স' হতে পারে এবং তা নিয়ে 'অর্গানাইজেশন' ও হতে পারে কিন্তু তা দিয়ে মানুষের মনের শক্তি, সমাজরক্ষণ এবং সভ্যতার গতি নির্ণয় করা যায় না। এগুলি ঘটনা, বিশেষ বিষয়ের সান্নিধ্যে বিশেষ মনের প্রকাশ (manifestations), কিন্তু সেগুলির সমবায়ে মনের খোঁজ পাওয়া যায় না। অলদার নৃত্য আর সমগ্র ইন্দ্রিয় মনের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-ক্রিয়ার উপলব্ধি এক নয়। বুদ্ধি আর উপলব্ধিও তাই এক নয়। শিক্ষাকার্য আর শিক্ষাও সেই কারণে এক নয়। চৈতন্যদেবের শব্দবিচার শুধু ব্যাকরণকে মান্য করে নয়, ব্যাকরণকে যে সৃষ্টি করে সেই লোকমন থেকেই এই বিচার পদ্ধতি পেয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের সমগ্রজীবনে এই লোকমনকে মান্য করবার ইচ্ছা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। অথচ তারই মধ্যে তিনি সমাজমনকে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করেছেন। এই পরিবর্তনের মান তিনি স্থির করে নিয়েছিলেন বৃহত্তর কল্যাণের জন্য। আমাদের যুগের 'পরীক্ষা সংস্কার' আন্দোলনের অনুরূপ নয়। আমরা একদিকে বলছি—এত ছাত্র ফেল করছে কেন? অতএব পরীক্ষা ব্যবস্থা বদলানো হোক। কেমনভাবে বদলাব? রচনা-গত পরীক্ষার বদলে বৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা প্রবর্তন কর। আবার অন্যদিকে বলছি, শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে—এত বেশি পাশ করছে কেন? অর্থাৎ মনস্তত্ত্বকে দেখবার মতো দৃষ্টি আমাদের নেই। দৃষ্টিতে 'মান' নেই 'ক্ষণ' আছে। শিক্ষায় আমরা ক্ষণব্যবসায়ী।

চৈতন্যদেবের জীবনটিই আমাদের বুঝবার বাইরে। শিশু এবং কিশোর নিমাইকে আমরা বর্তমান যুগে নির্ঘাৎ শিশু মনোরোগবিদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। তিনি তাকে 'delinquent child' বলে 'কিউমিলেটিভ' কার্ডে লিখতেন; মেন্টাল হাইজিন এবং চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন। ছেলেটি নিতান্তই পাগল হয়ে যেত অথবা শিক্ষানীতির 'সুনাগরিক' হয়ে দাঁড়াত। তাঁর পরবর্তী জীবনটি আমরা পেতাম না। হয়ত ফ্রয়েডের দিকে ব্যাখ্যা করে বলতাম বহু বিবাহ যখন আছেই তখন আর কয়েকটা বিয়ে দাও অথবা বলতাম 'শিতার প্রতি একটা গৌন তান্ত্রিক আক্রোশ আছে।'

কিন্তু চৈতন্যদেবের যুগে এমন বৈজ্ঞানিক গুরু ছিলেন না। তাঁর গুরু এই ঘটনায় কি করেছিলেন তাই বলছি:

নিমাই অধ্যাপনা করছেন। এ সময়ে তিনি রুক্ষভাবে বিভোর। পড়ুয়ারা প্রশ্ন করেছে—সিদ্ধ-বর্ণসমাম্নায়। কলাপ ব্যাকরণের প্রথম সূত্র। অর্থাৎ বর্ণমালার পাঠক্রম নিত্যসিদ্ধ কি না। নিমাই উত্তর করলেন, সর্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ। বর্ণ-সিদ্ধ হল কি করে? না, কৃষ্ণ বৃষ্টিপাতের জন্য। এ কি ঠিক ব্যাখ্যা হল—পড়ুয়ারা প্রশ্ন করে। তিনি বললেন, 'কৃষ্ণের তখন কহি—সম্যক আমার।' ইহাই মুরারি উপদেশ।

"যদি আছি বুঝহ এখনে
বিকালে সকলে বুঝাইব একখনে"
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই।
বিকালে সকলে যেন হই এক ঠাঁই॥

তাবে এমন বিভোর হয়েও, 'ভুল বলেছি, কি আরও বলতে হবে' বুঝবার জন্য একান্তে অধ্যয়ন করবার কথা তোলেন নি। অধ্যাপকের অভ্যাসমত এটি গুরু দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন তিনি এতাবৎকাল যে করে গেছেন, তা এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়।

যাই হোক, পড়ুয়ারা নিমাইয়ের গুরু গঙ্গাদাসের কাছে গেল। তিনি বললেন, 'তোমরা বাড়ী যাও, আমি নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা করে বুঝে নেবি।' বিকালে গঙ্গাদাসের কাছে নিমাই এলেন। গুরুর চরণধূলি মাথায় নিতে তিনি আশীর্বাদ করলেন, "বিদ্যালাভ হউক।" অদ্ভুত আশীর্বাদ। যে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাকেও বললেন, 'বিদ্যালাভ হউক'। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের এই কথাটিতে সেকালে বিদ্যালাভ করা কাকে বলে তা যেন বুঝতে আর বাকী থাকেনা। শিক্ষার লক্ষ্যটিই বিদ্যালাভ। ভারতের প্রথম আদর্শ শিক্ষক যাজ্ঞবল্ক্য সম্পর্কেও এমনি ধরণের কাহিনী আছে। যাজ্ঞবল্ক্য যখন জনক রাজার সভায় দিগ্বিজয়ী হয়ে এসে আশ্রমে শিষ্যদের নিয়ে শিক্ষাদান সুরু করলেন সেই সময় এক বৃদ্ধ এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চান। এই বৃদ্ধটি যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু। গুরু বলেছিলেন, আমি বিদ্যার খবর জেনেছি কিন্তু উপলব্ধি আমার হয় নি, সেদিকে দিয়ে তুমি অনেক উঁচুতে, তাই আমি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই।' সুপ্রাচীনকালে যা ছিল ব্রহ্ম উপলব্ধি চৈতন্যদেবের সময়ে তাই হয়ে এল বিদ্যালাভ যেন। এই জন্যই বিপ্র গঙ্গাদাসকে বলা হত উপাধ্যায় শিরোমণি। বস্তুত শিক্ষার স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান বলতে চিরকাল এইটিই বুঝিয়েছে, আমরা জোর করে তা কাজে-কর্মে বা আচরণের প্রকাশে (manifestation) আনতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলেছি মাত্র। যাই হোক গঙ্গাদাস নিমাইকে বললেন,

"বাপ বিশ্বম্ভর! শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য॥
মাতামহ যার—চক্রবর্তী নীলাম্বর।
বাপ যার—জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ-মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয়।

ভালমতে গিয়া শাস্ত্র পড়িয়া পঢ়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর, মোর মাথা খাও॥"

গঙ্গাদাসের উপদেশে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। বিদ্যাচর্চার কোথায় যেন ধারাবাহিকতা আছে। অবিরাম সেই স্রোত চলছে। এই স্রোতকে বইয়ে নিয়ে যাওয়াই বিদ্যাচর্চার চরম উদ্দেশ্য। এই বিদ্যালাভের গুরুই জগন্নাথ মিশ্র, নীলাম্বর চক্রবর্তী, প্রকৃতি শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছেন। সেই স্রোত অক্ষুণ্ণ রাখতে বলছেন। পিতা এবং মাতামহের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ সমূহ-তান্ত্রিক প্রথার সমাজের অঙ্গ বলেই। সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই। এই সমাজের সঙ্গে উত্তর পশ্চিম ইউরোপের সমাজের মিল হবে না। কারণ তারা হচ্ছে (Particularist Society) ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রথার। গঙ্গাদাসের উপদেশ সমূহতন্ত্রকে মান্য করেই রচিত হয়েছে (সমূহতন্ত্র কথাটা রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন।)

নিমাই এখনও বুঝতে পারেন নি, কোথায় তাঁর দোষ। তিনি গঙ্গাতীরে গিয়ে বসলেন শাস্ত্র আলোচনার জন্য। কোন অট্টাচার্যই তাঁর সঙ্গে পেরে উঠলেন না। তিনি সূত্র খণ্ডন করেন, আবার স্থাপন করেন। তাঁর সমকক্ষ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন বুঝতে পারলেন তাঁর বাক্যবৃত্তি সুরু হচ্ছে তখনই অধ্যাপনার অবসান ঘটালেন।

পড়ুয়াদের বলতেন তোমরা অন্যত্র যাও, আমার দ্বারা পড়ানো আর সম্ভব নয়।

এই ঘটনাটি বলবার কারণ আর কিছুই নয়। শুধু বলা যে সমাজচরিত্র তখন কেমন ছিল, গুরুর বিচক্ষণতা কিরূপ এবং বিদ্যা বলতে তাঁরা কি বুঝতেন, বুদ্ধিটা কি আর শিক্ষা-পরামর্শ (Education Guidance) কাকে তাঁরা বলতেন।

শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক কি, এবং পাঠ গ্রহণের প্রাক্কালে কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করতে হয় সে সম্পর্কে উপনিষদে অনেক কথা আছে। উপনিষদ এতি প্রাচীন-সেদব শ্লোক আবৃত্তি করতে ভালো লাগে কিন্তু আমরা "বাস্তব" বলে ভাবি না। নিমাই তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতেন তা বললে বোধ হয় খুব প্রাচীন বলে উপেক্ষা করা যাবে না।

শিষ্যগণকে তিনি "ভাই" বলে ডাকতেন। তাদের নিয়ে তিনি গঙ্গার জলে সাঁতার কাটতেন, তাদের নিয়ে বেড়াতেন, গঙ্গাতীরে বসে শাস্ত্রালোচনা করতেন। কলাপ ব্যাকরণ প্রধান অবলম্বন ছিল। তিনি পূর্বপক্ষ তুলে শিষ্যদের বলতেন খণ্ডন কর; আবার শিষ্যদের পূর্বপক্ষ তুলতে বলে নিজে খণ্ডন করতেন। মান-অপমান বোধ নেই, ঈর্ষা নেই দ্বেষ নেই। উপনিষদের গুরু শিষ্যের প্রার্থনা মনে পড়ে 'মা বিদ্বিষাবহৈ।' সোক্রাতিসের পদ্ধতির সঙ্গে বা 'ডিসকাসন' 'মেথডে'র সঙ্গে এই পদ্ধতির মিল আছে কিনা শিক্ষাবিদেরা ভেবে দেখতে পারেন। 'ভাই' বলে সম্বোধন করার সঙ্গে মিনাইয়ের অন্তর বাহিরের যেমন ঐক্য এমন আমি বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদের মধ্যেও পাইনি। এঁদের সঙ্গে 'ওয়ার্কিশপ' পদ্ধতি জানবার জন্য অনেকক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ঘটেছে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষের টেবিলে হেলান দিয়ে সিগারেট খাওয়া-দাওয়া ছাড়া সমতা কোথাও পাইনি; একটু মতবিরোধ হলেই কৃত্রিম রোষের বশে পড়তে বারবার দেখেছি। এঁরা সত্য বটে কিন্তু মনটি তত্ত্বাতে মাজিত নয়। অনেকটা কারখানার 'এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মতো। ইস্কুল কলেজে 'স্টাফ কাউন্সিল' বলে একটা কথা আছে সেখানে সেখান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ সহকর্মীদের কাছে অনেক পরামর্শ চান। কিন্তু পরামর্শ যে সহকর্মী দেন তাঁকে বিরোধী পক্ষ বা বিরোধী বলে মনে করেন—এমন ঘটনা সরকারী বা বিসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও হামেসাই দেখা যায়। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজে ও সংগঠনের অধিকার একটি মাত্র ব্যক্তিরই হাতে থাকবে। এই মর্যাদা-ভিত্তিক শৃঙ্খলা ছাত্র-শিক্ষকে মর্তে যায়, স্বাভাবিক নিয়মে বিশৃঙ্খলা এসে পড়ে। কে একজন শিক্ষাবিদ ইংরেজীতে লিখেছিলেন, শিক্ষক হবেন ছাত্রদের 'ফ্রেণ্ড,ফিলজফার, গাইড'। তাঁর কথাটা চৈতন্যদেবের যুগে স্বাভাবিক সত্য ছিল, ঐ কথাটি ঐ আধুনিক শিক্ষাবিদ মানতেন কিনা জানতে ভারী ইচ্ছে হয়। ব্যক্তিকে উপাসনা করা বা ব্যক্তিস্বার্থই যে সভ্যতার প্রকট, সে সভ্যতায় 'ফিলজফার এবং গাইড' কথা দুটি মৃত।

[ক্রমশঃ]

পরীক্ষা—৪

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পরীক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, কিন্তু এখনও ঢের বাকি। বর্তমানে কাইন্যাল পরীক্ষার (স্কুলের) কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। তবে পূর্ব প্রবন্ধের জের স্বরূপ আগে কিছু বলা দরকার।

সাপ্তাহিক পরীক্ষার উপর আমি বিশেষ জোর দিয়াছি। ইহার কারণ পাঠক পাঠিকারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। আজকাল দেখি পরীক্ষার খাতা ছেলেদের ফেরত দেওয়া হয় না। কোথাও কোথাও ইহার একটু ব্যতিক্রম যে না হয় তাহা বলি না। একটি স্কুলের কথা জানি, ছাত্রীদের পরীক্ষিত খাতা দেখাইয়া আবার ফেরৎ জমা লওয়া হয়, বাড়ীতে লইতে দেওয়া হয় না। এই ব্যাপারের তিরোধান চাই। ছাত্র বা ছাত্রীকে পরীক্ষার খাতা ফেরত দেওয়া হইবে। সাপ্তাহিক পরীক্ষার বেলায় তো ফেরৎ দেওয়া চাই-ই। প্রশ্নের উত্তর কিরূপ লিখিলে কত নম্বর পাওয়া যায়, খাতায় উত্তর লেখায় কি ধরণের ভুল তাহারা করে, বানান, বাক্য-গঠন, শব্দ-প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে উত্তরপত্রে তাহারা কতখানি শুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছে, কতটাই বা ভুল করিয়াছে, ছেলেমেয়েরা তাহাদের লিখিত উত্তরপত্র পাইলে তাহা যাচাই করিয়া লইতে পারে। পরবর্তী পরীক্ষায় উত্তর পত্র লিখিতে তাহারা অধিকতর সাবধান হয়। এইরূপে পাঠের উৎকর্ষ বিধান হইবে।

আজকাল সাপ্তাহিক পরীক্ষার তো বালাই নাই। মাণ্ডাসিক পরীক্ষায় এই রীতির বিপরীতই ঘটিতেছে। আমি এখানে বাৎসরিক পরীক্ষার কথা বলিতেছি না। ইহার উত্তরপত্র-সমূহ কতকটা গোপনীয় রাখা আবশ্যক, নহিলে নানারকম বাগ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতে পারে। বাৎসরিক পরীক্ষা বাদে অন্য সব পরীক্ষায় আমার প্রস্তাবিত রীতি অনুসৃত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি।

মাধ্যমিক শিক্ষার নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তন দ্বারা। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় না স্কুল না কলেজ। অথবা সত্য কথা বলিতে কি দুয়েরই অসহ সংযোগ। একদিন কোন ছাত্রীকে বলিতে শুনি আমরা তো কলেজে পড়ি। এই উক্তি যে একেবারে অযথার্থ তাহা কিন্তু নয়। নবম হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসগুলি অংশত কলেজী ধরণে করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরেজী বাংলা বাদে তিনটি বিষয় প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে লইতে হইত। এখানে এই বিষয় বলবৎ দেখিতেছি। শুনি এগুলিকে সংক্ষেপে বলা হয় 'combination subjects'। প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষক আলাদা হাজিরা বই লইয়া আসেন এবং কলেজের মতই নাম ডাকেন। এই বিষয়গুলির কোনটির শিক্ষক বা শিক্ষিকা অনুপস্থিত থাকিলে ক্লাস ফাঁক যায়, কেননা, এই ধরণের বিশেষ বিষয় পড়াইবার লোক তো দ্বিতীয়টি আর থাকেন না। এ যেন কলেজ। শুনিয়াছি একক্রমে তিন চার পীরিয়ডও এ রকম ফাঁক যায় এবং ছেলে মেয়েদের অলসভাবে কাল কাটান ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। পরীক্ষার সময় ইহার দরুন প্রতিক্রিয়া হয় খুব। কোথাও কোথাও শিক্ষক বা শিক্ষিকা অসংবরণ বশত হইয়া থাকেন, কোথাও বা তাঁহারা ছুটি লইয়া বি, টি, পড়িতে যান; অল্প সময়ের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। আমার দেখুন উচ্চতর বিদ্যালয়গুলি যে হারে বাড়িতেছে সে তুলনায়

শিক্ষক সংখ্যা আশানুরূপ বাড়িতেছে না বা শিক্ষক নির্দিষ্ট বেতনে পাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না।

কিন্তু পরীক্ষা তো ওসবের জন্য অপেক্ষা করিবে না। পরীক্ষা নৈতরণী ছাত্র ছাত্রীকে পার হইতেই হইবে। তাহাদের পাঠোৎকর্ষ কথা নিরূপে হওয়ার সঙ্গে দেখিতেছি বিষম বাধা। এই বাধা দূর না হইলে শত চেষ্টা করিয়াও ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই তৃতীয় বিভাগের উপরে আর উঠিতে পারে না। আমি সাপ্তাহিক পরীক্ষার কথা বলিয়াছি। কিন্তু এই ভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে আরও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

এই রকম একটি ব্যবস্থা আমার মনে হয় স্কুলে রীতিমত টিউটোরিয়াল ক্লাস খোলা। বিশেষ বিষয়ের ক্লাসের জন্য যেমন স্বতন্ত্র হাজিরা বহি রহিয়াছে এই সব টিউটোরিয়াল ক্লাসের জন্যও হাজিরা বহি থাকিবে। ছাত্র ছাত্রীদিগকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় গুণানুসারে ভাগ করিয়া প্রতি সপ্তাহে এক একটি বিষয়ের উপর অন্তত একবার এই ক্লাস লওয়া হইবে। সপ্তাহে তাহাদের পাঠোৎকর্ষ প্রশ্নোত্তর-ছলে, বেশির ভাগ লেখার মাধ্যমে যাচাই করিয়া লওয়া হইবে। সাধারণ ক্লাসে তাহারা যে সব বিষয় অনুধাবন করিতে না পারে এই ক্লাসে তাহাও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে পারিবে। এইরূপ হইলে দু' সাত সপ্তাহ অন্তর এই বিষয়ে যে সাপ্তাহিক পরীক্ষা লওয়া যাইবে তাহাতে ছাত্র ছাত্রীদের পাঠোৎকর্ষের মাপ ঠিক ঠিক বুঝা যাইবে। পাঠোৎকর্ষ বিষয় তাহাদের আগ্রহ এই উপায়ে আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।

সম্প্রতি যে ধরণের সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিশোধ করেই আমি এই সকল কথার অবতারণা করিতেছি। বিষয়টি যদি আমার জানা থাকে তাহা হইলে উত্তর দান কালে হাবু ডুবু খাইতে হয় না, অসৎ উপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তিও মনে জাগে না। আজকাল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে নকল করার প্রবৃত্তি এত বাড়িতেছে কেন তাহা এতক্ষণ আমরা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছি। বিভিন্ন বিষয় জানা থাকিলে সহজেই তাহারা এ সম্বন্ধে কিছু না কিছু লিখিতে পারে। লেখার কৌশল বা নৈপুণ্য দুই উত্তরের মান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সাদা মাঠা রকমের লেখাও যদি প্রশ্নানুগ হয় তাহা হইলে নম্বর কিছু অবশ্যই পাইবার অধিকারী পরীক্ষার্থীরা। সকলেরই মূলে আত্মপ্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাস। ইহার অভাব ঘটিলে নানা রকম অসদুপায় অবলম্বনে প্রবৃত্তি হয়। এই ব্যাপারটি হইতে আমি আমার মূল বক্তব্যে আসিতেছি।

প্রতিটি ক্লাসের পরীক্ষাগুলিতে ছেলেমেয়েরা যদি তাহাদের পাঠোৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারে তাহা হইলে তো কথাই নাই। কিন্তু ইহার বিপরীত ঘটনাই বিপদ হইতেছে। আমি প্রথমে, যাহারা নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিয়া স্কুল ফাইন্যালে এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে তাহাদের কথাই বলি। আমি যে পদ্ধতির কথা এতক্ষণ বলিয়াছি তাহা যথাযথ অবলম্বিত হইলে বর্তমানের বিপদ কাটিয়া যাইবে আশা করি। নকলের ছাড়া আর থাকিবে না। বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের মনে আত্মবিশ্বাস জন্মিবে এবং বিশ্বাস হেতুই সকল জিনিস তাহাদের নিকট সুগম্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু তেমনটি এখনই হইবার সম্ভাবনা দেখি না; একটি বিকল্প পন্থাও অবলম্বন করা যাইতে পারে। এই কথাই এখন বলি।

কয়েক বৎসর পূর্বে এই বিকল্প পন্থার কথা আমার মনে উদিত হইয়াছিল। পরে শুনি ভারতের এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকও এই পন্থার কথা প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছেন। তাই ইহা এখন এখানে লিখিতে ভরসা পাইতেছি। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার কথা বলিতেছি। স্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেণ্ডারি উভয় পরীক্ষার সম্বন্ধেই এই কথা। যে দিন যে বিষয়ের পরীক্ষা হইবে, বলা থাকিবে ছাত্র

ছাত্রীরা সেই সেই বিষয়ের পাঠ্য বই, রেফারেন্স বই ইত্যাদি পরীক্ষার হলে লইয়া আসিতে ক্ষমতাপন্ন হইবে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নয়, চালোয়া ব্যবস্থা এইরূপ হইবে। প্রশ্নকর্তাকে এমনভাবে প্রশ্ন দিতে হইবে যাহাতে বইগুলির ভিতরকার বিষয়বস্তু যে ছাত্র ছাত্রী অবগত তাহার পরিচয় মিলিবে। আমার বক্তব্য আর একটু পরিষ্কার করিতেছি। ইতিহাসের পরীক্ষা। আকবরের রাজ্যবিস্তার বা শেরশাহের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করেন তাহা হইলে বইয়ের ঐ ঐ অধ্যায় খুলিয়া তাহার নকল করিবে। কিন্তু প্রশ্নপত্রের ধারা অন্যরকম না হইলে উত্তরের মান বৃদ্ধি পাইবে না, বরং সকল করার প্রবৃত্তিই বাড়িবে। আসল কথা পাঠ্যবিষয়সংযুক্ত বইগুলি ছাত্র ছাত্রীরা পাঠ করিয়াছে ইহাই আমাদের জানা দরকার। বর্তমানে পাতা উল্টাইয়া সাজাইয়া তাহারা পরীক্ষার হলে লইয়া আসে। এরূপ কৌতুককর কথাও শুনিয়াছি, একটি ছেলে ছাপা পাতা ছেঁড়া প্রভৃতির ১৯টি স্থানে এইরকম কাগজপত্র গুছিয়া আনিয়াছিল। পরীক্ষার্থীদের এরূপ কষ্ট করার কোন কারণ থাকিবে না, ধরা পড়িবারও আশঙ্কা নাই। অবশ্য বইগুলি তো তাহাদের সঙ্গেই থাকিবে, যত ইচ্ছা দেখিয়া লউক। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র শেষ করিলেই হইল।

এই ব্যবস্থায় দুইটি উপকার। ১. ছেলেদের সকল করিবার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহের কারণ নিয়ন্ত্রিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইলে তাহা বিষয়ে বইগুলি আদ্যোপান্ত পড়িতেই হইবে। বিষয়গুলি জানা থাকিলে হাতড়াইতে হইবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর লেখা আবশ্যিক। কাজেই হাতড়াইবার সময় কোথায়। ছাত্রছাত্রীদের বইগুলি আগে ভালো করিয়া পড়িয়া লইতে হইবে। সকল ছাত্রছাত্রীকেই যে এই সব বই পরীক্ষাকালে দেখিতে হইবে এমন সম্ভাবনা কম। হয়তো কোন সন বা তারিখ মনে নাই, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা স্থানের নাম স্মরণ হইতেছে না, তাহারা সত্বর বই খুলিয়া এগুলি দেখিয়া লইতে পারিবে। পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন বই ভাল করিয়া পড়া থাকিলেই তবে তাহাদের পক্ষে এগুলি প্রয়োজন মত দেখিয়া লওয়া সম্ভব। মনুষ্য সব বই সামনে থাকিলেও তাহাদের চক্ষে সহজে ফুল দেখা আর ঘুচিবে না। কি ভাবে এই পন্থা কার্যকর হইতে পারে তাহা কর্তা ব্যক্তিরা ভাবিয়া দেখুন। হয় ছেলে মেয়েদের বিষয় বস্তুর সঙ্গে পরিচয়ের মান নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার (যার টিউটোরিয়াল ক্লাসে পড়ারও পরীক্ষা) ব্যবস্থা করুন নতুবা এইরূপ ঘোষণা করুন যে, পরীক্ষার সময় তাহাদের পাঠ্য বই লইয়া আসিবার অধিকার থাকিবে এবং উত্তর লিখিবার সময় উহা হইতে সাহায্য তাহারা লইতে পারিবে।

আমার মূল বক্তব্য হইল ছেলে মেয়েদের, বিশেষতঃ, কিশোর বয়সের ছেলে মেয়েদের রীতিমত অধ্যয়ন ও অনুশীলন লইয়া। যে যে উপায়ে ইহা কার্যকর হইতে পারে তাহা অবিলম্বে গ্রহণ করা আবশ্যক। সেদিন সংবাদ পত্রে দেখিলাম স্কুল ফাইন্যাল ও হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার ফল এবারে খারাপ হইয়াছে এবং ফল বাহির হইতে আরো অন্যূন এক মাস লাগিবে। পড়ার মান ক্রমশঃই নিম্নগামী হইতেছে। স্কুলে পড়া হয় না, বিভিন্ন ক্লাসে পড়ার মান নির্ণয় করার জন্য ঘন ঘন পরীক্ষার ব্যবস্থা এক-রূপ নাই-ই। স্কুলকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, কাজেই দু তিনটি বিষয় ফেল হওয়া ছাত্রছাত্রীকেও ক্লাসে প্রমোশন দিতে হয়। এই রকম হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, কাড় পোহ করিয়াও গোপা-মালের ছাত্রছাত্রী পাওয়া খুবই কঠিন হয়। পরীক্ষার ব্যাপারে কতই না গলতি, অনাচার। তৎসত্ত্বেও যাহারা পরীক্ষা বৈতরণী উত্তীর্ণ হয়, দেখা যায় তাহা দের খুব বেশির ভাগই তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হই-য়াছে। খুবই চিন্তার কথা। আবার সেদিন দেখিলাম

পুরাতন কোর্সের বি এ পরীক্ষায় প্রথম কিস্তিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইংরেজীতেও শতকরা গ্রেস নম্বর দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয়টিতে দেওয়া হইয়াছে ১২ নম্বর গ্রেস। তিনশত নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা। এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ একশত নম্বর পাইলেই পাস। দেখা যাইতেছে তিনটি পেপারে একুনে ৮৮ নম্বর যাহারা পাইতেছে তাহারা পাস হইবে। ইহা তো প্রথম কিস্তির 'গ্রেস', আরো কতটা দিতে হয় কে জানে। এইরূপে গ্রেস দিয়া পাস করানোর পরীক্ষা আজ একটা প্রহসনে দাঁড়াইয়াছে। পড়ার নাম কত দিনে গিয়া ঠেকিয়াছে একবার ভাবুন। শুধু বি, এ কেন, নিম্নতন পরীক্ষাগুলিতেও কি কম হেরফের করিতে হয়। দীর্ঘকাল পরীক্ষক থাকিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, এই ধরণের পরীক্ষা প্রহসন হইতে আমরা কবে রেহাই পাইব।

তুমি আজকাল উত্তর পত্র পরীক্ষার পরীক্ষকদের মধ্যেও বিশেষ গতি দেখা দিয়াছে। বন্ধুবর বলিলেন, ইতিহাসের পরীক্ষক এক শিক্ষয়িত্রী অপর এক শিক্ষয়িত্রীকে এই মর্মে বলিতেছিলেন যে প্রত্যেকটি খাতা কি আগাগোড়া পড়া সম্ভব, এক একটি প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার্থী যাহা লিখিয়াছে, তাহার প্রথম পাঁচ-সাত লাইন পড়ি, আর শেষে চার পাঁচ লাইন পড়ি; পরীক্ষার্থী ক'পাতা উত্তর লিখিয়াছে তাহাও দেখি। আর এই সকলের উপরে নম্বর দিই। পরীক্ষক আছেন, তদারক আছেন, সর্বোপরী আছেন প্রধান পরীক্ষক। আমাদের সময় কিন্তু এতটা গতি হইবার তেমন অবকাশ ছিল না। এখন বোধ হয় সকল স্তরেই গতি, নহিলে পরীক্ষক অমন কথা বলিতে সাহস পান কেমন করিয়া।

পরীক্ষা প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করিতে চাই। পূর্ব প্রবন্ধে 'irregular' নামীয় এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীর উল্লেখ করিয়াছি। তাহাদের বলা হয় সংক্ষেপে P. W. T. (Private without Test)। এই শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরা বেপরোয়া হইলে তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। শুনিতেছি ইহারাই নাকি পরীক্ষার হলে গণ্ডগোল বাঁধায় সবচেয়ে বেশি। কবে হইতে এই ব্যবস্থার আবির্ভাব হইল জানি না। এক সময় দেখিতাম মেয়েরা টেস্ট পরীক্ষা না দিয়াই প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনীরূপে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারিত। এখন ছেলেদের বেলায়ও ঐ নিয়ম চালু। সংবিধানে নারী-নরের সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই কি এই ব্যবস্থা! ইহাতে স্কুল বোর্ডের আর্থিক সাশ্রয় হইতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক বা শিক্ষা খাতে যে একেবারেই শূন্য। আমি বলি যদি এখনই এই শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের বাতিল করিয়া দেওয়া সম্ভব না হয় তবে তাহাদের জন্য আলাদা করিয়া পরীক্ষার কেন্দ্র স্থির করিয়া দেওয়া হোক। নিদেন পক্ষে এক একটি কেন্দ্রে বিশিষ্ট ঘর তাহাদিগের জন্য রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাহাদের উপর কড়া নজর রাখুন, চাই না রাখুন,—তাহারা পরীক্ষার্থীরা যাহাতে নির্ঝঞ্ঝাটে সন্তোষজনক পরীক্ষা দিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। পরীক্ষা ছেলেখেলা নয়। ছাত্রছাত্রীদের ইহা বুঝিতে দিন। আজকাল যে বিপদ দেখা দিয়াছে তাহার দিকে। পরীক্ষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য মুখী জনের নিকট পেশ করিলাম। শিক্ষাবিদ, শিক্ষা-নিয়ন্তা শিক্ষাব্রতী এবং অভিভাবক প্রত্যেকেই এ বিষয়ে চিন্তা করুন এবং কর্তব্য স্থির করুন এই প্রার্থনা।

———

লোকশিক্ষক রামানন্দ

শ্রীকালাইলাল বসু

সুবিখ্যাত প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর যে সম্পাদক রূপেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় খ্যাতিমান। সাময়িক পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি একটি মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং প্রবল লোক হিতৈষণা পত্রিকা দুইটির মধ্যে বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বলেই প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ আমাদের আশা আকাংখার বাণীরূপ, স্বদেশ সেবা ও জাতীয় মুক্তি সাধনার মুখপত্র এবং সাহিত্য সংস্কৃতির ধারকরূপে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালব্যাপী ভারতীয় জনমানসে ক্রিয়াশীল ছিল। সাময়িক পত্রিকায় লোক কল্যাণ ও লোক শিক্ষার যে আয়োজন রামানন্দ করেছিলেন তেমনটি তাঁর পূর্বে আর ছিল না, পরেও লুপ্ত হয়েছে। কথাটা সহজে বিশ্বাস করতে অনেকে কুণ্ঠিত হবেন। হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রামানন্দ সম্পাদিত একখানা প্রবাসী বা মডার্ণ রিভিউয়ের সঙ্গে তাঁর পূর্বকার বা বর্তমানকালের কোন পত্রিকার তুলনামূলক বিচার করলেই আমি নিসন্দেহ যে সে কুণ্ঠা আর থাকবে না।

অতীতের কথা না হয় নাই আলোচিত হোল। সাময়িক পত্র পত্রিকা প্রকাশিত বর্তমান সময়ের কোন পত্রিকাই কি রামানন্দ সম্পাদিত প্রবাসী বা মডার্ণ রিভিউর পাঠক পাঠিকাকে তৃপ্ত করতে পারে? অভিজ্ঞতা থেকে অনেকটা নির্ভরতার সঙ্গে বলা যায়, কোন চিন্তাশীল পাঠকই ইতিবাচক উত্তর দিতে সক্ষম হবেন না। এই যে উন্নতমান ও সুরুচির প্রতি আকর্ষণ প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর মাধ্যমে রামানন্দ সৃষ্টি করে গেছেন সেটা যে কত আয়াস-সাধ্য, বিশেষত, সিনেমা পত্রিকার রেকর্ড সেলের দেশে, তা সহজেই অনুমেয়। এ কথা বোধ হয় নিশ্চয় করে বলা যায় যে, এখনকার মত জনতার রুচি রীতি ও মতামতের পোষকতা করে রামানন্দ কখনও চাকা ঘুরাতে চান নি। ব্যবসায় বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে পত্রিকাকে তিনি অর্থ উপার্জনের উৎস বলে বিবেচনা করতেন না। তিনি বিপুল উদ্যম ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পত্রিকা দুখানিকে স্বদেশসেবা ও লোক-শিক্ষার ব্রত উদ্‌যাপনের অবলম্বনরূপেই পরিচালনা করে গেছেন। যাতে তীব্র গোয়েন্দা গল্প সুরুচি পূর্ণ বিজ্ঞাপন, এককথায় যা কিছু মানুষের রুচিকে পীড়িত ও শিক্ষাকে খর্ব করে সে সবই তিনি প্রকৃত আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

কিছু অর্থের সংস্থান থাকলে এ কাজটুকু করা খুব একটা দুঃসাধ্য নাও হতে পারে। কিন্তু রামানন্দ যখন অসহকর্মা হ'য়ে পত্রিকা পরিচালনায় আত্ম-নিয়োগ করেন তখন আদৌ আর্থিক সচ্ছলতা তাঁর ছিল না। অতএব আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা কত গভীর হলে এত বড় ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব এ ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই বিবেচ্য। আর এতো ঘটনাটির নেতি-বাচক দিক। এর ইতিবাচক অংশটি হচ্ছে উৎকৃষ্ট গল্প কবিতা উপন্যাস রম্য রচনাদির সংগ্রহ এবং লোকশিক্ষামূলক বিবিধ বিষয়ে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা ও সংগ্রহ। এই কাজটি যে খুবই আয়াসসাধ্য তা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে সে যুগের প্রায় সকল মনীষী লেখকগণের সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন। আর তার পত্রিকার প্রচার সংখ্যা হ্রাস তো পায়ই নি বরং বেড়েছিল।

পাঠকের সহযোগিতার অভাবে উচ্চমানের পত্রিকা চলছে না এই যুক্তি দিয়ে অনেকে চটুল ও সিনেমা পত্রিকার বহুল প্রচার সমর্থন করেন। কিন্তু এ কথা যে সর্বাংশে সত্য নহে তা আমরা রামানন্দ সম্পাদিত পত্রিকাগুলি দেখলেই বুঝতে পারি। প্রবাসীর পূর্বে তিনি একে একে তিনখানা পত্রিকার সম্পাদনা ত্যাগ করেছেন।

ধর্মবন্ধু, দাসী ও প্রদীপ। প্রতিটি পত্রিকা তাঁর হাতে পড়ে লোক শিক্ষার বাহন হয়ে ওঠে। ঐ সকল পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদি সম্যক আলোচনা করলেই আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকবে না। ঐ পত্রিকাগুলির মালিকানা ছিল অন্যের। সম্পাদকের স্বীয় অভিরুচি অনুসারে পত্রিকা সম্পাদনার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা না থাকলে অনেক অসুবিধা স্বাভাবিকভাবেই ঘটে, আদর্শের সঙ্গে আপোষ করে চলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু রামানন্দের পক্ষে এটা সম্ভবপর ছিল না। তিনি এই অসুবিধার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন প্রবাসী।

তাঁর প্রতিভা কেবল বাংলা ভাষাভাষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে খুবই পরিতাপের বিষয় হত। সন্দেহ নেই। সৌভাগ্যক্রমে প্রবাসী প্রকাশের অল্পকাল পরেই ইংরেজী মডার্ন রিভিউ পত্রিকা তিনি বের করলেন। লোকমাতা নিবেদিতা তাঁর নিজস্ব অপূর্ব ভাবে ও ভাষায় মডার্ন রিভিউকে আপন আসিয়ে বলেছিলেন, "শুধু বাংলার কথা বলিলেই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, তাহাকে সকল ভারতের কথা বলিতে হইবে এবং সকল জগতের কথাও ভুলিলে চলিবে না।" "আলোকস্তম্ভের মহাদীপের মত যে শক্তি তাহার কাজ কি ঘরের কোণে সামান্য লেখাতেই নিঃশেষিত হইবে।"

রামানন্দের সমগ্র স্বদেশ সেবা এবং স্বজাতির উন্নতির চিন্তা ও কর্মের পথ ছিল অগ্নিক্ষরা। যুগ যুগের লোক দীর্ঘ দিন সেই অত্যাচার অর্জরিত কণ্টকাকীর্ণ পথে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে চলে আমাদের স্বাধীনতা ও সর্ববিধ উন্নতি এবং অগ্রগতির পথ সুগম করে দিয়েছেন। এমনি একজন মহৎ মানুষ ছিলেন রামানন্দ। মহৎ মানুষের স্মরণ মননের দ্বারা জাতি আত্মস্থ হয়। তাই আজ অর্ধ শতবর্ষের পুণ্যাহে লোকশিক্ষক রামানন্দকে ভক্তি বিনম্র চিত্তে এই স্মরণ করছি।

পত্রিকা সম্পাদন রামানন্দের প্রধানতম কৃতি হলেও তাঁর জীবদ্দশায় ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনা খুব অল্পই আছে যার সঙ্গে রামানন্দের যোগ ছিল না বা যে সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেন নি। বহুবিচিত্র কর্মের সমন্বয়ে যে জীবন শতদল বিকশিত তা থেকে কোন একটি নিদেষ ঘটনাকে পৃথক করে নিয়ে আলোচনা করা খুবই দুঃসাধ্য। তবে ভরসা এই, শতদলের প্রত্যেকটি পাপড়ির নিজস্ব একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য আছে বলেই তার সামগ্রিক সুষমা। রামানন্দ-জীবনের কর্মশতদলের একটি দল শিক্ষকতা। তাঁর শিক্ষক জীবন আলোচনার মধ্যে পূর্ণ মানুষটির পরিচয় না মিললেও, আভাষ কিছু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আর বর্তমানের শিক্ষা-সংকট ও শিক্ষক-সংকটের দিনে এ আলোচনা সংকটত্রাণের সহায়ক হতে পারে।

বাস্তবিক রামানন্দ বেশ কিছুকাল শিক্ষকতা করেছেন। জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বরাবর সচেতন ছিলেন। ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শিক্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধে এর মজীর আছে। তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা ক্রফ্‌ট সাহেব আশুতোষকে শিক্ষা বিভাগে কাজ করবার সুযোগ না দেবার জন্য তাকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখি। আশুতোষের ন্যায় প্রতিভাবান মানুষ শিক্ষা বিভাগে না থাকলে দেশের উন্নতি হবে কি করে? সেই সময়ে খুব বেশি লোক এ কথাটা বুঝতেন বলে মনে হয় না।

তাঁর জীবনের সর্বাগ্রগণ্য কাজ যে পত্রিকা সম্পাদন সে কথা পূর্বেই বলেছি। এ কাজটিকে তিনি শিক্ষকের কাজের ন্যায় গৌরবজনক মনে করতেন। তিনি লিখেছেন, "আমি সম্পাদকের কার্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য অপেক্ষা কম পবিত্র অথবা দায়িত্বপূর্ণ মনে করি না।" পত্রিকাকে তিনি বিদ্যালয়ের ন্যায় হিতকরী মনে করতেন। এ জন্য

তিনি চেয়েছিলেন লোকে স্কুল কলেজ স্থাপনের জন্য যেমন অর্থদান করে তেমনি পত্রিকার জন্যও হাত বাড়াক। অতএব অনুমান করা যায় সম্পাদকের আসনে আসীন থাকলেও তাঁর শিক্ষক-মনটি সদা জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল ছিল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল দীর্ঘকাল প্রবাসীর সহ সম্পাদকরূপে রামানন্দের নিকট সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তিনি তাঁর রামানন্দ পুস্তক লিখেছেন—"রামানন্দ লোক শিক্ষক।" সংক্ষিপ্ত এই বাক্যটির মধ্যে রামানন্দ চরিত্রের সার নিহিত রয়েছে বলে আমার ধারণা। লোক শিক্ষক রামানন্দের জীবন সুরু হয়েছিল সাধারণ শিক্ষক রূপেই।

সিটি কলেজেই বস্তুতঃ রামানন্দের শিক্ষক জীবন সুরু। কিন্তু অনেক পূর্বে, বাঁকুড়ায় যখন স্কুলের ছাত্র তিনি তখনই সেখানে এক নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রের শিক্ষক কেশবনাথ কুলভীর সহায়তায় ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে এই স্কুল তিনি করেন। আদর্শ শিক্ষক কুলভির দ্বারা রামানন্দের জীবন বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। এর পরেই তাঁর সিটি কলেজের অধ্যাপনা। রামানন্দের বিদ্যাবত্তা অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রকে একতই মুগ্ধ করে যে তিনি উদ্যোগী হয়ে এই চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। রামানন্দ তখন সবে বি. এ. পাস করেছেন। অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী অবস্থায় তিনি এম. এ পাস করেন এবং কলেজেই পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে অধ্যাপনা কার্যে তাঁর দক্ষতা তিনি সংশয়াতীতরূপে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন বলে ঐ চাকরি জোটাতে তাঁকে কোন বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু বেগ তিনি পেয়েছিলেন আত্মীয় পরিজনদের সামলাতে। তাঁরা চেয়েছিলেন রামানন্দ মোটা বেতনের প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী সরকারী চাকুরিয়া হবেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটির চাকরী তিনি পেয়েছিলেনও। আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে সে দিন আত্মীয় পরিজনদের হতাশ করে, ডেপুটিগিরির লোভ ছেড়ে মাত্র একশত টাকা বেতনের অধ্যাপকের পদ তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষকতার প্রতি অনুরাগ অকৃত্রিম না হলে এ কাজ কোন অবস্থাতেই সম্ভব নহে।

রামানন্দ সাধারণ বেতনভোগী শিক্ষক বা অধ্যাপক মাত্র যে ছিলেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাদান পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তিনি সযত্নে অনুধাবন করেছিলেন এবং সাধ্যমত প্রতিকারে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর অজস্র লেখায় এ সব ছড়িয়ে আছে। এক স্থানে তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশের শিক্ষার একটি প্রধান দোষ এই যে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার সুযোগ নাই।" অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে রামানন্দ এই কথা লিখে গেছেন। আদর্শ ও কল্যাণকর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক-ছাত্রের ঘনিষ্ঠতার গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও এর সুফল যে কত সুদূর-প্রসারী তা অনেকেই আমরা যথার্থভাবে ধারণা করতে পারি বলে মনে হয় না। ঐ যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিবনাথ শাস্ত্রী আর একজন প্রাতঃস্মরণীয় জাতীয় শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে লিখেছেন—"বিদ্যাসাগরের ন্যায় তেজস্বী পুরুষকে একবার দেখাও পরম লাভ, একবার দেখিলে তাহা চিরজীবনের শক্তির উৎস হইয়া থাকিতে পারে।" কথাটা আমি বিশ্বাস করি। সকলের মধ্যে বিদ্যাসাগর চরিত্রের মহিমা কেহ প্রত্যাশা করে না। কিন্তু শিক্ষকের সান্নিধ্য-লাভ যে ছাত্রদের চিত্তে প্রচুর কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম তাতে আর সন্দেহ কি।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগৃতির যাঁরা হোতা তাঁদের অনেকেই ছিলেন শিক্ষক। ডিরোজিও, বিবেকিতা,

বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রভৃতি শিক্ষক-কুল তিলকবর্গ উনিশ শতকের সোনার ফসলকে নীতি ও নিষ্ঠার দ্বারা লোককল্যাণকর করে তুলেছিলেন। একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ঐ সময়ে অনেক স্বদেশীয় পুরুষ খুব সামান্য অবস্থা থেকে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন এবং দেশ হিতে লোক হিতে তাঁদের সেই অর্জিত বিত্ত সহায় হয়েছিল। তখনকার ভাবযোধ এখনকার সময় থেকে কিছু ভিন্ন ছিল। তথাপি এ কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না আট টাকা বেতনে যিনি জীবন শুরু করেন, জীবন সায়াহ্নে কোন ভাগ্য অনুমোদিত পথে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হতে পারেন। উনিশ শতকের যুগপুরুষদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা খুব অল্প নয়। তাহলে সেই যুগের যে অপূর্ব চারিত্রিক দৃঢ়তা, ন্যায় ও নীতি, সত্য এবং যুক্তিনিষ্ঠা শতবর্ষ পরেও আমাদের চিত্ত স্পর্শ করে তার সত্যকার উৎস কোথায়? আমার মনে হয় ঐ উৎস ছিল সে যুগের শিক্ষক সমাজে। হেরম্বচন্দ্রের নীতিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু কথিত গল্প- জানি কিন্তু বলব না; রামতনু লাহিড়ীর প্রভৃতি অনুরূপ গল্পাদির মধ্যে 'এ্যানেকডোটিক্যাল' লোকদের হাসির খোরাক যতই থাকুক না কেন, ওঁরা যে লোক শিক্ষা ও জাতীয় চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে অশেষ কল্যাণকর ও অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ করে গেছেন সে কথা কে অস্বীকার করবেন? উনিশ শতকের অষ্টম দশকের কোন দেশহিতব্রতী চেতনা সম্পন্ন মানুষের পক্ষে এই সকল শিক্ষকদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। এই শিক্ষক সমাজ সহস্র 'মাই'-এর কর্ম তৈরি করে বা কল্পিত ও বাস্তব অসুবিধাগুলির তালিকা নির্ধারণ করে নিজেদের আলস্য ও অকৃতির গ্লানি ঢাকবার চেষ্টা করতেন না। যতটুকু ছিল তারই পূর্ণ ব্যবহার করে ছাত্রদের মানুষ করতেন। যা ছিল না, তা সাধ্যমত করে নিতেন। উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব সব যুগেই থাকে। রামানন্দের সময়েও ছিল। তিনি আমাদের মত নেই বলে অনুযোগপরায়ণ হয়ে কান্ত থাকেন নি বা প্রকাশকের দোষ দিয়ে কর্তব্য শেষ করেন নি। লিখে ফেলেন ABC Picture Book, Century Primer। এ রকম উদাহরণের অভাব নেই রামানন্দ জীবনে।

পড়াবার পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। শৈশব বাল্যকালের অভিজ্ঞতা তিনি রসসিক্ত করে বর্ণনা করে দেখিয়েছেন মুখস্থ করে পাঠ করা ও করানোর প্রবণতা আমাদের সমগ্র শিক্ষণ পাঠনের মধ্যে অতিশয় নগ্নভাবে প্রকটিত। বাস্তবের সঙ্গে অধীতবিদ্যার যোগ বা হাতে কলমে শিক্ষাকে যাচাই করে নেবার সহজসাধ্য উপায়গুলি সম্পর্কেও আমরা উদাসীন বা অন্ধ। আজও এ অবস্থা বর্তমান রয়েছে। তবে কিছু রকম ফের হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে অথচ শিক্ষক অভাবে তা ব্যবহার করা হয় না এমন নজীর অনেক। সেখান থেকে ছেলেদের বিজ্ঞান শিক্ষায় পরীক্ষাদান কিছু বন্ধ নেই। ইদানীং সুবলাল কারখানী হাসপাতালের একটা গল্প শুনেছি। তার সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের কিছু যোগ আছে বলে এখানে উল্লেখ করছি। এই হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় বহুমূল্য যন্ত্রাদি কেনা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি কেউ ব্যবহার করেন না। আলস্যই হোক বা অজ্ঞতাই হোক ফল এক। আমাদের পঠনপাঠন পদ্ধতি এই ব্যবহার না করার জন্য দায়ী। রামানন্দ কংগ্রেসের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ-আন্দোলন শিক্ষা বর্জন নীতির তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। কোন কারণেই শিক্ষার বিকৃতি তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।

সিটি কলেজ থেকে রামানন্দ এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালায় অধ্যক্ষ হয়ে যান। এই তাঁর শেষ সরেন্তনে চাকরি। পরে খুব অল্প সময়ের জন্য তিনি অবৈতনিক শান্তিনিকেতন কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে সেখানকার অধ্যক্ষ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন নির্দেশ বা সর্ত তার মনঃপুত না হওয়ায় তিনি ঐ পদে ইস্তফা দেন। কায়স্থ পাঠশালা রামানন্দের নিপুণ পরিচালনায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এজন্য রামানন্দকে এক সেট সেকুরি অভিধান উপহার দিয়ে তাদের প্রীতি জ্ঞাপন করেন। এখানে কর্মরত অবস্থায় রামানন্দ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। বুঝাতঃ তাঁরই উদ্যোগে ঐ প্রদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে মাইকা বাহুল্য বর্জিত হয়।

কলকাতার মতন এলাহাবাদে রামানন্দ অধ্যাপনার সঙ্গে সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা, সমাজ সেবা ও দেশ সেবার বিবিধ কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। কলকাতা থাকাকালে দাসাশ্রমের সূত্রে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ঘটে। ও দেশে সহায় সম্বলহীন আর্ত মানুষের সেবার ইতিহাসে দাসাশ্রম অক্ষয় গৌরবের অধিকারী। রামানন্দ যে অনুষ্ঠান কর্ণধার ছিলেন। রাজসাহীর 'দর্পহরা' দাসাশ্রমের দাসী এবং পরে বন্ধু বৈকুণ্ঠ নাথ দাসের 'প্রবাসী' তিনি নিজে ক্রয়সূত্রে সম্পাদনা করেন এবং বিবিধ বিষয়ে লেখা দিয়ে ইণ্ডিয়ান মেগেজিন, ইণ্ডিয়ান রিভিউ ও সঞ্জীবনী পত্রিকাকে পুষ্ট করেন। পত্রিকাই ছিল রামানন্দের লোক শিক্ষার প্রধানতম হাতিয়ার। সাধারণ মানুষের শিক্ষার উপযোগী করে সহজবোধ্য ভাষায় নতুন ও গুরুত্ব বিষয় তিনি প্রকাশ করতেন যা হাকটোন স্তরের সঙ্গে আমরা সকলেই কম বেশি পরিচিত। কিন্তু ক'জন এর কলা কৌশলের খবর রাখি? অন্ধদের শিক্ষা, চা-বাগানের কুলিদের জন্য বিদ্যালয় মর্মান্তিক অবস্থা, আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব, বাংলা ভাষার সংকেত লিপন প্রণালী প্রভৃতি কত লোক শিক্ষণীয় বিষয়ই না তিনি সেই যুগেই পত্রিকায় অঙ্গীকৃত করে নেন। এ ছাড়া জাতীয় জীবন চরিত, গৌরব গাথা সংস্কৃতি, চিত্র ভাস্কর্যাদি তো ছিলই। পরবর্তীকালে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউর নানা বিভাগে ও বিবিধ প্রসঙ্গে এই সবকিছু পূর্ণ রূপে ফুটে ওঠে।

রামানন্দের এলাহাবাদ অবস্থানকালে যখন তিনি সেদিন অকস্মাৎ সারা দেশে যে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার ঢেউ এলাহাবাদেও পৌঁছায়। রামানন্দ কলেজে এবং বাইরে সেদিন যে দাড়া জাগিয়েছিলেন তাই কালক্রমে রামানন্দের কাল হলো বলা চলে। সংকারী চক্রান্ত তাঁকে শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদ থেকে তাড়িয়েই ছাড়ল। এগার বৎসরের কিছু বেশি সময় রামানন্দ এলাহাবাদে অধ্যক্ষতা করেন এবং কর্মদক্ষতা ও অধ্যাপনা নৈপুণ্যে অশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর শেষের দিকে বনিবনাও হচ্ছিল না। লালাদের কলেজ। রামানন্দ বলেন ছাত্রদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ গান লেখাতে হবে—তাতে তারা দেশপ্রেমিক হবে, ল্যাবরেটরি বাড়াও, পাঠাগার ভাল কর—ইত্যাদি। সাত বছর আগে এত খরচের কথা শুনলে কেবল লালারা কেন, অনেকেই ভিরমি খেতেন। অতএব মদনমোহন মালবীয়জীর মধ্যস্থতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রামানন্দকে কর্মত্যাগ করতেই হলো। আমার মনে হয় এটি উপলক্ষ মাত্র। লোক শিক্ষক রামানন্দের মনের আকুতি কেবল ছাত্র শিক্ষার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। বাইরের বন্ধনহীন বিপুল লোক-শিক্ষা কর্মক্ষেত্রের আহ্বান তাঁর হৃদয়ে ধ্বনিত হচ্ছিল। কোন কিছু তাঁকে তাই আর বেঁধে রাখতে পারলো না. এমনকি রুজি রোজগারের চিন্তাও না। সাময়িক পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনায় তিনি এখন অনন্যকর্মা হয়েই আত্মনিয়োগ করলেন। শুরু হলো শিক্ষক রামানন্দের লোক শিক্ষক জীবন। একদা তিনি বলেছিলেন India's political salvation depends on mass education" দ্বার শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি জনগণের শিক্ষক হলেন। ভারতের মুক্তিসাধনার জন্য জনশিক্ষার দায়িত্ব তাঁর চেয়ে মুক্তিস্তর বা যোগ্যতরূপে আর কে করতে পারতেন? রামানন্দের মত প্রকৃত সাধক আমাদের মধ্যে ছিলেন এটাই আজকের এই সামগ্রিক দুর্গতির দিনে আশার কথা, ভরসার কথা। তাঁর কর্মকৃতির অনুধ্যান ও আলোচনার দ্বারা চেষ্টা করলে আজকের বিপুল বিভ্রান্তির মধ্যেও কিছু সত্য পথের দিশারী পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৭২ | ৮ম সংখ্যা

আলোচনা

পরীক্ষার ফলাফল

বোর্ডের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা কৃতকার্য হইয়াছেন তাঁহারা ধন্যবাদভাজন। তরুণ শিক্ষার্থীদের সাফল্য হইল জীবনের প্রথম সাফল্য, দূরপ্রসারিও। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলি পরীক্ষার মধ্যে যেমন পুরুষকার আছে, তেমনি দৈবেরও স্থান আছে। প্রতিভা পরীক্ষায় হউ একটা ধরা যায় না। সেইজন্য যাঁহারা পরীক্ষায় আশানুরূপ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিরাশ না হইয়া, যাহা তাঁহাদের আছে, তাহার উপরই জোর করিয়া দাঁড়াইতে বলি। একবার যাঁহারা পারেন নাই পরের বার অবশ্যই তাঁহাদের যত্নের ফল ফলিবে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় কেহ কেহ পরীক্ষাকে অত্যধিক মূল্য দেন, কেহ কেহ মোটেই মূল্য দিতে চাহেন না। উভয় মতই ভ্রান্ত। পরীক্ষার মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু পরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইবার সময় বা চাকুরিতে যে সাক্ষাৎকার করিতে হয়, সে সাক্ষাৎকারের সময় চরিত্রের সেই সব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। পুস্তকের জ্ঞান ভিন্ন মানুষের জীবনে আরও অনেক গুণের প্রয়োজন।

আমাদের দেশে শিক্ষার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুত পট-পরিবর্তন হইতেছে। একটু আলস্য দিলে আর পারিব না, সুতরাং প্রতি পদক্ষেপেই সতর্ক হওয়া উচিত। ইহার আরম্ভ অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষায়, কিন্তু বাপে মাপে আমাদের এ বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত।

বয়স্ক শিক্ষা

আমাদের দেশে শিক্ষার হার কত কম তাহা লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শুধু বলিলে বা লিখিলে কি হইবে? কার্য করা চাই। প্রতি ঘরে আঁধার রাতি, তাহা সত্ত্বেও প্রতি ঘরে যাহাতে আমরা দীপ জ্বালাইতে পারি তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। এক একটি ব্লকের মধ্যে দিয়া বয়স্ক শিক্ষা বা নিরক্ষরতার

বিষয়ে অভিযান চালাইতে হইবে। ইহা উত্তম প্রস্তাব। দেখা যাক কি হয়।

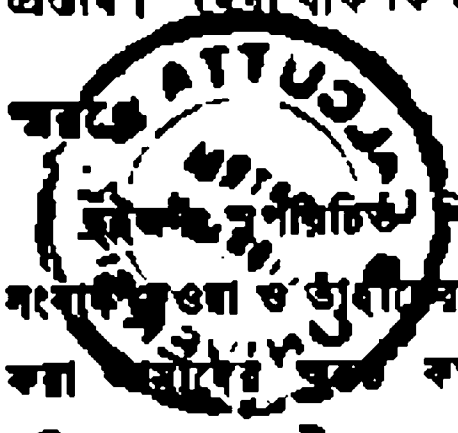

[illegible] নিক্ষকের পরলোক গমনের সংবাদ পাওয়া ও তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা আমাদের প্রথম কর্তব্য। জ্যোতির্ময় ঘোষ গণিত শাস্ত্রে প্রবীণ এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শুধু গণিত শাস্ত্রে নয়, সরল রম্য রচনায়ও তাঁহার হাত ছিল। 'তাম্বর' নামে তিনি শনিবারের চিঠি ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি প্রফুল্লচিত্ত সঙ্গী ছিলেন। মাত্র অল্পদিন হইল তাঁহার পরলোক গমন হইয়াছে।

আর একজন শিক্ষাবিদ্ হইলেন মনোরঞ্জন মিত্র। এখনকার বিদ্যালয়ে তাঁহার বহু ছাত্র আছেন। তবে তাঁহারাও সকলেই পরিণত বয়স্ক। মনোরঞ্জন বাবু ঢাকার শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ পদে ছিলেন এবং বহুদিন সম্মানের সহিত কাজ করিয়া অবসর নেন। দুই জনেই অবসর-প্রাপ্ত শিক্ষক এবং দুই জনেরই বিস্তর ছাত্র পরবর্তী জীবনে সুনাম অর্জন করিয়াছেন। আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে ইঁহাদের নাম অবশ্যই থাকিবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা

বিজ্ঞান শিক্ষা সার্বজনীন হোক এ কথা বলা উচিত। এখন আরও বেশি জোর গলায় বলা উচিত। কারণ আমরা আমেরিকার দিকে তাকাইয়া আছি। সম্প্রতি চেস্টার বোল্‌স্ সাহেব বলিয়াছেন যে, যাঁহারা এখনকার দিনে উচ্চ রাজকর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাঁহারা অধিকাংশই বিজ্ঞানের ছাত্র। আমরাও তো দেখিতেছি এখনকার বাজারে বিজ্ঞানের দাম বেশি। ইঞ্জিনিয়ারদের দাম বেশি। সুতরাং যাঁহারা ভবিষ্যতে উন্নতির পথ খোলা রাখিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে বিজ্ঞান শিক্ষা কতখানি প্রয়োজন তাহা আর বেশি ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর জীবন আমাদের দেশের সাধারণ ছাত্রজীবন হইতে অনেকখানি পৃথক। হয়ত খানিকটা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের মূল্য দিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। যেমন ছাত্রাবাস ব্যতীত ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা গ্রহণ করা প্রায়শঃই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। তাহা ছাড়া অধ্যয়নের সময় পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। ইহার ফল ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ জীবনে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহা আলোচনা করিবার ইহা স্থান নহে, আমাদের যোগ্যতাও নাই, সুতরাং উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

মহাশিল্পী গান্ধী

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

গোল-টেবিল-বৈঠকে গান্ধী কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে গেছেন। ঘরে তিনি বসে আছেন এবং একজন ইংরেজ শিল্পী তাঁর ছবি আঁকছেন। হঠাৎ তিনি শিল্পীর কাছ থেকে ছবিটা নিয়ে তার এক কোণে লিখে দিলেন, I am also a creative artist. My canvas is India. আমিও একজন পটুয়া। আমার পট ভারতবর্ষ। সেই মন্তব্যের নীচে রইলো এম.কে. গান্ধী নামের স্বাক্ষর।

গান্ধীর কাছে ভারতবর্ষ ছিল গ্রামে-গাঁথা ভারত। স্বদেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামকে নতুন ছাঁদে, নতুন ঢঙে তিনি ছবির মতো তৈরী করতে চেয়েছিলেন। অহিংসার এবং সত্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এই নতুন দিনের স্বাধীন এবং গ্রামীণ ভারতবর্ষ। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান মিলে মিশে বাস করবে, দুধে যেমন চিনি মিশে থাকে। পল্লীতে অস্পৃশ্য বলে কেউ থাকবে না। অর্থনীতির দিক থেকেও প্রতিটি গ্রাম হবে স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী। সুন্দর সুন্দর কুটিরগুলি মুখর থাকবে চরকার গুঞ্জনে। গ্রামে প্রবেশ করতে হলে চোখ ঢাকবার এবং নাক বন্ধ করবার প্রয়োজন হবে না। রাস্তা-ঘাট ঝকঝক তকতক করবে। গ্রামগুলো হবে গান্ধীর ভাষায় : models of cleanliness in every sense of the word." পল্লীর বাড়ীগুলো তো এখন আবর্জনার স্তূপ। পরিবেশের মধ্যে রুচিবোধের কোন পরিচয় নেই। বড় দুঃখেই মহাশিল্পী গান্ধী লিখলেন, 'instead of having graceful hamlets dotting the land, we have dung-heaps. সুন্দর সুন্দর কুটিরের পরিবর্তে শুধু স্তূপীকৃত সার!

গান্ধী কেবল রাজনৈতিক অর্থে বিপ্লবী ছিলেন না। রলাঁর (Romain Rolland) ভাষায় তিনি হচ্ছেন a builder of new humanity-নতুন মানবতাকে তিনি সেরা সেরা নরনারী দিয়ে ভরিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি আইরিশ কবি এবং দার্শনিক A. E. যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন—The creation of a rural civilisation is the greatest need of our time. মহানগরীর পাষাণ-বাঁধানো অলিতে গলিতে বাচ্চারা খেলা করছে, যুক্ত প্রকৃতির আনন্দময় পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নরনারী কৃত্রিম আনন্দের লোভে তাড়ির দোকানে ভীড় জমাচ্ছে —একথা ভাবতেও মন শিউরে উঠে। তাই A. E. তাঁর The National Being বইতে বড় দুঃখ ক'রেই লিখেছেন : Is there any prophet, any statesman, any leader who will—as Moses once led the Israelites out of the Egyptian, bondage—excite the human imagination and lead humanity back to Nature, to sunlight, starlight, earth-breath, sweet air, beauty, gaiety and health? কোথায় সেই আমি, সেই রাষ্ট্রনায়ক, সেই নেতা যিনি মানুষের কল্পনাকে জাগিয়ে দিয়ে মানবতাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন প্রকৃতির ক্রোড়ে, সূর্যের আলোয়, তারার আলোয়, মাটির গন্ধে, মধুময় বাতাসে, সুষমায়, আনন্দে, স্বাস্থ্যে?

পৃথিবীর রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে গান্ধীই বোধ হয় একমাত্র ব্যক্তি যিনি নূতন ভারতবর্ষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে করতে চেয়েছিলেন গ্রাম-কেন্দ্রিক!

মুষ্টিমেয় অনাকীর্ণ অতিকায় শহরগুলির রাহুগ্রাস থেকে গ্রাম-লক্ষ্মীকে মুক্ত করবার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাঁর স্বাধীন ভারতবর্ষের সোনালি পরিকল্পনায় ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাবলম্বী লাখো লাখো পল্লী। পল্লীর চারিদিকে ঢেউ-খেলা সবুজ মাঠ! সবুজ মাঠের সুগন্ধি ঘাস (গান্ধীর ভাষায় fragrant grass) খেয়ে গ্রামের দুধবতী গাভীরা প্রচুর দুধ দেয় আর সেই খাঁটি সুস্বাদু দুধ খেয়ে গ্রামের মানুষগুলির দেহ কী মজবুত! শরীর কী সুঠাম! পল্লীতে মহাজনদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার ছায়ায় ভূমিহীন দীনমজুরদের জীর্ণ পর্ণকুটীরগুলি অতীতের একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। গান্ধী বলেছেন, অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality) is the master Key to non-violent Independence. খাদিকে কেন্দ্র করে গ্রামের শিল্পগুলি পুনর্জীবন লাভ করেছে। পল্লীর মেয়েরা শিক্ষার আলো পেয়ে আত্ম-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দ্রৌপদীর মতো তেজস্বিনী তারা অকুণ্ঠ-পদ-বিক্ষেপে চলছে পুরুষের পাশে পাশে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অংশীদার হ'য়ে। শিক্ষার ব্যাপারে মাতৃভাষার অকুণ্ঠ প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায় পল্লীবাসীদের এবং পল্লীবাসিনীদের আলোক প্রাপ্ত চিত্ত পূর্ণস্বাধীনতার তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠেছে, নতুন যুগের পদধ্বনি উৎকর্ণ হ'য়ে তারা শুনছে।

পল্লীকেন্দ্রীক নূতন ভারতবর্ষের এই সমুজ্জ্বল স্বপ্ন গান্ধীর মর্মমূলে। এই স্বপ্ন ঘুমের মধ্যেও হয়তো, তাঁর মনে আনাগোনা করতো। আর সবশেষের এই বিরাট পরিকল্পনাকে বাস্তবে মূর্ত ক'রে তুলবার উদ্দীপনাই—হুইট্‌ম্যানের ভাষায়, The urge, the ardour; the unconquerable will—কি শতসাধারণের মধ্যেও তাঁকে লক্ষ্যের দিকে চালিয়ে নিয়ে যেতো না? একটা মহান স্বপ্ন যার মর্মের গোপনে দোলা দিয়েছে, সুন্দরের ধ্যান অনির্বাণ দীপশিখার মতোই যার হৃদয়ে জ্বলছে, পল্লীসভ্যতাকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার নেশায় যে বিভোর হ'য়ে আছে—তাকে হতোদ্যম করবার ক্ষমতা কারও নেই।

সত্যতার ধারাকে পল্লীমুখীন করবার যজ্ঞের ক্ষেত্রে এযুগে যাঁরা গান্ধীর সগোত্র তাঁদের মধ্যে আর্নাল্ড্‌-এর A. E.র নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। কাব্যের ভাষায় বারবার তিনি যুগের কাছে আবেদন করেছেন প্রকৃতির কোলে ফিরে যাবার জন্যে। ধূম্র লেশহীন নীল-নির্মল আকাশের নীচে সবুজ প্রান্তরের মধ্যে শ্যামলবনানী-ঘেরা গ্রামগুলির ছবি বারবার তিনি আমাদের কল্পনায় তুলে ধরেছেন!

আর্নাল্ড্‌-এর কবির সঙ্গে মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যানও একই সুরে গেয়েছেন:

Now I see the secret of the making of
the best persons,
It is to grow in the open air and to eat
and sleep with the earth.

এখন আমি দেখতে পেয়েছি সেরা সেরা মানুষ তৈরীর রহস্য,

সে রহস্য হচ্ছে খোলা বাতাসে বেড়ে ওঠা, মাটির কাছাকাছি বাস করা।

হুইট্‌ম্যান সেরা শহরের মর্যাদা আকাশচুম্বী অট্টালিকার প্রাচুর্যকে দেন নি। খুব দামী দামী লাইব্রেরী আর স্কুল কলেজ থাকলেই যে একটা জায়গা সেরা শহরের গৌরব পাবে এমনও কোন কথা নেই। যেখানে বড়ো বড়ো কবিদের অনুরাগী আর অনুরাগিণী ব্যক্তিরা বাস করে, যেখানে লোকেরা নিঃস্পৃহ এবং স্বাধীনচেতা, পরস্পরের মধ্যে যেখানে অকৃত্রিম প্রেমের সম্পর্ক বিরাজমান, আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে মানুষের মনে জিজ্ঞাসা যেখানে বলবতী, যেখানে গণিকা নেই, ব্যাভিচারের কালিমা নেই, পাপদের স্বাস্থ্য অটুট, মায়েদেরও—হুইট্‌ম্যানের মতে There the great city

stands. হুইটম্যান বলেছেন, এমন আবহাওয়ায় যদি শুচিশুভ্র পর্ণকুটীর থাকে তবুও it is still the greatest city in the whole world.

পল্লীর কুটীরে কুটীরে যদি সেরা সেরা মানুষ থাকে তবে নিশ্চয়ই পল্লী সেরা শহরের মর্যাদা পাবে।

সভ্যতাকে পল্লীমুখী করবার প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকেও কি গান্ধীর সগোত্র ব'লে মনে করবার কারণ নেই? গ্রামের 'পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির' ছেড়ে চাষীরা চিটাগড়ের চটকলে দলে দলে মরতে চলেছে—এ দৃশ্য কবিকে বেদনাই দিয়েছে। গাঁয়ের অনুপ আর উপমন্যু, শকলু আর কবুরা পল্লীর সব আলো নিবিয়ে দিয়ে রক্তকরবীর রাজার যক্ষপুরীতে এসে শুধু সংখ্যায় পর্যবসিত হবে, মানুষের এই অপমানে কবির হৃৎপিণ্ডে মোচড় দিতো। শহরে যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর শোষণের ব্যাপার রয়েছে যক্ষপুরীর রাজার তমাবহ শক্তির মধ্যে এই দানবীয় লোভের প্রকাশ। বিজ্ঞানকে সহায় ক'রে লোভাতুর শিল্পপতিদের ধনলিপ্সার যে নির্লজ্জ অভিযান চলেছে দিকে দিকে 'রক্তকরবী'তে এই অভিযানের বিরুদ্ধে কবি বাজিয়েছেন তাঁর সংস্কারের শাঁখ। 'রক্তকরবী' আর 'মুক্তধারা'—কবির এই দুটী নাটক পড়লে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মর্মমূলে ছিল পল্লীসভ্যতারই জ্যোতির্ময় স্বপ্ন। মানব-সভ্যতাকে তিনি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন সেইখানে যেখানে ঘাস সবুজ এবং আকাশ নীল, যেখানে "নীল চাঁদোয়ার নীচে খোলা বাতাস আচ্ছা," যেখানে ঘরে ঘরে সবারের উৎসব, যেখানে "রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে," যেখানে পৌষের ভালা ভরে উঠেছে পাকা ফসলে।

বড়ো বড়ো শহরগুলোর দিকে মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলও (Bertrand Russell) বক্রদৃষ্টি হেনেছেন। Principles of Social Reconstruction বইতে Property প্রবন্ধে অকুণ্ঠভাষায় রাসেল মন্তব্য করেছেন, Every great city is a centre of race-deterioration. প্রত্যেকটি অতিকায় নগর ও জাতির প্রাণশক্তি হরণ করবার এক একটি মৃত্যুবাণ স্বরূপ।

আর এ যুগের অন্যতম প্রতিভাবান জার্মান দার্শনিক Oswald Spengler তাঁর বিখ্যাত The Decline of the West পুস্তকের The Soul of the City প্রবন্ধে তো পরিষ্কার ভাষায় মহানগরগুলিকে demonic stone-desert অর্থাৎ বিশাল পাষাণ-মরু বলেছেন যাদের মধ্যে মানুষের সংস্কৃতির পরিবর্তে উগ্র বিষয়বুদ্ধি (spirit of commercial enterprise) প্রকট হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির এতগুলিকে, মূর্ত পল্লী-সভ্যতাকে কেমন ক'রে নূতন প্রেরণায়োগে সঞ্জীবিত করা যায়—সেই চিন্তা থেকে গান্ধীর মাথায় এসেছিল বুনিয়াদী শিক্ষার প্রেরণা। একথা গান্ধী নিঃসন্দেহে হুইটম্যানের মতোই উপলব্ধি করেছিলেন Produce great persons, the rest follows. সেরা সেরা মানুষ তৈরী করতে পারলে আপনা থেকেই সব হ'য়ে যাবে। মানুষের চরিত্রের এবং রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে সভ্যতার চেহারা পালটে যাবে। জ্ঞানের আলোয় মন যার আলোকিত হ'য়ে উঠেছে সেই ধীমান ব্যক্তি একটা বিশৃঙ্খল সমাজের অব্যবস্থাকে স্বীকার ক'রে নিতে স্বতঃই কুণ্ঠিত হবে। আমাদের দেশের পল্লীগুলি যে গান্ধীর ভাষায় এখনও dung heaps হয়ে আছে সে তো গ্রামবাসীদের অজ্ঞতার এবং রুচিবোধের দীনতার জন্যে। সুন্দরের প্রতি অনুরাগ যার মর্মমূলে আসন নিয়েছে সে কখনোই এমন গৃহে স্বচ্ছন্দচিত্তে বাস করবে না যেখানে সবকিছুর মধ্যেই রুচিবোধের অভাব। A. E. ঠিকই বলেছেন: We many say with certainty that the external circums-

tances of people are a measure of their inner life, জনসাধারণের মনের জীবনের প্রতিফলনই যে তার বাহিরের পরিবেশে—এমন কথা আমরা নিঃসংশয়ে ব্যক্ত করতে পারি।

আর মানুষের মনের জীবন কেমন হবে সে তো নির্ভর করে তার শিক্ষার উপর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রৌদ্রালোকের মতো কর্মব্যস্ত, স্বাবলম্বী পল্লী গড়ার স্বপ্নকে রূপায়িত করতে হ'লে সর্বাগ্রে দরকার সেরা সেরা মানুষ, আর সেরা সেরা মানুষ তৈরীর জন্য চাই শিক্ষা যা তাদের মনের জীবনে আনবে নব হাওয়া। আর শিক্ষা আরম্ভ হওয়া চাই শৈশবেই যাতে মহান আদর্শগুলি গ্রাম্য বালক-বালিকাদের মজ্জার সামগ্রী হ'য়ে যায়। গান্ধী তাই বুনিয়াদী শিক্ষাসম্পর্কে লিখেছেন: This education is meant to transform village children into model villagers. It is principally, designed for them. The inspiration for it came from the villages, এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের শিশুদিগকে আদর্শ পল্লীবাসীতে রূপান্তরিত করা। প্রধানতঃ তাদের জন্যেই এর পরিকল্পনা। বুনিয়াদি শিক্ষার প্রেরণা এসেছে গ্রাম থেকে।

বুনিয়াদী শিক্ষার রং নিয়ে, ঢং নিয়ে, তাৎপর্য নিয়ে যখন নানা দিকে নানা আলোচনার ঢেউ উঠেছে তখন শান্তচিত্তে আর একবার ভেবে দেখবার দিন এসেছে, এই শিক্ষার পরিকল্পনার মূলে ছিল যাঁর ব্যক্তিত্ব তিনি ছিলেন একজন মহান শিল্পী। ভারতবর্ষের পটভূমিতে অবহেলিত, অপরিচ্ছন্ন নিষ্প্রাণ গ্রামগুলিকে তিনি নতুন ক'রে আঁকতে চেয়েছিলেন। স্বপ্নকে রূপায়িত করতে গিয়ে বিবেকানন্দের মতোই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, "মানুষ চাই, মানুষ চাই; আর সব হইয়া যাইবে।" বুনিয়াদী শিক্ষার প্রেরণা গান্ধীর মনে এসেছিল নতুন ছাঁদের মানুষ গড়ার স্বপ্ন থেকে।

সাঁওতালের সহপাঠী

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

(৪)

আমার মাস, খুব শীত পড়েছে, হাড় কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা পশ্চিমে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সকাল বেলা বাইরে এসে রোদে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় চোখে পড়লো একদল লোক হৈ হৈ করে বনের পথ ধরে আমাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। একটু পরে তারা সামনে এসে পড়লো। দেখলাম বহুলোকের ভিড়ের মধ্যে দুজন জোয়ান লোক একটা লম্বা বাঁশের দুটির দুপ্রান্ত কাঁধে করে রয়েছে, সেই দুটিতে বাঁধা একটা চিতেবাঘ। বাঘটা অবশ্য মরা। বাড়ীর সামনে তারা বাঘটা নামিয়ে রাখলো। গোলমাল শুনে মামা বেরিয়ে এলেন, হেঁকে বল্লেন "কি হোল ডাকাত পড়লো নাকি?" জনতা প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে বল্ল "বাবুজী, বাঘ মেরেছি।" শুনে মামা এগিয়ে গেলেন, বাঘ দেখে বল্লেন "কখন মেরেছো?" তারা জবাব দিল "কাল সন্ধ্যায়।"

আমাদের বাড়ী থেকে আধমাইল দূরে যে গ্রাম, এরা সেই গ্রামের লোক। এদের মুখে শুনলুম চিতেবাঘটা কিছুদিন থেকে সুযোগ পেলেই গাঁয়ের

পরশুরাম মারছিল। পরশু রাতে নদীর ধারে একটা গরু মারে, গাঁয়ের গাদাবন্দুকধারী শিকারী কাল বিকেলে মরা গরুটার কাছাকাছি লুকিয়ে বসেছিল, সন্ধ্যা হতেই বাঘ এসে হাজির হয় এবং এক গুলিতেই শেষ হয়। বাবা আমাকে ঠেলে দিয়ে বল্লেন "যা, কাছে গিয়ে ভালকরে দেখ্। মরেছে বলে তাই, তা না হলে বন্দুক নিয়েও চিতেবাঘের সামনে এগোতে কেউ সাহস পায় না। ছোট হলে কি হয়, ভীষণ জানোয়ার রে। অথচ দেখতে কি সুন্দর।" এক পা দু পা করে চিতেবাঘের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম সত্যিই দেখতে কি সুন্দর, পিঠের দিকটা লালে-হলুদে মেশান রং তার উপর চাকা চাকা কালো দাগ, পেটের দিকটা সাদা। লম্বা লেজেও চাকা চাকা দাগ। মাথাটা তেমন বড় নয়, কান দুটো ছোট ছোট। মুখের ছাঁদ বিড়ালেরই মত, তাই বুঝি বিড়ালকে বাঘের মাসী বলা হয়।

টের পাইনি ইতিমধ্যে কখন মিতু এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে উৎসাহের সঙ্গে বল্লাম "গাঁয়ের শিকারী বাঘ মেরেছে মিতু।" মিতুর কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। আস্তে করে বল্ল "এটা বাঘ নয় কমল, এটা বাঘিনী।" এতক্ষণ খেয়াল করিনি—সত্যি বাঘিনীই তো! মিতু মুখে পড়ে বাঘিনীকে ভাল করে দেখলো তারপর লোকের ভিড় ঠেলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। বাবা হুকুম করলেন "ছালটা আমার চাই, সাবধানে ছাড়াবি, নষ্ট করিস নে।" গাঁয়ের লোকেরা চলে গেলে মিতু আমাকে বল্ল "দুপুরে তোমাকে নিয়ে জঙ্গলে বেড়াতে যাব। তৈরী হয়ে থেকো।"

দুপুর হতে না হতেই মিতু এসে উপস্থিত হোল। আমি তো অনেক আগে থেকেই তার পথ চেয়ে বসেছিলাম। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু যে পথ দিয়ে মিতু আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যায় আজ সে পথ ছেড়ে এক নতুন পথ ধরলো। জিজ্ঞাসা করলাম "আজ কোথায় যাচ্ছ মিতু?" মিতু বল্ল "গাঁয়ের দিকে যাচ্ছি।" গাঁয়ে যাচ্ছি শুনে আমার উৎসাহ অনেকখানি কমে গেল, তবু মিতুকে অনুসরণ করে চল্লাম।

গাঁয়ের দক্ষিণে একটা নদী, তার ওপার থেকেই জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে, সে জঙ্গল গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে মিতু গাঁয়ের প্রান্তে নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হোল। সেখানে অনেকগুলো ছোট ছোট পলাশগাছ ভিড় করে আছে। মিতু গিয়ে তার মধ্যে দাঁড়ালো। মিতুর চালচলন এখন আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হতে লাগলো, জিজ্ঞাসা করলাম "এখানে এলে কেন?" মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মিতু বল্ল "এই দেখ, বাঘিনী গরুটাকে মেরে টেনে এইখানে এনে রেখেছিল, শিকারী এইখানেই কাল বাঘিনীকে মেরেছে।" মাটিতে কয়েকটা নোখের আঁচড় ছাড়া আর আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

আমাকে নিয়ে মিতু এবার নদীতে গিয়ে নামলো, বালুচড়ার উপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো। এক জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়ালো, আমি চেয়ে দেখলাম সেখানে বালুর উপর জানোয়ারের পায়ের ছাপ। মিতুর মুখের দিকে চাইতেই সে বল্ল "এগুলো বাঘিনীর পায়ের ছাপ, এইভাবে দিয়ে এতদিন সে নদী পার হয়ে গাঁয়ে [redacted] করতো।" সেই পায়ের ছাপ ধরে নদী [redacted] মিতু ওপারের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো। মিতুর মতলব কিছুই বুঝতে পারলাম না, বাঘিনী তো মরে গেছে, এখন তার পায়ের দাগ ধরে মিতু কোথায় চলেছে? জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না। প্রশ্ন শুনে মিতু দাঁড়ালো, আমার কাছে এসে বল্ল "শোনো তা হলে, সব কথা তোমাকে খুলে বলি, ঐ যে বাঘিনী ওর বাচ্চা আছে। বাঘিনীর পেটে যখন বাচ্চা থাকে তখন সে ছুটে

শিকার করতে পারে না। তাই অনেকদিন না খেয়ে থাকে। বাচ্চা হলেই হালকা হয়ে যায় তখন কিছুদিন দরকারে অদরকারে বাঘিনী সামনে যা পায় তাই মারে। এ বাঘিনীটাও ঐ কারণে ঘন ঘন গাঁয়ের গরুবাছুর মারছিল। গাঁয়ের লোকেরা এসব জানে না। আমরা সাঁওতালরা জানি, আমরা যে বনের পশুর প্রতিবেশী। বাঘিনীটা তো মারা গেল, এখন তার বাচ্চার কি হোল আমি তাই দেখতে যাচ্ছি।" শুনে আমি তো অবাক। বাচ্চার জন্যে আমারও দুঃখ হল, না খেয়ে সেল, খেতে না পেয়ে তারাও মরে যাবে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম অসহায় বাঘের বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্যে মিতু তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। শহর গ্রামের মানুষ যেমন প্রতিবেশীর মা মরা শিশুটিকে কোলে টেনে নেয়, বনের অধিবাসী মিতুও তেমনি তার বনের প্রতিবেশিনীর শিশুটিকে বুকি কোলে টেনে নিতে চায়।

আর কোন কথা না বলে মিতু তাড়াতাড়ি চলতে লাগলো। বাচ্চাটার জন্যে আমার মনও কেঁদে উঠলো, মিতুর মত আমিও ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, যেমন করেই হোক বাচ্চাটাকে খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। পাহাড়ের কোলে বড় বড় পাথরের নীচে নিরাপদ আশ্রয়ে বাঘিনীরা বাচ্চা করে। এ রকম কয়েকটা জায়গা মিতুর জানা ছিল। এক এক করে সেই সব জায়গা সে খুঁজতে লাগলো। কাজটা বড়ই বিপজ্জনক, হঠাৎ বাঘের মুখেও পড়তে হতে পারে। তাই মিতু আমাকে দূরে রাখ করিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগলো। তার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। অনেক খোঁজাখুজি করেও কিন্তু বাঘের বাচ্চার সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে শীতের বেলা পড়ে আসছিল, মিতু বল্ল "আর তো দেরি করা চলে না, সন্ধ্যা লেগে আসছে, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। আমি এত সহজে হাল ছাড়বো না, কাল সকালে এসে আবার খুঁজবো।" আমি বল্লাম "আমাকে সঙ্গে আনবে না?" মিতু একটু ভেবে বল্ল "তোমাকে সঙ্গে আনলে যদি তোমার মামা রাগ করেন? আমি বাঘকে বড় ভয় করি।" আমি বল্লাম "মামা জানতেই পারবেন না; আমি চুপি চুপি চলে আসবো।" শুনে খুশী হোলো মিতু। দুই বন্ধুতে পরামর্শ হোল মামাকে এ সব কথা কিছু বলা হবে না।

(ক্রমশঃ)

সব দেখিয়া মনে হয়, জুনিয়র সিনিয়র ভেদ উঠাইয়া দিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার কাল অখণ্ডরূপে আট বৎসর ধরিলেই বুঝি ভাল হইত। এখন তো শুনিতেছি বাংলা [illegible] পূর্বের মত প্রাথমিক বিভাগেই ইংরাজীও শিখাইতে হইবে [illegible] কি প্রগতি, না পশ্চাদপসরণ?

—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

পরীক্ষা পাসের অন্তরায়

শ্রীপ্রমথভূষণ ভট্টাচার্য

পরীক্ষা পাসের দুইটি প্রধান অন্তরায়, ভয় এবং আতে আতে লেখা। ভয়ে অনেক জানা জিনিসও পরীক্ষার সময় মনে পড়ে না। আতে আতে লেখার জন্য অনেক মনে-পড়া জিনিসও সময়ের অভাবে পরীক্ষার খাতায় লিখিয়া আসা যায় না। মনে ভয় আসে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার ফলে, আর হাতের কলম আতে আতে চলে অভ্যাসের দোষে।

শিক্ষক মহোদয়গণের কৌশলী চেষ্টার ফলে, এই দুইটি অন্তরায় দূর করা অসম্ভব নহে।

আমি একটি বিদ্যালয়ের কথা জানি, যে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফল ভাল হইত না, কিন্তু ইংরাজী ১৯৬১ সাল হইতে পরীক্ষার ঐ প্রধান অন্তরায় দুইটি দূর করিবার জন্য নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার ফলে দিন দিন পরীক্ষার ফল ভাল হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ফেলের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তিন বিষয়ে (Subject) ফেল করা ছাত্রকেও উপরের শ্রেণীতে তুলিতে হইয়াছে। ১৯৬৩ সালে দুইটি এবং ১৯৬৪ সালে একটি বিষয়ে ফেল করা ছাত্র ভিন্ন অন্য কোন ফেল করা ছাত্রকে উপরের শ্রেণীতে তোলা হয় নাই। দেখা গিয়াছে, নিকাশ্ত (School Final) পরীক্ষার ফলও ভাল হইয়াছে।

১৯৬৩ সাল হইতে এই বিদ্যালয়ে সতগুলি বিষয় পড়ান হয়, শিক্ষক মহাশয়দের লইয়া ততগুলি সিলেবাস কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি, ভারপ্রাপ্ত বিষয়ের সিলেবাস এবং প্রথম চারিটি পরীক্ষার প্রশ্ন প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যই প্রস্তুত করেন। সিলেবাসের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি বিষয়ে যতগুলি প্রশ্ন করা সম্ভব ততগুলি প্রশ্ন করিয়া ছাত্রদিগকে শ্রেণীতে পড়া আরম্ভ হইবার পূর্বেই জানাইয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষার সময়ও ঐ প্রশ্নগুলির ভিতর হইতেই প্রশ্ন-পত্র ছাপান হয়। ইহার ফলে, পরীক্ষার প্রশ্ন কিরূপে হইবে, সে বিষয়ে ছাত্রদের মনে কোন চিন্তা বা ভয় আসে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য এক একটি সিলেবাস বই আছে এবং ঐ বইতে বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাস ও প্রশ্ন লেখা থাকে। ছাত্রদিগের প্রত্যেকের, প্রতি বিষয়ের জন্য এক বৎসরের উপযোগী, আলাদা আলাদা খাতা থাকে, ঐ খাতায় তাহারা প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া শিক্ষক মহাশয়দের দেখায়। মাঝে মাঝে সিলেবাস কমিটি তাহাদের খাতাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ১৯৬৩ সালের পূর্বে দুই এক বিষয়ে ভিন্ন, অন্য কোন বিষয়ে বাড়ীর কাজ (Home task) থাকিত না। এমন কি তাহাদের সকল বিষয়-এর খাতাও থাকিত না। এখন ছাত্রেরা নিজেদের প্রয়োজনেই প্রত্যেক বিষয়-এর খাতায় যাহা লেখে, তাহা নিতান্ত কম নহে। এইরূপে তাহাদের লেখার অভ্যাসও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। পরীক্ষাগৃহে গিয়া প্রশ্ন বুঝিতে পারিবে কি না এবং বুঝিলেও উত্তর জানা থাকিবে কি না—এইরূপ সন্দেহ বা ভয় তাহাদের মনে প্রায় থাকেনা বলিলেও চলে।

১৯৬৩ সাল হইতে এই বিদ্যালয়ে পাঁচটি করিয়া পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

অধিক পরীক্ষা লইবার ফল এই যে ছাত্রদের পরীক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ও ভয় দূর হয় এবং লেখার অভ্যাসও বাড়ে। প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ সংখ্যা থাকে ১০০, কিন্তু লিখিবার সময় দেওয়া হয় ২½ ঘণ্টা। ইহার ফলে তাহাদের লেখার গতি (speed) বাড়িয়া যায়। এই ৫টি পরীক্ষার

প্রথম ৪টি পরীক্ষার নাম দেওয়া হইয়াছে সাময়িক পরীক্ষা (Periodical Examination) এবং শেষের পরীক্ষাটির নাম বাৎসরীক পরীক্ষা। প্রত্যেক সাময়িক পরীক্ষা আরম্ভ হইলে, সিলেবাস কমিটি আগামী পরীক্ষার সিলেবাস ও প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া দেন, যাহাতে পরীক্ষা শেষ হইবার পরের দিনই প্রত্যেক শ্রেণীতে এইগুলি আনাইয়া দেওয়া যায়। বাৎসরিক পরীক্ষার প্রথম চারিটি পরীক্ষার সিলেবাসের পুনরাবৃত্তি (revision) হয় বলিয়া, এই পরীক্ষার জন্য কোন প্রশ্ন ও দেওয়া হয় না। প্রত্যেক সাময়িক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী যে নম্বর পায় তাহার ১৫% লওয়া হয় এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় তাহারা যে নম্বর পায় তাহা হইতে ৪০% নম্বর লওয়া হয়। অর্থাৎ ৪টি সাময়িক পরীক্ষার শতকরা মার্ক একত্রে ১৫% × ৪ = ৬০% + ৪০% বাৎসরিক পরীক্ষার শতকরা নম্বর = ১০০ নম্বর। প্রতি বিষয়-এ, এই ভাবে ১০০ নম্বর ধরিয়া, ছাত্রদের উপরের শ্রেণীতে তোলা এবং পরীক্ষায় তাহাদের স্থানীয় মান (1st, 2nd, 3rd ইত্যাদি) নির্ধারিত করা হয়। ছাত্রদিগকে সাময়িক পরীক্ষার খাতাগুলি ফেরৎ দেওয়া হয় এবং সকল পরীক্ষার ফলাফল প্রগতি-পত্র (Progress Report) মারফৎ অভিভাবকদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং বৎসরের ফলাফলের দরুণ আমা পরিবার, ছাত্র এবং তাহাদের অভিভাবক-দিগের পূজার বন্ধের পূর্বেই জানা হইয়া যায়। এই কারণে বাৎসরিক পরীক্ষার সময়ে অধিকাংশ ছাত্রদেরই মনে সন্দেহ বা ভয়ের লেশমাত্র করে না। উল্লেখযোগ্য যে এই বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটির পূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক, পূজার ছুটির পূর্বে তৃতীয় ও চতুর্থ সাময়িক এবং পূজার ছুটির পরে বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া থাকে।

আমাদের ধারণা, পরীক্ষার সহিত যত বেশি যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, ততই পরীক্ষা সম্পর্কে ভয় কমিতে থাকে এবং ততই ইহাকে কিভাবে অতিক্রম করা যায় তাহার ও কৌশল জানিতে পারা যায়। কিন্তু পরীক্ষাকে দূরে রাখিলে, পরীক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা এবং ভয় বাড়িতে থাকে। এই কারণেই আমরা আশা করিতেছি যে বর্ষাশিক্ষাপর্ষদের নিকট পরীক্ষা দিতেও, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নির্ভীক ভাবে পরীক্ষা দিয়া আসিবে এবং তাহার ফল ভালই হইবে।

পাঠকবর্গের অবগতির জন্য, উক্ত বিদ্যালয়ে মাত্র ১৯৬৩ সালে যে পরিকল্পনাটি লইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এবং বর্তমানে যে ফল পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা লিখিলাম। এক বৎসর পরে, ইহা কতটা ফলপ্রসূ হয়, তাহা বৎসরান্তে পুনরায় এই শিক্ষা পত্রিকা মারফৎ জানাইবার ইচ্ছা থাকিল।

——

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করণের সমস্যা

শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিক করণের প্রয়োজন বহুদিন থেকেই অনুভূত হয়েছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মহামতি গোখেল ইম্পিরিয়েল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিকরণের জন্য একটি বিল আনয়ন করেন। তার কিছুকাল পর সেই বিলটি আলোচিত হয় এবং পরিশেষে গোখেল পরাজিত হন। গোখেল পরাজিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টা বিফলে গেছে একথা বলা চলে না। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের দিকে সরকারের কিছুটা আগ্রহ দেখা যায় আর পক্ষান্তরে ভারতবাসী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। তারপর কেন্দ্রে আর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে চেষ্টা করা হয় নাই, হয়েছে বিভিন্ন প্রদেশে। বোম্বাই, পঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, আসাম, ইত্যাদি প্রদেশগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইন পাশ হয়। প্রথমতঃ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে শুরু হবে এবং প্রস্তাব থাকে যে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত সময় হয়েছে বুঝতে পারলে যে কোন অঞ্চলকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনতে পারবে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ এর পূর্বে বিভিন্ন প্রদেশের কিছু কিছু সহরে এবং গ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হলেও বাংলাদেশে একেবারেই হয় নাই বলা চলে। Nurullah & Nayek অবশ্য তাঁদের A Student's History of Education in India-তে বাংলাদেশের একটি সহরের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু যেখানে কিছুটা হয়েছিল সেটা এখন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত এবং সেখানেও ঠিক উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা হয়নি।

এখন স্বাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকরণের প্রশ্ন উঠেছে। যে কোন দেশের উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের শিক্ষা বিস্তারের উপর। আমাদের স্বাধীন ভারতে শিক্ষা সম্প্রসারণ আশু কর্তব্য বিবেচনা করে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানে বলা হয়েছিল, "The State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years."

যেখানে ১০ বৎসরের মধ্যে ৬—১৪ বৎসরের শিশুদের জন্য, বালক বালিকার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা ছিল, সেখানে আজও ১৯৬৫ সনে তা হয় নি। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির নির্দেশে যে অর্থকরী সমিতি বি. জিবিরের নেতৃত্বে গঠিত হয়, সেই সমিতি সুপারিশ করেন যে, দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬—১১ বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে এবং পরের ছয় বৎসরের মধ্যে ১২—১৪ বৎসরের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই ত চলে না। এ বাস্তব ব্যাপার নয়, মানুষ নিয়ে কাজ। যত টাকার প্রয়োজন হবে সবই পাওয়া গেলেও এ কাজ হয় না। কারণ বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ সম্পাদনা

করে ছাত্রছাত্রীদের উপরের দিকে উঠতে হবে। আজ যদি বলা হয় ৬—১১ বৎসরের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা হবে, তার জন্য যে টাকা খরচ হবে সব টাকা সরকার বহন করবেন, তাহলে কি হয়? সরকার টাকার ভার বইলেন, সব শিশুকে বয়স অনুযায়ী শ্রেণীতে ভর্তি করা হল। শিশুরা টানিয়ে যেতে পারবে কি? বলা বাহুল্য পারবে না। আজ যে ৯ বৎসরের ছাত্র কোন কালে পড়াশুনা করে নি, সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বে কি করে? তাই প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে সময় লেগেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঠিক আগে দেখা গেল ৬—১১ বয়স সীমার ছাত্র শতকরা ৪২ জন ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয়ে এসেছে, প্রথম প্রথম পরিকল্পনা শেষে ছাত্রছাত্রী এসেছে শতকরা ৫৩ জন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে এসেছে শতকরা ৬০ জন। এখন ৬—১১ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা গেল না, তখন ১২—১৪ বৎসরের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রশ্ন একেবারেই আসে না। তাই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সময় বৃদ্ধি করে দেওয়া হোল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ৬—১১ বৎসরের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন বিদ্যালয়ে আসবে। এই সংখ্যা নিয়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কাজে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। ৬—১১ বৎসর ছাত্র ছাত্রীরা ভালভাবে শিক্ষার পথে অগ্রসর হতে পারলেই ত ১২—১৪ বৎসরের ছাত্র ছাত্রীদের কথা বলা যেতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে যদি ৬—১১ বৎসরের বালক বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয় তাহলে আশা করা যাচ্ছে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ১২—১৪ বৎসরের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক হতে পারবে।

কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান যে ছাত্র ছাত্রী পরিস্থিতি তাতে শেষ অবস্থাটুকুর জন্য অর্থাৎ যারা এখনও বিদ্যালয়ে আসেনি তাদের জন্য অনেক বাধা বিপত্তি অসুবিধা এসে দেখা দিয়েছে। আমি ৬—১১ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের কথাই বলছি। আমি এখানে আজ পশ্চিমবাংলার কথাই বিশেষ করে আলোচনা করছি। আমাদের পশ্চিমবাংলায় ৬—১১ বৎসরের বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় ৪৪ লক্ষ। বিদ্যালয়ে ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে এসেছে প্রায় ৩১ লক্ষ বাকি আছে ১৩ লক্ষ। এদের বিদ্যালয়ে আনতে পারলেই বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ছাত্র ছাত্রীরা সবাই বিদ্যালয়ে আসবে। কিন্তু এদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসাই হচ্ছে খুব মুস্কিলের ব্যাপার। হয়ত কিছু আপনা আপনিই আসবে। যারা ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ে এসে গিয়েছে কিংবা স্বেচ্ছায় কিছুসংখ্যক আসবে তারা নিজের ইচ্ছাতেই বিদ্যালয়ে এসেছে, আর বাকী যারা রয়েছে তাদের বিদ্যালয়ে না আসার কারণ কি? তাদের অসুবিধা কোথায়? তাদের না আসার কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক অসুবিধা, সামাজিক অসুবিধা, শিক্ষকতার অসুবিধা দারিদ্র-জনিত অসুবিধা ইত্যাদি আরও অনেক। প্রাকৃতিক অসুবিধার দিক থেকে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশে অনেক গ্রাম আছে যেখানে লোক-সংখ্যা ২০০ থেকে ৫০০। এসব গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব নয়। দুটি বা তিনটি গ্রামে মিলে যে বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে, তারও অসুবিধা আছে। কোথায় বিদ্যালয় অবস্থিত হবে? দুই বা তিন গ্রামের মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে যে টানা-পোড়েন চলে তা মোটেই স্বাস্থ্যকর ব্যাপার নয়। তারপর যে গ্রামেই বিদ্যালয় স্থাপিত হোক না কেন, অন্য গ্রামের ছেলেমেয়েরা যাবে কি করে? রাস্তা ঘাট ভাল নয়। এইরকম নানা সমস্যা আছে। সামাজিক অন্তরায়ের মধ্যে আছে মেয়েদের

শিক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে এখনও নানা পরিবারে বাধা নিষেধ, তথাকথিত অস্পৃশ্য সমাজের এক অসহযোগী মনোভাব ইত্যাদি। তাছাড়া অনেক পিতামাতাই শিশু পুত্রের উপার্জনের উপর নির্ভর করে থাকেন। অতএব সেদিক থেকেও সমস্যা রয়েছে। সরকার সামাদিক থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দেখেছেন এবং সমস্ত সমস্যার সমাধানে দৃঢ় সংকল্প হয়েছেন। আমরাও বলি যে যখন শিক্ষার প্রসার না হলে দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে, তখন প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকরণের পক্ষে সমস্ত বাধা অপসারণ করে এগিয়ে চলাই আমাদের কর্তব্য। গৃহ সমস্যা খুব বেশী সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের প্রাচীন যুগের নজির আছে। মন্দির, মসজিদ, কারও চণ্ডীমণ্ডপ, ধর্মশালা ইত্যাদিতে বিদ্যালয় বসতে পারে, পরে ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হবে। শিক্ষকের অসুবিধা? বড় কঠিন সমস্যা সন্দেহ নাই। কিন্তু তারও ব্যবস্থা হতে পারে। আমাদের দেশের বহু শিক্ষকও কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটি ২।৩ শ্রেণীতে একসঙ্গে পড়িয়েছেন। এখনও প্রয়োজন বোধে তাই করতে হবে। দরিদ্র পিতামাতার সন্তান যারা পিতা-মাতাকে জীবিকা উপার্জনে সাহায্য করে যাতে তাদের জন্য আংশিক সময়ের জন্যও শিক্ষাব্যবস্থা করা চলে। অর্থ ও পরিশ্রম দিয়ে যতটুকু পারা যায় তা করা সম্ভবই হবে। এরকম বহুসমস্যার সমাধান সরকার করছেন ও করবেন।

কিন্তু এক বিষয়ে আমি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের যদি মোটামুটি সহজভাবে ভাগ করি তাহলে তারা তিনটি পর্যায়ে পড়ে। সাধারণ (average); সাধারণের উপরে (above average), এবং সাধারণের নীচে (below average)। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যদি বিদ্যা নির্বাচনে একটি দলকে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে মোটামুটি শতকরা ৬৪ থেকে ৬৬ ভাগে সাধারণ, আর বাদ বাকীর অর্ধেক বেশি বুদ্ধি সম্পন্ন এবং বাকী অর্ধেক কম বুদ্ধি সম্পন্ন। সাধারণ ও বেশি বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে উপকৃত হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অধিও বেশি বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রদের জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা যদি না করা যায় তাহলে তাদের বুদ্ধির উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না। কিন্তু আসল সমস্যা যারা সাধারণের নীচে। সাধারণের নীচেও অনেক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী আছে। পড়া লেখার অনগ্রসর, বোকা, জড়বুদ্ধি ইত্যাদি। যারা পড়া লেখায় অনগ্রসর অর্থাৎ যাদের বুদ্ধাঙ্ক ৭০ থেকে ৯০ তাদের কোন ও রকম ভাবে ব্যক্তিগত সাহায্য দিয়ে পড়াশুনায় অগ্রসর করান যায়। এমন কি যাদের বুদ্ধাঙ্ক ৮০ হতে ৯০ তাদের আরও বেশি পড়াশুনা করবারও সুযোগ হয়ে থাকে। কিন্তু যারা বোকা বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের কিছুতেই পুস্তকমুখী পড়া লেখা চলবে না। হয়ত কষ্ট করে তারা নামটা লিখতে পারবে; কিংবা কিছু গুণতে পারবে। তাদের সংখ্যা যদি শতকরা ৫।৬ হয় তাহলে সমস্ত বোকা ও জড়বুদ্ধি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় দুইলক্ষ। জোর করে বিদ্যালয়ে আনলেও তাদের দ্বারা লেখাপড়া করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। অথচ তারা যদি সুনাগরিক না হয় উপার্জনক্ষম না হতে পারে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে হবে জাতীয় ক্ষতি। জাতীয় আয় তাহলে ব্যাহত হবে। অতএব তাদের জন্য শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ কারিগরি শিক্ষাই হউক, বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাই হউক, এমন একটা শিক্ষা যেটা যান্ত্রিক ভাবে তারা করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই দুই লক্ষ ছেলেমেয়ে এক জায়গায় জড় হয়ে নাই, যাতে করে তাদের জন্য আলাদা করে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু দেশের যদি সত্যগতি আমরা চাই তাহলে

তাদের ব্যবস্থাও আমাদের করতে হবে। সহর অঞ্চলে যদি এরূপ সাধারণ কারিগরি শিক্ষার জন্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়, এবং সরকার যদি মনস্তত্ত্ব-বিদদের দিয়ে যুক্তিসঙ্গত পরীক্ষা করিয়ে বোকা ও অবুঝদের সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের ঐ সকল কেন্দ্রে এনে জড় করেন, তাহলে কিছুদিন পরে এর সুফল পাওয়া যাবে এতে সন্দেহ নাই। সহজে কথাটা বলা হল বটে। কিন্তু কাজে রূপায়িত করা খুবই কঠিন। কিন্তু আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে। সরকার যে ব্যবস্থা সানন্দে করবেন, এই আমাদের সংবিধান। অতএব ব্যবস্থা আমাদের দেশে করতেই হবে।

এ ছাড়া আর একটি বিষয়ও আমাদের চিন্তা করে দেখা কর্তব্য। যে ১৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এখনও বিদ্যালয়ে আসতে বাকী আছে তাদের মধ্যে অনেকে অন্ধ, অনেকে বধির এবং অনেকে খোঁড়া ইত্যাদি বিকলাঙ্গ শিশু আছে। এদের বুদ্ধি হয়ত কম নয়, কিন্তু এরাও অনেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছেনা। এদের জন্য যা ব্যবস্থা আছে তা অত্যন্ত অপ্রতুল। বিলাতে ১৯৪৪ সনের বাটলার আইনে বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদের দেশে সেরকম ব্যবস্থা হয় নি। এদের জন্যও জাতীয় ক্ষতি হচ্ছে। এদের জন্য আলাদা ভাবে ব্যবস্থা করা কি উচিত নয়? আমরা অন্ধ মূক বধির বিদ্যালয়গুলিতে দেখেছি যে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হলে তারা সমস্ত রকম কাজই করতে পারে। অতএব তাদের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে, যদি পশ্চিম বাংলার ৪৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা শিক্ষাদান করতে চাই।

আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের প্রয়োজন জনগনের সহযোগিতা। আমরা এতবড় একটা কাজ করতে যাচ্ছি, অথচ জনগনের সহযোগিতা আমরা যদি প্রার্থনা না করি তাহলে আমাদের চেষ্টা সুফলপ্রসূ হবে না। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে প্রচার কার্যে নামতে হবে, জনগনের কাছে সাহায্য চাইতে হবে, তারা যেন সরকারের প্রচেষ্টায় অকুণ্ঠ সাহায্য করেন। তা না হলে শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় কিছু হবে না। আজ বিদ্যালয়ে গৃহ নাই, সাজ-সরঞ্জাম নাই, কিছু নাই বলে হা হুতাশ না করে জনগনের সংবেদনশীল মনকে আমাদের দিকে টেনে আনতে হবে। সমস্যার সমাধান তাতে অনেক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বিদ্যালয় আবার শুধু বই পড়ার জায়গা নয়, বাহিরের শুচিতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শুচি থাকিবার উপকরণও এখানে থাকা চাই। এ ছাড়া সরবে হউক আর নীরবে হউক, প্রার্থনার জন্য নিয়মিত সময় এবং সঙ্গে সঙ্গে সময়নিষ্ঠা চাই।

—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

আমাদের ছেলেবেলাকার খেলা ও খেয়াল

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

৭৬ বছর বয়স হয়েছে ; বার্ধক্য ও ব্যাধির আক্রমণ কম নয় ; এর ওপর দীর্ঘায়ুর দুর্ভাগ্য শোক ও তাপ যথেষ্ট আছে। বাড়ীর সামনে দেশবন্ধু পার্কে সকালে ঘণ্টা খানেকের জন্য যাই। বেশি বেড়াতে পারি না। একটা ডমটিতে বসি, সেখানে ৪ খানা বেঞ্চ আছে, মেঝের সঙ্গে আটা ; প্রত্যেক বেঞ্চে ৩ জন বসতে পারেন। এই ৪ খানা বেঞ্চই আমাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়, কখনও কখনও ২।১ খানা বেঞ্চে ৪।৫ জনকে বসতে হয়। ৫৫ বছর থেকে ৮৬ বছরের আমরা সকলে। আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ অবসর প্রাপ্ত, তবে একটি, এন্‌জিনিয়ার ব্যবসায়ী, এখনও চাকুরে, প্রফুল্লও আছেন। ৮৬'র নিচেই আমার ও আর একজনের বয়স। যার ৮৬, তিনি আমার জ্ঞাতি (আটপুরে মিত্র পরিবার ভুক্ত), বিবাহ করেন নি, তবে আমাদের অপেক্ষা কম সংসারী নন। ৮৬ বছর বয়স হ'লে কি হবে, কুঁজো হয়ে গেলে কি হবে প্রাণের প্রাচুর্য এখনও প্রচুর আছে। এই সে দিন চন্দননগরে 'শিখনিক' করে এলেন, প্রায় সমস্ত দিন সেখানে কাটিয়ে এলেন। এঁর উদাহরণ বিরল ; এঁকে আমরা 'প্রেসিডেন্ট' বলি। শ্রদ্ধা করি। আমাদের মধ্যে এক জন আছেন, ৭০ বছর বয়স, স্বাস্থ্য খুব ভাল, অনবরত বলে যাচ্ছেন, কিন্তু অপর্যাপ্ত মামলা-মকদ্দমার কথা বলে যাচ্ছেন, খুব প্রাণখোলা লোক। আমার এক জন খুব ধনী ব্যবসায়ী আছেন, ৬৭ বছর বয়স। কেবল "গোপাল" "গোপাল" করেন। তাঁর ব্যবসায়ের একটি শাখার সহিত "গোপাল" নাম যুক্ত আছে। আমাদের মধ্যে ২।১ জনের হৃদরোগ আছে, যাকে "থ্রম্বোসিস" বলে, কিন্তু তাঁরাও বেপরোয়া। নানা বিষয়ের গল্প হয়, এমন কোন বিষয় নেই যা বাদ পড়ে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি সব বিষয়েই আমরা নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে মনে করি। দেশ বিদেশের কোন নেতৃস্থানীয় লোককে আমরা ছোট কথা বলি না। ওয়াশিংটন, মস্কো, লণ্ডন, পিকিং, থাসখিয়ার্স, কায়রো, কাটমুণ্ডু, কাশ্মীর প্রভৃতি আমাদের নখদর্পণে থাকে।

একদিন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্য জীবনের খেলা ও খেয়ালের কথা হচ্ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ একজন, ৩৫ বছর বয়স, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার বাল্যকালের খেয়াল কি ছিল। আমি খুব ঘাবড়িয়েই গেলাম, কোথায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আর কোথায় আমি ; কার সঙ্গে কার তুলনা ! এখন তাঁকে বললাম যদি সব কথা বলি আপনারা আমাকে আর এখানে বসতে দেবেন না। পরে মনে হয়েছে বালক বয়সের খেলা ও খেয়ালের কথা আজকের দিনের শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের কাছে উল্লেখযোগ্য হলে সে দিনের শিশু মনের সঙ্গে হালে আমাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারবেন। তাই আজ "শিক্ষার" মাধ্যমে আমাদের বাল্যকালের খেলা ও খেয়ালের কথা কিছু বলতে চেষ্টা করছি।

১২ বছর বয়স পর্যন্ত পাড়াগাঁয়ে ছিলাম, তার আগে সহর দেখি নি ; সহর কলিকাতার গল্প শুনতাম, শুনে অবাক হয়ে যেতাম। একটা উদাহরণ দিচ্ছি : গ্রামের মাইনার স্কুলে পড়তাম, মনে আছে এই সময় বিদ্যালয়ের একজন পরিদর্শক শ্রীরামপুর সহর থেকে 'বাইসিকেলে' চড়ে আমাদের স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা 'বাইসিকেল' দেখে অবাক হয়ে গিছলাম। তখন কে জানতো অল্পদিন কালের চাকরী জীবনে

আমাকেই পুরস্কৃত করা হতো, কলির আল প্রভৃতির উপর দিয়ে, মটী, খাল, বিল, বাঁশের সাঁকো বা চার পেরিয়ে, কখনও কখনও বা বাইসিকেল কাঁধে করে প্রায় প্রতিদিন ২০।২৫ মাইল 'বাইসিকেলে' যেতে হবে! কিন্তু এই সময়েই স্কুল পরিদর্শক মহাশয়ের 'বাইসিকেলের' প্রথম দর্শন মনে পড়তো। আর মনে হোত এখন কি সেই স্কুল পরিদর্শক মহাশয় আমার সঙ্গে 'বাইসিকেলে' পাল্লা দিতে পারবেন? তখন 'বাইসিকেল' দেখিয়ে আমাদের অবাক করেছিলেন, বোকা বানিয়েছিলেন।

ঝড়ের পর পরের বাগানে গিয়ে আম কুড়োনোটা আমাদের ছেলেবেলায় খুবই প্রচলিত ছিল; একলা যেতাম না, হয় সঙ্গীরা এসে ডাকতো, না হয় আমি তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ডেকে আনতাম; কেলা যাওয়াতে কোন আবদ্ধ ছিল না। যারা চিরস্থায়ী করতেন, বলতেন নিজেদের বাড়ীর বাগানে ত ঝড়ে আম পড়েছে, সেগুলো না কুড়িয়ে পরের বাগানে আম কুড়োতে যাও কেন? কি জানি কেন নিজেদের বাগানের ঝড়ে-পড়া আম কুড়োতে তত ইচ্ছা হত না; আর সঙ্গীদের ডেকে এনে সকলে মিলে নিজেদের বাগানে আম কুড়োতেও তেমন আনন্দ পেতাম না। মনো-বৈজ্ঞানিকগণ হয়ত এই উভয় কারণের একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করতে পারবেন, তবে বলে রাখি পরের বাগানে গিয়ে গাছে উঠে কখনও আম পেড়ে আনি নি। হয়ত অবচেতন মনে ছিল যে, এই কাজটা করলে চুরি করা হবে। গাছে উঠতেও তত পটু ছিলাম না। তবে পরের বাগানের ফুল তুলে এনেছি, এটাকে চুরি মনে হোত না, বোধ হয় পুজোতে লাগবে বলে, প্রাচীনারা খুশী হতেন।

বর্ষার সময়ে খুলিতে মাছ ধরা আর একটা বাড়তি পাওনা ছিল। পুকুরের পাশের জলাজমি যখন জলে পূর্ণ হয়ে যেতো পুকুরের পাড় স্থানে স্থানে কেটে, কাটা স্থানে আমরা খুলি বসাতাম খুলির চারধার দিয়ে যাতে জলাজমির জল না যায় মাটি দিয়ে তার ব্যবস্থা করতাম, খুলির ওপরেও ঘাস পানা ইত্যাদি দিয়ে দিতাম, যাতে মাছ খুলির ওপর দিয়ে টপ্‌কে না যায়; খুলিতে জলাজমির অসংখ্য ছোট ছোট মাছ এসে আটকে যেতো। খুলি বাঁশের সরু সরু কাটি দিয়ে তৈরী হয়, হাটে কিনতে পাওয়া যায়। কার খুলিতে কত মাছ পড়লো, সেটা দেখার মধ্যেও খুব আনন্দ ছিল। যার খুলিতে কম মাছ ধরা পড়তো, তাকে আমরা তাস দিতাম, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যাতে সমান মাছ পায় তা দেখতাম। বাড়ীতে যখন মাছ নিয়ে যেতাম বাড়ীর লোকেরা খুশী হ'তেন, তবে ভর্ৎসনাও করতেন—কেন লেখা-পড়ার ক্ষতি করে খুলিতে মাছ ধরতে যাই।

কলা গাছের ভেলাতে চড়াও আর একটা মজা ছিল; মোটা মোটা কলাগাছ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ৮।১০টা খণ্ড পাশাপাশি রেখে তাঁর দুই দিকে চাঁচা ছোলা বেতারি ঢুকিয়ে ভেলা তৈরী হ'তো; সেই ভেলা পুকুরের বা দীঘির গভীর জলের ওপর ভাসতো; আমরা এক একটা ভেলায় ২।৩ জন চড়ে যেন সমুদ্র অভিযানে যেতাম, মনে গর্ব অনুভব করতাম যেন এক একজন "কলম্বাস"। সকলেই কম বেশি সাঁতার জানতাম; কখনও কখনও ২।১ জনকে ঠেলে জলে ফেলে দিতাম; এতে খুবই 'রোমাঞ্চ' অনুভব করতাম; এর জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে বকুনিও কম খেতে হয় নি। প্রত্যেকের কলা কাণ্ড থেকে ২।১ টা করে কলা গাছ সংগ্রহ করতাম।

কলকাতা থেকে আগত লোকদের মুখে 'কোট' বা কেল্লার কথা শুনতাম, বাগীর গাদায় বসে ছোট ছোট কেল্লা তৈরী করা একটা নেশা হয়ে উঠেছিল, বাগীর মাঝে মাঝে গর্ত করে, গর্তের চারিদিকে ইটের পাঁচিল দিয়ে পাঁচিলের ওপর তালপাতার ছাউনি করে তার ওপর বালী চাপিয়ে ছোট ছোট ঘর তৈরী হোত। এই ঘরগুলোকেই

কেল্লা বলতাম ; এই ঘরগুলোর মধ্যে ছোট ছোট তীর ধনুক রাখতাম, তাল্লা টিন কেটে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতাম, সেগুলোকেও কেল্লার মধ্যে রাখতাম ; কেল্লার ঘরদোও থাকতো, জানি না আমাদের মধ্যে ভবিষ্যতে কেউ 'মিলিটারীতে' গিয়েছিলেন কিনা।

আর একটা মস্ত বড় খেয়াল বা সখের কথা বলছি। এটাকে কেল্লার পিঠেই স্থান দেওয়া যায়। আমাদের মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় "ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টার" ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে আমরা বিশেষতঃ আমার মেজদাদা ও আমি ডাকঘরের অনেক কাজ শিখেছিলাম। আমরা কয়েকজনে মিলে ডাকঘর স্থাপন করে ফেললাম। গ্রামের স্থানে স্থানে বড় বড় গাছে আমরা 'লেটার বক্স' টাঙ্গিয়ে দিতাম, মোটা পিচ-বোর্ড বা তাল্লা টিন দিয়ে আমাদের 'লেটার বক্স' তৈরী হোত, আমরাই পত্র প্রেরক ও গ্রাহক, আমরাই পিওন, পালা করে এক এক জনে 'পিওন' হতাম। 'লেটার বক্সে' চিঠি ফেলবার নির্দিষ্ট সময় ছিল, 'লেটার বক্স' খোলবারও নির্দিষ্ট সময় ছিল, অবশ্য চিঠিতে কোন টিকিট থাকতো না। সব 'বেয়ারিং'। 'বেয়ারিং এর' জন্য মাশুল দিতে হোত না। খাম, পোষ্টকার্ড দুইই প্রচলিত ছিল। আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমাদের ডাকঘর স্থাপনের কথা জানতেন, তিনি মাঝে মাঝে 'লেটার বক্স' থেকে চিঠি নিয়ে পড়তেন, আবার লেটার বক্সে রেখে দিতেন, আমাদের চিঠিতে নানান রকমের কথা থাকতো, কখনও কখনও কোন কোন শিক্ষকের কথাও আমরা লিখতাম, কোন্ ক্লাসের কোন্ শিক্ষক কোন্ ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলেন কোন্ শিক্ষক পড়াতে পড়াতে ঘুমিয়ে পড়লেন, ইত্যাদি। কিন্তু এখনও মনে আছে, আমাদের চিঠিতে কোন শিক্ষকের সম্বন্ধে কোন কটু উক্তি থাকতো না। আমাদের চিঠিতে কারোর ওপর কোন দোষারোপ থাকতো না ; আমাদের প্রধান শিক্ষক এই খেয়ালটাকে ভাল চোখেই দেখতেন, বলতেন এখন থেকেই তোমাদের চিঠি লেখা লেখা অভ্যেস করে দিতেন চিঠি বিলি করার জন্যে লেখাপড়ার ক্ষতি যেন না হয়। তিনি হাসতে হাসতে বলতেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ 'পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল' হবে। তাঁর এই ভবিষ্যৎ বাণী ফলে নি।

আরও একটা খেয়াল বা ঝোঁকের কথা বলি। তখনকার দিনে আমাদের গ্রামের প্রধান রাস্তাটাও কাঁচা ছিল ; ঐ রাস্তা দিয়ে প্রত্যহ চলাচল করতো মালবাহী ও মানুষবাহী গরুর গাড়ী ; বর্ষাকালে ঐ রাস্তায় মাঝে মাঝে খুব গভীর কাদা জমতো এবং ঐ কাদায় গাড়ীর চাকা এমন ঢুকে যেতো যে গাড়ী অচল হয়ে পড়তো। আমরা কয়েকজন ছেলে ওতপেতে থাকতাম কখন গাড়ীর চাকা কাদায় আটকে গাড়ী অচল হয়ে যাবে গাড়ী অচল হলেই আমরা কাদার মধ্যে চাকা ঠেলে তুলে দিতাম। কত গাড়োয়ানের কাছ থেকে কত পুরুষ মহিলার কাছ থেকে আমাদের এই জন্য কত আশীর্বাদ পেয়েছি বলা যায় না। অসময়ে এই কাজ করে গায়ে কাদা মেখে বাড়ী ফিরলে বাড়ীতে বকুনি খেতাম।

এ ছাড়া গ্রামের খেলা যথা হা-ডু-ডু, লুকোচুরি ইত্যাদি আমরা খেলতাম, তাস, বাবা, পাশা ইত্যাদি কখনও খেলি নি, জানতাম ওসব বুড়োদের খেলা। কিন্তু বুড়ো হয়েও ওসব খেলা শিখতে পারলাম না। এখন মনে হয় শিখলে ভাল হোত, এখন সময় অনেকটা কেটে যেতো।

আমাদের মিত্রবাটীর মধ্যস্থলে একটি অতি পুরাতন বকুল গাছ আছে. তার তলাটি বাঁধান প্রশস্ত, এই বকুল গাছের আশে পাশে রাধা-গোবিন্দ জিউর প্রাচীন মন্দির ভাগ্নের দিগ্যাত এবং অন্যান্য দেবালয় আছে। অপরাহ্ণে বকুল

তলায় যাঁদের স্থানে প্রাইমারের ছাত্রদের বসতো; বড়দিন ফুল ফোটার সময় আমাদের কয়েকজনের কাজ ছিল করে-পড়া ফুল দিয়ে মালা গাঁথা; সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত গুরুজনদের প্রণাম করে তাঁদের গলায় সেই মালা পরিয়ে দেওয়া; তাঁরা আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেন। তখন থেকেই মাল্যদান করা শিখেছি।

কোন কোন বিষয়ে আমার বাবার খুব কড়া শাসন ছিল। যেমন, তিনি গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের ভিন্ন গ্রামে যেতে দিতেন না। বলতেন যদি অন্য গ্রামে যেতে ইচ্ছে হয় আমার সঙ্গে যাবে; এই কারণে বাল্যকালে আমাদের নিজের গ্রামের পাশাপাশি গ্রামের সঙ্গে আমাদের তেমন যোগাযোগ ছিল না। কাছাকাছি কোন গ্রামে যাত্রা হলেও আমরা কারোর সঙ্গে যেতে পেতাম না। বাবা ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াতে দিতেন না; ছিপে মাছ ধরতে দিতেন না এইরকম অনেক বিষয়েই আমাদের নিষেধ ছিল এর ফলে গ্রামের অনেক ছেলের কাছে আমরা অনেক বিষয়ে বোকা বিবেচিত হতাম।

আজকের দ্রুত অগ্রসরমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ছোটবেলার চিত্ত বিনোদনের এই সকল খেলা, খেয়াল এখনকার ছেলেদের কাছে স্বভাবতই খুবই অকিঞ্চিৎকর মনে হবে; ট্রানজিস্টার, মিওন আলো, টেষ্ট খেলা আর সিনেমা শুধু শহর কেন সুদূর গ্রামের সিদ্ধান্তকেও গ্রাস করে ফেলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ জীবনের দাবাড়ে শৌঁছে পিছনে রেখে আসা শৈশবের এইসব সুখস্মৃতি এখনও আনন্দের সঞ্চার করে। আজ অতীত রোমন্থন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি বার বার মনে আসছে:

"তার পরে এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের আজ প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা শোনা নিভৃত সন্ধ্যেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে।
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।"

দুঃখের বিষয়, যেমন যেমন পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকের ও পাঠদানের 'মান' বাড়িতেছে, 'মানের বইয়ের' সংখ্যা ও আয়তনও তেমন তেমন বাড়িতেছে। 'কিশলয় বোধিনী' হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত তাহার পরিসর। ইহাও তো এই ষাট বৎসরের প্রগতি! —শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিমাই সম্পর্কে চরিতকারেরাও কোন কোন সময় তাঁর বিদ্যার ঔদ্ধত্য বর্ণনা করেছেন। রাস্তা ঘাটে যাকে পাচ্ছেন তাকেই তর্কে মাতাচ্ছেন। তাঁরা বেরে যাচ্ছেন, ভয়ে পেছে আর তাঁর সামনে কেউ পড়তে চান না। এগুলি ঔদ্ধত্য বলতে আমার আপত্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ এই ঔদ্ধত্যের বলেই মাইকেলের মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা করেছিলেন বলে তিনি পরে স্বীকার করেছেন। আমার মনে হয় এই মনোভাবকে ঔদ্ধত্য না বলে প্রতিভা স্ফুরণের অবকাশ কিংবা লক্ষণ বলা যায়। সন্ধানী দৃষ্টির পৌগণ্ড রূপ। কারণ, বিদ্যা নিয়ে যে বড়াই করতে নেই সে কথা নিমাই বারবার বলেছেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক :

নবদ্বীপে এক দিগ্বিজয়ী বিদ্যা-বীর এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কোন পণ্ডিতই পেরে উঠছেন না। পণ্ডিত সমাজে রীতিমত ভয় ঢুকেছে। শিষ্যেরা এসে চৈতন্যদেবকে ধরলেন। তিনি একটু হেসে বললেন,

"শুন ভাইসব ! এই কহি তত্ত্বকথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা ॥
...
ফলবন্ত বৃক্ষ, আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ ॥"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবলেন,

সভামধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃত্যুতুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে ॥
লাঘবো বিপ্রেরে করিবেক সর্বলোকে।
ঘুচিবেক সর্বস্ব, মরিবে বিপ্র শোকে ॥
দুঃখ না পাইব বিপ্র, গর্ব হৈব ক্ষয়।
বিরলে করিয়াও দিগ্বিজয়ী জয় ॥

শুধু এই বিচারটুকুই নয়, বিচার অনুযায়ী কাজও করতেন। দিগ্বিজয়ীকে যখন হারিয়ে দিলেন, সেই পরাজয় দেখে চৈতন্যদেবের শিষ্যেরা পণ্ডিতকে একটু উপহাস করতে উদ্যত হতেই তিনি পণ্ডিতের মর্যাদা পুনঃস্থাপিত করতে চেষ্টা করেন,

তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী।
তোমারে কবিত্ব দিছে গঙ্গাজলধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর।
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবের কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥
দোষ-গুণ বিচার এই 'অল্প' করে মানি।
কবিত্ব-করণে শক্তি—তাহা যে বাখানি।
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মূর্খ না হই তোমার।
আজি যাহ, কালি দিনিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥

সত্যি কথা বলতে কি চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনেই দেখা গেছে, বিদ্যার দম্ভে না ঠেকলে তিনি যুক্তির সঙ্গে বিতর্কে নামতেন না। এই জন্যই মনে হয়, বিদ্যার ঔদ্ধত্য বলতে চরিতকারেরা যা বলেছেন—তা যেন মানতে ইচ্ছে করে না। অবশ্য ঔদ্ধত্য কথাটির অর্থবোধ যদি সেকালে অন্যরূপ হয়ে থাকে সে ভিন্ন কথা। ঔদ্ধত্য প্রকাশই যে প্রতিভার লক্ষণ তা যেমন ঠিক নয়, তেমনি প্রতিভার ঔদ্ধত্য মনের পূর্ণ পরিণতির পথেই এগিয়ে দেয়।

রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনাতেও চৈতন্য-

দেবের এই স্বভাবটি দেখা গেছে। রায় রামানন্দের উপলব্ধিকে ঠিক যায়গায় আনবার জন্য কেবলই বলে যাচ্ছেন, 'এই হয়, আগে কহ আর' কিংবা 'এহ বাহ্য আগে কহ আর।' অথবা, 'আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।'

অধ্যয়ন ব্যাপারে চৈতন্যদেবের আর-একটি বিশেষ দিক দেখা যায়। বালসুলভ চঞ্চলতা তাঁর ছিল। এ ব্যাপারে তিনি পিতার কাছ থেকে বহুবার তিরস্কৃতও হয়েছেন। শাসনের জন্য জগন্নাথ মিশ্র মারিও ধরতেন। তাঁর পরিবর্তন ঘটে তাঁর দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নেওয়ায়। এই সময় অধ্যয়নে তাঁর মন একেবারে নিবিষ্ট হয়ে যায়। শুধু মাত্রিক নিয়মে পড়াশুনাতেই নয়, গ্রন্থসমূহের অর্থবোধে যেমন অপূর্ব দক্ষতায় তেমনি উপলব্ধিতে। শচীদেবীর তো ভয় হল। বড় ছেলে পড়াশুনা করে সংসারের অনিত্যতা বুঝতে পেরে সংসার ছাড়ল। নিমাইও আবার তেমন না করে। বস্তুতঃ, প্রকৃত পড়াশুনা বলতে তখনকার দিনে সত্য উপলব্ধিকেই বোঝাত। বিশ্বঠাকুর নিমাইয়ের পড়াশুনা বন্ধ করে দিলেন। তখন বোধ হয়, পড়াশুনা না করলে অন্নসংস্থান জুটবে না এমন ভয় ছিল না। লেখাপড়া ছিল আধ্যাত্মিক ব্যাপার। অধ্যাত্মসাধনাই লেখাপড়ার উদ্দেশ্য। শিক্ষিত হওয়া অর্থ ব্যক্তির এবং সমষ্টির জীবনযাত্রা উন্নয়ন করা।

নিমাই পিতার আদেশ শিরোধার্য করলেন। কিন্তু অধ্যয়ন থেকে নিজের মনকে ফেরাতে পারলেন না। অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়ত থাকল। একদিন কেলে-দেওয়া এঁটো-কাঁটা হাঁড়ির উপর গিয়ে বসলেন। শচীদেবী নিষ্ঠাবতী মহিলা, হায় হায় করে উঠলেন। নিমাই তখন বলছেন,

তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
অন্যায়ত্র মূর্খ বিপ্র আনিব কেমতে॥
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভালোমন্দ কাম।
সর্বত্র আমার হয় অবিতীয় জ্ঞান॥

বন্ধুবান্ধবেরা মিশ্রকে পরামর্শ দিলেন, ছেলেকে পড়তে দাও। পুনরায় পড়াবার ব্যবস্থা হল।

এখানে মনোবিদেরা হয়ত বলবেন, 'তবে। আমরা যে conflict conflict করি তার কারণ তো এই! পড়তে না দিলে সে তো ভণ্ডা হয়ে পড়ত!' মনোবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যে-বিদ্যার পিছনে মনীষীদের প্রতিনিয়ত ভাবনা রয়েছে তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু প্রয়োগ-কর্তাদের একদেশদর্শী দেখে যত কিছু আপত্তি ওঠে। হাওড়া-ব্রীজ বোলার চালিয়ে বিজ্ঞানের সূত্র তাঁরা যে-ভাবে প্রয়োগ করেন, আর পরিসংখ্যানের ঘণ্টা-রেখা এঁকে তাঁরা যে ভাবে উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে যান—তাতে সমাজের এবং ব্যক্তির অকল্যাণ ছাড়া যে আর কিছু হচ্ছে না তা জগতের সমস্ত দেশের গণসমাজ প্রমাণ করছে। সমাজ যদি থাকে এবং তার সামগ্রিক রূপ যদি বজায় রাখা যায় তবে ছেলেমেয়েদের বয়োবৃদ্ধির নানা বৈশিষ্ট্য ঠিক পথেই যাবে, তার জন্য ক্লিনিক খুলে দেশকে ক্লিনিকের অরণ্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। আর সমাজ স্বার্থসর্বস্ব ব্যক্তির জন্য হলে, তাকেই সমাজ-রূপে পরিবর্তিত করা দরকার। সভ্যতা চিকিৎসা করে পাগলোয়ান তৈরী করা অসম্ভব ব্যাপার। নিমাই পূর্ববঙ্গে গিয়ে শ্রীহট্টবাসীদের ভাষা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন, কিন্তু তাতে কেউ অপমানিত বোধ করেন নি। তার কারণ সমাজ ছিল সুস্থ। যে-কথায় অন্যের উপর আঘাত পড়ে সে-কথা দেশের মনে তখন ছিল না। ব্রহ্মণ্যতন্ত্র দর্শন আউড়ে প্রতি-বেশীকে প্রবঞ্চনা করলে দর্শনকে আর মর্যাদা দেওয়া যায় না, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণেরও একটি বড় কারণ বোধ হয়, "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়্'। তিনি তাঁর পড়ুয়াদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়েছিলেন। পড়ুয়াদের মধ্যে কেউ কেউ ষড়যন্ত্র করেছিল তাঁকে প্রহার করবার। সব ছাত্র বা

সব মানুষ যে কোন-একজনে ভালো ছিল এমন কথা মানবসভ্যতার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। নিমাই বুঝতে পেরেছিলেন তাদের ভ্রান্তি। তবে আর তাদের পড়িয়ে কি হল? পড়ানো তো অনর্থক।

করিল শিষ্যগণ যত কক্ষ নিবারিতে।
উলটিয়া আরও কক্ষ বাড়িল দেহেতে॥

তিনি নিজকে অনুসন্ধান করলেন। তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প করে নিত্যানন্দকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা বললেন:

যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইয়া কালি তাঁহার দুয়ারে॥

আর এই সঙ্কল্প থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারেন নি। গুরু নিজে বড় হয়ে বড় হওয়ার শিক্ষা দিতে চান। এইভাবে শিক্ষার মান তিনি উন্নত করতে চেয়েছিলেন। আজ এ কথা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এ ঘটনার মধ্যে তো খুব একটা অলৌকিকতা নেই। তবে কেন আমরা সেই আদর্শ অনুসরণ করতে পারি না। কারণ আর কিছুই নয়, আমরা মেটিরিয়ালিজমের ঘড়ি থেকে ঘড়ি-গ্লানিং করছি। শীততাপনিয়ন্ত্রিত কৌচে বসে তৃতীয় শ্রেণীর লোকের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া চলে না। ধনী-দরিদ্র বিচার করে ছাত্রকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায় না। মূলত, দেশের অন্যান্য দিকের বিকৃত চেহারার প্রতি তাকিয়ে শিক্ষাকে ছাঁটে চালছি বলেই, শিক্ষালাভ এখন আর ব্যবসায়িক স্বভাব থেকে মুক্ত হতে পারছে না। সমস্ত যুগেই এই প্রবণতা ছিল, কিন্তু সে সব যুগে মাঝে মাঝে লোকোত্তর পুরুষের অলৌকিক স্বার্থ-ত্যাগে আবার মুক্ত হতে পেরেছিল। বেদের ঋষিরা এই জন্যই 'পণি'দের থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন কিনা বিচার করা দরকার।

প্রকৃত গুরু কে হবেন সে সম্পর্কেও চৈতন্যদেবের নির্দেশ ছিল। হাত রামানন্দকে তিনি বলেছেন,

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—সেই গুরু হয়॥

শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। গুরু তিনরকম—শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরু। কিন্তু তিনরকম গুরুর একই লক্ষণ বলে তাঁরা ধরেছিলেন। যিনি শব্দ-ব্রহ্মে এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলছেন,

"শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন্যায়তো ব্যাখ্যানতো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞম্, অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগাৎ। পরে চ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্। অন্যথা বোধকত্বাযোগাৎ। পরব্রহ্ম নিষ্ণাতত্ব-শ্রোতৃকত্বাদ্ উপনয়নাদ্রভ্যমিতি।" বেদাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যানে এবং যুক্তি তর্কাদির সঙ্গে বিচারে বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ এবং এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ হয়েও পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনুভব-সম্পন্ন এবং পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনুভব-সম্পন্ন বলে যিনি পরমশান্ত—তাঁকেই গুরু বলে স্বীকার করা চলে। এ ব্যাপারে প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে অধুনা কাল পর্যন্ত জাতিভেদ স্বীকার করা হয় নি। কিন্তু লোকাচারে অন্যরূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলেই চৈতন্যদেব তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অধিকতর পরিষ্কার করে বলেছে, "কাম-ক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্। শ্রদ্ধা বিনাপ্যায়াতি স বক্তা পরমো-গুরু॥" যে-জাতিরই হোক এইরূপ গুরুর নিকটে সমিৎপাণি হয়ে গিয়েছিলেন যাবে; উদ্দালক মুনি ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয় রাজা অশ্বপতির নিকট গিয়েছিলেন বৈশ্বানর বিদ্যালাভের জন্য সমিৎপাণি হয়েই। সমিৎপাণি তো আগুন জ্বালার কাঠ, তা নিয়ে যেতে হত কেন? মনে হয়, আদিতে গুরুর অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল সমিৎকাঠ,

পরে ঐটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। দেহ ধারণ এবং করণীয় কার্যের অত্যাবশ্যক ভবাই গুরু গ্রহণ করতেন, বাড়তি নয়। এইজন্যই অনুশাসন ছিল "রিক্তহস্তো ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুম্।" সমাজের কল্যাণের জন্য যেমন গুরু তেমনি সমাজও তাঁর অস্তিত্বের জন্য। সমাজের কল্যাণ-ইচ্ছা না পোষণ ক'রে কোন ব্যক্তির কল্যাণে যদি গুরু আত্ম-নিয়োগ করেন তবে একদিন আসবে যখন সমাজ এমন কি সেই ব্যক্তিও অবজ্ঞা করবে; এমন একদিন আসবে যখন তিনি নিজেও বাদনাকে দমন করতে পারবেন না, ইস্কুলের বাড়ীর টাকায় নিজের বাড়ী নির্মিত হবে; বিদ্যা বন্ধ্যা হয়ে পড়বে তিনি শুধু মাত্র এ্যাডমিনিস্ট্রেটরে পরিণত হবেন।

নিষ্ঠার কাছে সবাই যে ছার মানে এ কথা বারবার চৈতন্যদেব বলে গেছেন। আর তুমা-জ্ঞান ছাড়া নিষ্ঠা আসে না। তুমাজ্ঞান লাভ হয় নিবিষ্ট-চিত্ততার ফলে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের গীতাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের কথা হয়ত অনেকেই জানেন। সেই ব্রাহ্মণ,

'দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্তন।
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন—লোকে করে উপহাসে।

চৈতন্যদেব তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কিরূপ অর্থ করে এত সুখ পাও? ব্রাহ্মণ বলেন,

মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
তথাপিহ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি।
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাথে তোত্র অতীব সুন্দর॥

যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥

চৈতন্যদেব বললেন, 'তোমারই গীতাপাঠের অধিকার আছে।' বস্তুত নাম-সঙ্কীর্তন প্রবর্তন করবার গোড়ার কথাও চৈতন্যদেবের এই ছিল। পূর্ববঙ্গে তপন মিশ্রকে এই উপদেশই দিয়েছিলেন। নিবিষ্টচিত্তে যে-কাজ করা যায় তার মধ্য থেকেই নতুন আলোক পাওয়া যায়। আজকালকার মনোবিদ্যার পরিভাষায় একেই বলে insightful learning. আর এ ইঙ্গিতমূলিনাত বিষয়ের কতগুলি 'টেকনিক' জেনে হয় না।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, দেবদাস প্রভৃতি বিভিন্ন উপন্যাসে মিষ্টার কাছে তার্কিক বারবার নতি স্বীকার করেছে দেখা যায়। ঔপন্যাসিক লোকচরিত্রের বাস্তব রূপ যা দেখেছেন এবং বুঝেছেন তাই ফুটিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ তুমার কথা বারবার বলেছেন। শাস্ত্রের কথা আর তুলছি না। এঁরা আধুনিক যুগের লোক, এঁদের অভিজ্ঞতায় সন্দেহ করবার হেতু থাকে না।

বর্ণডাইকের শিক্ষাসূত্র থেকে সুরু করে গেস্টাল-টিস্টদের, কাফ্‌কা, কুহলার, লেউইন, টলম্যান পর্যন্ত সবাই শিক্ষায় এই অন্তর্দৃষ্টি লাভের কথা বলেছেন। প্রাণীজগতে কারও একটু দেরীতে হয়, কারও তাড়াতাড়ি হয় এই মাত্র। মানুষের চেতন রাজ্যের, মানুষের গঠনপ্রকৃতি আরও বিচিত্র। প্রতীকতা বুঝে মানুষের চিন্তারাজ্যকে চালিত করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য আছে বলেই মানুষের জ্ঞান এমন সঞ্চিত হয়েছে এবং মানুষ অভিজ্ঞতায় সেগুলি নূতন করে বুঝতে চেষ্টা করেছে। গণতন্ত্রের শিক্ষায় এই ধর্মকে বিশেষ খাতে বইয়ে দেওয়া নিষেধ। মানুষের আচরণে যেমন ক্ষণ আছে তেমনি মহাকাল আছে। ক্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের দৈনন্দিন কাজ কর্ম, মহাকালের প্রভাবে পরিচালিত তার কল্যাণ চিন্তা এবং ধর্মনি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সেদিনও বলেছেন, মানুষের

দুটি দিক থাকা উচিত—একটি যেমন আশু দিক, অন্যটি তেমনি পরম দর্শন। কিন্তু আমার মাধ্যমে আমরা বর্তমান যুগে বিদ্যালয়ের করণীয় হিসাবে ধরে নিয়েছি :

1. To educate the citizen for effective participation in all those common undertakings and co-operations which are necessary to sustain the best in our complex contemporaneous civilisation.

2. It is to prepare young people for productive living.

প্রথম ধারায় 'সমকালীন সভ্যতা' বলতে কোথা থেকে সুরু করব তা যেমন অস্পষ্ট তেমনি তার 'উত্তম' কোন্‌টুকু তা বুঝতে পারা কঠিন। দ্বিতীয় ধারায় কিভাবে বাঁচলে যে সমাজের সার্বজনকল্যাণে বাঁচা যায় তারও ব্যাখ্যা কঠিন। অথচ এই দুই শিক্ষাশাস্ত্রেই আবার আছে শিক্ষকের দুরকমের ধর্ম থাকবে, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণ পথে নীতি নির্দেশ। এইসব অস্পষ্ট এবং স্ববিরোধী আধুনিক শিক্ষাশাস্ত্রের নির্দেশই শিক্ষাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অনন্তার মধ্যেকার বক্তৃতার যেমন দিগ্‌দর্শন থাকে না, সমাজ ভেঙে বাকি স্বাতন্ত্র্য নির্মাণেও তেমনি গুলজার যতটা আছে ততটা সুস্থ চিন্তা নেই। ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে আমরা সিন্ধু সভ্যতাই যে ভারতের আদি সভ্যতা তাই স্বীকার করে ক্লাসে পড়াই, সন্ধি আর সমাসের সূত্র দিয়েই যে মানুষ কথা বলে—তাথা শিক্ষক হিসাবে সেইটুকু মাত্র জানি, ভূগোলের শিক্ষকের কাছে পৃথিবীর মাত্র দুটি গতি, আর শিক্ষা-পরামর্শ-দাতা দর্শনের কার্তের বাইরে কিছু দেখতে পান না।

খোলা-বেচা শ্রীধরের সঙ্গে চৈতন্যদেব কেমন ব্যবহার করতেন, কিংবা ভজন বিষয়ে তাঁর কিরূপ উদারতা ছিল, অথবা গুরু রূপে জাতিভেদ মানতেন না—এ সব বিষয় শিক্ষাপ্রসঙ্গে তাঁর বড় রকমের স্থান নয়। কারণ ভারতবর্ষেরই এই বৈশিষ্ট্য, শঙ্করাচার্যের মতো বহু পূর্বে দেখা গেছে। তাঁর নামের তুলনা হয় না যখন দেখি লোক-শিক্ষার জন্যই তিনি গৃহত্যাগ করলেন এবং শিক্ষার যে অন্তর্দৃষ্টি দানই হত এই কথা পরিষ্কারভাবে বললেন।

অভ্যস্ত পথে যাঁরা পড়ে সমাজের যে অবনতি দেখেছিলেন তাকেই উন্নত করবার জন্য চিন্তারাজ্যে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করলেন তিনি। যে-কোন পাঠক্রম তৈরী করতেই ভাবতে হয় যে, যেবিষয় অন্তর্ভুক্ত করছি তার মূল্য সমাজে কিরূপ, সেই মূল্য ব্যক্তির আশু প্রয়োজনে কতটা লাগে এবং সমাজের কল্যাণে সেই প্রয়োজন কতটা উৎসর্গ করতে হয়। এইজন্যই তিনি শঙ্কর সূত্রকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। মনে হয় এইজন্যই সমগ্র ভারতবর্ষকে জানবার জন্য পরিক্রমা করেন। সার্বভৌমের সঙ্গে 'মুক্তিপদ' শব্দটির অর্থ নিয়ে চৈতন্যদেব তাই ব্যাখ্যায় বসেন। লোকশিক্ষাকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে নতুন ব্যাখ্যায় পুনঃ স্থাপিত করেছেন। ব্যাকরণে অধিকার তাঁকে মানুষের মনের চিন্তাকে বুঝতে সাহায্য করেছিল, আর সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোত মিশে মানুষের ভাবনা-স্রোতকে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনীতে অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে। কিন্তু কোথাওও আদি-মানুষের কবি-কথা বা অতি-কথা নেই। মহাজন পদাবলীতে কোন কবি এমন উপমা প্রয়োগ করেন নি। অথচ সাধারণের সার্বিক আবেগকে তিনি স্থান দিলেন। যে-সব 'বীথি'-এ অস্বস্তি আসে, যে-সব গ্রামীণ সংস্কারে মানুষকে ডুবে যেতে হয় সেসব বিষয় তিনি পরিহার করে গেছেন; কিন্তু যে-গুলিতে মানুষের আনন্দ এবং যা সহজলভ্য সেইগুলিই তিনি ব্যবহার করলেন।

সর্বাগ্রে প্রাতঃস্নান তারপর ঠাকুরপূজা তারপর অধ্যাপনা, সামাজিক প্রথাসিদ্ধ করণীয়; অতিথি সেবা। অধ্যয়নকালে সদাচার রক্ষণ। এগুলি তিনি যাদের বলে গেছেন। অর্থাৎ সমাজের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে। আবার নামসংকীর্তন নতুনভাবে প্রবর্তিত করা, শিক্ষাকে নতুনপথে চালিত করা, সঙ্গীতে সাধারণ মৃদঙ্গ ব্যবহার প্রভৃতি সবই তাঁর করণীয়ের মধ্যে থাকল।

উপসংহারে আমরা এইটুকুই বলব যে, সমাজকে অনুসরণ করা এবং সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়া এই দুটি দিকই তিনি তাঁর শিক্ষায় রেখেছিলেন। আর রাখতে পেরেছিলেন যে-কারণে সে-কারণটি তাঁর শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকটিতে আছে:

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

ষোড়শ শতাব্দীর এই কথার সঙ্গে অষ্টম শতাব্দীর শঙ্করের শ্লোকের অনেকটাই মিল পাওয়া যায়:

ন ত্বাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা,
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

আটশ' বছর ধরে একই কথা।

———

এখনও স্কুলের সঙ্গে খেলার জায়গা নাই, বাগানের ব্যবস্থা নাই, শান্ত পরিবেশ নাই, নিকটে ক্ষুদ্র সরোবর বা নদী নাই যাহা দেখিলে চোখ জুড়ায়, নলকূপের জলে পিপাসা দূর করিবার ব্যবস্থাও হয়ত নাই। ছাত্রের মন শান্ত হইবে কি করিয়া, কখন সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে?

—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকরং কর্ম্মভি: ভূগতিং তাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৭২ | ৯ম সংখ্যা

আলোচনা

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সংস্কার

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা সম্প্রতি কলিকাতার কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকদের এক সভায় বলিয়াছেন যে ছাত্রভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য আর নূতন কলেজ খোলা সম্ভব হইবে না। এবং বর্তমানে কলেজগুলিতে ছাত্রভর্তি বিষয়ক যে নির্দেশ দেওয়া আছে তাহাও তুলিয়া লওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি, অর্থাৎ মান উন্নয়নের প্রতি প্রধান লক্ষ্য থাকা চাই।

তাহা হইলে এই যে বন্যার মত ছাত্রদল ভর্তি হইতে চায় তাহাদের গতি কি হইবে? শ্রীচাগলা প্রয়োজন বোধে Correspondence Course অথবা ডাকযোগে শিক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবিয়াছেন। ডাকযোগে শিক্ষাদানের কথা আমরা বহুদিন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহা কোথাও চালু হইয়াছে বলিয়া জানি না। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে, তাহাও শুনিয়াছিলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বিবেচনা করিতেছিলেন, কিন্তু কার্যগত কিছু করা হইয়াছে কিনা তাহার পরিচয় পাই নাই। Part-time Course দ্বারা অগ্রসর হওয়া যায় কিনা তাহাও তিনি ভাবিতেছেন। এবিষয়ে তিনি রুশোতে প্রচলিত প্রথার বর্ণনা করেন।

শ্রীচাগলা আশা দিয়াছেন যে, শিক্ষার সকল স্তরেই ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিবেন—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যদি অগ্রসর হয় তাহা হইলে দেশের পক্ষে কল্যাণ হইবে। কিন্তু জাতিগঠনের চেয়েও উচ্চতর লক্ষ্য আছে, মানুষ গঠন। Man-making education-এর কথা ভারতে নূতন নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল যে বলিয়াছিলেন, 'আমার তোরা মানুষ হ'—সেই শিক্ষা কেন আমরা ভুলিয়া যাই।

শ্রীচাগলা আরও আশার বাণী শুনাইয়াছেন, শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনের কথা। অধ্যাপকদের বেতনের হার সর্বত্রই ৪০০৲—৮০০৲ গ্রেড প্রবর্তন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী

কমিশনের নিকট মন্তিহেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে এবিষয়ে সমাক অবহিত হওয়া বিভিন্ন রাজ্য সরকারেরও একান্ত প্রয়োজন।

আরও আশার কথা এই যে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠিতে বলেন, যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে হিন্দুই হইতে হইবে এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে মুসলমানই হইতে হইবে, এমন কি কথা আছে?

কিন্তু কার্যতে ইহা কি সম্ভব হইবে? কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি হিন্দু বা মুসলমানের জন্য না হইয়া—ঐ নাম তো ঐতিহাসিক কারণে—সকলের জন্য হইত, তবে আমরা ভারতীয় ঐক্যের লক্ষ্যে আরও একধাপ অগ্রসর হইতাম।

অভিভাবক সমিতি

কলিকাতার অভিভাবক সমিতি বা Guardians' Association-এর নাম বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তাঁহারা সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর নিকট যে স্মারক পেশ করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত। আগামী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে তাঁহারা আশা করেন যে দেশে চৌদ্দবৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সকলের শিক্ষার সংস্থান করা যাইতে পারিবে। সেই আশায় তাঁহারা দাবি করেন যে কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত ছেলেমেয়েদের কথা ভাবিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষা চালু করিবার উদ্দেশ্যে আরও অনেক নূতন বিদ্যালয় খোলা হউক। তাঁহারা শিক্ষামন্ত্রীকে দিয়া এইজন্য পৌরপতিকে বলাইতে চাহেন। শিক্ষামন্ত্রী নাকি এইভাবে কথা বলিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। কাজেকর্মে যাহাই হউক, অন্তত চাহিদা থাকা চাই এবং চাহিদা লইয়া সাধারণ বিতর্কের কর্মে অগ্রসর হওয়া চাই। অভিভাবক সমিতির এই পদক্ষেপ আমাদের ভালই লাগিতেছে। কাগজে কলমে ছাড়া আমরা তো সত্যই কোনও প্রকার প্রস্তুতির লক্ষণ দেখিতেছি না।

স্মরণে :

অধ্যাপক অতুল সেন

সম্প্রতি অধ্যাপক অতুল সেন মহাশয়ের পরলোক গমন বিশেষ দুঃখের সহিত আমিলাম। ১৯২০ সালে তাঁহার সহিত উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজে একত্রে পড়াইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিনি সেখানে দর্শন বা philosophy পড়াইতেন। তাহার পর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি আপনার কাজ ছাড়িয়া স্বদেশ সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে যোগ দেন ও কয়েক বৎসর দুঃখ কষ্ট বরণ করিবার পরে শিল্প সংগঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল তাঁহার এই জীবনব্যাপী সাধনার কথা কখনও ভুলিবে না। তিনি কিন্তু বরাবরই অধ্যাপক অতুল সেনই ছিলেন। তাঁহার ছাত্রবৎসল ও বন্ধুবৎসল রূপ যে দেখিয়াছে, সে-ই এই দিক স্মরণ করিবে। দেশকে তিনি কখনও ভুলেন নাই। তাঁহার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

অধ্যাপক হীরালাল রায়

যাদবপুরের ডাঃ হীরালাল রায় ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আজীবন রসায়ন শাস্ত্রের চর্চা ও অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনেও স্বদেশসেবা ও অধ্যাপনা একসঙ্গে চলিয়াছিল। তাঁহার চিন্তা ছিল বহুমুখ, এবং ১৯৪৭ সালে আমেরিকা ভ্রমণ হইতে ফিরিবার পরে কলিকাতায় যে শিক্ষাসম্মেলন ডাকা হয় তিনি তাহাতে যোগ দিয়া আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা পরিকল্পনা নির্ধারণে বিশেষ সাহায্য করেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের হলে আহূত পরবর্তী সভায় এই বিষয় লইয়া চর্চা আর অধিক অগ্রসর না হইলেও এই শিক্ষা সম্মেলনের চিন্তাধারা শিক্ষক সমাজের একস্তরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং

ডক্টর হীরালাল রায় মহাশয়ের সাহায্য ও সহযোগিতা আমাদের শিক্ষাসম্বন্ধীয় চিন্তাকে পুষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার মিলনাত্মে দক্ষতা অনস্বীকার্য। তিনি নিরহঙ্কার ও সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন।

কবিরাজ রাখালদাস সেন

সম্প্রতি কবিরাজ রাখালদাস সেন মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তির সংবাদও পাইলাম। ইনি অনেক আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় ও আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ইহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি প্রাঞ্জল বাংলা লিখিতে পারিতেন এবং 'উদ্ভাসন' পত্রিকায় নিয়মিত লিখিতেন। তাঁহার 'যুগের পরে' সুন্দর সুলিখিত প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় বাহির হইত।

কলেজে ছাত্রভর্তি

স্কুলেও যেমন, কলেজেও তেমন, ছাত্রভর্তি করা এক ভীষণ সমস্যা। অভিভাবকগণ বুঝিতেছেন যে এই দায় 'কন্যাদায়ের' মতই গুরুতর। এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই অসুবিধা শুধু কলেজের নয়, সর্বব্যাপী। কোথাও শিক্ষক নাই ছাত্র আছে, কোথাও বা ছাত্র নাই শিক্ষক আছে। কলিকাতার কাছাকাছি কেন, বঙ্গদেশের সর্বত্রই এই অবস্থা। এক একটি পরীক্ষার ফল বাহির হইতেই আমরা চারদিকে একটা উদ্বেগের ছায়া দেখিতে পাই—'অতঃ কিম্' এই প্রশ্নের ভারে প্রপীড়িত। আরও কলেজ চাই। বিদ্যুৎ নির্বাচনে এবং কলেজ নির্বাচনে সাহায্য করিবার মত ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাদপ্তর হইতে কেন করা হয় না, এই প্রশ্ন আমাদের স্বতঃসিদ্ধই করিতে ইচ্ছা হয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়, শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও সরকারি শিক্ষাদপ্তর—সকলে একযোগে এই সমস্যা সমাধানে করিতে কেন অগ্রসর হইতেছেন না? ইহা কি একটা বড় সমস্যা নয়?

শিক্ষক শিক্ষণ সমস্যা

সম্প্রতি অধ্যাপক গোকুল স্টেটসম্যানে কাজের ইংরাজী শিক্ষণের দান দেশে এতখানি করিয়াছে কেন তাহা লইয়া সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে নূতন করিয়া পুরাতন পাঠক্রমকে গড়িয়া লইতে বলিয়াছেন, তাহাতে আর কাহারও দ্বিমত করিবার ক্ষমতা নাই। পাঠ্যপুস্তক হইবে নূতন ধরণের, আধুনিক। আর অনেক পদ্ধতি না শিখাইয়া একটি পদ্ধতিই তো ভাল করিয়া শিখাইলেই হয়। আমাদের দেশে তো একটা কথা আছে, "চললে চল্লিশ মুক্তি, না চললে চতুর্ভুজ।" ইংরাজী পড়াইবার ধরণ সম্বন্ধে তো তাহা বলা চলেই, কোন বিষয়েই বা না চলে! আমাদের বি. টি. শিক্ষার্থীরা এই method বা পদ্ধতি লইয়া কতই না বিব্রত হয়! কোনও বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাল করিয়া না জানার জন্যই এরূপ হয়।

সাঁওতালের সহপাঠী

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

(৪)

পলাশ গাছের ছায়াটা যখন কুয়োর ধারে এসে পৌঁছোয় তখন বেলা দশটা বাজে। বারে বারে কুয়োর ধারে এসে দেখছি আমার জলের ঘড়ির দশটার কাঁটাটা কতখানি এগিয়ে এলো। কিন্তু বলেছে সে দশটায় আসবে। সময় হয়ে গেছে, পলাশ গাছের ছায়া কুয়োর ধারে পৌঁছে গেছে, মিতুর পথের দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় কানে এলো একটা ময়ূরের ডাক। এসময়ে তো ময়ূর ডাকে না, আশ্চর্য হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছি, দেখি খানিক দূরে একটা শাল গাছের পাশে মিতু দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম ময়ূরের ডাক নয়, ওটা মিতুর সঙ্কেত। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম সেইদিকে। কাছে গেলে সে হেসে বলে "চলো আমরা ঐভাবে সর্দারের ডাকি। চলো, আও অনেকদূর যেতে হবে।" মিতুর পিছনে পিছনে চললাম।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি, পথের চিহ্ন নাই, অথচ মিতু অনায়াসে চলে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম "এত খাল খন্দ, বড় বড় পাথরের চাঁই, এমন এড়িয়ে তুমি যাচ্ছ কেমন করে? পথ তো নাই।" মিতু জবাব দিল "পথ আছে।" মিতুর তামাশা ভাল লাগলো না, বললাম "পথ কোথায়? আমি তো পথ দেখছি না।" মিতু দাঁড়ালো, মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে "কতজন এপথ দিয়ে দিনরাত যাতায়াত করছে, তাদের পায়ের চিহ্ন স্পষ্ট রয়েছে"। মাটির দিকে তাকিয়ে কারো পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম না, একটু রাগ হোলো। মিতু সেটা বুঝতে পেরে বলে" তুমি মানুষের পায়ের দাগ খুঁজছো, তা পাবে কোথায়? যারা এপথ দিয়ে আসে যায় তারা মানুষ নয়, তারা বনের জানোয়ার। কত জানোয়ারের পায়ের দাগ রয়েছে। চেয়ে দেখ, এ-পাশে ও-পাশে ঘাসগুলো কত লম্বা, আমাদের পায়ের তলায় ঘাসের ডগাগুলো ছেঁড়া, হরিণ আর বনগুয়োরের খুরের ঘায়ে ছিঁড়ে গেছে। সামনে ঐ যেখানটায় ঘাস নেই, মাটি আর বালু, ওর উপরে নখের আঁচড় রয়েছে, ভালুকের অথবা শজারুর।" বিস্ময়ের সুর বলাম, "বাঘেরও হতে পারে।" শুনে মিতু হাসলো, বলে "না, বাঘের নয়, পথচলার সময় বাঘ এত নখ গাবার মধ্যে গুটিয়ে রেখে, ঘুমোবার বা শিকে মাটিতে থাবার ছাপ পড়ে কিন্তু নখের আঁচড় পড়ে না। আর একটু এগিয়ে চলো, বাঘের নখের আঁচড় ও দেখিয়ে দেব।" এগিয়ে চললাম। হঠাৎ এক পাশের একটা মস্ত অর্জুন গাছের গুঁড়ির কাছে গিয়ে মিতু দাঁড়ালো, বলে "দেখ।" দেখলাম গাছের গুঁড়িতে ধারালো ছুরির ফলা দিয়ে কে যেন উপর থেকে নীচে টেনে টেনে গভীর দাগ কেটেছে। মিতু বলে "ওসব বাঘের নখের আঁচড়, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে তারা গুঁড়িটা নখ দিয়ে আঁচড়ায়।" দেখে চক্ষু স্থির হয়ে গেল, যার নখের আঁচড়ে গুঁড়ির শক্ত বাকলের এই অবস্থা হয় তার আঁচড়ে মানুষের নরম শরীরের কি অবস্থা হবে।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছি, মিতু আর থামে না। প্রায় মাইল দুই গিয়ে একটা নদী দেখতে পেলাম, নদী তো নয়, তাকে বড় নালা বলা চলে। জায়গাটা দেখতে বড় সুন্দর, পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে পর্যন্ত অসংখ্য বড় বড় পাথর; যেন একটা মস্ত পাথরের সিঁড়ি নদীতে এসে মেশেছে। এর মধ্যে অনেক ছোট বড় গুহা, বুঝলাম মিতু

এতগুলো দেখতেই আমি এসেছে। আমাকে দূরে বসিয়ে রেখে মিতু সেই পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলো, একটু পরে সে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সময় কেটে যায়। চারিদিকে গভীর জঙ্গল আর আমি একা বসে আছি, তাগড়াই একটা বাঘ থাকে, হঠাৎ যদি একটা এসে পড়ে তাহলে কি হবে! বেশ ভয় করতে লাগলো। কাছে যে গাছটা ছিল দেখলাম তাতে চড়া কঠিন নয়, জুতো খুলে রেখে নিঃশব্দে তার একটা উঁচু ডালে উঠে বসলাম। অনেকক্ষণ পরে মিতু পাহাড় থেকে নেমে এলো। আমি মনে মনে তখন হাসছি, ভাবছি আমাকে না দেখে মিতু ভয়ানক ঘাবড়ে যাবে। মিতু কিন্তু একটুও ঘাবড়ালো না, সোজা গাছের তলায় এসে আমাকে ডেকে বলল "কমল, গাছ থেকে নেমে এসো।" একটু হতাশ হয়ে নেমে এলাম, বললাম "আমি গাছের উপর আছি তা তুমি টের পেলে কেমন করে?" মিতু হেসে বলল "কেবল আমি টের পাইনি, কাছাকাছি যত পশুপাখী আছে তারা সবাই টের পেয়েছে"। আপত্তি করে বললাম "তা কেমন করে সম্ভব, আমি খুব সাবধানে গাছে চড়েছি, একটুও শব্দ করিনি।" মিতু বলল "শব্দ করোনি ঠিকই, তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছে তোমার ঐ সাদা কাপড় জামা। শোনো কমল, জঙ্গল বড় ভয়ঙ্কর জায়গা, এখানকার অধিবাসীরা একজন আর একজনকে পাকড়াও করবার জন্যে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়, একজন আর একজনকে পেলেই খায়। তবু খুব কমই ধরতে পারে, কেন জানো? ভগবান তাদের এমন রূপ ও রং দিয়েছেন যাতে জঙ্গলের আলোছায়ো, গাছপালা, পাথর মাটির সঙ্গে বেমালুম মিশে যায়, চট্‌করে চোখে পড়ে না। বাঘের হলুদের উপর কালো ডোরা, হরিণের লালচের উপর সাদা ফুটকি আলোছায়ার সঙ্গে মিশে যায়। পাখীদের রং কারো কচিপাতার মত সবুজ, কারো শুকনো পাতার মত পাটকিলে; বনমুরগীর হচ্ছে লালচে মাটির রং, মাটির সঙ্গে মিশে যায়, তিতিরের ডানায় সাদায় ছিট সোপে ঘাসে লুকোতে পারে। তুমি কিন্তু পার না।" বললাম "তাহলে তুমিও পার না।" শুনে হাসতে লাগলো মিতু, তারপরে বলল "তোমাতে আমাতে অনেক তফাৎ কমল, তুমি শহরের ভদ্রলোক, আমি জঙ্গলের জংলী। আমি প্রায় পশুপাখীদের মতই। দেখছো না, গা খালি, জুতো কখনো পরি না, কাপড় বলতে দা তা এত ছোট ও এত ময়লা যে কারো চোখে পড়ে না, আমি জঙ্গলের আলোছায়া রোদবাতাসের সঙ্গে মিশে যাই, সাদা কাপড় জামা তোমাকে আলাদা করে রাখে"। মানতে হোলো কথাটা। এই সব যুক্তি-তর্কের মধ্যে আসল কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম "বাঘের বাচ্চার কোন খবর পেলে?" মাথা নেড়ে মিতু বলল "না, খুঁজে পেতে দেখলাম সে এদিকে নাই।" "এখন তাহলে কি করবে?" "বাড়ী ফিরে যাব, তাকে আর পাব না, মাকে খুঁজতে খুঁজতে হয় দূরে চলে গেছে, না হয় মরে গেছে।" শুনে মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে এলাম দুজনে।

পরদিন সকালবেলা বাইরে বসে রোদ পোয়াচ্ছি এমন সময় মিতু ছুটে এসে আমার হাত ধরে টেনে বলল "চলো"। হঠাৎ এই তাগিদের অর্থ বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞাসা করলাম "কোথায় যাব?" মিতুর যেন তর সইছে না, বলল "আমাদের পাড়া। চলো তাড়াতাড়ি।" যেতে হোলো। সাঁওতাল পাড়ায় ঢুকে মিতু তার বাড়ীর পাশ কাটিয়ে আর একটা বাড়ীর দিকে চলল। সাঁওতালের বাড়ী মানে একখানা ছোটো ঘর, তার দেওয়াল মাটির, চাল খড়ের, সামনের উঠোনটুকু বাঁশের উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। উঠোনে ঢুকে মিতু ডাকলো "কই গো কেনার মা।" ডাক শুনে ছেলে কোলে নিয়ে একটি আধাবয়সী স্ত্রীলোক ঘর থেকে বেরিয়ে

এলো। মিতু বল্ল "খুড়িটা বার করো একবার কমল দেখবে।" কেনার মা আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো, একটু পরে ঘরপোশধরা জাল দিয়ে ঢাকা একটা বড় খুড়ি এনে উঠোনে রাখলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো মিতু, আমিও গেলাম। কেনার মা খুড়ির মুখ থেকে জাল সরিয়ে নিতেই আমি দেখলাম একটি ছোট্ট জানোয়ার ভটিশুটি খুড়ির মধ্যে বসে আছে। মিতু হাত বাড়িয়ে আস্তে করে সেটা তুলে নিয়ে আমার সামনে ধরলো। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলাম, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম সেই পশু-শিশুকে, বড় বড় দুটো চোখ, ছাই রং এর শরীরের উপর চাকা চাকা কালো ছাপ। আনন্দে বুকটা ভরে উঠলো, তার মাথার উপর আলগোছে আমার হাতখানা রাখলাম, জীবনে প্রথম স্পর্শ করলাম বাঘের বাচ্চা।

কেমন করে বাচ্চাটিকে পেলো সে কথা বলতে লাগলো কেনার মা। পাড়ার আরো কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে সে দূরের জঙ্গলে গিয়েছিল হরিতকী আর আমলকী সংগ্রহ করতে। সারা দুপুর জঙ্গলে ঘুরে বিকেলবেলা গাঁয়ে ফিরে আসছে, মাই (মদী) পার হয়ে এপারে এসেছে, হঠাৎ দেখে পথের এক পাশে বাচ্চাটা বসে আছে। প্রথমে ওরা ভেবেছিল খরগোশ, কাছে এসে চিনতে পারলো চিতে বাঘের বাচ্চা বলে। তুলে নিয়ে খুড়িতে বসিয়ে তারা ছুটতে লাগলো, ভাগ্যিস বাঘিনী কাছে ছিল না, তাই তারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে। মিতু বল্ল "ওর মা বেঁচে নেই গো, সেদিন সেটাকেই তো গাঁয়ের শিকারী মেরেছে।" শুনে কেনার মা কপালে চোখ তুলে বল্ল "তাই বলো, তা না হলে বাঘের বাচ্চা ঘরে আনতে পারি! মিতু বাচ্চাটা বুকের কাছে তুলে নিয়ে বল্ল "তুমি এটা কি করবে গো কেনার মা? "কেন, বাজারে নিয়ে বেচবো" জবাব দিল কেনার মা। আমি মিতুকে বল্লাম "কত দাম চায় জিজ্ঞাসা করো।" আমার কথা বুঝতে পেরে কেনার মা বল্ল "দু টাকা নেব। বাজারে নিয়ে গেলে বেশিদামে বেচতে পারি, কিন্তু তুমি যখন চাইছো তখন দুটাকা দিও।" অনেক দরকষাকষি করে এক টাকায় রফা হোলো। ছুটে গিয়ে তখুনি টাকাটা এনে দিলাম।

এইবার ভাবনায় পড়লাম। বাঘের বাচ্চা বাড়ী নিয়ে গেলে আমি কি খাওয়াব আর মামাই বা কি বলবেন! মিতু সমস্যার সমাধান করে দিল, বল্ল "আমার কাছে থাক।"

শিক্ষার লক্ষ্য : ব্যক্তি না সমাজ

শ্রীকালিদাস বসু

"Central to the debate is the question whether the aims of education should be stated in terms of the individual or in frankly social terms"

[Education : Chambers's Encyclopaedia (New Edition), Vol. 4]

শিক্ষার লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে আজ অবধি যত ধরণের মতের জন্ম হয়েছে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় : শিক্ষাকে মূলতঃ দুটি বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে—একটি ব্যক্তির দিক থেকে, অপরটি সমাজের দিক থেকে।

এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে রয়েছে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ যুক্তিকোণ—ব্যক্তির জন্যে সমাজ, না সমাজের জন্যে ব্যক্তি। এই মৌল প্রশ্ন দুটিকে ভিত্তি করে দুটি বিপরীতমুখী দর্শন গড়ে উঠেছে, তাদের মৌলিক সমস্যা হল : ব্যক্তির উন্নতি বনাম সমাজ কল্যাণ।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে যত মতভেদই থাক না কেন, অন্ততঃ একটি ব্যাপারে একমত হওয়া যায়—নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শিক্ষার লক্ষ্য জীবনের লক্ষ্যকেই অনুসরণ করে ; শিক্ষার লক্ষ্য জীবন-ভিত্তিক। জীবনের যেমন কোন চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধেও তেমনি কোন চরম কথা বলা সম্ভব নয়। জীবন সম্পর্কে যেখানে কোন সিদ্ধান্তই স্থায়ী নয়, শিক্ষার লক্ষ্য সেখানে শাশ্বত স্থির থাকতে পারে না।

শিক্ষা জীবনের অনুগামী—দেশ ও কালের সীমাবদ্ধ। জীবন-দর্শনের অভিব্যক্তি ঘটে তাই শিক্ষা-দর্শনে—শিক্ষা-দর্শন জীবন-দর্শনের সক্রিয় একটি দিক। আর জীবন—সে হল একটি প্রক্রিয়া, —ক্রিয়াশীলতা, বিকাশমুখী অগ্রগতি। জীবন চলমান, সেই সঙ্গে শিক্ষাও চলিষ্ণু।

জীবন—সে হল 'পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন'। একদিকে জীবন, আর অন্য দিকে পরিবেশ—সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে চলে আসছে এই আদান-প্রক্রিয়া। পরিবেশের সঙ্গে যারা নিজেদের অভিযোজন করে নিতে পারেনি তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। আর যারা তা পেরেছে কেবল তারাই অভিযোজনের নানা পরিবর্তনের ধাপ পেরিয়ে আজও টিকে আছে। এই ভাবে জীবন সব সময়ে অভিযোজন করে চলেছে, আর শিক্ষা চলেছে তার অভিযোজন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে।

জীবন-অভিযোজনের এই সমস্যাটিকে দুটি পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা যেতে পারে, আর দেখাও হয়েছে তাই,—একটি ব্যক্তির দিক থেকে, অন্যটি সমাজের দিক থেকে। শিক্ষায় যারা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বেশী মূল্য দিয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে শিক্ষার লক্ষ্য হল : 'ব্যক্তিত্বের বর্ধণ' ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের চর্চা। আবার অন্যদিকে শিক্ষায় যারা সমাজ ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয় তাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত : 'ব্যক্তির সামাজিকী করণ'। শিক্ষায় এই লক্ষ্য-চিন্তার অনিবার্য পরিণতি হল : শিক্ষাকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ধারায় চালিত করতে হবে, না সমাজমানসিকতার খাতে বহাতে হবে—মানুষের জন্য সমাজ, না সমাজের জন্য মানুষ—এই ধরণের বিপরীতধর্মী মতের মধ্যে আদর্শগত সংঘর্ষ, শিক্ষা-চিন্তার দার্শনিক সংঘাত।

শিক্ষায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য হল :

ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। ব্যক্তি মানুষের সত্তা, তার সুপ্ত ক্ষমতাকে বিকশিত করে তোলাই প্রকৃত শিক্ষা—প্রকৃত শিক্ষা ব্যক্তির অন্তর-ক্ষমতাকে জাগ্রত করে তোলে, মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায়। এদের বিশ্বাস, ব্যক্তির বিকাশ, তার অগ্রগতি সমাজ-নির্ভর নয়—তা সমাজ নিরপেক্ষ। এই ধারণা এদের তাই শিক্ষায় করে তুলেছে সমাজ বিমুখ।

অন্যদিকে, শিক্ষায় যাদের সমাজতন্ত্রবাদে আস্থা আছে তাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হল : মুখ্যতঃ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ-বিচ্ছিন্ন একক-ব্যক্তিত্বের কোন অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তির বিকাশ সমাজ-নির্ভর, তার উন্নতি সমাজ-সাপেক্ষ।—সমাজের উন্নতিতেই তার উন্নতি, সমাজহীন ব্যক্তিত্ব ছিন্নবৃন্ত পুষ্পের মত। ব্যক্তিকে তাই সমাজের অনুকূলে পরিপূর্ণ সত্তায় প্রস্তুত করে তোলাই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত (ব্যক্তিত্বের বিকাশের কথাও বটে !)। এই সমাজমুখীনতা শিক্ষাক্ষেত্রে এদের করে তুলেছে (অংশতঃ) ব্যক্তি বিমুখ।

আসলে ব্যক্তি নিয়ে যেমন সমাজ—ব্যক্তির প্রয়োজনে যেমন সমাজ, তেমনি আবার সমাজেরই সে একজন, সমাজের মধ্যেই তার ব্যক্তিত্ব তার অগ্রগতি। ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে কেবল সমাজের দাবী পূরণ করা যেমন শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না, আবার সমাজকে পুরোপুরি অস্বীকার করে তেমনি আত্মমুখী ব্যক্তিত্বের চর্চাও শিক্ষার লক্ষ্য নয়।

ব্যক্তি নিয়ে যেমন সমষ্টি, সমষ্টির মধ্যেও তেমনি আবার ঐ-ব্যক্তি—বাস্তবে, এরা একে অপরের বিপরীত নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক, পরস্পর এরা অন্তর-সম্পর্কে যুক্ত। কাজেই, শিক্ষার লক্ষ্য কেবল ব্যক্তি, বা কেবল সমাজ—কোন একটি নয়, উভয়ই—ব্যক্তি ও সমাজ। অর্থাৎ, শিক্ষার একটি লক্ষ্য ব্যক্তিগত, অপরটি সমাজগত। একটি ব্যক্তিকে ঘিরে অপরটি ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমাজকে নিয়ে—দুইয়ে মিলে 'একক'।

তাহলে এখন এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে সমাজের একজন সদস্য হিসাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবু এখনও সমস্যা থেকে গেল,—সমস্যাটা হল ব্যক্তির উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তাকে সমাজের অগ্রগতিতে নিয়োজিত করা। প্রশ্নটিকে আরও তীক্ষ্ণ করে রাখলে দাঁড়ায় : ব্যক্তি স্বার্থ বনাম সমাজ চাহিদা। সমস্যাটিকে ব্যক্তি কল্যাণের প্রশ্নের সঙ্গে সমাজ প্রগতির ব্যাপারটিকে মিলিয়ে দেখা,—তার মধ্যে একটা তারতম্য আসা। এই দেখাটা একটা সামগ্রিক দেখা,—তা না হয়ে যখনই যে-কোন-একটার ওপর বেশী ঝোঁক গেছে, চাপ পড়েছে একটা দিকে তখনই হয়েছে বিপদ, দেখা দিয়েছে সংকট। কেন না, সেই দেখা—কোন একটাকে বাদ দিয়ে কেবল-বাকি-একটাকে দেখা, সেটা তাই সম্পূর্ণ নয়, আংশিক দেখা। ফল একদেশদর্শীতা, পক্ষপাতিত্ব।

ইতিহাসে এমন বহু নজির আছে। ব্যক্তিত্বের চাপে যখনই সমাজজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তখনই শোনা গেছে রাষ্ট্রের অয়গান ধ্বনিতে হতে। যেমন উগ্র-ব্যক্তিত্বের সন্ত্রাসে হেগেলীয় দর্শনে দেখা দিয়েছে সমষ্টির জয়গান। আবার, সমষ্টির উদ্ভূ অসত্তা যখন উৎকট হয়ে উঠেছে তখনই দেখা দিয়েছে কাণ্টের 'অতিমানব'-এর পদসঞ্চার। যুগে যুগে মানুষ এমনভাবে আত্মবিকাশের পথ খুঁজেছে কখনও ব্যক্তির মধ্যে, কখন-বা সমষ্টির মধ্যে।

এই দুই মতের মধ্যে সামঞ্জস্য করে শিক্ষার একটা সঠিক লক্ষ্য নির্ণয় করা দরকার। কারণ : 'If we eliminate the *Social factor*

from the child we are left only with an abstraction ; if we elimiate the *individual factor* from society, we are left only inert and lifeless mass.' (John Dewey)। এই কথাটা আবার অন্যভাবেও বলা যায়,—ব্যক্তিকে পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তোলার, তাকে পরিস্ফুট করার সমস্ত সুযোগ —সুবিধা করে দেয় সমাজ তার নিজের ব্যক্তির কল্যাণে, তার উন্নতির দিকে তাকিয়ে। সমাজের অনুকূল পরিবেশে সমস্ত সুবিধা-অসুবিধার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার সামঞ্জস্যতা পায়,—ব্যক্তির অগ্রগতির মধ্য দিয়ে সমাজ অগ্রসর হয়, তার মহত্ত্বের মধ্য দিয়েই সমাজ আরও মহত্তর হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি মানেই সামাজিক ব্যক্তি, আর সমাজ মানে 'ব্যক্তির মৈত্রীসৃষ্টি'। সমাজের প্রভাব যেমন ব্যক্তির ওপরে প্রতিনিয়ত পড়ছে, আবার ব্যক্তির দ্বারাও তো সে সমানভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। সমাজ আছে বলেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য, ব্যক্তি আছে বলেই সমাজের অস্তিত্ব। আসলে, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের প্রতিকূল নয়, অনুকূল অনুপূরক।

এখন শিক্ষার লক্ষ্য যদি হয় পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন তবে তার ক্ষেত্রে স্থাপন করতে হবে একদিকে ব্যক্তি, অন্যদিকে সমাজকে। ব্যক্তির দিক থেকে বিচার করতে হবে তার স্বভাব ও সামর্থ্যের প্রশ্ন ; আর সমাজের দিক থেকে চিন্তা করে দেখতে হবে তার চাহিদা ও সুযোগের কথা। ব্যক্তির দিক থেকে শিক্ষার লক্ষ্য হল : 'ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ।' আর, সমাজের দিক থেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল : ব্যক্তির মধ্যে 'সামাজিক উপযুক্ততা' সৃষ্টি করা। 'ব্যক্তি হিসাবে মানুষ' ও 'সমষ্টি হিসাবে মানুষ'—এইভাবে মানুষকে দু'দিক থেকে গড়ে তোলাই হল প্রকৃত শিক্ষার কাজ, তবেই তার মধ্যে তৈরী হবে হ্যাব্‌হাইমের 'wholeness of the person'। তার জন্যে চাই শিক্ষাকে ব্যক্তির ও ব্যক্তিকে সামাজিক করা, আর সমাজকে করা চাই মানবিক।

২

রবীন্দ্র তত্ত্বে শিক্ষা

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

জাতির চিত্ত ঐশ্বর্যের বেদীমূল যাতে সুদৃঢ় ও সুসংহত হয় তার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত শিক্ষার আদর্শ তৎকালে প্রচলিত শিক্ষার সকল নিয়ম ও তত্ত্বকে অতিক্রম করে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছিল ভারতের একটি স্বকীয় অথচ যুগে যুগে অবহেলিত পন্থরেখা, যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর কাছে বয়ে এসেছিল হয়ত কোনো সুদূরকালে উচ্চারিত কয়েকটি মুক্ত মনের প্রতিধ্বনিতে। সে যুগে শিক্ষা জাতির প্রাণশক্তির প্রবাহকে বহাবার, সৃজনশীল প্রতিভাকে লালিত ও উন্মেষিত করার কোন প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম ছিল। জাতির জীবনে পরম উচ্চার্থ ও মহৎ লক্ষ্যের বীজ বপন করবার জন্য তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলবার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন।

দেয়ালের বেষ্টনী আর টেবিল চেয়ারের ছক-ফেলা পরিবেশের মধ্যে যে শিক্ষা তা তাঁর কাছে ছিল এক প্রাণধর্মের বিপরীত অস্বাভাবিক আয়োজন।

"কারণ প্রকৃতির থেকে মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার স্বাভাবিক নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে"।

এই কৃত্রিমতা এবং পীড়াপ্রদ শিক্ষারীতির ব্যাপক অনুমোদনের মধ্যে তিনি একটি স্বতন্ত্র এবং স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

"সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়; প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মানুষ করে তুলব। ...সাধারণ শিক্ষা আমি পাইনি, তাতে অতিরিক্ত ছিলুম না। আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে।"

শিক্ষার মধ্যে এই আনন্দকে বিচিত্রভাবে আহরণ করার সঙ্গে একটি বৃহত্তর আদর্শকে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের আরেকটি প্রধান উপলক্ষ্য।

"এখনকার শিশু শিক্ষার আর একটি দিক আছে। সেটা হচ্ছে—জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য—ছোটো ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশে সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, যা মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। সবচেয়ে বড়ো যা আদর্শ মানুষের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে।"

এমনি এক আদর্শ শিক্ষাধামের ভূমি রচনার উদ্দেশ্যে একদিন রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির নির্জন একাকিত্বের মাঝখানে থেকে সাহিত্য চর্চায় ডুবে থাকার কামনা পরিহার করে চলে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রম গড়তে। তারপর কয়েকটি যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যথার্থ এবং প্রকৃত শিক্ষার ভিতর দিয়ে জাতির মানসে এমন একটি সর্বাঙ্গীণ রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন যা জাতীয় জীবনে এক অবরুদ্ধ প্রাণবন্যাকে নির্মুক্ত করবে। এক বা দুই মুসাবসানে দেশে এক নবীন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হবে যারা জানবে যা মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই।

কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ মনে হয় এদেশের শিক্ষা প্রবাহেরা কবির আদর্শকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেননি, তাঁর সাধনাকে বুঝবার বা আরও গভীর-ভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন নি।

শিক্ষার চরম সার্থকতার বিচারে শিক্ষার আধার

অর্থাৎ মানুষের মনোভূমিতে নূতন ও মহত্তর সৃষ্টি করা, চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করা, জীবনের আদর্শ-মূলে ভারতীয় সাধনার বৃহত্তর লক্ষ্যগুলিকে স্থাপন করা—এইগুলি অপেক্ষা মানুষের সমাজের জটিল কর্ম এবং কারিগরীতে উপযুক্ত ও কর্মপটু করার দিকে ঝোঁকটা পড়েছে বেশী। মানুষের অন্তরে উন্নত হওয়ার আদর্শের বদলে বাইরে সমাজের আপেক্ষিক মূল্যের জগতে কি করে আপনাকে অধিকতর মূল্যবান করে তোলা যায়—সেইটেই চরমত্ব লাভ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যক্ষ ফল বাঙ্গালী জাতির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেভাবে অধুনা ফুটে উঠেছে তাতে জাতির চিত্তজগতে এক গভীর দৈন্য দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠছে। সাংস্কৃতিক মান নেমে যাচ্ছে ক্রমশঃ; যে আনন্দলোকের অধিকারী হওয়ার আশ্বাস ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায়, তা থেকে বহু দূরে সরে এসে বর্তমানের আদর্শ অত্যন্ত তুচ্ছ, সাময়িক এবং সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

শিক্ষার লক্ষ্য যদি কেবলমাত্র মানুষকে কল-কারখানায় কাজ করার পটুত্ব অর্জন করতে সুশিক্ষিত করে তোলা না হয় অথবা অফিস কাছারী যানবাহন সমাকীর্ণ সমাজের কর্মযোগের বিরাট প্রাঙ্গণে কর্মকুশলী করে তোলা না হয়—যদি শিক্ষার বৃহত্তম এবং গভীরতম লক্ষ্য হয় মানুষকে পরিণত করা, কোনো এক মহৎ রূপান্তরের সম্ভাবনা সার্থক করে তোলার মধ্যে, যে শিক্ষা বাইরের বাহুল্যে প্রকাশিত নয়, জীবনকে সৌন্দর্যে রূপদানের মধ্যেই যা সার্থক,—তাহলে পৃথিবীব্যাপী মানুষের শিক্ষার লক্ষ্যকে বলা যায় যে মানুষের সংস্কৃতির সাধনা। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতি কি তা বর্ণনা করে বলেছেন, 'যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অমুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ধারন করে নেয়। ...সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীত, বাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত সাধনার জন্যে যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করবো।'

কবি রবীন্দ্রনাথ একদিন আসন নিলেন শুচি পাঁচ ছয় ছেলের মাঝখানে, তাদের শিক্ষকরূপে। এই শিক্ষকতা হল তাঁর সাধনার উন্মেষের পথ। সেই সাধনার বাণীটিই যেন তিনি বেশী জোর করে কোটাতে চেয়েছিলেন তাঁর বিরাট জীবনকর্মের শেষ পর্যায়ে।

শিক্ষার যথার্থ রূপ, শিক্ষকের কর্তব্য ও আদর্শ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে মৌলিক তত্ত্বগুলির উপর লক্ষ্য স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব তিনি আরোপ করেন শিক্ষাকে জীবনের সকল বিকাশের অঙ্গীভূত করার প্রশ্নে। জীবনের ক্রমবিকাশের প্রতি পর্যায় মানুষের সমগ্র সত্তার রূপান্তর ঘটানোর একান্ত লক্ষ্যে। এই রূপান্তরের ছাত্রদের মধ্যে আনবেন শিক্ষক, সেজন্যে তাঁর নিবিষ্ট সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনা তাঁরও নিজের রূপান্তরের সাধনা, আপনার জীবন ক্ষেত্রে নিহিত উন্মেষের বীজকে অঙ্কুরিত হতে দেওয়ার সাধনা।

নিজেকে দিয়ে ফেলার চেয়ে নিজেকে পাওয়ার লোভ এই সাধনার আকাঙ্ক্ষা! শিক্ষার এই পূর্ণ-যোগে তিনি আনতে চেয়েছিলেন বিরাট এবং মহান বিশ্ব প্রকৃতির শিক্ষার সমৃদ্ধ সংযোগকে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে অন্তরবোধের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যে সম্প্রীতি ও পরিচয়ের সেতুবন্ধন হয়, তার ভিতর দিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রাণসত্তের ঐক্য সাধিত হয় এবং চেতনার স্বাভাবিক উন্মীলন ঘটে। এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শে প্রণোদিত প্রত্যেকের উপলব্ধি করা উচিত।

ছুটি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

এবারে যেদিন হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফল বাহির হয়—উত্তর কলিকাতার কোন এক স্কুলের ফল সন্তোষজনক হওয়াতে (মোট শতকরা ৮০ জন উত্তীর্ণ) উক্ত স্কুলের ছাত্রেরা স্কুলের ছুটি দিবার জন্য দরখাস্ত করে; কর্তৃপক্ষ (বর্তমানে এডমিনিষ্ট্রেটর) তৎক্ষণাৎ উহা মঞ্জুর করেন। তিনি কি বিবেচনা করিয়া উহা মঞ্জুর করিলেন জানি না সম্ভবতঃ তাঁহার আতঙ্ক হইয়াছিল যে, ছুটি মঞ্জুর না করিলে ছাত্রদলের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে, এমন কি তাহারা 'ষ্ট্রাইক'ও করিতে পারে। পরে স্কুলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এক বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত আলোচনা কালে বলিয়াছিলাম, কলিকাতার যে স্কুলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক ফল (বিজ্ঞানে প্রথম ও অষ্টমস্থান) হইয়াছে তাঁহারা কি একদণ্ডাহ ছুটি দিলেন? বন্ধু ইহার কোন উত্তর দেন নাই; কিন্তু তিনি হাসিবার পাত্র নহেন; বলিলেন "ছুটির আনন্দে ছেলেরা হৈ হৈ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, ইহার দ্বারা স্কুলের সন্তোষজনক ফল পাওয়ার পাওয়া বিশেষভাবে প্রচারিত হইল, এবং ইহাতে স্কুলের খ্যাতি বৃদ্ধি পাইল।" বন্ধুর এই কথায় নীরব রহিলাম এবং ভাবিলাম আমরা বর্তমানে ত সকল বিষয়েই প্রচার কার্যের গুরুত্ব দেখিতেছি। প্রচারের চোটে কি না ঘটিতেছে! প্রচারের প্রভাবে সত্য মিথ্যা হইতেছে, মিথ্যা সত্য হইতেছে!

আমিও কয়েকটি স্কুলের সহিত জড়িত ছিলাম; এইরূপ অনুরোধে আমাকেও স্কুলের ছুটি মঞ্জুর করিতে হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি এইরূপ অনুরোধে ছাত্রছাত্রীরা ছুটির জন্য যে দরখাস্ত করে তাহা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পূর্বে জানে না, ছুটি হইলে জানিতে পারে যে কি কারণে স্কুলের ছুটি হইল। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের নিকট পরে আবিয়াছি যে তাহারা এই ছুটি সমর্থন করে না; কেহ কেহ এইরূপ ছুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। এখনও বলিয়াছে "স্কুলে ত পড়ার বই পড়ানো শেষ হয় না, তার ওপর এইসব ছুটি কেন! এখন হঠাৎ বাড়ী ফিরিয়া কিভাবে সময় কাটাইব, পড়াতে মন বসিবে না, নিদ্রা ছাড়া সময় কাটাইবার আর কোন উপায় নাই।" অনেক ছাত্রী বলিয়াছে "ছেলেরা এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে, আড্ডা দিতে পারে, সিনেমা বা খেলাধূলা দেখিতে যাইতে পারে, আমরা কি করিব?" অবশ্য অনুরূপ উদাহরণও আছে, তবে বিরল, যেখানে ২।৩ জন ছাত্র কোন ছাত্রের বাড়ীতে যাইয়া এইরূপ ছুটিতে লেখাপড়ার চর্চা করে। ছাত্রীদের মধ্যেও এই দৃষ্টান্ত আছে।

কখনও কখনও শিক্ষক ও শিক্ষিকারা এইরূপ অনুরোধে ছুটির দরখাস্ত করেন, এ ক্ষেত্রেও সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকার সমর্থন থাকে না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের দরখাস্ত করিবার জন্য উস্কাইয়া দেন।

ছুটির নির্দিষ্ট তালিকা ছাড়া অনেক রকম অনুরোধে পূর্ণ ছুটি বা অর্ধ ছুটি দেওয়া হয়। কিন্তু ছুটির পূর্বে কি উদ্দেশ্যে ছুটি দেওয়া হইল এবং সেই উদ্দেশ্য ছাত্র ছাত্রীরা কি ভাবে পালন করিবে তাহা তাহাদিগকে বিশদভাবে বলা হয় কিনা এবং পরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মোটামুটি শতকরা কয়জন সেই উদ্দেশ্য পালন করিয়াছে তাহা খোঁজ লইবার ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। প্রসঙ্গক্রমে একজন ৭২

বৎসর বয়স্ক বিশিষ্ট বন্ধু বলিলেন যে, তাঁহারা যখন অর্থাৎ ৬০ বৎসর পূর্বে পল্লী অঞ্চলের কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন ছুটির আবেদন করিলে তাঁহাদের ৮০৲ টাকা মাহিনার প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছুটি মঞ্জুর করিবার সর্ত বলিয়া দিতেন এবং সেই সর্ত তাঁহাদের পালন করিতে হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলিলেন, কোন এক প্রসিদ্ধ বাগ্মীর বক্তৃতা শুনিতে যাইবার জন্য তাঁহারা (উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা) ছুটির আবেদন করিয়াছিলেন ; প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁহাদের এই সর্তে ছুটি দিয়াছিলেন যে, বক্তৃতার সারাংশ লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। তাঁহারা এই সর্ত পালন করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। আমারও মনে আছে পল্লী অঞ্চলে যখন মাইনর স্কুলে পড়ি তখনও আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় সাধারণতঃ এইরূপ কোন সর্তে ছুটি মঞ্জুর করিতেন। একবার স্থানীয় মেলা দেখিবার জন্য ছুটির আবেদন করিয়াছিলাম ; তাঁহাকে মেলা সম্বন্ধে রচনা লিখিয়া দেখাইতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উক্ত বন্ধু আরও বলিলেন যে তাঁহাদের বিদ্যালয়ে প্রত্যেক মাসে একটি সাহিত্য সভা হইত ; সেই সভায় ছাত্রদের রচনা পাঠ, আবৃত্তি প্রভৃতির আয়োজন থাকিত সভায় মাননীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য সাহিত্যানুরাগী পদস্থ সরকারী কর্মচারী উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রচনা পাঠ করিতেন ও আবৃত্তিও করিতেন। কিন্তু ৮০৲ টাকা মাহিনার প্রধান শিক্ষক মহাশয় সেই সভায় পৌরহিত্য করিতেন ; তখন হইতেই আমরা শিখিয়াছিলাম প্রধান শিক্ষকের স্থান সকলের উপরে। এই দৃষ্টান্ত এখন আছে কি ? আজকাল অহরহ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টান্ত ঘটিতেছে।

যে কথা বলিতেছিলাম সেই সূত্রে বলি যে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে যে ছুটি দেওয়া হয়, সেই ছুটি ছাত্র ছাত্রীগণ প্রধানতঃ আমোদ প্রমোদে বৃথা কাটায়। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়।

ছুটির প্রয়োজন আছে অস্বীকার করি না। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলি। বিদেশে চাকরী করিতাম, একবার ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসি, এবং তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কলিকাতায় আসিয়াছ কেন ?" আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম, সম্প্রতি খুব পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, কিছুদিন বিশ্রামের জন্য ছুটি লইয়াছি," তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "what is the definition of holiday." আমি নিরুত্তর রহিলাম তিনি বলিলেন "কি তাস খেলবে, ফুটবল খেলা দেখবে ?" আমি তখনও নিরুত্তর : তখন তিনি বলিলেন, "আমার ছুটির definition হোল change of work is a holiday. যখন হাইকোর্টের কাজে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে মনোযোগ দিই, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে পরিশ্রান্ত অনুভব করি তখন এসিয়াটিক সোসাইটির কাজে নিজেকে নিযুক্ত করি। তুমি তোমার নিজের দৈনন্দিন কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, তুমি ছুটিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে ফেলো।" তিনি বলিলেন "বিশ্রামও হবে, জ্ঞান অর্জনও হইবে"।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহার ছুটির এই অমূল্য সংজ্ঞা কোন বিদ্যালয়ে প্রচার করা হইয়াছে কি ?

———

জিলা স্কুল বোর্ডের সম্পাদক

(Secretary, District School Board)

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাসগুপ্ত

জিলা স্কুল বোর্ডের কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার ভার রহিয়াছে জিলা স্কুল বোর্ডের সম্পাদকের উপর। জিলা স্কুল বোর্ড সভাপতি, সহ সভাপতি সম্পাদক ও কতিপয় সদস্য লইয়া গঠিত। সভাপতি, সহ সভাপতি ও সদস্যগণ অবৈতনিক। প্রতি জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক এই এই জিলা স্কুল বোর্ডের সম্পাদক। সুতরাং তাঁহাকে জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজ ছাড়াও অতিরিক্ত স্কুল বোর্ডের সম্পাদকের কাজ করিতে হয়। মূলতঃ স্কুল বোর্ডের সকল কাজ তাঁহাকেই করিতে হয়। জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজ অপেক্ষা অনেক অধিক সময় তাঁহাকে স্কুল বোর্ডের কাজে ব্যয় করিতে হয়। স্কুল বোর্ডের সম্পাদক হিসাবে তাঁহার করণীয় কাজ অনেক।

প্রথমতঃ, হাসাকালে প্রাথমিক বিদ্যালয় এই জিলা স্কুল বোর্ডের অধীন। প্রতি জিলা স্কুল বোর্ডের অধীনে বেড় হইতে দুই হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকে এবং শিক্ষকসংখ্যাও প্রায় চার হাজার হইয়া থাকে, সকল শিক্ষকই যে বিনয়ী ও কর্তব্য-পরায়ণ হইবেন, আশা করা যায় না। যাঁহারা বিনয়ী বা কর্তব্যপরায়ণ হন না, সম্পাদক তাঁহাদের ভালবাসা দ্বারা বুঝাইয়া বিনয়ী ও কর্তব্যপরায়ণ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহাকেও ধীর স্থির শান্ত বিনয়ী সহিষ্ণু ও ক্ষমা-সুন্দর হইতে হয়। হইতে হয় তাঁহাকে তেজস্বী, অন্যায়ের প্রতিরোধ-করে সচেষ্ট ও যত্নশীল।

তাঁহাকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয় প্রাথমিক শিক্ষকদের কল্যাণের দিকে। প্রাথমিক শিক্ষকরা অধিকাংশই দরিদ্র। তাঁহারা যাহাতে নিয়মিতভাবে বেতন পান সেইদিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়, তাঁহারা জানেন নিয়মিত বেতন না পাইলে তাঁহাদের কষ্টের অবধি থাকে না। আর পরিদর্শক নির্ধারিত দিনে শিক্ষকদের মাহিনার বিল স্কুল বোর্ডে জমা দিলেন কিনা, স্কুল বোর্ড হইতে বিল পাশ হইয়া চেক ও মণিঅর্ডারসহ বিল পোষ্ট অফিসে জমা হইল কিনা এবং জমা হইয়া পোষ্ট অফিসে অযথা পড়িয়া রহিল কিনা সম্পাদকের উহা তদারক করিতে হয়। শুধু তাহাই নয়, পোষ্ট অফিসে পড়িয়া থাকিলে পোষ্ট অফিসের উপরওয়ালাকে বলিয়া সত্বর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

সম্পাদকের আর একটী বড় কাজ, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা। পরিদর্শক-গণ যাহাতে তাঁহার এলাকাস্থিত সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় বৎসরে দুইবার, সম্ভব না হইলে অন্ততঃ একবার পরিদর্শন করেন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে একই স্কুল বৎসরে কয়েকবার পরিদর্শন হয় আবার অনেক স্কুল আছে যাহা তিন চার বৎসরের মধ্যে দূরবর্তী দুর্গম স্থান বলিয়া একবারও পরিদর্শন হয় না। তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হয় যেন সেইসকল বিদ্যালয়গুলি ও অন্য সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অন্তর পরিদর্শক প্রতি বৎসর পরিদর্শন করেন। তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে অন্তর পরিদর্শকদের এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যত্নবান হইতে আদেশ দেন। প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের

মূলে রহিয়াছে মন মন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন। পরিদর্শন অর্থ শিক্ষকদের ত্রুটি ধরা নয়। ত্রুটি সংশোধন করা পরামর্শ ও উপদেশ প্রদানের প্রতিই সমাধিক মনোযোগ দিতে হইবে। বিদ্যালয় পরিদর্শক নিছক তত্ত্বাবধায়ক না হন। তিনি শিক্ষকদের বন্ধু, গুরু ও উপদেষ্টারূপে উন্নততর ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্কুল পরিদর্শক ও জিলা স্কুল বোর্ডের সম্পাদক হিসাবে এই সকল তাঁহাকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত সহানুভূতিপরায়ণ, গঠনমূলক ও বিবেকসম্মত হইয়া থাকে। যিনি শিক্ষক ও জনগণের অন্তরে ভীতি ও বিরক্তির সৃষ্টি করেন তিনি কখনও শ্রেষ্ঠ পরিদর্শক ও সম্পাদক নন। পক্ষান্তরে যিনি শিক্ষকগণকে কার্যের সম্বন্ধে উৎসাহ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে ও কর্তব্য পালনে সাহায্য করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ পরিদর্শক ও জিলা শিক্ষা পর্ষদের সম্পাদকের যোগ্য। জিলা স্কুল বোর্ডের কাজ পরিচালনা করিতে গিয়া সম্পাদককে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য সম্পাদক অন্যান্য পরিদর্শকদের সভা (conference) করিয়া থাকেন। অনেক জেলায় দেখা যায় সম্পাদক, বোর্ডের সভাপতি, সহকারী সভাপতিকে এই সভায় আমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সামনে বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হয় এবং অচিরে মীমাংসা হইয়া যায়।

তারপর জিলা স্কুল বোর্ডের শিক্ষক নিয়োগ ও বদলীর ব্যবস্থা সম্পাদককে করিতে হয়। নিয়োগ ও বদলী বিষয়ে সম্পাদক সভাপতি ও বোর্ডের সভ্যদের পরামর্শ নিয়া থাকেন। তাঁহার সুপারিশে বোর্ডের মিটিং-এ উহা পাস করিয়া নিতে হয়। অতঃপর সম্পাদক সেই সকল নিয়োগ ও বদলী পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ 'ইন্টারভিউ' নিয়া যোগ্যতা অনুসারে Panel করিয়া সেই Panel এর Priority অনুযায়ী চাকুরীর জন্য সুপারিশ করিয়া থাকেন। শিক্ষকের পদ খালি হইলে সেই অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করেন। শিক্ষক নিয়োগ ব্যাপারে ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইন্যাল পাস ও ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হইলে সরকারী ট্রেনিং প্রাপ্ত ম্যাট্রিক পাস শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইবেন।

পল্লী অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ শুধু অবর পরিদর্শক পরিদর্শন করেন না, জিলা স্কুলবোর্ডের সভাপতি ও সম্পাদক এবং সভ্যরাও পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

সম্পাদক মধ্যে মধ্যে প্রতি অঞ্চলে যাইয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের, অভিভাবকদের নিয়া সভা করিয়া থাকেন। এই সভা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক ও জনগণের সেবার মাধ্যমেই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সফলতামণ্ডিত করিবে। সম্পাদক বাস্তবধর্মী হইয়া গঠনমূলক প্রয়োগবিধি সহকারে পরিদর্শক কার্য সম্পাদন করিবেন। জনসাধারণের নিকট হইতে তাহাদের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিয়া বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির সমস্যা সমূহ সমাধানে অগ্রণী হন। অভিভাবকগণ যাহাতে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠান সেই বিষয়ে জনগণকে অনুরোধ করিয়া থাকেন। শিক্ষকগণও যাহাতে বিদ্যালয়ে আসিয়া ছেলে-মেয়েদের বিদ্যাদান করেন সেই বিষয়ে জনগণের প্রখর দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যাহাতে হাজিরা ও উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয় ও জিলা স্কুল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত থাকে তাহা সম্পাদককে দেখিতে হয়।

অনেক সময় প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ বড়ে পড়িয়া যায়, বন্যায় ধসিয়া পড়ে অথবা জীর্ণ বলিয়া মেরামতের দরকার হয়। স্থানীয় চাঁদার উপরে

কিছু টাকা দিয়া এই সকল স্কুল গৃহ নির্মাণ ও মেরামতের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে বরাদ্দ অর্থ দিয়া স্কুল গৃহ নির্মাণ ও মেরামত হয় সম্পাদকের তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র ও শিক্ষোপকরণ থাকে না। বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র ও শিক্ষোপকরণ দিবার ব্যবস্থা সম্পাদক করিয়া থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। অভাবের সময় যাহাতে আইনসঙ্গত ভাবে শিক্ষক টাকা তুলিতে পারেন অথবা চাকুরীতে ইস্তফা দিলে তাড়াতাড়ি সেই টাকা পাইতে পারেন তাহাও সম্পাদককে দেখিতে হয়।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে ও শিক্ষকদের সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট হইতে অভিযোগ আসিলে সম্পাদক যতশীঘ্র পারেন তাঁহার পরিদর্শক দ্বারা তদন্তের ব্যবস্থা করেন এবং তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী যতশীঘ্র পারেন যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের স্কুল বোর্ডের সম্পাদক হিসাবে এই ভারে তাঁহাকে কত কাজ করিতে হয়। জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবেও তাঁহার কাজ দিন দিন কত বাড়িয়া যাইতেছে। প্রতি জেলায় কত হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, জুনিয়ার হাই স্কুল নিত্য নূতন হইতেছে। তাহাদের বিভিন্ন রকমের গ্র্যাণ্ট, বিবিধ রকমের সমস্যা তো আছেই। জিলা পরিদর্শকের এই কর্ম বহুলতার পরে তাঁহাকে জিলা স্কুল বোর্ডের সম্পাদকের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উপরও নির্ভর অনেক কাজ করিতে হইতেছে, তাহা ছাড়া জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাঁহাদের অভাব অভিযোগ, সমস্যা রহিয়াছে তাহা শুনিয়া প্রতিকার করিতে হয়। সেইজন্য জিলা স্কুল বোর্ডের কার্য সম্পাদন করিতে প্রতি জেলায় সর্ব সময়ের জন্য একজন সম্পাদক নিযুক্ত করা খুবই প্রয়োজন মনে হয়। তিনি শুধু জিলা স্কুল বোর্ডেরই কাজ করিবেন। একজন এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টরের পদ (Additional District Inspector of Schools) প্রতি জেলার জন্য সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে জিলা স্কুল বোর্ডের সম্পাদকের কার্যভার দেওয়া যাইতে পারে। অথবা জিলা বিদ্যালয় পরিদর্শক নিজে স্কুল বোর্ডের সম্পাদকের কাজ করিয়া অপর বিদ্যালয় পরিদর্শককে হাই, হায়ার সেকেণ্ডারী, জুনিয়ার হাই স্কুল ইত্যাদির পরিচালনা ভার দেওয়া যাইতে পারে। প্রতি জিলা বোর্ডের জন্য একজন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (Assistant Inspector of Schools, attached to the District School Board) থাকেন। তিনি স্কুল বোর্ডের কাজে পারদর্শী হন বলিয়া সম্পাদকের পদ পূরণের প্রশ্ন উঠিলে তাঁহাকেই উক্ত পদে উন্নীত করা বাঞ্ছনীয় হইবে।

কেবলমাত্র প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়াইলে ও শিক্ষক নিয়োগ করিলেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি হইবে না। সম্পাদক হিসাবে বিবিধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উপরও নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রগতি।

রাজা রামমোহন রায় ও শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি, যুগসন্ধিক্ষণের শিক্ষা আলোচনায় আমরা শিক্ষা ইতিহাসের বিশেষ সাড়া পেয়ে থাকি। প্রাচীন শিক্ষাধারার সঙ্গে নূতন শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণের অধ্যায় এই সময়েই পাওয়া যায়; ভবিষ্যতের লক্ষণ বহুলাংশে মিলে থাকে। ১৭৭২ সাল থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত রামমোহনের জীবন-কাল। ১৭৭২ সালে রাজা রামমোহন জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে সকলে স্বীকার করে থাকেন। বাংলাদেশ ১৭৬৭ সালের দেওয়ানী নূতন শাসকবর্গের হাতে চলে এল। বিদেশীর শাসনের আওতায় ভারতবর্ষ এই যে প্রথম এল তা নয়, তবে বাংলাদেশ ইংরেজের প্রভাবে বিশেষভাবে এসে পড়ায় তাদের কর্মপ্রয়োগ এবং জীবনযাত্রার ইতিহাস অনেকটাই এই সময়ে মিলবে।

রামমোহন রায় সমাজের ব্যাপক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিক্ষা তার মধ্যে একটি বিশেষ দিক। পুরনো স্রোতের ধারার সঙ্গে নতুনের স্রোত যোগ করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এইজন্যই তাঁকে আধুনিক যুগের প্রবর্তক বলা হয়ে থাকে।

চৈতন্যদেব যেমন শঙ্করের শিল্পকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন নতুন কালের শিল্পে, রামমোহন তেমনি চৈতন্যদেবের পরিবর্তনকে ঘুরিয়ে শঙ্করাচার্যের ধারায় যোগ করতে চেয়েছেন। চৈতন্যদেব ভারতীয় মনের আবেগকে প্রধান ভাবে ধরে নিয়ে শঙ্করের আদর্শকে পরিণত সহজ-বুদ্ধির প্রয়োগে রূপান্তরিত করে গেছেন। চৈতন্যদেব ভুল করেন নি, কারণ আমরা দেখতে পাই জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব একদিকে যেমন সুদূর দক্ষিণ ভারতে মনোভাব গঠনে এবং সাংসারিক করণীয়ের মধ্যে এসে পড়েছিল অন্যদিকে তেমনি সুদূর উত্তর ভারতের বাসলীতে শিল্পীদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। চৈতন্যদেব মানুষের মনের এই সার্বিক দিক দেখতে পেয়েছিলেন।

তিনশ' বছর পর রামমোহন দেখতে পেলেন, এই সার্বিক মনোভাবের দীপ্তি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, নানা সংস্কারে সমাজের অকল্যাণের দিক বড় হয়ে পড়ছে। এইজন্য তিনি বুদ্ধি এবং বিচারের দিকে দেশকে ফেরাতে চাইলেন আর তাই তাঁকে শঙ্করের আশ্রয় নিতে হল।

রাধানগর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাধানগর গ্রামটি সেকালকার বাংলাদেশের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। সংস্কৃত আর ফার্সী শিক্ষা সেখানে বিশেষভাবে প্রচলিত. রামনারায়ণ সর্বাধিকারীর 'মুন্সী চালায়' তাঁর লেখাপড়ার সুরু.

অতিরাম স্বামীর বৈষ্ণব-শিক্ষা প্রভাব এখানে রয়েছে, চৈতন্যদেব নিজে এই গ্রামে এসেছিলেন, শৈবধর্মও এখানে প্রতিষ্ঠিত ধন্টেশ্বর শিবের কল্যাণে, এইখানে কণাদের দর্শনের প্রসার ছিল, আর ছিল আগমবাগীশের তন্ত্রালোচনা। এইরকম পরিবেশে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব যেমন সহজ রামমোহনেরও তেমনি স্বাভাবিক।

রামমোহনের ছিল বৈষ্ণব চরিত্র, কিন্তু বেদান্ত আর উপনিষদ ছিল তাঁর দিগ্‌দর্শন; মহানির্বাণতন্ত্র ছিল তাঁর যোগমুদ্রা আর আরবী-পারসী গ্রন্থ এবং বাইবেল ছিল তাঁর ত্রিপুণ্ড্রক।

এই যোগীপুরুষকে পৃথক পৃথক ভাবে যে আলোচনা না করা যায় এমন নয়, যেমন সমাজ-সংস্কারক রামমোহন, রাজনীতিবিদ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার যোদ্ধা, ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তক, বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি

আরও কত কি। কিন্তু তাঁকে এইরূপে ভাগ ভাগ করে দেখলে অন্যটি বড় হয়ে যায়; তাঁকে বলতে হয় ইংরেজি শিক্ষা কমিশনের সভাপতি, ধর্মান্দোলনের আচার্য, কিংবা 'খুব বড় দরের নেটিভ।' শিক্ষা-কমিশনের সভাপতি যেমন একরোখা শিক্ষা ব্যাপার নিয়েই থাকেন, সমাজের আপাতসিদ্ধির দিকে যতখানি তাঁর নজর এমন অন্যত্র নয়, রামমোহন তো তেমন নন। ব্যাপক সমাজের দিকে ছিল তাঁর দৃষ্টি।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। 'ভারত-পথিক রামমোহন রায়' হলে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিভাষণ আছে, আর 'যোগক্ষেত্র ভারতের পূর্ণ সাধক রামমোহন' নামে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের একটি প্রবন্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহনের বক্তব্য বিষয় প্রায় একই। রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণে কবীর, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি ভারতের মুক্তিদূতের প্রসঙ্গ আছে, ক্ষিতিমোহনের প্রবন্ধেও এঁদের কথা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণে রামমোহন যেমন স্পষ্ট, সেন মহাশয়ের প্রবন্ধে তেমনি রামমোহন প্রায় অনুপস্থিত। (সে সময়ে মহাযুদ্ধের সাধনার ধারা নিয়ে আলোচনার একটা হিড়িক এসেছিল বোধ হয়, কারণ হাজারিবাগেও ঐ সময়ে অধ্যাপক পি. সিংহ রামানন্দ থেকে সুরু করে স্বামী দয়ানন্দ পর্যন্ত একটি ধারা অনুসরণ করে রামমোহনের আলোচনা করেন)। এই দুর্ঘটনা আলোচনার ঘটে, বক্তব্যকে খণ্ড খণ্ড করে অহরহ আলোচনার দরুণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মনটি এমন উদ্যুক্ত যে তাঁর সে মোহ আসে না। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের ঐ অভিভাষণটি অনুবাদ করতে সরোজিনী নাইডু এত 'কিন্তু কিন্তু' করেছিলেন, "In doing so, I feel just as a dew drop on a lotus leaf might feel if the rainbow said to it "Reflect me in all the splendours of my seven colours".

কেবল তাহাই নয়, ১৯৩৩ সালের রামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকীতে নাইডু অধীর হয়ে বলেছিলেন, "This being the age of isolated specialisation, each expert in his enthusiasm has spoken of one aspect or another of the Raja's contributions to life.....But to me the real greatness of Raja Rammohun Roy lies in this,—that he believed and realised within himself Goethe's saying, 'We shall live in the Absolute, in the Beautiful and in the Good' In the Absulate in the Beautiful and in the Good Rammohun lived. You cannot separate any single item of activity, intellectual, social or spiritual, in the life of the Raja, and say "This is he".

বিচ্ছিন্ন করে দেখা কিংবা বিশেষ বিষয়জ্ঞানে দেখা এর কোনটিও ভালো দেখা নয়। বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সূত্রের সত্য উপলব্ধি হয় না, বিষয়-জ্ঞানে দেখলে শক্তিটি উহ্য হয়ে যায়। আমরা দেখেছি শ্রীচৈতন্যদেবের লোকচরিত্র বুঝবার জন্য সমস্ত দক্ষিণভারত এবং কিছু উত্তর ভারত পর্যটন করেছেন (ঐতিহাসিক ভারতে যে-কার্যের সুরু করেন শঙ্করাচার্য) আর রামমোহনও তেমনি লোকবলের চরিত্র উপলব্ধির জন্য তন্ত্রক্ষেত্র তিব্বত, সংস্কৃত বেদভূমি কাশী এবং তৎকালীন বর্তমানে সংস্কৃতিকেন্দ্র বিলাত ভ্রমণ করেছেন। এই সমস্ত নিয়ে রামমোহন পূর্ণ মানুষ।

রামমোহনের শিক্ষানীতি বুঝতে গেলে রামমোহনের জীবনের এই পূর্ণাঙ্গ রূপটি সবসময়েই মনের পটভূমিতে থাকা দরকার।

রামমোহনের কতিপয় কার্যের সঙ্গে আমরা একটু পরিচিত হয়ে নিই। ধর্মের উপাসনাপদ্ধতি তিনি পরিবর্তন করেছিলেন; স্ত্রীস্বাধীনতার কথা তিনি বলেছেন; সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা তিনি করেন; শিক্ষাব্যবস্থার নানা পরিবর্তন করেন;

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বে তিনি প্রতিবাদ করেন। একটু অনুধাবন করলেই এর সমস্ত কিছুর মধ্যে তাঁর মনের ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই ঐক্য তিনি পেয়েছিলেন সমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর বোধ থেকেই। বাংলা তথা ভারতের সমাজের চরিত্র তখন কি?

হিন্দু সভ্যতার বিচিত্রধারা এক হয়ে গেছে; মুসলমান সভ্যতা তার ধারা যোগ করেছে, ইংরেজী শাসন নতুন হলেও, ইংরেজ বণিক সামাজিক আচরণ সপ্তদশ শতক থেকে বেপরোয়াভাবে এসে পড়েছে। এই তিনটি ধারা বিচিত্রভাবে নিয়ে তখন বর্তমান। ঐ বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে বহিয়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। কিভাবে তা করা যায়? দেশকে সামগ্রিকভাবে টেনে তুলতে হবে।

বাংলাদেশ আবার এরই মধ্যে অদ্ভুত অবস্থায়। সতীদাহের কথাই ধরা যাক। সতীদাহ প্রথা মানবসভ্যতায় অনেক প্রাচীন। টলিস্টি, মেসোপটেমিয়া এবং শকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। বোর্ণিওতে মৃতের স্ত্রী আত্মবিসর্জন না করলে জীবনে সমাজের সমস্ত অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হবে; আহার-বিহার সমস্ত কিছুই ন্যূনতম। জীবন্মৃত হয়ে থাকা। বোর্ণিওতে না হলেও, অন্যত্র এ ব্যবস্থার বদল বহু পূর্বেই ঘটে গেছে। মোঙ্গিল খাঁর আমলেও মোঙ্গলদের মধ্যে এ ব্যবস্থা একেবারে অবলুপ্ত। বরং পুনর্বিবাহই প্রচলিত। ভারতবর্ষেও অন্যত্র তখন এই প্রথার প্রকোপ নেই। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলছেন,

"The institution of Sati had got a great hold on the Bengali mind. It was much more prevalent there at that time than it was over the rest of India."

বাংলাদেশে বর্ণহিন্দুদের মধ্যেই বোধ হয় এই প্রথার প্রচলন বহু ছিল। সেই সময়ে এক বছরেই কলকাতা শহরে ৩০৯টি বিধবা সহমরণে গেছেন। অথচ বাংলাদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা তো খুব সহজ নয়। সপ্তম শতক থেকেই তো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণের সংশোধন এই দেশের চন্দ্রগোমিনের হাতেই হয়েছিল। রামমোহন একথা বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন শাস্ত্র আলোচনা আর তার প্রয়োগ দুটি ভিন্ন চরিত্রের। জব চার্নকের মতো ব্যবসায়িক করুণা তাঁর ছিল না। জব চার্নক সহমরণের নিষ্ঠুরতা দেখে সম্পৃক্ত বিধবাকে উদ্ধার করে বিয়ে করলেন, ভালোও বাসলেন; কিন্তু তাঁর চরিত্রের সূত্র কাপ্তেন হ্যামিলটনের বর্ণনায় পাওয়া যায়,

"Mr. Charnock choosing the Ground of the Colony, where it now is, reigned more absolute then a Rajah, only he wanted much of their Humanity, for when any poor ignorant Native transgressed his laws, they were sure to undergo a severe Whipping for a Penalty and the Execution was generally done when he was at Dinner, so near his Dining-room that the Groues and Cries of the poor Delinquent served him for Musick."

চার্নকের এই চরিত্রটিই গতানুগতিক। এমনি চরিত্রই তৎকালের হিন্দুমুসলমানের। যাকে বলে খাঁটি শাস্ত্রীয় চরিত্র! হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্র নিয়ে যেমন তাঁর আন্দোলন, তেমনি আন্দোলন বাইবেল নিয়ে। তাঁর একটি পুস্তকের নাম করা যায়, "The Precepts of Jesus, the guide to Peace and Happiness"—এই পুস্তকখানিতে তিনি যীশুর নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয় ও বাণীগুলি রেখেছেন কিন্তু দৈবী ঘটনা বা অলৌকিক কাহিনীগুলিকে বর্জন করেছিলেন। এইখানেই সকল ধর্মের অনুসরণকারীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। শাস্ত্রের অন্ধপথ অনুসরণ করলে কেবল অনুষ্ঠান-সর্বস্ব হবে

পড়ে ধর্ম। আর সেই অনুষ্ঠানই প্রাচীন সমাজের সবটুকু। রামমোহনের এই ধর্ম প্রসঙ্গে অক্সের যুবক সমাজের প্রতিনিধিরা একসময়ে বলেছিলেন, 'ওঁর ধর্ম একরকমের ভাঁওতা'—সেই কথা ডক্টর ডি. এ. পুরুষোত্তম সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে বলতে, রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন (১৯৩০ সালে),

"I have great deal of sympathy for such young men. Religion consists of ritual. The so-called anti religious movement in Russia is not so much directed against religion as such, but against an injustic perpetiated by an established body in not improving the condition of millions committed to its care. The prolelariat only wishes to establish a social brotherhood in the world. True religion may be defined as "spiritual good manners". Just as we have in society certain good manners, even so we have in matters of religion, which it is the duty of every individual who claims to be cultured to possess."

অপরের প্রতি সুশোভন ব্যবহার এবং সর্বমানবিকতাবোধ এই দুটি দিক শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই থাকা উচিত। উপনিষদেরও এই বাণী। রামমোহনও একেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সমাজের অজ্ঞতা ও কাটালে এই সংস্কার আর অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম তিরোহিত হবে না। ইংরেজ শাসক বলে ইংরেজি ভাষার প্রতি তাঁর আস্থা একথা ঠিক নয়, বিজ্ঞানের চর্চা সে ভাষায় আছে বলেই ইংরেজি শিক্ষার জন্ত তিনি আন্দোলন করেন। পার্থিব জগৎটা কি, তার সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক, তার সঙ্গে অলৌকিক দেবতত্ত্বের কতখানি সম্বন্ধ সেকথা স্বাধীনভাবে শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝতে শিখুক। গণশিক্ষার কথা তিনি ভাবেন নি, তিনি ভেবেছেন উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষার কথাই। বুঝেছিলেন, এদের হাতেই এই মনোভাব বিস্তৃত হবে। বুদ্ধদেব এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহায্য চেয়েছিলেন বলেই 'শ্রমণ'দের তৈরী করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, শঙ্করও সেই কথা ভেবেছেন তাই তাঁর যত কিছু নির্দেশ সবই সন্ন্যাসীদের জন্ত, একমাত্র শ্রীচৈতন্তদেব এবং মহাত্মা গান্ধী শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চান—অবশ্য দুজনই ভিন্নপথে। তবে তথাকথিত 'culture infiltration theory'—এর অমন মুষ্টিমেয় চাই তৈরী করতে রামমোহন চান নি। আরও ব্যাপক, আরও বৃহত্তর গণ্ডীকে নিয়ে তাঁর কাজ। অবশ্য তিনি মানুষের আবেগের দিককে উপেক্ষা করেন নি। তাঁর উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন,

"He insisted on *Upasana*, the duty of meditation and worship, as well as on ethical duties (Nishkama Karma), as obligatory, till the realisation of *Moksha* (Liberation); and to the Knower of the Brahma, he gave the option of *Karma* (Nishkama Karma) or *Akarma*, and equally of being an *Asrami* or an *Anasrami*. In there respects, it would be correct to say that the Raja's Brahma-Vidya comprehended *Visishtadvita* and *Dvaita* in his attitude towards the world and the individual soul."

দেশের মানোন্নয়নের ব্যাপারেও তিনি দেশবাসীকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে দিয়েছিলেন,—বুদ্ধিজীবী, আর কর্মজীবী। বেদান্ত স্কুলও তিনি স্থাপন করেন, এ্যাংলো হিন্দু স্কুলও তাঁর পরিচালনায়।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বেদান্ত কলেজ স্থাপন করেন। অন্ন ছাত্রই পড়ত। পরিকার পরিচ্ছন্ন ঘর-দোর। সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কতিপয় ব্যক্তি এখানে পড়াতেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে ঐ সঙ্গে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষাও চালু করবেন।

হিন্দু কলেজ (বিভিন্ন নামে—সিভালদ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ, মহাপাঠশালা, মেটিভ হিন্দু কলেজ, পরবর্তীকালে (প্রেসিডেন্সী কলেজ) প্রতিষ্ঠার পিছনেও রামমোহনের যে কি প্রচেষ্টা ছিল এবং কেন তিনি সরে গেলেন তা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ঈস্টের চিঠিপত্র থেকেই জানা যায়।

কিন্তু তা বাদ দিলেও, তাঁর নিজের স্কুল (সুঁড়িপাড়াতে অবস্থিত) এ্যাংলো হিন্দু স্কুলের কথা বলতে হয়; দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত হিন্দু বালকদের জন্যই এই স্কুল ১৮১৬-১৭ সালে স্থাপিত হয়। ২০০ জন ছাত্র। সমস্ত ব্যবস্থার নিজে নজর করতেন পরে তাঁর আপার সার্কুলার রোডের বাগান বাড়ীতে এই বিদ্যালয়েরই একটি ইংরেজি শ্রেণী খুললেন। ভালো ছেলেরা এখানে ভর্তি হতে পেত, মোয়াক্রফট সাহেব এই বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন ১০০৲ বেতনে। তারপর হেয়ারের ওখানে দাবণা কিনে ১৮২২ সালে বিদ্যালয় ভবন তৈরী করলেন। এই বিদ্যালয়ও অবৈতনিক, তবে তাঁর বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে কিছু কিছু চাঁদা নিয়েছিলেন। উইলিয়াম এ্যাডাম এবং স্কাওয়ার্ড এখানে পড়ানোর ভারতের তার নিয়েছিলেন। এই স্কুলই পরে বিখ্যাত পূর্ব মিত্রের স্কুলে পরিণত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই স্কুলের ছাত্র। ১৮৩৪ এর পর এর নাম হয় ইণ্ডিয়ান একাডেমী। এই সময় ভূদেব মুখোপাধ্যায় এখানকার ছাত্র।

এখানকার পাঠ্যতালিকার খবর কিছু জানা যায়। পড়া, বানান শেখা, ব্যাকরণ, অনুবাদ ছাড়াও উচ্চ শ্রেণীতে জ্যেমের মেকানিক্স, এ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কে বিজ্ঞান আলোচনাও পড়ানো হত। আর ছিল ইউক্লিডের জ্যামিতি। সুইডেনের রাজা চার্লস সম্পর্কে ভলটেয়ারের যে-ইতিহাস আছে তা থেকে বাংলায় অনুবাদ করানো হত।

এই সব স্থানে ইংরেজি বিভাগ ছাড়া শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। ইংরেজি নয়। লক্ষ্য করবার মতো যে, যিনি ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন করতে বলে ছিলেন, তিনি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্দ্দেশ দিলেন বাংলা ভাষা-ই।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে রামমোহন দু'টি ভাগ করেছিলেন,—মেধাবী আর সাধারণ। মেধাবীরা ইংরেজি শ্রেণীতে যোগ দিতে পারত, সাধারণে বিজ্ঞানের কিছু এবং সংস্কৃত। পাঠক্রম দেখে মনে হচ্ছে রামমোহন কবাদী বিপ্লব সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ যে একদিন ইংরেজের শাসন পাশ থেকে মুক্ত হতে পারবে, এমন আশাও করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এতখানও ভেবেছিলেন ইংরেজের বস্তুজ্ঞান এবং শিক্ষার আলোক ভারতের সমাজে আরও কিছুদিন ছড়িয়ে পড়ুক। এসব উক্তি আন্তরিক বিশ্বাস কিংবা বিরক্তি থেকে এসেছিল জানি না। ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে তিনি যখন ওয়াকিবহাল ছিলেন তখন শাসকবর্গ কি কি কারণে অপ্রিয় হয় তা তাঁর অজানা ছিল না; ১৭৯৩ সালে যখন ফরাসীদেশে ভূমির অধিকার কৃষকের এল, সেই সময় আমাদের দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘটে গেল; এই কালোচিত্যবোধ রামমোহনের মস্তরে পড়া খুব অসম্ভব নয়। সংবাদপত্রের ভূমিকা যে, দেশে কি, তাও ঐ ইতিহাস থেকেই জানা যায়।

এইসব ঘটনায় বিস্ময়ের কিছু নেই। বিস্ময় প্রকাশও করতাম না। কিন্তু বিস্মিত হতে হয় এই কারণে যে, ঐ যুগসন্ধিক্ষণেই রামমোহনের মতো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এদেশে অন্তত আর দেখা যায়নি; সমগ্র মানবজাতির চরিত্র যেন তিনি একটি সূত্রে গেঁথে নিয়েছিলেন। জগতে অন্যত্র যা ঘটছে তা যে এদেশে ঘটতে বিলম্ব হবে না, জগতের অন্যান্য মানুষের মতোই যে এদেশেরও মানুষ এই কথা তিনি অতি সহজে বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ ইংরেজ কোম্পানীর লোক তা বুঝতে পারে নি।

ইংরেজ-কোম্পানীকেও তিনি বুঝে নিয়েছিলেন।

তাদের অসন্তোষ কোন পথে চলছে তা বুঝতে পেরেই তিনি এখন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করতে চান। সন্তর্পর ফেনারেলকে লেখা চিঠি (১১ই ডিসেম্বর, ১৮২৩) তার সাক্ষ্য বহন। তিনি বিজ্ঞানের উপর জোর দিয়েছিলেন; আর তাই যেকলে বর্জন করলেন। এই প্রসঙ্গে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মহারাণীর সনদ নিয়ে এসেছিল ইংরেজ বণিক। তার আগে যে ইংরেজ এদেশে না এসেছে তা নয়। রাজা আলফ্রেডের সময় ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'আলফ্রেড' কেউ এসেছিলেন সিংহলরাজ; ১২৯০ সালে এসেছিলেন আর-এক বণিক। মোগল আমলে সুরাতে বেশ ঘাঁটিই করে বসেছে ইংরেজ। বণিককুল প্রতিষ্ঠিত হল। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক একত্র হয়ে কোম্পানী-প্রতিষ্ঠা করল।

এলিজাবেথ প্রাচ্যদেশের রাজাদের কাছে সওদাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ব্যবসা করতে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে যে চিঠি লেখেন, তার মধ্যেকার একটি কথা—

"And if your Majesty shall, in your princely favour, accept, with good liking this first repair of our merchants unto your country, resorting thither in peaceable traffique, and shall entertain this their first voyage, as an introduction to a further continuance of frindship betweon your Majesty and us, for commerce and intercourse between your subjects and ours, we have given order to this, our principal merchant (if your Majesty shall be pleased thought) to have in your country some such of our said merchants as he shall make choice of, to reside in your dominions. under your princely and safe protection, until the return of another fleet we shall send unto you, who may, in the meantime learn the language of your country, and apply their behaviours, as it may best sort, to converse with your Majesty's subjects, to the end that amity and friendshif being entertained and begun the same may the better be continued when our people shall be instructed, how to direct themselves according to the fashions of your country. "(পুরনো ইংরেজি বানান যাত্র বদলে দেওয়া হল)।

এই চিঠিতে তদ্দেশের ভাষা শিখে নেওয়ার কথা আছে। আর আছে সেই দেশের আচার আচরণ যে কিরূপ তা ১৫৯৯ এর মধ্যে জানা যায়, সুরাতের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মোল্লা আবদুল গফুরের হজযাত্রার জাহাজ লুণ্ঠন করে দেওয়ায়। ভাষা শিক্ষার ইতিহাস ইত্যাদি কি বলে তা পরের বারে আলোচিত হবে। (ক্রমশঃ)

আমাদের দৃষ্টিশক্তি

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

এখানে একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন আলোচনা করা যাইতেছে। বর্ত্তমানে শিক্ষার্থী বালক ও যুবকদের দৃষ্টিশক্তি বাড়িতেছে না কমিতেছে।

এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসার পক্ষে একটি অন্তরায় আছে। তুলনা করিতে গেলেই দুই পক্ষ চাই, একপক্ষ দেখিয়া তালমন্দ কিছুই বোঝা যায় না। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের বালক ও যুবকগণের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ কি প্রখর ছিল তাহা জানিবার উপায় প্রায় নাই। কিন্তু এ নিমিত্ত অতি পূর্ব্বকালের ইতিহাস না পাইলেও চলে: শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমনই জিনিস যে তাহার বিকার দুই এক পুরুষের মধ্যেই কিছু না কিছু ধরা পড়ে। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা কি দেখিয়াছি এবং কি দেখিতেছি, তাহা মিলাইলেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকটা অনুমান করিতে পারা যায়।

আমরা যত বালক ও যুবকগণকে চশমা পরিতে দেখিতেছি, বিশ, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তত দেখিতাম কি?

আমার মনে হয় এবং মনে থাকিবার বিশেষ কারণও আছে, আমরা যখন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমাদের প্রায় আশি জনের মধ্যে কেবল দুইজন চোখে চশমা দিতেন। এই দুইজন দূরের জিনিষ দেখিতে পাইতেন না, তাহারা নিকট দৃষ্টি ছিলেন। আমার মনে থাকিবার কারণ এই আমাকেও শীঘ্রই তাহাদের দলে মিলিতে হইয়াছিল। কিন্তু চোখে দিতে কত লজ্জা বোধ করিতাম পাছে কেহ মনে করে বাহার দেখাইবার নিমিত্ত চশমা, পাছে কেহ বলে আহা এই বয়সেই অন্ধ। সে সময়ে, 'চোখে চশমা ঢাকা চাপ দাড়ি রাধা' ইত্যাদি একটা গানও শুনিতে পাওয়া যাইত। এইসব কারণে চশমা প্রায়ই লুকাইয়া রাখিতে হইত। অথচ দূরের জিনিষ দেখিবার উপায়ও ছিল না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া এই বিশারদ কবিরাজ মহাশয়ের শরণাপন্ন হই। তিনি বলিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদে এই নূতন রোগের চিকিৎসা নাই।

তখন চশমা চোখে দিতে কি দুঃখ ও লজ্জা পাইতাম। কিন্তু এখন পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

এখন কলেজের যুবকগণের কথা দূরে থাক্, স্কুলের ছাত্রগণের ছেলেকে চোখে চশমা দিয়া নিঃসঙ্কোচে বেড়াইতে দেখা যায়। কারণ কাণ-কাটার দেশে কর্ণের লজ্জা থাকে না। যাহাদের ভয়ে চশমা,—একথা ইঙ্গিতেও শুনিতে পাই না। সমাজ যেন স্বীকার করিয়া লইয়াছে, লেখাপড়া করিতে গেলেই চক্ষুর মায়া কাটাইতে হইবে। বার-তের বৎসরের বালক চোখে চশমা না দিলে পঁচিশ হাত দূরের লোক চিনিতে পারে না, ইস্কুলের কৃষ্ণ পটে খড়িতে লেখা অঙ্ক পড়িতে পারে না।

পূর্ব্বকালে এমন দুর্ভাগা ছিল কি? অবশ্য ছিল। কিন্তু সংখ্যা বেশী ছিল কি? বোধ হয় না। থাকিলে আয়ুর্বেদে রোগের অন্ততঃ একটা নাম থাকিত।

মহাভারতে, সুশ্রুতে ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্টিশক্তি মাপিবার এক উপায় পাওয়া যায়। লিখিত আছে, বশিষ্ঠ তারার অরুন্ধতী যে দেখিতে না পায়, তাহার মৃত্যু আসন্ন। এইরূপ কৃত্তিকা নক্ষত্রেরও উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে সেকালে এমন লোক অল্পই থাকিত, যাহারা

অক্ষতী তারা কিংবা কস্তিকার দাতটি তারা দেখিতে পাইত না। অনেকে বিশেষতঃ যুবকে দেখিতে না পাইলে আদর বৃদ্ধার কথা উঠিত না। যখন যাহাদের তারা উপস্থিত হইলে, লোকে অন্ধপ্রায় হয়, কেবল তারাই স্পষ্ট দেখিতে পায় না।

অর্থাৎ তখন যাহা বৃদ্ধ বয়সে ঘটিত এখন তাহা কিশোর বয়সেই ঘটিতেছে।

হয়ত সেকালে এখনকার মত ওত অল্প বয়সের বালক একালের তুল্য বিদ্যার্থী হইত না, হয়ত সেকালে ক্ষীণ দৃষ্টি বালক কাচনয় প্রতি চক্ষুর অভাব অধ্যয়ন হইতে বিরত হইত। সেকালে দৃষ্টিশক্তি-হীন কিংবা অল্প দৃষ্টি বালক থাকিত না বলিতে পারা যায় না। কম থাকিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ চোখ খোয়ানো সভ্যতার একটি লক্ষণ। যে অসভ্য মানবকে দূর হইতে বন্য অন্বেষণ করিতে হইত, শত্রুবা আহার জুটিত না, যাহাকে দূর হইতে শত্রু নিরীক্ষণ করিতে হইত, শত্রুর রক্ষার উপায় থাকিত না; তাহার চক্ষু অবশ্য প্রখর ছিল। প্রকৃতির উদ্ভূক্ত ও বিরাট ক্রোড়ে যে লালিত পালিত হইয়া থাকে, প্রকৃতিই তাহার শক্তির বিকাশ করিয়া দেন। বিকৃতির ক্ষুদ্র কোটরে আবদ্ধ মানবের ভাগ্যে সে বিকাশ সম্ভবে না। বস্তুতঃ জীবসৃষ্টির মধ্যে এক সত্য এই যে, যে যা চায়, সে তা পায়, যে অঙ্গের যে শক্তি যে আকাঙ্খা করে, তাহার সে শক্তি লাভ হয়। যাহা চাই না, তাহা শীর্ণ হইয়া কালক্রমে লুপ্ত হয়। চিল উচ্চ আকাশ হইতে লক্ষ্য করিয়া বেগে নামিয়া অন্যের উপর ছোঁ মারে আর গৃহ-চটক খাদ্যের সম্মুখে না গেলে খাদ্য দেখিতে পায় না। বাজর, শিঙ্গি, কুঁচ্যা প্রভৃতি কর্দমচর সংজ্ঞের চক্ষু অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়াছে; কিন্তু নির্মল জলচারি রোহিত ও কাতলের চক্ষু বৃহৎ। ইহাই নিয়ম, যে যা চায় না, যাতে যার প্রয়োজন নাই, সে তা পায় না। প্রকৃতিকে ফাঁকি দিতে গেলে প্রকৃতি আমাদের ফাঁকি দেন। কাজেই নগরের গৃহ কোটরে কৈশোর ও যৌবন কাটাইলে প্রকৃতিকে অবহেলার প্রতিশোধ পাইতে হয়। দিবারাত্রি ছোট ছোট অক্ষর চোখের কাছে রাখিয়া পড়িলে অল্প দৃষ্টি-ই লাভ হয়।

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের "ঘুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কার্যক্রম" প্রবন্ধটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ আছে। পৃ ১৩৬।১৬-১৮ লাইনে আছে—তা হলে প্রত্যেক সপ্তাহে পরিবেশ পর্যবেক্ষণের একটা এককও সেই উপলক্ষে শিক্ষা ৫ দিন চলবে।—পরিবর্তে হইবে "তা হলে প্রত্যেক সপ্তাহে পরিবেশ পর্যবেক্ষণের একটা এককও সেই উপলক্ষে শিক্ষা ৫ দিন এবং তাদের একটা এককও সেই উপলক্ষে শিক্ষা ৫ দিন চলবে।"

শিক্ষা

ম হি কল্যাণকৃৎ কল্পিত্ ম্রগণ্ডিং ভাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৭২ | ১০ম সংখ্যা

আলোচনা

স্মরণে

প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। উঁহার শোকতপ্ত পুত্র পরিজনের নিকট সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।

শিক্ষা কমিশন

বাংলাদেশের শিক্ষক সংঘ শিক্ষাবিদ্, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, পত্র পত্রিকা, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় অনেক কৈফিয়ৎ ও অনেক কারণও দর্শাইতে হইয়াছে। জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনায় বৈদেশিক সদস্যদের উপস্থিতির হেতু কমিশনের অন্যতম ডাক্তার কোঠারি বলিয়াছেন, জাতীয় শিক্ষাকে অন্যান্য দেশের শিক্ষার সহিত সমানতালে পা ফেলিতে হইবে। বর্তমান যুগের লক্ষ্য হইল দেশের শিক্ষাকে দেশের উৎপাদনের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া, এ বিষয়ে এ দেশের অন্যান্য দেশ হইতে অনেক কিছু শিক্ষার আছে। মনে রাখিতে হইবে, গান্ধীজীর হস্তশিল্পের উৎপাদন-মূল্য শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আধুনিক পরিবর্তনের মধ্যে কি স্থান অধিকার করিয়াছিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন নাকি নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার কথাই বেশি করিয়া বলিয়াছেন। আমাদের পরিকল্পনায় ইহাকেই অগ্রাধিকার দিতে হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে জানিতে চাই, আমরা এবিষয়েই বা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি!

আসাম, উড়িষ্যা ও কেরল প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া কমিশন কার্য শেষ করিবেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বলিত রিপোর্ট আগামী মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিবেন। এইরূপ কর্মতালিকা গৃহীত হইয়াছে।

মূল্যবৃদ্ধি

আগামী অগ্রহায়ণ হইতে আমরা শিক্ষার বার্ষিক চাঁদা বর্তমান সাড়ে তিন টাকা হইতে বাড়াইয়া চার টাকা ও প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩৪ পয়সা করিতে চাই। না হইলে কাজ চালানো কঠিন হইবে। আশা করি আমাদের গ্রাহক ও অনুগ্রাহকেরা দুর্মূল্য বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা অনুমোদন করিবেন।

ছুটি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি আমরা প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করে। শিক্ষকদের একটু কর্ম বিরতি দরকার, অধীত বিদ্যার বাহিরে কিছু জানার জন্য এবং জীবনধর্মের বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্যও। শিক্ষা কমিশন এ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিতেছেন। কতদিন ছুটি দেওয়া সঙ্গত, এবং সেই ছুটির সদ্ব্যয় কি ভাবে হইতে পারে তাহাও বিবেচনার জন্য। ক্ষেত্রভেদে অবস্থাভেদ ও অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ, আশা করি এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ অবহিত থাকিবেন।

শারদীয় অবকাশ আগতপ্রায় বলিয়া এই কথাগুলি লিখিলাম।

তদন্ত

কলিকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ ও কল্যাণীতে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণভাবে, এবং বিশেষ করিয়া স্কুল ফাইনাল ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া যে অধিক সংখ্যায় ছাত্রেরা অকৃতকার্য হইয়া আসিতেছে তাহার কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তদন্ত করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এজন্য ঐ চার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় কার্যালয় বসাইয়া তদন্ত চালাইবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। সংবাদপত্রে ইহার আভাষটুকু মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে অভিযোগ তো বরাবরই আছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিস্টিকস বিভাগ হইতে বিস্তৃতও কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। এখন কার্যত কিছু হইলে হয়। তদন্ত, কমিশন, বিবৃতি—কিন্তু যতক্ষণ না প্রকৃত উন্নতি হয় ততক্ষণ সবই কথার কথা।

প্রণতি

সন্ত বিনোবার জন্মদিনে তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই।

শিমলোনের সভায়

সন্ত বিনোবা

Nation Builder (জাতিগঠনকারী) যদি কেহ থাকেন তবে একদিকে মাতাপিতা অন্যদিকে শিক্ষক। শিক্ষকের দুই প্রকারে গুণ থাকা দরকার (১) মাতা-পিতার বাৎসল্য, করুণা, ইত্যাদি ও (২) জ্ঞান। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম মিলিত হলে তা অত্যন্ত কল্যাণকর হয়ে থাকে। বাৎসল্য ও করুণার জন্য ব্রহ্মচারী চাই। আমার ভক্তির জীবন নেওয়ার কল্পনা ছিল। কিন্তু ছোট ছেলেদের পিতার বাৎসল্য বিবাহিত—২।১টি বাচ্চা হয়েছে-এরূপ লোক শিক্ষক হলে কতটা বাৎসল্য হস্তান্তর করতে পারবে? সবে তো তার বাৎসল্য আরম্ভ হয়েছে। এজন্য অনুভবী পুরুষ-বানপ্রস্থ গ্রহণ করেছেন—এরূপ মানুষ বাৎসল্য সম্পন্ন হতে পারেন। তরুণ শিক্ষকের পক্ষে জ্ঞানোপাসনা করা প্রয়োজন। তোর ২টায় উঠে এক ঘণ্টা জ্ঞানার্জন করা।

———

উড়িষ্যায় ছাত্রজীবন

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

(১)

১৯১৩ সালে কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে পড়িতে যাই। তখন প্রাদেশিকতার যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ দিল্লীর দরবারে বঙ্গ-বিভাগ রদ হইয়া গিয়া বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়াছে এবং নূতন প্রদেশের সম্পূর্ণ স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় হইয়া বৃত্তি যথারীতি পাইলাম বটে, কিন্তু সেইজন্য আমাকে বিহার-উড়িষ্যার অন্তর্গত কোনও কলেজে ভর্তি হইতে হইল, কারণ চাইবাসা হইতে পাশ করিয়াছিলাম।

কিন্তু কটকে পড়িতে গিয়া থাকিব কোথায়? হষ্টেলে বাঙালীর স্থান নাই, যদি না সে 'ডোমিসাইল' অর্থাৎ উক্ত প্রদেশে স্থায়ী বসবাস করিবার প্রমাণ দাখিল করে! আমি নিরুপায় হইয়া এক ব্রাহ্ম পরিবারে স্থান পাইলাম, সেখানে আমার অগ্রজের এক বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাসি গলির বাড়িতে উঠিলাম! কাসিগলির এই পরিবারে জ্ঞানদাদা ও বৌদিদির স্নেহাদর পাইয়াছিলাম। জ্ঞানদাদার ভাইয়েরা স্কুলে পড়িত—ছোট ছোট ছিল, এখন কে কোথায় জানি না। যে চারিখানি পরিচয়পত্র আনিয়াছিলাম তাহার একখানি আমাদের গণিতের অধ্যাপক শরৎ গাঙ্গুলি মহাশয়ের নামে, একখানি ওখানকার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর রায়ের নামে, একখানি ছিল অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের নামে। অধ্যাপক মহাশয় মুজনার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা হইল, কিছু কিছু হাতে কলমে কাজ করিবার সৌভাগ্যও ঘটিল। যেমন, যোগেশবাবুর নিকট গিয়া Indexing কিছুটা শিখিলাম, করিলামও। অধ্যাপক গাঙ্গুলির কাছে গিয়া শিখিলাম সংস্কৃত ভাষায় রচিত শ্লোকটি—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্মসূত্রনিয়তো হি লোকঃ।

আমার সুখদুঃখ কে দিবে? অন্যে দেয় ইহা কুবুদ্ধি; নিজে করি? বৃথা অহংভিমান। তবে? আমার কর্মের ফলাফলই আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

তখন শ সাহেব ছিলেন কলেজের Principal-আর দোর্দণ্ড প্রতাপ ডিউক সাহেব ছিলেন ইকনমিক্সের অধ্যাপক—তাঁহাদের সঙ্গে এমন কিছু সম্পর্ক হয় নাই—তবে শ সাহেব আমাদের অঙ্ক পড়াইতেন। বিষয় নির্বাচনে মূর্খতার পরিচয় দিয়াছিলাম, লজিক, অঙ্ক ও সংস্কৃত। মূর্খতা এই জন্য যে, পূর্বে সংস্কৃত মধ্য পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং নূতন করিয়া পড়িতে হয় নাই। নূতন বিষয় শেখা হইল না। লজিক স্বয়ং অম্বিকা চরণ মিত্র মহাশয় এমন সুন্দর করিয়া পড়াইতেন যে বই আর পড়িতেই হইত না! সুতরাং পরীক্ষার ব্যাপারে বেশি কিছু শিখিবার রহিল না। অঙ্ক? সেকালে অঙ্কের পাঠ্য বেশি ছিল না—প্রথম বৎসর কণিক্স, ট্রিগোনোমেট্রি, সলিড্ জিওমেট্রি, অ্যালজেব্রা। বুদ্ধিশক্তির ক্ষীণতার জন্য চশমা ব্যবহার করিতে থাকিলাম। নিকেল চশমার এই প্রথম ব্যাপারের সহিত আমার এক বাল্যবন্ধুর স্মৃতি জড়িত আছে। আড়কান্দীর পবিত্র রায় আমার দিনাজপুর থাকিবার শেষ ভাগে দীর্ঘ অসুস্থতার দিনে যে সস্নেহ সেবা করিয়াছিলেন তাহা ভুলিবার

নয়। ঐ চার বৎসর যেখানে যাহা কাজ করিয়াছি তাহার অভিজ্ঞতা আমার অত্যন্ত সঞ্চয় হইয়াছিল, কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করি। ইংরাজীর অঙ্কের ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে মোটেই কিছু দেখিতে পাইতাম না। যাহা হোক, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর শেষ ভাগে কলিকাতায় আসিয়া কার্য্য উপাধি পরীক্ষা দিলাম, চশমাও নিলাম।

এইখানেই আমি মস্ত একটা ভুল করিলাম। প্রথম পা ফেলিতে ভুল হইলে পরে পা ঠিকমত ফেলিতে পারা যায় না। একথা অঙ্কের সম্বন্ধে খুব বেশি খাটে। সলিড জিওমেট্রি ও কণিক্‌স, ট্রিগোনোমেট্রি ও অ্যানালেটা—একরকম হইয়া গেল, তবে রুচি বা অনুরাগ জন্মিল না!

প্রথম বৎসরেই কুলদা মল্লিক ভাগবতরত্নের সহিত পরিচয় ও উড়িয়া শিখিতে তাঁহার উপদেশ লাভ করি। তাঁহার চেহারা ও ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি আজও মনে আছে। "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং" আর 'মুকং করোতি বাচালং' এত সুন্দর বলিতেন যে ঐ রসে মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম।

আর আমার প্রথম বার্ষিকের নূতন নূতন বন্ধুরা —তাহারাই বা কোথায় গেল! সত্যেন তো জানুয়ারি মাসেই বিলাত চলিয়া গেল এবং আই, সি, এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া ফিরিল। তাহার পর আর তাহার সঙ্গে দেখা তাহার অবসর গ্রহণের পর অর্থাৎ সম্প্রতি বছর দেড়েক আগে হইয়াছিল। সবই তো তখন নূতন—একমাত্র পুরুলিয়া কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়াছিলাম বলিয়া পুরুলিয়ার দুই চারিটি মুখ চেনা। পুরুলিয়ার মনমথমোহন সরকার, অলকানন্দ বক্সী,—কেহই এখন বাঁচিয়া নাই। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর শেষভাগেই আমার একবার বাতজ্বর হয়, rheumatic fever—জ্বরে একেবারে শয্যাগত তখন betol oil দিয়া ইহার চিকিৎসা চলিত। কিন্তু এই জ্বর সুযোগও আনিয়া দেয়—ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই উপলক্ষেই ঘরে করিয়া আসিয়া সযত্নে চিকিৎসা করেন, এবং গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মুন্সেফ বারিপদার হাত—তখনও কলেজের গন্ধ যায় নাই)—সেবাব্রত লইয়া শুশ্রূষা করেন। ইহাদের সযত্নলাভে জীবন সমৃদ্ধ হইয়াছিল। দেবেন বাবু পরে সন্ন্যাস লন,—তাঁহার দেহান্তর হইয়াছে—আজীবন তিনি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁহার স্নেহ ভুলিবার নয়।

আমার প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর কথা এইখানেই শেষ করি। পড়াশুনা বিশেষ হয় নাই—Natural History of Australia—সংস্কৃত পড়িবার প্রয়োজন রহিল না—Deductive Logic অম্বিকাবাবুর পড়ানোর গুণে মুখস্থ প্রায় হইয়া গিয়াছিল—পাঠ্য পুস্তক গোটা কেনা হইয়াছিল তাহার কিছুটা পড়া হইল, বাকিটা কেনা হইল না, 'পরে পড়িব' বলিয়া রাখা হইল।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিকের মধ্যে গ্রীষ্মাবকাশ। ভাবিলাম, ন' দাদার (কুমুদবন্ধু সেন) নিকট গিয়া কাটাইব। আমি পুরুলিয়াতে গিয়া উঠিলাম। ন দাদা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত ও আজীবন অবিবাহিত—সে সময় ব্যবসা করিতেছিলেন। আমার ভগ্নীপতি বিশ্বেশ্বর দাসগুপ্ত মাস্টারি ছাড়িয়া এই ব্যবসায়ের দ্বারা অল্পসল্প স্বচ্ছল অবস্থায় উঠিয়াছিলেন। চোখের সামনে ইহা দেখিয়া ন'দাদা চাকরিতে ইস্তফা দিয়া পুরুলিয়াতে বাসা লইয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। আমি তাঁহার সঙ্গে কিছুদিন কাটাইব মনে করিয়া গেলাম, কিন্তু তিন, আমি যাওয়ার তিন দিন পরেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গী হইয়া দক্ষিণ ভারতে বেড়াইতে চলিলেন! এবং ফিরিয়া আসিলেন আমার ছুটি শেষ হওয়ার আগের দিন। অবশ্য আমার দুবেলা খাওয়া খাওয়া ও রাত্রে পাহারা দেওয়ার একটা ব্যবস্থা থাকিল।

পড়াশুনার অপূর্ব সুযোগ, কিন্তু আমার লাভ হইল না। যদিও পুরুলিয়ায় আমার পূর্বসম্পর্কের অথচ পরম আপনার জন কাকা শরচ্চন্দ্র সেন তখন ওখানকার উকিল ছিলেন, তাঁহাদের গৃহপরিজনের সহিত মেহের সম্বন্ধের দাবি অবশ্যই ছিল। সহপাঠী মন্মথের দাদা অতুলাক্ষ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হইয়া ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও নির্জন বাসের যে উপকারিতা তাহা তেমন কিছু খুঁজিয়াও না। সময় হয় নাই। জীবনের পূর্ণ পরিণতির অনেক বাকি ছিল।

যাহা হউক, এবার কটকে ফিরিয়া জানদাদার বাড়িতে থাকা হইল না। হস্টেলে স্থান পাইতাম। এক বৎসর বাহিরে থাকিয়া বাধা অতিক্রম করিয়াও পরীক্ষার ফলের গুণে স্থান পাইতাম বটে, ওড়িয়া-বাঙালী প্রশ্নও উঠিত না, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মামাত ভাই কান্তিচন্দ্রের অসুস্থতা ও ডাক্তারের উপদেশমত আমাদের মামা সপরিবারে কান্তির পড়াশুনার জন্য তাহাকে লইয়া কটকে বাসা করিলেন। এই বাসা কটকেরই অন্য এক মোহল্লার —গণেশঘাট রোডে, কাঠজোড়ী নদীর নিকটে। কান্তি বয়সে আমার অপেক্ষা বাড়াই বছরের ছোট হইলেও কলেজে দুই বৎসর আগাইয়া ছিল।

কাঠজোড়ী নদী তখন ছিল কটকের অন্যতম lunge-এর মত। প্রতিদিন সকালে বিকালে অনেক লোকে হাওয়া খাইতে বাহির হইত। বাঁধানো ঘাট প্রায় এক মাইল কি তাহারও বেশি দূর প্রসারিত, কটক সহরকে রক্ষা করিয়াও বটে, আবার তাহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াও বটে, চলিয়াছে তো চলিয়াছেই। তাহার পরই বালি আর বালি। দু-এক জায়গায় ঠিক তাহার পারেই অথই জল। সুতরাং সতর্ক হইয়া নামিতে হয়। অন্যত্র চলিয়া গিয়া বর্ষা ছাড়া অন্য ঋতুতে বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে হাত দিয়া বালু খুঁড়িয়া জল বাহির করিতে হয়। সহর হইতে বিস্তর লোক আসিয়া এইভাবে কাঠজোড়ীর জলে স্নান করিত, এখনও নিশ্চয় করে।

আমাদের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় গাঢ়তর হয়। সুভাষের পরীক্ষা কেন্দ্র এবার কটকে ছিল, টাইফয়েড জ্বরের আক্রমণ হইতে উঠিয়া তাহাকে আবার কলিকাতায় পরীক্ষা দিতে পাঠানো হয় নাই। নূতন নূতন অধ্যাপকদের সঙ্গেও আলাপ হয়—যেমন আর্ভবরক্ত মহাশয় আমাদের সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করেন। তিনি হেসিয়া খুসিয়া পড়াইতেন, শুনিয়াছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তেমন ভাল করিতে পারেন নাই। কিন্তু পড়িতে ও পড়াইতে রস পাইতেন সন্দেহ নাই। অধ্যাপক গোপাল গাঙ্গুলি মহাশয়ের নিকটও তেমনি ইংরাজী পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি। কিন্তু Inductive Logic পড়িতে গিয়া ততটা আনন্দ পাই নাই। Caveth Read-এর Logic বেশ ছিল কিন্তু পরীক্ষা অতি নিকটে আসিবার সময় তাহার মর্যাদা বুঝিলাম, পূর্বে বুঝি নাই। অঙ্কের সম্বন্ধেও তাই। আমি বিনাজপুর থাকিতে mechanics ও mathematics লইয়া ম্যাট্রিক দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলাম, Statics ও Dynamics পড়িতে গিয়া বুঝিতে পারিলাম না, পরীক্ষার হলেও বুঝিয়া করিতে পারিলাম না। এইভাবে প্রায় অপ্রস্তুত-ভাবেই পরীক্ষা দিব দিব করিলাম। একটা রোগেও ধরিয়াছিল—sleeping sickness—যখন তখন ঘুমাইয়া পড়িতাম, সকাল বিকাল দুপুর কোনও সময়ের বাছবিচার ছিল না। সুতরাং পড়া আগাইল না। হয়তো ভিতরে ভিতরে শরীর খুব দুর্বল হইয়াছিল।

আমাদের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতেই Prinoipal বদল হইল। শ সাহেবের স্থানে আসিলেন এইচ্.

ম্যাথার্ট। ইনি ক্রিকেট খেলিতে খুব ভালবাসিতেন। আগে ছোটনাগপুর বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টর ছিলেন। সুতরাং চাইবাসা স্কুল হইতে যে আমি পরীক্ষায় ফল ভাল করিয়া কটকে আসি সে খবর তাঁহার জানা ছিল। প্রিন্সিপালের নিকট লেখায় না যাওয়াইলেও তিনি আমাকে প্রথম ডাকিয়া আলাপ করিয়া লইলেন। এবং পূর্বাপর তাঁহার সদয় ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু আমাদের সপ্তাহে একদিন করিয়া ইংরাজীও পড়াইতেন, তাহা আমার সেক্সপীয়রের নাটক!

তখনকার দিনে আজকার মত ছাত্রদের লইয়া বেশি tour বা excursion এবং বিধান ছিল না। তবু আমরা নিজেরাই পরীক্ষার শেষে আটজন একত্র বেড়াইতে বাহির হইলাম। সুভাষ, হেমেন্দু, ও আমরা আরও ছয় জন। স্থির হইল, চিল্কা হ্রদ, পুরীর মন্দির, সাক্ষীগোপালে সত্যবাদী বিদ্যালয়,—এই তিনটি স্থান দেখিয়া সপ্তাহান্তে বাড়ি ফিরিয়া আসিব। বেশি মালপত্র সঙ্গে ছিল না। তবু বাড়ী হাত পা বলিয়াই বুঝি বেশি আনক! প্রথমেই ট্রেনে করিয়া খুর্দা স্টেশনে পৌঁছিলাম। সেখানে চিল্কার মধ্যে একটি দ্বীপে নৌকা করিয়া যাইব। কোনও জমিদার বা ছোটখাটো রাজার বাড়ি হইবে। আমাদের তো এক রাত্তির বাস। লোকজন যাহারা ছিল তাহারা সমাদরে উপরে থাকিবার ঘর খুলিয়া দিল। শুক্ল পক্ষ। বোধ হয় পূর্ণিমা তিথি ছিল যে দিন। সকলে ছাদের উপর শুইয়া তোর বেলায় উঠিলাম। তারপর যে নৌকা করিয়া আসিয়াছিলাম তাহাতেই পুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইলাম। সুভাষ তখনই আমাদের নেতা, তাহার উপর গায়ক। "আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান" এবং আরও একটি গান বারবার সকলে মিলিয়া গাহিয়া ফিরিলাম—চিরস্মরণীয় সেই প্রত্যূষ কাল। তাহার পর অনযোগ সমাপনান্তে চিল্কা ত্যাগ করিয়া জগন্নাথ বাসে পৌঁছিলাম। সেখানে সুভাষদের বাড়ি "জগন্নাথ বাস" তখনও নির্মিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এখানেও সকালবেলায় সমুদ্র তীরে বসিয়া সদ্য প্রকাশিত ভারতবর্ষ হইতে "যেদিন সুনীল জলধি হইতে—" সুভাষের মধুকণ্ঠে গান আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিলাম।

কটকে ফিরিবার পথে সত্যবাদী বিদ্যালয় দেখিয়া আসিলাম। সুভাষের সঙ্গে উৎকলমণি (তখনও এই নাম হয় নাই) গোপবন্ধু দাসের জানা শুনা কিছুটা ছিল। আমরা দেখিয়া অবাক হইলাম। জাতীয় বিদ্যালয় সত্যই দরিদ্র দেশের উপযোগী বটে। চার আনা করিয়া ঘর ভাড়া—cost rent। শারীরিক ব্যায়ামের প্রচুর আয়োজন। একসঙ্গে ও এক মনে দৌড়ানোর ব্যবস্থা আছে। স্বাস্থ্যকর অথচ সস্তায় খাওয়া। এই গ্রাম শাসনী গ্রাম, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অগ্রহার গ্রাম। এখানেই পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানে গ্রামবাসীরা বিদ্যালয় গোড়াইয়া দিয়াছিল; কিন্তু জাতীয়তার অমর মন্ত্র আবার নূতন করিয়া কানে শুনাইল। নারিকেল বৃক্ষ পরিবেষ্টিত দীঘিগুলিই বা কি সুন্দর! সমগ্র ভারত যে জাতীয়তার সূত্রে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল।

কটক ফিরিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলাম। নূতন সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ কিশোরের দল।

———

সাঁওতালের সহপাঠী

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

(৬)

কথাটা মামার কানে গেল। আমাকে ডেকে বল্লেন "মস্তবড় শিকারী হয়েছিস্ শুনলাম, বাঘের বাচ্চা ধরে এনেছিস? কিছুদিন অপেক্ষা কর বয়স কিছু বাড়ুক, তার পরে ওসব করিস্। হ্যারে, বাঘ কখনো দেখেছিস?" বল্লাম, দেখেছি—জুঁতে।" শুনে মামা হাসলেন, বল্লেন "খাঁচায় পুরলে বাঘের চেহারাটাই থাকে বাঘের মত। আর কিছু থাকে না, খাঁচায় বাঘের হাঁকডাক শুনলে মানুষ হাসে, বনের বাঘের হাঁক শুনলে বীরপুরুষের বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। বনে যখন এসেছিস্ তখন বাঘ একদিন দেখবি, তবে এখন নয়। আর কখনো বাঘের আস্তানায় যাস্ নে—সাবধান।" বল্লাম "না আর যাব না।" খুশী হয়ে মামা বল্লেন "যা, তোর বাঘের বাচ্চা নিয়ে আয়—দেখি।"

ছুটলাম মিতুর বাড়ী। বাড়ীতেই ছিল সে, বল্লাম "বাচ্চাটা নিয়ে চলো—মামা দেখতে চেয়েছেন।" ঝুড়িতে বসিয়ে বাচ্চা নিয়ে রাখলাম মামার সামনে। দেখে মামা বল্লেন "দু মাসের বাচ্চা মাংস খায়—ওকে মাংস খেতে দিবি। আর ওকে দিন রাত আটকে রাখিস যে, উঠোনে ছেড়ে রাখবি, নিজের খুশীমত বেড়াবে। বাঘের বাচ্চা বাঁচানো বড় মুস্কিল রে—কত বাচ্চা যে পুষেছি, কিন্তু একটাও বাঁচাতে পারিনি। এ'তো চিতেবাঘ, একবার পেলাম একটা বড় বাঘের বাচ্চা—খুব ছোট। দুধ খাইয়ে বড় করলাম তারপরে দু'মাস বয়স হলে মাংস দিতে লাগলাম, খাওয়ানোর পেসেন্সটা হোলো না আর কিছু হোলো বুঝতে পারলাম না, মরে গেল।" হাত বাড়িয়ে মামা ঝুড়ি থেকে বাচ্চাটা তুলে নিয়ে মাটিতে বসিয়ে দিলেন। এদিক ওদিক চেয়ে সে একপা দুপা করে মামার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। মামা ডাকলেন "আয় বাঘা আয়।" ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো বাচ্চাটা। মামা জিজ্ঞাসা করলেন "কি নাম রেখেছিস?" নাম তো কিছু রাখা হয় নি—জানালাম তাঁকে। মামা মাথা নেড়ে বল্লেন "নাম চাই। একটা নাম রেখে সেই নাম ধরে সব সময় ডাকবি। তাহলে নামটা ওর জানা হয়ে যাবে।" কি নাম রাখবো ভেবে পেলাম না। বাঘের নাম রাখা তো সহজ নয়। আমার অবস্থাটা অনুমান করে মামা বল্লেন "আচ্ছা, আমি একটা নাম রেখে দিচ্ছি। ওর কপালে ঐ কালো দাগটা তিলকের মত দেখাচ্ছে, ওর তিলকা নাম হোক।" নাম খুব পছন্দ হোলো আমাদের। মামা ডাকলেন "আয় তিলকা আয়।" তিলকা আবার এগিয়ে চল। মামা খুশী হয়ে বল্লেন "বুদ্ধিমান বাঘের বাচ্চা, ডাকামাত্র বুঝতে পেরেছে। খুব সাবধানে রাখবি আর মাংস খাওয়াবি।"

একটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল, ভয়ে ভয়ে বল্লাম "মাংস খাওয়ালে কি দোষ মানবে? একটু বড় হলে হালুম করে আমাদেরই ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।" শুনে মামা হো হো করে হেসে উঠলেন, বল্লেন "মাংস খেলেই বুঝি হিংস্র হয়! তুই মাংস খাস্নে? মুরগুলো মাংস খায় না? তা নয়, মাংস খেলেই হিংস্র হয় না। আদর যত্ন করলে, সব সময় কাছে রাখলে বাঘও পোষ মানে। মানুষকে চিনলে আর মানুষের ঘাড়ে হালুম করে লাফিয়ে পড়ে না। তবে বাঘের

যে স্বভাবে তা কি যায়, দিয়ে গেলে পোষা বাঘও শিকার ধরে খায়। আগেকার দিনের সৌখিন বড়লোকেরা শিকারী চিতে পুষতো। মানুষকে তারা কিছু বোলতো না, বনে নিয়ে ছেড়ে দিলে হরিণ ধরে আনতো। সে চিতে আর এ চিতে এক নয়, তারা আর এক জাতের।" বাচ্চাটাকে আবার খুন্তিতে তুলে নিয়ে মাথা নেড়ে বল্লেন "নিয়ে যা। ওর গলায় কখনো শিকল দিসনে, গলায় শিকল দিলেই বাঘ ক্ষেপে যাবে। রবিবাবু কি বলেছেন মনে আছে? বাঘের বাচ্চারে বাঘ না করিনু কি শিখায়ু তারে।" বলে মাথা নাড়তে লাগলেন।

মামার হুকুম, বনে বেড়ানো কিছুদিন বন্ধ থাকলো। দুপুর বেলা চলে যাই মিতুর বাড়ী। তিলকাকে ছেড়ে দি আড়িমায়, সে দুরে ঘুরে বেড়ায়। মিতু যায় শিকার করতে। ঘরের সামনে রোদে বসে বাঁশ কেটে ধনুক বানায় মিতুর বাপ তিতু। বুড়ো মানুষ তিতু. খাটের উপর বসে হয়েছে। এখন আর শিকারে বেরোয় না। ঘরে বসে ধনুক তৈরী করে। তার পাশে বসি। সে কতরকম গল্প করে। তার ছেলেবেলাকার কথা, যৌবনের কথা, শিকারের কথা। বলে—এই বন দেখে তোমরা ভয় পাও; তাবো কি ভয়ঙ্কর বন, বনতো অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে, পথ তৈরী হয়েছে, গ্রাম গড়ে উঠেছে। যে বন দেখেছি আমাদের ছেলে-বেলায় সে বন তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। কেবল পাহাড় আর বন, লোক নাই, লোকালয় নাই, মাঝে মাঝে সাঁওতালদের দু'চারখানা কুঁড়ে ঘর। রেলের লাইন তখন এদেশে আসে নাই। যেখানে এখন রেলস সেখানে তখন দোকান ছিল কয়েকখানা, সপ্তাহে একদিন হাট বসতো, আমরা বার-চোদ্দ মাইল বন পার হয়ে হাটে যেতাম চাল, নুন, তামাক কিনতে। বাইরের লোকের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই ছিল না, আমরা ছিলাম যেন আর এক রাজ্যের লোক। সাঁওতালী কথায় আমাদের বলে বীরহর অর্থাৎ বনের মানুষ। সত্যিই আমরা বনের মানুষ, বনে আমাদের জন্ম হয়, বনে আমরা জীবন কাটাই, আবার সেই বনেই আমরা মরি।

আশ্চর্য হয়ে শুনি তিতুর গল্প। সে বলে যায়—আমরা বনের মানুষ আর বনের পশু পাশাপাশি বাস করতাম। আমাদের মধ্যে যেমন শত্রুতা ছিল তেমন মিতালিও ছিল। আজকাল যেমন পথ চলতে মানুষের সঙ্গে দেখা হয়, তখন পথ চলতে বাঘ ভালুকের সঙ্গে দেখা হোতো। বাঘ ভালুক সাধারণত মানুষকে সমীহ করে চলে, মানুষ দেখলে পাশ কাটায়। আবার মাঝে মাঝে মুখে এসেও পড়ে। আমরাও পাশ কাটিয়ে চলি। প্রাণ বাঁচাতে হলেই লড়াই করি। এমনও দেখেছি দিনের পর দিন বাঘ ঘরের সামনে দিয়ে আনাগোনা করছে, যেমন পাড়াপড়শীর সঙ্গে দেখা হয় তেমন জল আনতে গিয়ে নদীর ঘাটে, কাঠ কুড়োতে গিয়ে বনের পথে দেখা হোতো—কোনদিন কিছু বলে নি। সে তার কাজে চলে গেছে, আমরা আমাদের কাজে গেছি। আবার বদমেজাজী বাঘও দু-একটা দেখেছি, মানুষ দেখলেই তাদের মেজাজ গরম হোতো। আসল কথা কি জানো, পশু হলেও তারা কে বন্ধু কে দুশমন তা বুঝতে পারে। আগে আমরা ছিলাম বাঘের বন্ধু এখন হয়েছি শত্রু। আগে বনে হরিণ চরতো পালে পালে, বুনো শুয়োর ছিল হাজার হাজার, সহজেই খাবার মিলে যেতো বাঘের। এখন বন ছোট হয়ে আসছে, হরিণ শুয়োর কমে আসছে, বাঘও অনেক মারা পড়েছে। তবু যে দু-চারটে বাঘ আছে তাদের খাবারের জন্যে অনেক সময় বাঘের আগে পাশে পোষা গরু মোষ খুঁজতে হয়, ফলে মানুষের সঙ্গে শত্রুতা হয়।

তিতুর হাতের কাজ এগোয় না, গল্প বলে যায় —কেবল বাঘ ভালুকের কথা বলেই সব কথা বলা

হোলো না, গাছের ডালে ডালে পাখী আছে ওরাও বনের বাসিন্দা। আগে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পাখীর ডাক শুনতে পেতাম, এখন তা পাই না। পাখী কমে গেছে। মযূর তো আমরা প্রায় শেষ করে এনেছি। খেয়ে শেষ করি নাই, কেবল খেলে ওরা শেষ হোতো না, বাজারে ময়ূরের পালকের ভাল দাম, একটা মেরে দিয়ে গেলেই বেশ পয়সা পাওয়া যায়। এ লোভ কি কম লোভ! খুঁজে দেখো, কাছাকাছি ময়ূর দেখতে পাবে না। অনেক দূরে, গভীর জঙ্গলে ওরা পালিয়ে গেছে। সেখানেও ওদের রেহাই নাই। আহা, কি পাখীই টিয়া পাখী, ছোট বড় কত রকম। আগে ঐ সামনে মহুয়া গাছের গর্তে কত টিয়ে বাসা করে ডিম পাড়তো। এখন একটাও বসে না। কেন? আমরা ধরে এনে বাজারে বেচি। বাবুরা টিয়া পাখী খাঁচায় করে পোষে। যে মানুষ আকাশে ওদের ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে দেখেছে সে কি ওদের খাঁচায় আটকে রাখতে পারে। মেরে ফেলা যায় কিন্তু আটকে রাখা যায় না।

আঙিনায় ছায়া পড়ে, বেলা পড়ে আসে, আমি সেদিনকার মত গল্প শোনা শেষ করে বাড়ী ফিরে যাই।

রাজা রামমোহন রায় ও শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফোর্ট সেণ্ট জর্জের লাইব্রেরী থেকে জানা যায়, ইংরেজ ফ্যাক্টরীতে কি কি পুস্তক অধ্যয়ন করা হত। বাইবেল, গার্হস্থ্য চিকিৎসা, বিসূচিকা রোগ, ফ্যাক্টরীর নিরাপত্তার বিষয়; পাকপ্রণালী, খেলাধূলার পুস্তক; জনসনের অভিধান, রসায়নের, কবিতা গল্পসাহিত্য—ডনকুইক্সোট, ম্যাকেকার্সনের ওসিয়ান, প্লুটার্কের জীবনী, সেক্সপীয়ার, মিলটন, রবার্টসন, হিউম, সোলেট প্রভৃতি। এদেশের ভাষার মধ্যে হিন্দুস্থানী। বোধ হয় পারসী-আরবী লেখার সঙ্গে সহজ হয় বলে।

দেশীয় ভাষা তারা শিখছে কেন? এলিজাবেথের উদ্দেশ্য যা ছিল, এদের তা নয়। এলিজাবেথ চেয়েছিলেন, তাঁর প্রজারা ঐ দেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাক; তাদের চরিত্র আর আচরণ মিশিয়ে ওলন্দাজ, পোর্তুগীজ এবং স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হোক। আর ফ্যাক্টরীর মানুষদের দরকার—বেনিয়াদের সঙ্গে, দালাল এবং পণ্য-উৎপাদনকারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা যাতে সরাসরি চালাতে পারে। তার মধ্যে বেছে নিল তারা হিন্দুস্থানী ভাষা, কারণ আরব-পারস্য পথে তার অনেকটা আয়ত্ত হয়ে যায় এবং ফ্যাক্টরীর প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে সঙ্গে তারাও রাজভাষা শিখে নিজের উন্নতি করবে। ফ্যাক্টরী গঠিত হত—নানা স্তরের লোক নিয়ে—(১) এ্যাপ্রেন্টিস, (২) রাইটার্স, (৩) ফ্যাক্টর এবং (৪) প্রেসিডেন্ট। এ্যাপ্রেন্টিস থেকে ফ্যাক্টর স্তর পর্যন্ত লোকের বেতন এবং অন্যান্য পাওনা বড় সামান্য। দারিদ্র্যই বলা যায়। তারপর প্রেসিডেন্ট

যেন বিদেশের চরনদের, রাজা-গজার মতো। প্রেসিডেন্টের ভোগৈশ্বর্যের সামনে দরিদ্র টিকতে পারে না। ভোগস্পৃহা দেখলে ভোগের লিপ্সা বেড়ে যায়। তাই এদের মধ্যে অসাধু বা দস্যু বণিক বা স্বতন্ত্র রোজগারের সংখ্যা (interlopers) বেড়ে গেল।

এই অসাধুতার হাত থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যই ধর্মের অনুশাসন এবং পাদ্রীর ক্ষমতা নিয়োগ করা হল ফ্যাক্টরীতে। পরবর্তীকালে দেখেছি পাদ্রীরা চায় শিক্ষায় দেশীয় ভাষা, আর বণিককুল চায় ইংরেজি ভাষা। এই সন্দর্ভেই আমরা নিম orientalist আর anglicist আলোচনা। ১৬১৪ সালে ডক্টর ফ্রায়ার (Dr. Fryer) ফ্যাক্টরীর প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে লিখছেন ;

"The Presidency of Surat is esteemed superior to all in India" কেবল সুরত কেন সমস্ত ফ্যাক্টরীর প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে তার বক্তব্য,

The President besides these has a noise of trumpets, and is carried himself in a Palanquin, a horse of State led before him, a Mirchal (a fan of ostriches' feathers) to keep off the sun, as Omrahs or great men have, none but the Emperor have a sumbrero among the Moguls : besides these, every one according to his quality has his menial servants to wait on him in his Chamber, and follow him out."

আরার লিখছেন,

"It would be too mean to descend to indirect ways, which are chiefly managed by the Banians, the fittest tools for any deceitful undertaking ; out of whom are made brokers for the Company, and private persons, who are allowed two percent. On all bargains, besides what they squeeze secretly out of the price of things bought ; which cannot be well understood for want of knowledge in their language,...Though the Company, to encourage young men in their service, maintain a master to learn them to write and and read the language, and an annuity to be annexed when they gain a perfection therein, which few attempt, and fewer attain."

কর্মি-রোজগারের জন্য বিদেশী ভাষা শেখা বিরক্তিকর আর তাই কষ্টকর। কাজেই তারা শিখতে চায় না। এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া যায় যদি রাজস্বটা হাতে পাওয়া যায়। হুগলীতে ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে এদের ফ্যাক্টরী স্থাপিত হল, কাশিমবাজারে ১৬৫৮-তে কনসিলাল এজেন্ট নিযুক্ত হলেন, ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মালদহতে ফ্যাক্টরী বসল, ঢাকাতেও আছে। উইলিয়াম হেজ (Hedge) বলে এক সাহেব বিশেষ ভার নিয়ে কোম্পানীগুলি তদারক করতে আসেন। ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে (৩১ অক্টোবর) তাঁর ডায়রীতে লিখেছেন,

"The Company's affairs will never be better but always grow worse with continual patching till they resolve to quarrel with these people and build a fort on the island Sagor at the mouth of this river..." তিনি ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাক্টরী প্রেসিডেন্টকে বলতে বলতে শুনেছিলেন, "The trade of the place could never be on carried and managed to the company's advantage till they fell out with the the government."

এত পরে কেন, তারও আগে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বরের কোম্পানীর চিঠিতে জানা যায়,

"Our late Agent and some of our Captains tells us there is no way to mend our condition by seizing and fortifyng one of those pleasant islands in the Ganges about the Braces." কাজেই বাণিজ্য করা উদ্দেশ্য এবং তা কত নির্বিঘ্নে করা যায় এই থেকে যেসব সাম্রাজ্য গঠন তাদের ছিল, তারা শিক্ষাও ছিল। সাম্রাজ্য গঠন করা হয়ত বা সহজ কিন্তু অপরের ভাষা শেখানো অত সহজ নয়। কোম্পানী রাজত্বলাভ করল, তবু দুর্নীতি ছাড়ানো গেল না। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে মে'তে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা চিঠিতে কোম্পানীর কর্মচারীদের চরিত্র ও ব্যবহার কিরূপ হবে তার নির্দেশ দিলেন। তার ৭২ নম্বরের ধারা এই,

To preserve the ascendancy which our national character has acquired over the minds of the natives of India must ever be important to the maintenance of the political power we possess in the East, and we are well persuaded that this end is not to be served either by a disregard of the external observances of religion or by any assimilation to to Eastern manners and opinions...

তাঁদের দুর্নীতির কথা বিলেতে পৌঁছেছিল দেশীয় সংবাদপত্র ও পত্রিকার মাধ্যমে,

"We are here naturally led to remark exclusive of what relates to the public institutions of religion, that the general tenor of the Indian newspapers and periodical publications which come under our inspection, as well as the private informations which reach this country, concur in exhibiting an increasing spirit of luxury dissipation in our principal settlements, and even at some of the subordinate stations."

পরিবর্তে লর্ড ওয়েলেসলী ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে-তে প্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেন : তারপর মিণ্টো।

এই বিষয়টির উপর দীর্ঘ আলোচনা করবার হেতু এই যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা চর্চার ব্যাপার সংবাদপত্রের কার্যকলাপ এবং ফ্যাক্টরী সভ্যতার অনিবার্য পরিণতিগুলি বুঝে নেওয়া।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা পড়ানোর রেওয়াজ হল। রাইটারেরা পড়বে, সিভিলিয়ানেরা পড়বে। বাংলা গদ্যসাহিত্য লেখা সুরু হল।

একদিকে পাদ্রীর দল শ্রীরামপুর মিশনারীদের মাধ্যমে বাংলাভাষার চর্চা সুরু করলেন। আর একদিকে ফোর্টউলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারীরা তো আর শিখতে চায় না, ঘুসঘাস দ'রে তাদের যে অনিচ্ছা দেখা গেছে। পাদ্রীরা নতুন আগ্রহ পেয়েছেন—মেটিভদের মধ্যে ধর্মপ্রচার। বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন দল বেনিয়ান মুৎসুদ্দিরা, অধিকারেরা। মোটামুটি দুটিই অসাধু ব্যবসায়ী। কিন্তু একদলের সঙ্গে আর একদলের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমাজের সাধারণ লোক 'গামছা-নিংড়ানো' হয়ে উঠলেন। এই সময়ে যদি রামমোহনের আবির্ভাব হয়, তবে স্বভাবতই তাঁর চেষ্টা হবে দেশের মান উন্নয়ন করা। তিনি লক্ষ্য করতে ভুল করেন নি যে, কোন ধর্মচর্চাতেই হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক আর খ্রীষ্টানই হোক সমাজের

উন্নতি সম্ভব নয়। মনে হয় রামমোহন রায় শিক্ষাকে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করে দেখলেন—গার্হস্থ্যের শিক্ষা, বুদ্ধিমান অথচ দরিদ্র হিন্দুর শিক্ষা এবং নতুন কালের আবশ্যকীয় শিক্ষা। তিন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই চালু থাকা দরকার। এ্যাংলো-হিন্দুর শিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজি ধরণের শিক্ষা, বেদান্ত কলেজ এবং হিন্দু কলেজ বা অনুরূপ শিক্ষা মনে হয় এই জন্যই তিনি ইংরেজি শিক্ষা চেয়েছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা চেয়েছিলেন বা দিতে বণিক সরকার আপত্তি করবে জানতেন। জানতেন বলেই, বাংলা ভাষার পত্রিকা সংবাদ-কৌমুদীর মধ্যে তিনি বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করেন। তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ উল্লেখ করা যায়; প্রতিধ্বনি, অয়স্কান্ত অথবা চুম্বকমণি, নক্ষত্র সংস্থান বিবরণ, বেলুনের বিবরণ, মিথ্যাকথন, চিনের প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদি।

বণিকেরা ইংরেজি শিক্ষার কথা লুফে নিল। দেশের উন্নতি ঘটানোর জন্য নয়, দেশীয় 'রাইটার' পাওয়া যাবে বলে (রাইটারের বাংলা তখনও 'করণিক' নয়)। এতে ক্যাইরীর খরচ বাঁচে, লোক পাওয়ার সুবিধে। তবু বাংলা শিক্ষা একেবারে বর্জন করবার মতো সময় তখনও আসে নি। হিন্দুস্থানী ভাষা থেকে বণিকেরা বাংলা ভাষার দিকে এগিয়ে এল, কারণ বাংলাদেশই তখন তাদের কর্মকেন্দ্র। নতুন সমাজরূপ কল্পনা করেছিলেন রামমোহন, আর তাই তিনি য়ুরোপীয়দের শেখার জন্য ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লিখলেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে (Bengalee Grammar)। এই ব্যাকরণের প্রচার বোধ হয় য়ুরোপীয় সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই প্রথমদিকে রামমোহনের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই পুস্তকের নাম ছিল না, নতুনরূপে প্রকাশ করা হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৩০১ সালের পৌষ সংখ্যায়। আর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বইটিরই বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক। বিদ্যালয়ে এই পুস্তকটিই পাঠ্য করা হয় সেই সময় থেকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাকরণটি ইয়োরোপীয়দের শেখাবার জন্যই লেখা।

রামমোহন ইংরেজি, হিন্দী, সংস্কৃত, পারসী এবং বাংলা ভাষায় গ্রন্থ লেখেন দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ উন্নয়ন করবার জন্যই, সেই কথাই স্পষ্ট। কিন্তু বাংলা ভাষার কথ্যরূপ বা বাক্‌ভঙ্গী তিনি গ্রহণ করেন নি। গ্রহণ করেন নি তার কারণ তিনি বেদান্ত গ্রন্থের 'অনুষ্ঠান' অংশে লিখেছেন।

"প্রথমত, বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে।... দ্বিতীয়ত, এ ভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না।.....অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন। .....যাহাদের সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক, আর যাহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন, তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।"

উপরের অংশ থেকে আমরা কয়েকটি বিষয়ের ধারণা পাচ্ছি। তিনি গল্পসাহিত্য লিখতে চান নি। তিনি সংস্কৃত অনুযায়ী বাংলা ভাষা তৈরী করে নিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য লিখলেন। আর তিনি কথ্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ যথা, 'আর' 'কিঞ্চিতো,' 'অধিবেক' প্রভৃতি বর্জন করে উঠতে পারলেন না। বাংলা ভাষার মুরকেও বর্জন করে উঠতে পারলেন না।

বিষয় অনুসারে যে ভাষার রীতি পরিবর্তন করবার স্পৃহা তা আমরা পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের রচনাতে দেখতে পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র ও অনুরূপ প্রয়োগের সমর্থন করেছেন।

কিন্তু নতুন সৃষ্টির পথে 'সংযোজক ক্রিয়া' (Copula) যোগ করলেন। এই ক্রিয়াটি আমরা বাংলা ভাষাতে সাধারণত যোগ করিনা। অচেতন বা গুণবাচক বিশেষ্য কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি ব্যবহার করেছেন। শেষেরটি বোধ হয় বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ছিল। বলতে গেলে রামমোহন সাধুভাষাতেই লিখতে চেয়েছেন, অথচ সাধুভাষা খাঁটি সংস্কৃত ভাষাও হতে পারে না। এ বিষয়ে তিনি খুব সতর্কও ছিলেন। তিনি লিখেছেন,

"বেদান্তশাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃত শব্দসকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে ইহার বোধ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না কারণ বিচারযোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না।"

যুক্তি সমন্বিত করবার জন্য ভাষার বিন্যাসও তাঁকে নতুন উপায়ে করতে হয়েছে এই পদ্ধতি তিনি ইংরেজি ভাষা থেকে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়; বাক্যাংশ বা সহায়ক বাক্য প্রধান পদ বা বাক্যের ঠিক পরই ব্যবহার করছেন:

"ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন, যাঁর যাহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন।"

প্রকৃতপক্ষে, বাক্যের অর্থ বুঝবার জন্য যেমন তাঁকে সংযোজক ক্রিয়া (Copula) ব্যবহার করতে হয়েছিল তেমনি সমগ্র বাক্যের প্রধান অংশকে বুঝবার জন্য তাঁর অধীন বাক্যগুলি ব্যবহার করতে হয়। এখানেও দেখতে পাচ্ছি বাঙলার ভবিষ্যৎ সমাজকে তিনি সামগ্রিক রূপে দেখেছেন—অর্থাৎ ইংরেজও আছেন। মনে হয়, ভারতের মুসলমানদের অবস্থা দেখেই তিনি এরূপ অনুমান করেছিলেন।

পরিশেষে, শিক্ষাসম্পর্কে তাঁর আর একটি নীতির কথা উল্লেখ করব। সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চের সঙ্গে রাম মোহনের যোগাযোগ ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেক জান্ডার ডাফ্ কলকাতায় স্কটল্যাণ্ডের চার্চ কর্তৃক প্রেরিত হন। তখন রাজা রামমোহনের বয়স ৫৮ (ডক্টর জর্জ স্মিথ বলছেন ৫৩, বোধহয় রামমোহনের জন্ম সন ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ ধরে গণনা করেছেন)। ডাফের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ নিয়ে ডাফ এসেছেন শুনে রামমোহন তাকে উৎসাহিত করলেন। ঐ সঙ্গে তিনি বললেন,

"All true education ought to be religious, since the object was not merely to give information, but to develop and regulate all the powers of the mind, the emotions, and the working of the conscience."

প্রকৃত শিক্ষা ধর্মের উপরই নির্ভর। শিক্ষা দেওয়া তো সংবাদ জানানো নয়; শিক্ষা দেওয়া অর্থ মনের সমগ্র শক্তিকে আয়ত্তে, বিবেকের ক্রিয়া পদ্ধতিকে বিকশিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা। শিক্ষার পরমতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর একই উপলব্ধি। তাঁর মনের এই উপলব্ধির কথা যদি আমরা না ধরতে পারি তবেই তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত নানা কাজের খণ্ড আলোচনা করে আমরা উপসংহার করে থাকি তার চিত্তের দ্বন্দ্ব বলে।

বস্তুত রামমোহনের সমগ্র কার্যকলাপ যেমন মূল্যবত্তাপূর্ণ, একটি মাত্র উৎস থেকে উৎসারিত এমনটি সচরাচর শিক্ষাবিদদের মধ্যে চোখে পড়ে না।

শিক্ষার লক্ষ্য : জীবন অভিযোজন

শ্রীকালিদাস বসু

স্বরূপ ও লক্ষ্য :

যে কোন দার্শনিক আলোচনায়, প্রথম যা দরকার তা হল : মূল বিষয় সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি —একটা সামগ্রিক ধারণা। তারপর, এই ধারণার আলোকে ঐ-বিষয়গুলি একবার যাচাই করে নির্বাচন করা চাই, অর্থাৎ, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া। সবশেষে, আলোচনা থেকে মূল সূত্র আবিষ্কার করে সেই ধারার মূল্যায়ন হওয়া দরকার।

শিক্ষাও একটি দর্শন। শিক্ষা-দর্শনের আলোচনাতেও আনুষ্ঠিক এই তিনটি দিকের অবতারণা হওয়া দরকার। অর্থাৎ, (১) শিক্ষার মূল বিষয় সম্বন্ধে উপলব্ধি, (২) ঐ-বিষয়ে নির্বাচন বা স্বীকৃতি, (৩) ঐ-ধারার মূল সূত্রের মূল্যায়ন।

এবারে শিক্ষার মূল প্রশ্ন, তার স্বরূপে আসা যাক। শিক্ষার স্বরূপ পরিবর্তনশীলতা। এখন প্রশ্ন হল : এই পরিবর্তনশীলতার প্রেরণা কোথায়? মানুষের অভাববোধে? আবার এই অভাব বোধ জাগে তার অপূর্ণতা থেকে। এই যে ক্রম-পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমানতা—এ-কোন অর্থহীন বিকাশ নয়, আদর্শাভিমুখী বৃদ্ধি।

এই ক্রমবিকাশ সুনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি—দিগলক্ষ্য উন্নয়ন। উন্নয়নের অর্থ হল : আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বিকাশ,—আত্মবিকাশ। আমার এই উন্নয়ন তত্ত্ব আধ্যাত্মিকতা মণ্ডিত, বাস্তবর্বজিত।

বস্তুজগতে যেমন ভাব, জগৎও তেমনি গতি-শীল, প্রগতিধর্মী। জগতে ও জীবনের এই চলমানতা শিক্ষাকেও করে তুলেছে চলিষ্ণু। জীবন দর্শন ক্রিয়াবাদী, শিক্ষা-দর্শন এই ক্রিয়াশীল জীবনের শক্তির একটি দিক।—শিক্ষা হচ্ছে একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

এই শিক্ষার লক্ষ্যকে দুটি প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে—একটি ব্যক্তি প্রসঙ্গ অপরটি সমাজ প্রসঙ্গ। ব্যক্তির দিক থেকে বিচার্য তার স্বভাব, সামর্থ্য ও যোগ্যতা। আর, সমাজের দিক থেকে চিন্তনীয় তার চাহিদা, সুযোগ ও সুবিধা।

শিক্ষার লক্ষ্যকে অন্য আর একটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে—একটি শিক্ষার অব্যবহিত লক্ষ্য, অপরটি তার সুদূরবর্তী লক্ষ্য। অর্থাৎ, প্রথমটি ব্যক্তির অন্নচিন্তা, অন্যটি তার আত্মচর্চা। শিক্ষার যে-লক্ষ্য অর্থ উপার্জনকে কেন্দ্র করে (অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের সমস্যা নিয়ে) শিক্ষাতত্ত্বে এই জীবিকামুখী লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বিশেষ মতপার্থক্য নেই। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে যত সমস্যা, দার্শনিক কূটতর্ক, এই জীবনমূলক প্রশ্নে,—শিক্ষায় ব্যক্তির আত্মচর্চাকে ঘিরে।

লক্ষ্য নির্ণয়

জীবনের মত শিক্ষাও চলমান। জীবনের লক্ষ্যের মত শিক্ষার লক্ষ্যও পরিবর্তনশীল। জীবন-দর্শনের সঙ্গে শিক্ষাদর্শনেরও রূপান্তর ঘটে,—জীবন-দর্শনের রূপারোপ ঘটে শিক্ষা-দর্শনে।

শিক্ষার লক্ষ্য দেশকাল-আপেক্ষিক। শিক্ষার সংজ্ঞা চিরকাল এক থাকেনি, থাকতে পারে না—যুগে যুগে দেশে দেশে তা পালটেছে সমাজের প্রয়োজনে, জীবনের তাগিদে। শিক্ষা-দর্শনে লক্ষ্য রূপান্তরের পেছনে সব সময় নিয়ন্ত্রণী-ক্ষমতা বিশেষে কাজ করেছে—(১) সমসাময়িক কালের প্রচলিত

জ্ঞান, (২) সমাজে প্রভাবশালী সামাজিকআদর্শের স্বরূপ, (৩) ভবিষ্যৎ সমাজে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ, (৪) মুষ্টিমেয় শক্তিশালী (প্রভুত্বকারী) সমাজ প্রধানদের শ্রেণীস্বার্থ।—শিক্ষা চিন্তায় লক্ষ্য-নির্ধারণে এরা সর্ত হিসাবে শক্তি জুগিয়েছে, সামান্যভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষ পরাবিদ্যা অর্জন করাকে শিক্ষার চরম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করেছে। প্রাচীন গ্রীসে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল : স্পার্টার সবল দেহ ও শক্ত মন, এবং এথেন্সে সুন্দর দেহ ও সুন্দর মন। আর, গ্রীক তার্কিক-পণ্ডিত সোফিস্টদের কাছে শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তি সত্তার বিকাশ সাধন। মধ্যযুগের ইউরোপে শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল ধার্মিক মানুষ সৃষ্টি করা। রেঁনেসাসের ইউরোপে মানসিক বৃত্তির চর্চাকে শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করা সুরু হল।

শিক্ষার লক্ষ্যকে রুশো বললেন আত্মর-ক্ষমতার স্বভাবজ বিকাশ। স্পেন্সারের ভাষায় শিক্ষা হল সম্পূর্ণ জীবন যাপনের প্রস্তুতি। ডিউই ব্যক্তির সমাজীকিকরণ ও তার সামাজিক উপযুক্ততাকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষার সার্থকতা মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে।

এভাবে যথেচ্ছ সংখ্যা কুড়িয়ে লাভ নেই। বরং শিক্ষা-চিন্তার মৌলিক সমস্যাগুলি এবার আলোচনা হওয়া দরকার। শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে এযাবৎ যত দার্শনিক আলোচনা হয়েছে, তাদের প্রতিনিধিমূলক কয়েকটি চিন্তাধারা এখানে সূত্র আকারে রাখা যেতে পারে।

এক। আত্মার মুক্তিই মানুষের চরম লক্ষ্য। অধ্যাত্মবাদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত পর জগতের জন্যে প্রস্তুতি।

দুই। বস্তু জগৎ চরম সত্য। শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত এই জগৎ, তার লক্ষ্য হবে জাগতিক। শিক্ষায় বাস্তববাদের দৃষ্টি—তত্ত্ব ও যুক্তির দিকে।

তিন। চরম সত্য হল 'ভাব'। ভাববাদে সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শে বিশ্বাসী। শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমীম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রেম জীবনের সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া।

চার। চরম সত্য দ্বিবিধ—বস্তু সত্য ও ভাব সত্য। বস্তু ও ভাব—দুইয়ে মিলে পরিপূর্ণ সত্য। ব্যক্তি জীবনের দুটি দিক—যুক্তি ও বিশ্বাসের দিক। এই দুইয়ে মিলেই পূর্ণাঙ্গ মানব। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত পূর্ণাঙ্গ মানব সৃষ্টি করা। শিক্ষাক্ষেত্রে এ-ধারণা 'রিয়্যালিস্টিক' মতবাদের।

পাঁচ। প্রাকৃত সত্তা চরম সত্য। আত্মর-ক্ষমতার স্বভাবজ বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত স্বভাব (প্রকৃতি)-বাদ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রকৃতি-নির্ভর।

ছয়। জগৎ ও জীবন পরিবর্তমান, নিয়ত চলিষ্ণু—সত্য তাই আপেক্ষিক। ব্যবহারিক ভিত্তিতে প্রয়োগবাদ সত্য খোঁজাই করে। এই দর্শনের ভিত্তি মূল অভিজ্ঞতা। এই মতবাদ বিশ্বাস করে : "The end of education is growth, and that the optimum conditions of growth consists in freedom to investigate together with unfettered sharing of ideas in an open system of human association.

অভিযোজনের শিক্ষা

শিক্ষা কি—সংকীর্ণ অর্থে কেতাবী শিক্ষা, জীবিকার শিক্ষা। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা উন্নয়ন প্রক্রিয়া, আদর্শাভিমুখী বৃদ্ধি। শিক্ষার সার্থকতা ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তনে। জ্ঞানার্জন শিক্ষার এই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়ে মাত্র।

শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল তত্ত্ব হিসাবে তাদের যত যৌক্তিকতা থাক, এ কথা সত্য, বাস্তব জীবনে তাদের প্রয়োগ সম্ভব হয়নি।

শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করার আগে চাই বাস্তব

দৃষ্টি-ভঙ্গী। লক্ষ্য নির্ণয় করার আগে এই বিষয়গুলি চিন্তা করে দেখা দরকার : (১) শিক্ষার লক্ষ্যকে পরিবর্তন-সাপেক্ষ হতে হবে ; (২) শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়টি সংযুক্ত থাকা চাই ; (৩) শিক্ষার লক্ষ্য যেন শিক্ষার্থীর আয়ত্তাধীন হয়। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া দরকার সুস্পষ্ট, শারস্পর্শ সমন্বিত।

শিক্ষা যখন জীবনের, আর জীবন যখন পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন, তখন শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত অভিযোজনের, জীবন-অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকৃত শিক্ষা হল : পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন-ক্ষমতাকে ব্যক্তির মধ্যে বৃদ্ধি করা। জীবন-অভিযোজনের এই লক্ষ্যটিকে সামগ্রিকভাবে দেখলে এতে তিনটি 'দল' পাওয়া যায়।—এর জন্যে চাই জীবনের দুরুহতর তিনটি ক্ষেত্রে অভিযোজন (সমষ্টি বিধানের)-ক্ষমতা। তাই, শিক্ষা পরিকল্পনায় অভিযোজনের এই তিনটি দিকে শিক্ষা দেওয়ার যুগপৎ ব্যবস্থা থাকা চাই—

(ক) সুনাগরিক,

(খ) সুগৃহী (পরিবার সদস্য), এবং

(গ) সুস্থ সুখদায়ী কর্মী হবার শিক্ষা। কারণ Life adjustment education is disigned to equip all youth to live democratically with satisfaction to themselves and profit to society as home members, workers and citizens.

উৎস-নির্দেশ :

১। Educational Research—
ed., W. Harris.
২। Education for Life
Adjustment—U. S. Edl. Pamphlet.

শিক্ষা ও জীবনের মান

কত বেড়েছে ? আরও কত বাড়বে ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পল্লীগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহে আমার জন্ম। সেখানেই বাল্যকাল কেটেছে, এ আজ ৬০।৬৫ বছর আগেকার কথা। বাল্যকালে আমরা অতি অল্পে সন্তুষ্ট হতাম। খুব সম্ভব এখনকার বালক বালিকারা তা বিশ্বাস করবেন না। বাস্তবিকই আমাদের Plain living ছিল, high thinking ছিল কিনা বলতে পারি না।

দুর্গা পূজা আমাদের মহাপূজা। এই পূজার সময় বাড়ীর সকলকে, এমন কি দাসদাসী, নাপিত, রজক প্রভৃতিকে নূতন বস্ত্রাদি দিতে হয়, এই প্রথা আমাদের কাল থেকেই প্রচলিত আছে, কিন্তু বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রথার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। প্রধান কারণ আর্থিক অবস্থা, অন্যতম কারণ মানুষের মনের পরিবর্তন ; যাক এ সব কথা।

বাল্যকালে আমরা পূজার সময় একখানি বা দুইখানি সাধারণ ধুতি, একটি সাধারণ ছিটের জামা ও দেশী মুচির তৈরী এক জোড়া জুতা পেতাম। একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলেন কখনও কখনও "কড়েয়ার" জুতা হোত ; এই জুতোর তলার চামড়ার মধ্যে ঘাটি ভরা থাকতো, এক এক জোড়া জুতোর দাম ছিল এক টাকা কি পাঁচ সিকা ; এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন এই ত আমাদের পূজোর পোষাক

পরিচ্ছদ ছিল, কিন্তু বাড়ীতে পূজা হোত পূজার সময় বাড়ীতে হাজার দেড় হাজার নর নারায়ণ পাতা পেতে খেতেন। এই এক জোড়া জুতোতেই আমাদের সারা বছর কাটাতে হোত। বর্তমানে পল্লীগ্রামে দেশী মুচির জুতো তৈরীর ব্যবস্থা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদে আমাদের যে আনন্দ হোত এখনও তা অনুভব করতে পারি আমি মা পোষাক পরিচ্ছদের আনন্দ বেশি ছিল, না মায়ের আগমনের আনন্দ বেশি ছিল। পূজার সময় আমরা যেন বিহ্বল হয়ে যেতাম। সে যেন কি একটা উন্মাদনা ও উত্তেজনা।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। পূর্ব বঙ্গের এক অতি সম্ভ্রান্ত কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে সিংহ পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান (সুসন্তান) কলিকাতায় গৃহ শিক্ষকের কাজ করে নিজের লেখা পড়ার খরচ ও অন্যান্য ব্যয় বহন করতেন এবং দেশে পিতাকেও কিছু কিছু মাসিক আর্থিক সাহায্য করতেন। একবার পূজোতে দেশে যাবার সময় তিনি বাড়ীর সকলের জন্য নূতন বস্ত্রাদি নিয়ে গিয়েছিলেন; পিতা বস্ত্রাদি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "রজকের কাপড় কোথায়?" পুত্র মাথা নিচু করে উত্তর দিলেন "টাকায় কুলোয় নি, আনতে পারি নি।" পিতা তৎক্ষণাৎ বল্লেন "আমার কাপড়খানা রজককে দিয়ে দাও।" পুত্রও তৎক্ষণাৎ স্থানীয় বাজারে গিয়ে রজকের জন্য ধারে একখানা কাপড় কিনে আনলেন, বলে এলেন কলিকাতায় ফিরে মাসের প্রথমেই টাকা পাঠিয়ে দেবেন। এই দৃষ্টান্ত এখন আছে কিনা জানি না; এই সুসন্তান এখনও জীবিত, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতাতেই আছেন; এর ভাইগুলিও বহু, তাঁদের কথা যদি বলি সকলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যাবেন; বাস্তবিকই এদের মা রত্নগর্ভা ছিলেন। এরা দেশে স্কুল, কলেজ স্থাপন করেছেন।

শীতকালে শিশু অবস্থায় আমরা রেজাই বা দোলাই গায়ে দিতাম, একটু বয়স হলে ৩।৪৲ টাকা দামের একখানা মযূরকণ্ঠি রঙের র‍্যাপার পেতাম; গরম কোট খুব কম ছেলের ভাগ্যেই জুটতো; মোজা বুটিং-এর কোন বালাই ছিল না। আর রবীন্দ্রনাথই ত বলেছেন ১০।১২ বছর বয়সের আগে তাঁর পায়ে মোজা ওঠে নি।

আমরা মেঝেতে কিম্বা শুকাপোষের ওপর মাদুর পেতে পড়তাম, অনেক ক্ষেত্রে সেই মাদুরও জীর্ণ থাকতো; শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথও মাদুরে বসে সামনে ডেস্ক রেখে লিখতেন; প্রধানতঃ বাদির কাগজ দিয়েই বাড়ীতে আমাদের খাতা তৈরী হোত কখনও কখনও সাদা কাগজের খাতা পেতাম, সেও বাড়ীতে তৈরী; কালির, খাগের বা সরের বা নিবের কলমই আমাদের লেখবার সম্বল ছিল; তখন "ফাউন্টেন পেন" দেখি নি; হাতের লেখার জন্য বাদির কাগজের খাতাই ব্যবহৃত হোত তা' আবার ঘষে করতে হোত; লাইন টেনে কলি বুক রেখে খাতার এক পাতায় প্রথম হাতের লেখা লিখতাম, সেই পাতা শেষ হয়ে গেলে সেই পাতায় আড়াআড়িভাবে আবার লাইন টেনে হাতের লেখার নিয়ম ছিল; একখানা পাতায় এই রকম করে ২।৩ বার লিখতে হোত; একে ঘষা কপি বলে। সাধারণতঃ আমরা পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করে বিদ্যাভ্যাস করতাম।

কয়েকটি পূজা পার্বনে যথা রথ, দোল, চড়ক প্রভৃতিতে দোকান পাট বসতো, এখনও বসে, তবে এখন দ্রব্য সম্ভার খুব বেশি দামী। এই সব পূজা পার্বণে বাড়ীর ছেলে মেয়েদের ও দাসদাসীদের কিছু কিছু পয়সা দেবার রীতি ছিল, যাতে তারা এ সকল দোকান পাঠ থেকে কিছু খেলনা ও খাদ্য বস্তু কিনতে পারে। খাদ্য বস্তুর মধ্যে পাঁপর ভাজা ও গুড়ের জিলিপি ছিল প্রধান। মাথা পিছু এক আনা করে পেলে আমাদের আনন্দ উথলে উঠতো। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা বলি।

একটি বিশিষ্ট বন্ধুর কাছ থেকে এটি শুনেছি। দুই শুভ সম্প্রতি ভদ্রলোক তাঁদের শিশুদের কাছে এক স্থানে গিছলেন, রাত্রে ফেরবার শেষ ট্রেন ধরতে পারলেন না, গল্প শুজব করে কিছু সময় কাটাবার জন্য তাঁরা ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকলেন। ষ্টেশন মাষ্টার মুখ নিচু করে খাতাপত্র লিখেই যেতে লাগলেন, তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলেন না ভদ্রলোকেরা তাঁকে অভদ্র মনে করে প্লাটফর্মে একখানা বেঞ্চের ওপর বসে গল্পসল্প করতে লাগলেন। বেশ খানিকক্ষণ পর ষ্টেশন মাষ্টার বেরিয়ে তাঁদের কাছে এসে বল্লেন "আমাকে ক্ষমা করবেন, খুব গরীবের ছেলে আমি, বছরে একবার ক্যাম্পের সময় পাশের তালা বাবার জন্য বাবার কাছ থেকে একটি পয়সা পেতাম, সারা বছর এই দিনটির প্রতীক্ষায় থাকিতাম। আর এখন ৭ ১০০ টাকা মাইনে পাই। তাই এ কাজ ফেলে কি করে আসি বলুন। কখনও কি আশা করেছিলাম ১০০ টাকা মাইনের চাকরী পাবে!"

কোন নিকট আত্মীয় স্বজন বাড়ীতে এলে ফেরবার সময় বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে এক আনা দু'আনা পয়সা দিয়ে যেতেন; সেই স্মৃতি জড়িত আনন্দ এখনও মনে আছে। কাকা বিদেশে চাকরী করতেন; এখনও মনে পড়ে একবার ছুটির শেষে চাকরীর স্থানে ফেরবার সময় আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন "এবারে ক' পয়সা চাই", আমরা বলেছিলাম "এবারে আমাদের দু'আনা করে চাই।" কাকা আমাদের প্রত্যেককে চার আনা করে দিয়েছিলেন, তখন আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিছলাম। পরে আমরা যদি কাকার কাছে চার আনা করে চাইতাম, কাকা আমাদের আট আনা করে দিতেন। কিন্তু এই কয়েক দিন আগে এক দৌহিত্রীকে (১৫।১৬ বছর বয়স) বললাম "এই বইখানা আলমারী থেকে খুঁজে বার করে দিলে দু' আনা পাবে।" সে বইখানা খুঁজে দিলে না, এখনও দেয় নি; খুব সম্ভব দু'আনায় তার মন সাড়া দেয় নি। এই সেকাল ও একাল। মনে আছে দু'ঘণ্টা ধরে দাদার মাথার পাকা চুল তুলে দিয়েছিলাম, পারিশ্রমিক পেয়েছিলাম দু'পয়সা।

তখনকার দিনে আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতাম। জলখাবার ছিল মুড়ি, গুড়, মাসে মাকে মুড়কি—সঙ্গে নারিকেল থাকতো, কাঠালের সময় কাঠাল থাকতো মাঝে মাঝে কলাও থাকতো, এ ছাড়া বিভিন্ন ফলের সময় বিভিন্ন রকমের ফল খেতাম, তবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়, তখন পাড়াগাঁয়ে যা জন্মাতো তাই। আর একটা কথা। আজকাল যেমন সংসারের লোক সংখ্যা অনুসারে গুণে গুণে আম কিনতে হয়, গুণে আম খেতে হয় আমাদের ছেলেবেলায় তা' ছিল না, গুণে আম খেতে হয় আমরা জানতামই না। সে দিন একজন বল্লেন আমরা পালো দিয়ে এক দাড়ি আম খেতাম। এর মানে মাটিতে বসে আম খাওয়া হতো, আমের আঁটি স্তূপীকৃত হয়ে দাড়ি পর্যন্ত যতক্ষণ না উঠতো, আমরা আম খাওয়া ছাড়তাম না। ভাতের সঙ্গে দেশী শাক সব্জীর তরকারী, মাছ, দুধ থাকতো; হাঁসের ডিমের ডালনা মাঝে মাঝে হোত। অনেক বাড়ীতেই ডিম অস্পৃশ্য ছিল। বাড়ীতে মুরগীর ডিমের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। মাংস প্রচলিত ছিল না বলেই হয়, তখন হাটে বাজারে কাটা মাংস বিক্রীই হোত না; বছরে একবার দুর্গা পূজার বলির মাংস একটু পাওয়া যেতো। পিঁয়াজ দিয়ে রান্না নিষিদ্ধ ছিল, এখনও আছে; এই দিনটির প্রত্যাশায় আমরা সারা বছর থাকতাম। চপ, কাটলেট, কোর্মা, দো-পিঁয়াজী প্রভৃতি কাকে বলে আমরা জানতাম না। তবে আমরা যা' খেয়েছি এখনকার ছেলেরা বিশেষতঃ সহরের ছেলেরা তা খেতে পায় না। আমরা সব জিনিষই খেয়েছি অ-বৃত অর্থাৎ বৃত নয়, বাসি নয়, সবই টাট্‌কা। আর এখনকার ছেলেরা যাদ

মৃত অর্থাৎ বাসি, টাটকা নয়। আমরা পেয়েছি খাঁটী দুধ, দুধের পুষ্ট দই, দুধের চাঁচি ও খাঁকরী, গাওয়া ঘি, খাঁকরি দিয়ে মাখা মুড়ি কি যে উপাদেয় লাগতো তা' বর্ণনাতীত।

বিজয়ার দিন বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রণাম করে আসতে হোত; এখনকার মত ২।৩ সপ্তাহ ধরে বিজয়ার প্রণাম করা চলতো না; আমরা প্রায় দল বেঁধেই যেতাম, প্রণামের পর ২।১ টা নারকেলের সন্দেশ পাওয়া যেতো, কি যে উপাদেয় লাগতো বলতে পারি না। এখন বিজয়ার দিন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে বিজয়াতে কি খেতে দেওয়া হবে এই নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা হয় কত অশান্তি ও দাঁড়াই কোথা।"

শিক্ষাব্রতী রামনারায়ণ তর্করত্ন

শ্রীদয়াময় ভট্টাচার্য

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দীর্ঘকাল ধরিয়া কলিকাতা গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ব্যাকরণ অলঙ্কারের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃতকাব্য ও অলঙ্কারে তাহার অসাধারণ দক্ষতা এবং অধ্যাপক হিসাবে তাহার প্রসিদ্ধি আজ গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়াছে কিন্তু বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ নাট্যকার হিসাবে তিনি সগৌরবে বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার জীবন ও কীর্তির আলোচনায় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার মতাদর্শকে তুলিয়া ধরিলে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সংস্কারে তাঁহার স্থান নির্ণয় করা সহজ হইবে।

১৮২২ খৃঃ রামনারায়ণ চব্বিশপরগণার হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। "বাল্যাবস্থায় দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমান খণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করেন।" ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৩ পর্যন্ত তিনি গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ সালের ২রা মে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন।

তাঁহার শিক্ষকতার প্রশংসা করিয়া সংবাদ প্রভাকর লিখিয়াছিলেন (১৮৫৩, ২৬শে সেপ্টেম্বর) "শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ছাত্রদিগের বাঙ্গালা শিক্ষা অতি সুচারু রূপে নির্বাহ হইতেছে, ইনি অতি সুপণ্ডিত, এবং সংস্কৃত কলেজের একজন বৃত্তিধারি ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভাষা লেখন ও পঠনেও বিশেষ পারদর্শী, পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তক লিখিয়া রংপুরের

কুষ্টিয়ানগরীর বিখ্যাত কৃতিকারী শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় প্রথম প্রাইজ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য মহাশয়ের সংযোগ দ্বারা অভিনব কলেজে বিদ্যালোকে পরিদীপ্ত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।"

১৮৫৫ খৃঃ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর রামনারায়ণের শেষদিনগুলি কিভাবে কাটিয়াছিল 'শিরপুষ্পাঞ্জলি'তে স্বর্গীয় কবিবেদরী রামনারায়ণ তর্করত্ন শীর্ষক প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

"কার্য্যময় জীবন কোন কালে স্থির থাকিবার নয়, তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল, শেষাংশেও সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াও বাটিতে কতক ব্রাহ্মণ বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ কার্য্যের সুবিধার জন্য খৃঃ ১৮৮৪ অব্দের ৩০শে অক্টোবর রবিবার স্বীয় ভবনে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বহু লোকেরা উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সহানুভূতি দেখাইছিলেন। ...।" ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী রামনারায়ণের মৃত্যু হয়।

তাঁহার রচিত পতিব্রতোপাখ্যানের মধ্যে 'শিক্ষাচিন্তার' যে নিদর্শন রহিয়াছে তাহার মূল্য আজও হ্রাস পায় নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন —"এই বহুতরা মধ্যে প্রায় যাবতীয় ভদ্রব্যক্তি এক্ষণে স্ব স্ব পুত্রকে সাদরে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছেন পুত্রেরাও বিবিধ বিদ্যামন্দিরে সংসঙ্গে সদালাপনে সময়পূর্বক অপূর্ব প্রকৃতি হইতেছে কিন্তু এতদ্দেশীয় অভাগা যোষাজাতির প্রতি কেহই দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, ইহারা অন্তঃপুরকে অন্ধকার করিয়া যে বিদ্যা-শিক্ষা করান না এমত নহে অন্যদেশীয়ে যা অতি ধনলোকি ইহারা কহেন কন্যারা কি মনোপর্জন করিবে যে তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান আবশ্যক কিন্তু আমি এই ধনদাস দেশীয়গণকে জিজ্ঞাসা করি ধনই কি কেবল তাহাদিগের সংসার যাত্রার উদ্দেশ্য, বিদ্যাভ্যাস করিলে বোধ বিদূরে উদয় হয়, তাহাতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায় এবং সচ্চরিত্রারূপচন্দ্রিকার প্রচার অন্তঃকরণ কৈরব প্রফুল্ল সুখসাগর, বর্দ্ধমান, সৎপথে দৃষ্টিপাত সাহসিক ব্যাপারের সঙ্কোচ হয়, বিদ্যার এইসকল ফল কি তাহারা দেখিতে পান না অতএব বিদ্যালয়ে স্ত্রী জাতিকে বঞ্চিত রাখা কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। স্ত্রী জাতিকে বিদ্যাশিক্ষা না করাইলে অনেকানেক দুষ্ট দোষ আছে।...

রামনারায়ণ সমাজের শিক্ষক। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের মধ্যে তাহার সমাজচেতনা 'স্ত্রীশিক্ষায়' ভাষণগুলিসংক্রান্ত তাহার নিজস্ব বিশ্বাসেরই প্রকাশ-মাত্র। তৎকালীন সমাজে বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ নিরোধ প্রভৃতি নারীমুক্তি আন্দোলন সক্রিয়ভাবে দানা বাঁধিতেছিল। রামনারায়ণ রচিত সামাজিক নাটক ও প্রহসনগুলির সাহিত্যিক মূল্য যাহাই থাকুক না কেন ইহা যে সমাজের ক্যানসার রোগকে দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই। রামনারায়ণের রচনার মধ্যে প্রাচ্য বিদ্যারই প্রকাশ দেখা যায় তারপ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব তাহার শিক্ষা জীবন উল্লেখ করা হইয়াছে তবুও তিনি সেই যুগের অন্যান্য মনীষীর ন্যায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মেট্রোপলিটান (হিন্দু) কলেজে ছাত্রদিগকে যেরূপ তাহারা উপদেশ দিতেন তাহাতে শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে তাহার অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে স্বজাতি ও মাতৃভাষার প্রতি তাহার ভক্তিস্রোত উচ্ছ্বসিতভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বক্তৃতায় তিনি ছাত্রগণকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন "তোমরা মনোযোগ পূর্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গালাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গালার প্রতি কদাচ

অবাধ্য করিবে না, বাঙ্গালা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা সুতরাং মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্তমানকালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা-জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন আপন দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্যভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ কদাচ উচিত নহে।

এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ প্রকার পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতিষ রাজনীতি ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতেছে। যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষায় সুরূপ যোগ্য হও তাহা হইলে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে পারিবে। তাহাতে দেশীয় ব্যক্তিদিগের যে কত উপকার হইবে তাহা কল্পনাতীত। দেশীয় লোকেরাও তদ্দৃষ্টে অসামান্য উপকৃত হইবে।

এই সুকুমার দেশীয় ভাষা ইহা শিক্ষা করিতে তোমাদিগকে নিতান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না যেহেতু ইহা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা। মাতৃ-অধর হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই ঐ ভাষা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে এবং স্তন্যপান সময়কালেও অনেক শ্রুতিগম্য হয়, পরে মাতা পিতা প্রভৃতি পর সাধারণ সকলেরি নিকট সর্বদা তাহা শ্রবণ করাতে বাল্যাবস্থাতেই প্রায় অর্দ্ধেক অভ্যস্ত হইয়া থাকে, অনন্তর কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া সবার্থ নিয়মে শিক্ষা করিলেই সম্পূর্ণরূপে তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মে।

ইউরোপীয় যবন আর্য্যীয় রাজারা আপনা-দিগের ভাষার প্রতি দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কাহার কাহার নিজ ভাষার প্রতি এতদূর অনুরাগ ছিল যে তাহারা ভদ্রভাষার সম্যক প্রচার করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ভাষার সমুদ্যোগ পাইলেও চেষ্টা করিয়াছে এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা যতদূর পর্যন্ত সম্ভব স্বদেশীয় ভাষাপ্রীতি অনুরাগ রাখিয়া ইহার দৃষ্টান্ত পথে বর্তমান আছেন, কিন্তু এতদ্দেশের দৌর্ভাগ্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় লোকের প্রায় অনেকেই দেশীয় ভাষার প্রতি দ্বেষ করেন, বিদ্যালয়ে বাংলা বিদ্যাশিক্ষা ছাত্রদিগের অভিলাষ অনুসারেই চলিয়া থাকে, যে দিবস ইংরাজী শিক্ষা করিয়া অবসর সময় থাকে ও আলস্য দোষ উপস্থিত না হয় সেইদিনই একবার দেশীয় ভাষার পুস্তক অবাধ্য বুদ্ধিতে গৃহীত হয়, নতুবা হয় না ইহাতে যে কেবল ঐ সকল ছাত্রগণেরই দোষ এমত নহে। তাহাদিগের মাতাপিতাও তদ্বিষয়ে দোষাক্রান্ত হইতেছেন, যেহেতু ইহারা স্ব স্ব সন্তানদিগের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছে কিনা ইহা একবারও দেখেন না বালকেরা ইংরাজী পাঠ্যাভ্যাস করিলেই প্রশংসা করেন।

ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রেমযুক্ত কোন কোন ব্যক্তি কহেন যদি কোন লোক জ্ঞানোপার্জনে অভিলাষী হয় তবে কেবল ইংরাজীশিক্ষা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে, স্বদেশীয় সকলেই ইংরাজী শিক্ষা করুন, কিন্তু আমিই ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আর্য্য ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা ও পরভাষায় বিদ্যাশিক্ষা ইহার মধ্যে তুলন্ত কি, বোধ হয় ইহা বিবেচনা করিলে তাহারা আর এমত কথা কহিবেন না। অতএব ইহারা স্বদেশের প্রতি প্রীতি রাখিয়া যাহাতে আর্য্যভাষার উচ্ছেদ না হয় এমত চেষ্টা করুন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা জন্মভূমিকে জননীর তুল্য বলিয়াছেন, সুতরাং সেই জন্মভূমিকে দুরবস্থা হইতে মোচন করা আর ব্যাধি পীড়িত জননীকে ঔষধ প্রদান ও শুশ্রূষা বিধানাদিদ্বারা সুস্থ না করা তুল্য কথা।

দেশীয় ভাষায় যাহাদের নিতান্তদ্বেষ তাহারা ইংরাজী বিদ্যায় আপনাদিগের গাঢ়তর ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত স্বদেশীয় স্বজনগণের সহিতও ইংরাজী ভাষায় আলাপ করেন; কিন্তু নিজ নিজ

বাটির পরিজনের সহিত আলাপ করিতে হইলে অবশ্যই ইহাদিগের দেশীয় ভাষা অবলম্বিতা হয় তাহার সন্দেহ নাই ; সুতরাং যে ভাষা ব্যতীত সাংসারিক ব্যাপার সমাধা হয় না, তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা বোধ বৈধ নহে, স্বদেশীয় ভাষা ব্যতীত মনোগত অভিপ্রায় প্রায় ব্যক্ত করা যায় না। তাই স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অশ্রদ্ধাকারীকে আরো জিজ্ঞাসা করি উহারা সেকসপীয়ার প্রভৃতি গ্রন্থ যখন পাঠ করেন তখন কি স্বদেশীয় ভাষায় তাহা উদ্যম করেন না ? অগ্রে দেশ ভাষার ভাব গ্রহণ না করিলে কখনই বিদেশভাষার ভাবোদয় হয় না।

অতএব হে ছাত্রগণ তোমরা বাঙলা সাধুভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশকর, এই ভাষা এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা যতদিন পর্যন্ত এতপ্রদেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, ততদিন নানা ইংরাজী গ্রন্থ প্রচার হউক, ততগৌতম শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই এতদ্দেশীয় সাধারণের তাদৃশ রসাস্বাদন হইবে না।"

———

বিদ্যালয় পরিদর্শক

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাসগুপ্ত

বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজ অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। ইহাকে বিদ্যালয়ের সকল দাতাপত্র, হিসাবাদি খুঁটিনাটিভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। তাই 'ইন্সপেক্টর' এই কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে এক উচ্চপদস্থ কর্তাসদৃশ ব্যক্তি আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। পরিদর্শকের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসা অর্থ বিদ্যালয়ের দোষ অনুসন্ধান করিতে আসা সকলে মনে করেন। কাজেই মূল পরিদর্শককে কেহ প্রীতির চোখে দেখেন না। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেছি। আমি কোন বিদ্যালয়ে যাইয়া নিজের মূল ইন্সপেক্টর পরিচয়টি দিলে সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বলিলেন "আপনি আমাদের দোষ দেখাইতে আসিয়াছেন।" মূল ইন্সপেক্টরের সম্বন্ধে এই মনোভাবে বিস্মিত হইয়াছিলাম সেদিন। ইহার কারণ আমরা বিদ্যালয়ে পরিদর্শন করিতে যাইয়া আমরা বিদ্যালয়ের পরিচালনমূলক বিষয়ের প্রতি অত্যাধিক জোর দিয়া থাকি। বিদ্যালয় পরিদর্শনের আসল উদ্দেশ্য গঠনমূলক ও শিক্ষাবিস্তার ব্যবস্থার মূল্য আমাদের কাছে উপেক্ষিত হয়। কোন নূতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সরকারী মঞ্জুরী দান, পূর্ব-প্রদত্ত অস্থায়ী মঞ্জুরীর পূর্ণমঞ্জুরী প্রদান, সরকারী সাহায্য প্রদান, ম্যানেজিং কমিটি গঠন প্রণালী পরীক্ষা করা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণবত্তা লক্ষ্য করা, হিসাব নিকাশ দেখা এই সকল দেখিতে যাইয়া বিদ্যালয়ের অনেক দোষত্রুটি লক্ষিত হয়। এই সকল বিষয়ের সংশোধন করিতে গর্ত দেওয়া হয়। পরিদর্শন কার্যের শিক্ষামূলক দিকটাই প্রায়ই বাদ পড়িয়া যায়। লিখিত পরিদর্শন-মন্তব্যে পরিদর্শকগণের মন্তব্যও যেন অস্পষ্ট, ইংরাজী পাঠদান যথাযথভাবে হইতেছে না, গণিত শিক্ষার বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিতে হইবে, হাজীর খাতা দেওয়া হইতেছে না, ইতিহাস পঠনের সময় মানচিত্র দেখাইতে হইবে। এই ধরণের অস্পষ্ট উক্তিতে পরিদর্শন বহি ভরপুর থাকে। শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শক মহাশয় ছাত্রগণকে নিজের ইচ্ছামত কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া শিক্ষকদের অধ্যাপনার

তথাগুণ বিচার করিয়া থাকেন। ছাত্রগণও স্কুল পরিদর্শকের উপস্থিতিতে ভয়ে ভীত হয়, অনেক-ক্ষেত্রে জানিলেও ভয়ে ঠিক উত্তর দিতে পারে না। নীরব থাকে। বিদ্যালয়ের পরিদর্শক এত অল্প সময় থাকেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষাদান পদ্ধতির তথাগুণ যথার্থ বিচার করিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও বিদ্যালয়ের সম্পর্কে কোন গঠনমূলক উপদেশ দান করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

বিদ্যালয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইহার সঙ্গে জড়িত আছেন বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলী, শিক্ষকগণ ছাত্রগণ ও তাহাদের পিতামাতা। তাঁহাদের সকলের যোগ্যতা ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও মঙ্গল। সহযোগিতা ও সংহতি বিদ্যালয়ের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। বিদ্যালয় পরিদর্শকের প্রধান কর্তব্য হইবে তিনি বিদ্যালয়ের গঠনমূলক বিভিন্ন কাজের সহযোগিতা করিবেন এবং সংহতি আনয়নে সাহায্য করিবেন। সুতরাং তিনি বিদ্যালয়ের পরিচালকবৃন্দ, শিক্ষক ও ছাত্রগণের অভিভাবক-দের সঙ্গে মেলামেশা করিবেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে যথেষ্ট সময় নিয়োগ করিবেন। তিনি এইভাবে মেলামেশা ও সহযোগিতার দ্বারা শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে নূতন নূতন ভাব ও উৎসাহ যোগাইবেন। এই ভাবধারা ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষায় আজ সকলের অধিকার। ইহা আজ আর কতক-গুলি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একচেটিয়া নয়। তাই পরিদর্শকের কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাঁহাকে এখন কর্তৃত্ব-সূচক শাসনের পরিবর্তে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদানের দিকে অধিক মনোযোগী হইতে হইবে। তিনি এখন আর কেবলমাত্র শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক নন। তিনি হইবেন শিক্ষকগণের বন্ধু, গুরু ও উপদেষ্টা। ছাত্রগণের সহযোগিতা ও সহায়তা দ্বারা নূতন সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবেন, তিনি তাঁহার কর্তৃত্ব-সুলভ মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীকে সহানুভূতিপরায়ণ ও গঠনমূলক করিলে শিক্ষক ও পরিদর্শকের মধ্যে যে স্বাভাবিক অপ্রীতিকর ভাব আছে তাহা বিদূরিত হইবে। যিনি শিক্ষকগণের মধ্যে ভীতি ও বিরক্তির সৃষ্টি করেন তিনি যথার্থ পরিদর্শক নন, যিনি শিক্ষকগণের মধ্যে তাঁহাদের কাজের সম্বন্ধে গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন ও তাঁহাদের কর্তব্য পালনে প্রকৃত সাহায্য করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ পরিদর্শক।

আজকাল শিক্ষাবিষয়ক দিকটি উপেক্ষা করিয়া পরিচালন বিষয়ে অধিক মনোযোগ পরিদর্শকবৃন্দের দিতে হয়। বিদ্যালয়ের হিসাব নিকাশের গণ্ডগোল পরিচালকবৃন্দের মধ্যে বলাবলি, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার ও মীমাংসা করা পরিদর্শকের মুখ্য কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার কাজটা এখন অনেকটা পুলিশ কর্মচারীদের কাজের মতন। আসল পরিদর্শক বসিয়া যায়। দুঃখের তাহা করিতে পরিদর্শকরা সময় পান না, তাই বিদ্যালয়ের উৎকর্ষের বিচার হইতেছে না। যদি বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান করাই পরিদর্শকবৃন্দের কর্তব্য হয়, তবে শিক্ষাপদ্ধতি ও উৎকর্ষ সাধনের প্রতি তাঁহার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। শিক্ষকগণ যাহাতে তাঁহাদের শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি করিতে পারেন, জ্ঞানের পরিধির বৃদ্ধি করিতে পারেন, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি করিতে পারেন সেই সকল বিষয়ে পরিদর্শকের তাঁহাদের সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। তবে একজন পরিদর্শকই যে বিদ্যালয়ের সমস্ত পাঠ্যেরই একাই পারদর্শী হইবেন এইরূপ আশা করা যায় না। তাঁহার স্কুল পাঠ্যেরও সমস্ত বিষয়ের শিক্ষাদান কর্মের যোগ্যতা থাকে না। আমার মনে হয়, কোন বিদ্যালয় দুই তিন দিন ব্যাপীয়া পরিদর্শন

করা উচিত। স্কুল পরিদর্শকের সঙ্গে থাকিবেন সঙ্গীত, খেলাধুলা, কৃষিকার্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ। তাঁহারা কেবল বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান নিপুণভাবে লক্ষ্য করিবেন বা আদর্শ শিক্ষাদান পদ্ধতিও দেখাইবেন। এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিবেন। পরিদর্শন কার্য হইবে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা। ইহাতে থাকিবে পরিদর্শক ও শিক্ষকদের সমান অংশ। ছাত্রদের অভিভাবক ও জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ও বিশদভাবে শিক্ষা উৎকর্ষ বিষয়ে আলোচনা করা পরিদর্শকের একটি প্রধান কর্তব্য হইবে। এইরূপ সাক্ষাতের জন্য বিদ্যালয়ে সভার আহ্বান করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করিবেন। ইহাতে তিনি বিদ্যালয় সম্বন্ধেও জনসাধারণের মতামত জানিতে পারিবেন। এবং তাঁহাদের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য করিতে পারিবেন। জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক ও জনমতের সাহায্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সফল হইবে, বিদ্যালয় পরিদর্শকগণের প্রকৃত কর্তব্য হইবে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের সমস্যা সম্বন্ধে অবগত হওয়া, ও সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করা, শিক্ষকগণকে উপদেশ ও যুক্তি পরামর্শ দিয়া তাঁহাদের সাহায্য করা, সুতরাং মুদালিয়র কমিশন পরিদর্শককে 'শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা' নামে অভিহিত করা পছন্দ করেন। কমিশন ব্যায়াম শিক্ষা, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনের মতে স্কুল পরিদর্শকের দশবৎসর কাল বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। অথবা তাঁহাকে তিন বৎসর কোন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইতে হইবে। ট্রেনিং কলেজের যোগ্য শিক্ষকগণ পরিদর্শক পদের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তাঁহারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বিদ্যালয়ের পরিচালন ও শিক্ষাদানের সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্কুলের শিক্ষক হইতে পরিদর্শক খুব কমই নির্বাচিত করা হয়। সরকারী বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পদে বদলী করা হয় না। যদিও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা একই। যে ব্যক্তি শিক্ষক হইয়া সরকারী কার্যে প্রবেশ করেন তাঁহাকে সারা চাকুরী জীবন শিক্ষকরূপে থাকিতে হয়। কমিশনের সুপারিশ মতে শিক্ষক ও পরিদর্শকের কাজে বদলী ব্যবস্থা রাখা ভাল। অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা পরিদর্শকরূপে পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন। আবার অনেক পরিদর্শক ভাল শিক্ষক হইতে পারেন। সুতরাং, শিক্ষক ও পরিদর্শকের মধ্যে বদলী সতত বাঞ্ছনীয়। আমি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

CALCUTTA UNIVERSITY
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

শিক্ষা

ম ধি কল্যাণস্তৎ শক্তিঃ ধ্রুবাস্তিং তাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৭২ | ১১শ সংখ্যা

আলোচনা

শারদায় উৎসব

শারদীয় উৎসবে বেসরকারী স্কুলেরই আনন্দ। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে আনন্দের ভাব মেশানো আছে, এবং মুক্তের এলটোর চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইলেও শারদীয় তাহার স্বরূপ লুকাইতে পারে নাই। কর্ম বিরতির একটা মূল্য আছে; ছাত্রদের পক্ষে তাহার মূল্য স্পষ্ট। সুতরাং আকাশ বাতাস ছুটির আমেজের কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিলে তাহা আমাদের হৃদয়কেও স্পর্শ করিবে। আমরা সেই আনন্দ আমাদের লেখক পাঠক গ্রাহক ও অনুগ্রাহক সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইতেছি। আনন্দই হইতেছে শক্তি, তাহা আমাদের সকলকে প্রেরণা দিক। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রেরণার মূল্য এবং ইহার সৃষ্টিধর্মিতা অব্যাহত থাকুক।

শিক্ষকদের ভাতা

সরকারি দুর্মূল্য ভাতা বরাদ্দ ঘোষণা করা হইলেও প্রাথমিক শিক্ষকেরা এখনও সকলে তাহা পান নাই। আমাদের সরকারী দপ্তরের এই বিষয়ে দীর্ঘসূত্রতা বড়ই দুঃখের বিষয়। সম্প্রতি প্রাথমিক ও জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষকদের পূজা খরচ বাবদ দেড়শত টাকা পর্যন্ত অগ্রিম ঢাওলাত দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া খুব ভালই করিয়াছেন, যদিও মাসে মাসে ৮ মাসের কিস্তীতে ঐ টাকা শোধ করিয়া দেওয়া স্বল্পবিত্ত শিক্ষকদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর।

শিক্ষকদের বয়সের উর্ধ্বসীমা

শিক্ষকেরা কত বৎসর পর্যন্ত চাকুরী করিতে পারিবেন? ৬০ বৎসর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সময় সময় শিক্ষকের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক পটুতা থাকিলে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর এক বৎসরের কর্মবৃদ্ধি হিসাব করিয়া পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষকেরা কাজ করিতে পারিবেন।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ৭০ পর্যন্ত উর্ধ্বসীমা বলিয়া ধরা হইবে না কেন?

ভারতীয় শিক্ষাব্রতীর অভিজ্ঞতা

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে বিদ্যার্থীদের মুখস্থ করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে ও এই পদ্ধতির উন্নতি সাধিত হতে পারে।

আমেরিকায়ও বিদ্যার্থীদের লেখাপড়ার মূল্যায়নের পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তা ছাত্র ও শিক্ষকের নিজেদের ব্যাপার। ভারতের পরীক্ষা ব্যবস্থার মত নয়। আমেরিকায় কোন লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। ক্লাসের লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজের মধ্য দিয়া সারা বছরে বিদ্যার্থী সম্পর্কে অধ্যাপকের যে ধারণা সৃষ্টি হয় তারই ভিত্তিতে তিনি তার লেখাপড়ার অগ্রগতির মূল্যায়ণ করে থাকেন।

ভারতীয় পদ্ধতিতে মূলতঃ কোন ত্রুটি নেই। তবে পরীক্ষার ব্যাপারে মুখস্থ বিদ্যা যাতে কোন কাজেই না লাগতে পারে এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করতে হবে। তুষ ঝাড়তে গিয়ে ধানও তুষ হইয়ে ফেলে দিলে তো চলবে না। কোন বিদেশী পদ্ধতি অনুকরণ করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের যা আছে তারই উন্নতি বিধান কি ভাবে করা যেতে পারে তাই আমাদের দেখতে হবে।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এতকাল ইউরোপে ব্যতীত অন্যান্য দেশ সম্পর্কে পড়াশুনা খুব কমই হত। কারণ এই নূতন পৃথিবী ছিল সেই ইউরোপেরই সন্তান। কিন্তু বর্তমানে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যক্রমে ক্রমেই এশিয়া ও আফ্রিকার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বহু বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় বিষয় সমূহের অনুশীলন সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহ দিচ্ছে, যেমন হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, পেনসিলভানিয়া প্রভৃতি। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয় আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ভারতীয় বিষয় সম্পর্কে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। এ পর্যন্ত স্নাতকোত্তর পর্যায়েই ভারত চর্চার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে স্নাতকপূর্ব পর্যায়েও ভারতীয় বিষয় সমূহ অনুশীলনের ব্যবস্থা হচ্ছে। ('ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস' হইতে প্রাপ্ত)।

ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অপূর্ব প্রতিভা বলে যে ভারতের উপযোগী এক নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। তাহা পরীক্ষামূলকভাবে কতিপয় ক্ষেত্রে প্রবর্তন ও প্রয়োগ করিয়া উহার নমুনা সৃষ্টি করা হইয়াছে। নিম্নস্তরের শিক্ষার দরকার তাহা প্রচলন করিতেছেন। কিন্তু তাহা এক প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। কারণ গান্ধীজীর আদর্শ ও বিচার ধারায় যাহাদের তেমন বিশ্বাস নাই তাহাদের দ্বারা উহা পরিচালিত হইয়া থাকে? শিক্ষক শিক্ষণও নিছক আদর্শ পদ্ধতিতে হয় না। আদর্শানুরূপ শিক্ষক নাই। সুতরাং উহা প্রহসনে পরিণত হইবে না কেন? দ্বিতীয়তঃ ঐ শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল মাত্র নিম্নস্তরে রাখিলে কি কাজ হইবে? যদি করিতে হয় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে হটাইয়া দিয়া নিম্নতম হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা সেই পুনর্গঠিত করিতে হইবে ও সর্বক্ষেত্রে উহাতে সরকারের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি থাকা চাই। যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার এরূপ বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সাহসী হন তবে তাহারা আজ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইতেন। নচেৎ বলিতেন যে অবস্থা চলিতেছে তাহা চলিতে দিলে পরিণতি কি যে হইবে তাহা কে জানে?

"সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বেলা দশটা এগারোটা হবে। বাগানে কাজ করছি। উদ্যান-চর্চায় প্রবল ঝোঁক আছে। বাড়ীর সংলগ্ন নয়-দশ বিঘা জুড়ে বাগান। বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, নারকেল, আতা, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের গাছ। অনেক ফুলের মাতাল দিয়ে, অনেক অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে, অনেক রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে ললাটের ঘাম ঝরিয়ে যা সৃষ্টি করা যায় তার প্রতি একটা নিবিড় আকর্ষণ স্বাভাবিক। আমার কাছে বাগানটী ভাই পুত্রের মতোই প্রিয়।

কানে এলো 'হরিবোল', 'হরিবোল'। চমকে উঠলাম। কার জীবনের প্রদীপ নিবলো? কাছে ছিল বেদিক কলেজের মালী কাশেম আলী। সে বললো, "কাকাবাবু, কলেজের ছেলেরা বিষ খাইয়ে কুকুর মেরেছে। মরা কুকুরটাকে নিয়ে ছেলেরা নদীতে চলেছে। ভাসিয়ে দেবে।" চট্ করে আমার মনে এলো, কিন্তু নদীর জলে কেন? কুকুরের মৃতদেহটা আমার বাগানের বেলেমাটির নীচে কোন ফলের গাছের প্রান্তে ঠাঁই পেতে পারে। তাতে ছেলেদের শ্রমের লাঘব হবে, জল ও হাওয়া বিস্তর থাকবে, মাটির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পাবে, ফলের আয়তন ও সংখ্যা বাড়বে। দ্রুতপদে গেলাম ছেলেদের কাছে। তাদের অনুরোধ করলাম কুকুরটাকে আমার বাগানে ফেলে যেতে। ছেলেদের মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করলাম। তবে কি আমি ওদের উৎসাহের উপরে বরফ-গলা জল ঢেলে দিলাম? সেটা কিছু বিচিত্র নয়। দেখলাম কুকুরের গলায় জবার মালা পরানো। ওর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার নাটকীয় পরিকল্পনা আমি ভেঙে দিলাম।

যাই হোক্, ছেলেরা আমার কথা রাখলো। একটা ফলন্ত বাতাবীর ছায়ায় আমার শোক দিয়ে গর্ত খনন করালাম এবং সেই গর্তটার মধ্যে পশুর মৃতদেহ কবর দিলাম। বাতাস ঘুমিয়ে হতে পারলো না, রুগ্ন মৃত্তিকা পুষ্টিকর খাদ্য পেলো, মরা কুকুর উৎকৃষ্ট সারে রূপান্তরিত হ'য়ে গাছটাকে আরও ফলবান হ'তে আনুকূল্য করলো। মাটির ঊর্ধ্বে যে তাজমান মৃতদেহ নদীর জলকে কলুষিত করতো ভূস্বর্গের অন্ধকারে সেই একই মৃতদেহ দেশের ফল-শস্য বৃদ্ধির পথে সহায়ক হোলো।

আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে আট দশ বিঘা জমির মালিক করেছেন। কৃষ্ণ জমি যাতে বালির ভাগই বেশী। বালি নয় শুধু; কাশের প্রাচুর্য। গ্রামের লোকেরা বলে কেশে। রবীন্দ্রনাথের কত কবিতায় কাশের গুচ্ছের ছড়াছড়ি। বহরমপুর জেলে শরতের সোনার আলোয় যখন প্রসন্ন প্রভাত ঝলমল করতো তখন কাজী নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হোতো, "আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ।" আশ্বিনের হাওয়ায় 'জলদরি তীরে তীরে তরঙ্গায়িত শুভ্র কাশবন কতদিন চোখ জুড়িয়ে দিয়েছে। শহরের পাষাণ মরু থেকে মাটির কোলে এসে যখন চাষীর ভূমিকায় প্রথম নামলাম নতুন অভিজ্ঞতা কুড়ালাম। কাশের গুচ্ছ কবিতায় পড়তে, গানে শুনতে এবং নদীতীরে দেখতে খুবই ভালো; ফসল খেতে কাশ বা কেশের অস্তিত্ব একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। রাক্ষসীর মতো ওরা মাটির সমস্ত রস খেয়ে ফেলে। কেশের শিকড় মাটির নীচে আড়াই হাত তিন হাত চলে যায়। সেই শিকড়গুলি তুলে ফেলে জমিতে ফসল ফলানো একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কিন্তু বাচতে শেখে উঠোন বন্ধুর বলে নিজিয়ে আমার কোন মানে হয় না।

কৃষকের নতুন জীবনের অভিযান সুরু হোলো দুঃখকে সাথের ক'রে। পল্লীগ্রামে এসেছিলাম শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে কাব্যময় জীবন যাপন করতে। বসুমতীকে দেখ্‌তাম স্নেহময়ী জননীর মতো। আমার অন্ন প্রভাতেই চারাগুলি পল্লবিত হ'য়ে সুন্দর প্রান্তরটাকে একটি সুন্দর উদ্যানে রূপান্তরিত করেছে। অন্তরাকাশে অবনত শাখায় শাখায় প্রাচুর্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, সম্পদলক্ষ্মীর আশীর্বাদ!

আমার স্বপ্ন ভাঙ্‌লো। কঠিন বাস্তবের মধ্যে জাগরণের সেই মুহূর্তে স্বতঃই মনে পড়লো এ্যাডাম্ আর ঈভের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপের কথা: Woman must bring forth children in sorrow and man must eat bread in the sweat of his face. নারী চরম বেদনার মধ্যে সন্তান প্রসব করবে আর পুরুষ ললাটের ঘর্ম ঝরিয়ে ফসল ফলাবে—এই অভিসম্পাত মাথায় নিয়ে তাঁর নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হোলো আদিম মানব আর মানবী। সুরু হোলো পশুপালন, সুরু হোলো মাটির বুকে ফসল উৎপাদনের কর্মযোগ। স্বর্গের উদ্যানে ফল কুড়িয়ে জীবন-যাপনের সুখময় পর্ব ফুরিয়ে গেল দুঃখ ব্যথার মধ্যে নব নব সৃষ্টির সৌরবে। জীবন-নাট্যে মানুষের ভূমিকা সেখানেই মহত্ত্বের মহিমায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে যেখানেই বেদনার বিষে সে নীলকণ্ঠ, কাঁটার কণ্ঠহারে সে ভূষিত, দুঃখের গৌরবে সে মুকুটিত। সে খ্রীষ্টই হউন অথবা গান্ধীই হউন, গ্যেটের ফাউস্ট্‌ই হউন অথবা বাল্মীকির রামচন্দ্র হউন।

ভূমির অনুর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জীবন সুরু হোলো। চেয়েছিলাম নীল নির্মল আকাশের নীচে গাঢ়-সবুজ শ্যামল শোভার মধ্যে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি থাকতে। মাটির গন্ধ, তারার আলো, ঝর-মর্মর, বাতাসে মধু, উর্ধ্বে তেসে-চলা রোদ্রী মেঘের তন্দ্রা! এই সুন্দর পরিবেশে প্রশান্ত জীবন-যাপনের শান্তি কখনোই শিল্পক আরামের পথে আসতে পারতো না! এই শান্তিকে যথোচিত মূল্য দিয়ে অর্জন করে নেবার সত্যটি বিশ্ব-শিল্পের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল। যেখানেই আরামকে আকড়ে থাকার ইচ্ছা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বলবতী হ'য়ে ওঠে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে আমরা খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠি, পথ থেকে পালঙ্কের দিকে পা বাড়াই তখনই জীবনের দুর্বার গতিবেগ হারিয়ে আলস্যের মধ্যে, নির্জীব শান্তির মধ্যে আমরা আত্ম হয়ে যাই। জীবনের বিচিত্র নাট্যলীলায় যেখানে বাধার পর বাধা আছে এবং সেই বাধাগুলিকে জয় ক'রে শিখর থেকে শিখরে চলার সাহস এবং বীর্যও আছে, ঐতিহাসিক টয়েনবীর ভাষায় যেখানে Challenges and response-এর এই নাট্যের অভিনয়ে কোথাও পূর্ণচ্ছেদ সেই সেখানেই শুধু সভ্যতার বিকাশ ব্যাহত হবার নয়! রবীন্দ্রনাথের কবিতার পর কবিতায় দুঃখের জয়-গান ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। "আমি বিপদ আমি আঘাত আছে, তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ আছে"—এই সুরটিকে রবীন্দ্রনাথ কত বিচিত্র ভঙ্গীতেই না প্রকাশ করেছেন গদ্যে এবং পদ্যে! হুইটম্যানের Leaves of Grass-এ সংগ্রামের পথে চলবার উদ্দীপ্ত আহ্বান! ব্রাউনিং-এর কাব্যেও দুঃখ-ব্যথার জয়-শঙ্খ ঘোরালো সুরেই বেজে উঠেছে আর এ কথা আমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাবোনা যে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের অধ্যাপনায় ব্রতী না থাকলেও ইতিহাসের মনোযোগী ছাত্র ছিলেন এবং মানুষের জয়-যাত্রার ইতিহাস থেকে অনেক মাল-মসলা কুড়িয়ে তিনি সেই উপাদানগুলিকে কাব্যময়ী ছন্দে গেঁথেছেন। কোথায় যেন পড়েছিলাম, The function of history is to lend materials to politics and to poetry. লেখকের নাম মনে পড়ছে না!

কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর আর বাড়াবোনা।

হুকুরের শব-যাত্রা দিয়ে লেখা সুরু করেছিলাম! একটা ব্যাপার আমার ইদানীং মনেক চিন্তিত ক'রে তুলেছে। আমাদের বেসিক স্কুলের বা স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা moral seriousness-এর অভাব লক্ষ্য করছি! শ্রমকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা, অধীত বিদ্যাকে জীবনে কাজে লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহের দৈন্য, lotus-eater সুলভ একটা গদ্য-গন্ধ তার! শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "যেন চিঁড়ের ফলার, আট নাই, জোর নাই, ত্যাৎ ত্যাৎ করছে!" অথচ আজকে আমাদের দেশে, এই দুর্বার্ত হতভাগ্য দেশে ফসলের প্রাচুর্যের কতই না প্রয়োজন আছে! Woodroffe কতকাল আগে Bharat Shakti তে লিখেছিলেন, If India is fed India will be herself again, and will be strong of mind and body. শরীরে আর মনে দুর্জয় শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে প্রয়োজন আছে প্রচুর ও সুসমখাদ্যের এবং এই প্রাচুর্য আনবার জন্যে দরকার জ্ঞানের সঙ্গে কর্মকে মেলানো। এই মিলনেই কি আচার্য বিনোবার ভাষায়, দুনিয়াদী শিক্ষার সার্থকতা নয়?

আদর্শ শিক্ষক গোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

গোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা আমরা গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তিনি বালি-নিবাসী এবং আমাদের নিতান্তই আপন ছিলেন। তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী, সৎশিক্ষা দিয়া ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবেন এই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। এই মহান্ আদর্শের সাধনা লইয়া তিনি জীবন আরম্ভ করেন এবং এই সাধনে পথের-যাত্রী থাকিয়া তাঁহার জীবনের কার্য শেষ হয়। অর্থের মোহ বা সম্মানের আকর্ষণ তাঁহার কর্তব্যপথে বাধা হইতে পারে নাই। গোকুলবাবুর পিতা ছিলেন বালি পঞ্চানতলা-নিবাসী হরনাথ-বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি লক্ষ্ণৌ-এ মিলিটারি একাউন্টস্ বিভাগে কাজ করিতেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে গোকুলবাবুর জন্ম হয়। তাঁহার লেখাপড়া এই স্থানেই আরম্ভ হয়। হরনাথবাবু পরে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। গোকুলবাবু তখন কলিকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয় হইতেই তিনি ১৮৯৬ সনে এন্ট্রান্স এবং তারপর এফ. এ., ও বি. এ. পাস করেন। পরে ১৯০২ সনে কলিকাতা ভাফ্ কলেজ হইতে তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভাফ্ কলেজে, আদর্শ শিক্ষক সুবিখ্যাত ধার্মিক পণ্ডিত স্টিফেন সাহেবের ছাত্র হইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তারপর তিনি আইনের প্রথম পরীক্ষা পাস করেন। কিন্তু ওকালতী পছন্দ নয় বলিয়া তিনি আইন পড়া ছাড়িয়া দেন।

গোকুলবাবু প্রথম শিক্ষকতা করেন কলিকাতা আর্য মিশন বিদ্যালয়ে। এই সময় বালির স্বনামধন্য শান্তিরামবাবু একদিন তাঁহাদের পঞ্চানতলার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং গোকুলবাবুকে বালি রিভার্স টমসন স্কুলে (বর্তমান শান্তিরাম বিদ্যালয়) শিক্ষকতা করিবার জন্য আহ্বান করেন। তাঁহার আহ্বানে ১৯০৩ সনে গোকুলবাবু রিভার্স

টমসন স্কুলে যোগ দেন। ১৯০৩ হইতে ১৯০৭ সন পর্যন্ত তিনি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে একটি সুশিক্ষিত পরিবেশের সৃষ্টি করেন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মধ্য দিয়া ছাত্রগণের তরুণ হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা, তাঁহার সমদর্শিতা, কঠোর শ্রম উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও ধর্মবোধ, চরিত্রের মাধুর্য ও গাম্ভীর্য, কর্তব্যপরায়ণতা, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা, সন্তোষ, জীবনযাত্রার প্রসন্ন সরলতা এবং শিক্ষাদানের আগ্রহ ও কুশলতা প্রভৃতি গুণে ছাত্রগণ তৎপ্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইত এবং গোকুলবাবুর ছাত্র বলিয়া গৌরব বোধ করিত। ১৯০৬-৭ সনে তিনি রিভার্স টমসন হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। এই সময়টা বাংলার স্বদেশী যুগের প্রথম পাদ। স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্কল্প এই যুগসন্ধিকালে বাঙালী যুবকের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯০৭ সনে বাগি স্কুলের সহিত তাঁহার যোগ শেষ হয়। ছাত্রগণ গভীর দুঃখে তাহাদের আপনজন এই আদর্শ শিক্ষককে বাধ্য হইয়া বিদায় দেয়। তাহারা অনুভব করে তাহাদের এই ক্ষতি অপূরণীয়।

গোকুলবাবু তৎপরে এলাহাবাদে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কাজ পান। কিন্তু তাঁহার শিক্ষাব্রতীর হৃদয় যেমন ওকালতীর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, তেমনই এই কার্যেও সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। এই কাজের মধ্যে তিনি একটা শূন্যতা ও অতৃপ্তি বোধ করিতে থাকেন। তাই কিছুকাল পরে তিনি কাজ ছাড়িয়া দেন এবং আপন বাহিত পথে ফিরিয়া আসেন।

ইহার পর ভাড়া বিদ্যালয়ে দিন কতক শিক্ষকতা করিবার পর তিনি ভদ্রেশ্বর তেদিনীপাড়া হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগ দেন এবং গভীর পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতা সহকারে কাজ করিয়া বিদ্যালয়টিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করেন। ১৯১১ সনের শেষের দিকে তিনি বালুরঘাট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। পরে ১৯১৩ সনে দড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে দর্শনের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন এবং ১৯৫৫ সন পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এই কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই কলেজে তিনি ক্রমে অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভের পর দড়াইল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৫ সনে দড়াইল কলেজ হইতে অবসর লইয়া তিনি নিজ গ্রাম বালিতে চলিয়া আসেন। দড়াইলে অবস্থানকালে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রই তাঁহার সমুন্নত চরিত্রের দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইত এবং তাঁহাকে প্রকৃত গুরুস্থানে ভক্তি করিত। জীবনের প্রধান ভাগ তিনি দড়াইলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় যাপন করেন। এই সময়ে তিনি বহু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের সমধিক আলোচনা করিয়া গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি অনেক কবিতা ও নাটক লিখিয়াছিলেন—তন্মধ্যে কয়েকটি নাটক ধর্মমূলক। অর্থাভাবে সেগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই।

তিনি কবিতায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপাদেয় বঙ্গানুবাদ করেন—অনুবাদ যেমন সরল তেমনই প্রাঞ্জল। ডাক্তার পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও কিরণচন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ তাঁর কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে ও বাগি সাধারণ গ্রন্থাগারের সহযোগে, তাঁহার এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থখানি সংকর্তৃক প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। গ্রন্থখানি তাঁহার পাণ্ডিত্য, সাধনা ও লেখন-শক্তির সাক্ষ্য বহন করে।

১৯০৭ সনে গোকুলবাবু যখন রিভার্স টমসন স্কুল হইতে বিদায় লন তখন তাঁহার ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দিবার জন্য অল্প কিছু চাঁদা তুলেন। তিনি এই অভিনন্দন গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রিয় ছাত্রদের ঐ অল্প

অর্থবলে দরিদ্রের সাহায্যার্থে কোন কিছু সৎ চেষ্টা আরম্ভ করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে রিভার্স টমসন স্কুলে "গোকুল ভাণ্ডার" স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রাক্তন ছাত্রদের সহযোগিতায় গোকুল ভাণ্ডারের চাঁদা আদায় করিয়া প্রায় ১২ বৎসরকাল এই ক্ষুদ্র কল্যাণ-প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত করেন। বর্তমান বালি সেবাসমিতি এই গোকুল ভাণ্ডারের সহিত বালি অনাথ ভাণ্ডার ও সাহায্য ভাণ্ডারের মিলনের পরিণত রূপ।

গোকুলবাবু আপনাকে কখন প্রচার করেন নাই। নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি আপন নিষ্কামভাবে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটি সরল হাসি ও প্রসন্নতা সর্বদাই বিরাজ করিত। ভগবানকে স্মরণ করিয়া, তাঁরই মনন, চিন্তন ও ভজন করিয়া, তাঁহাতেই কর্ম সমর্পণ করিয়া এই নীরব সাধু গৃহস্থ তাঁহার অনাড়ম্বর পুণ্য জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৯৫৭ সনে ১লা এপ্রিল বালিতে তাঁহার গঙ্গালাভ হয়। গোকুলবাবুকে স্মরণ করিলে বালির পুণ্যশ্লোক ৺প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। স্মরণ হয় শাস্ত্রের সেই কথা—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

যাঁহাদের পুণ্যে সংসার ও সমাজ টিকিয়া আছে গোকুলবাবু সেই দলের লোক ছিলেন। ছাত্র হিসাবে অন্যান্য সতীর্থদের সহিত আমি তাঁহাকে একান্ত ভক্তিভরে প্রণাম করি।*

গোকুলবাবু কৃত গীতার বঙ্গানুবাদ হইতে কয়েকটি শ্লোক

অর্জুন শ্রীভগবানকে বলিলেন—

না পারি বুঝিতে ধর্ম ; হয়েছি কাতর,
জিজ্ঞাসি তোমারে তাই, হে আর্তত্রাণ,
কহ মোরে সুনিশ্চিত যাহা শ্রেয়স্কর ;
শিষ্য তব, দেহ শিক্ষা, লইনু শরণ। ২।৭

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন—

জীবের এ দেহে যথা হয় দশান্তর,
শৈশব যৌবন জরা আসে পর পর,
তেমনি মরার পর আসে যে মরণ
অধীর না হয় তায় সুধীর যে জন। ২।১৩
সমুদয় বিশ্ব যিনি আছেন ব্যাপিয়া,
অবিনাশী জানিও তাঁহারে।
ইহাই অব্যয় আত্মা, ইহার সংহার
এ সংসারে কে করিতে পারে ? ২।১৭
পরিহরি জীর্ণ বস্ত্র মানব যেমন
করয়ে গ্রহণ অন্য নূতন বসন,
তেমনি এ জীর্ণ দেহ করিয়া বর্জন
জীবাত্মা করেন দেহ নূতন গ্রহণ। ২।২২
কর কর্ম, কর্মে শুধু তব অধিকার,
ফল কভু নহে তো তোমার,
ফললাভ তরে কর্ম না করিও তুমি,
না করিও কর্ম পরিহার। ২।৪৭
কর্ম কর যোগযুক্ত হইয়া সর্বথা
আসক্তি ত্যজিয়া ধনঞ্জয়,
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি দুই সমান ভাবিয়া
সমত্বই যোগ সুনিশ্চয়। ২।৪৮
জনকাদি ঋষিগণ করি কর্ম আচরণ,
লভেছেন পরাসিদ্ধি সাধি অবহিত।
যাহাতে বাসবচয় নিত্য কর্মে রত রয়
সেজন্য তোমার কর্ম কারাই বিহিত। ৩।২০
সর্বকর্ম আমাতে করিয়া সমর্পণ
আত্মবশে রাখি নিজ মন,
কামনা, মমত্ব, শোক করিয়া বর্জন
কর যুদ্ধ, হে শত্রুদমন। ৩।৩০
প্রণতি, সাগ্রহ প্রশ্ন, সেবা শ্রদ্ধাসহ
করি যেই জ্ঞানলাভ হয়,
তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ, দেন যাঁরা উপদেশ
সেই জ্ঞান লভ ধনঞ্জয়। ৪।৩৪

* 'সাধারণী' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

আহার বিহার আর নিদ্রা জাগরণ যার
পরিমিত ভাবে সদা হয়,
বিষয়িত চেষ্টা যার সব কাজে যোগে তাঁর
সব দুঃখ হবে যায় ক্ষয়। ৬।১৭
নিজ সুখদুঃখ সাথে অপরের সুখদুঃখ
তুলনা করিয়া তিনি করেন বিচার,
সেই সাধু যোগীবর, সকলেরই শ্রেষ্ঠ তিনি
এই মত জানিহ আমার। ৬।৩২
জগতের পিতা আমি জগতের মাতা,
সর্বজগতের আমি পিতামহ ধাতা,
এই বিশ্বে আমি মাত্র বস্তু জানিবার,
আমি ঋক্ সাম যজু পবিত্র ওঁকার। ৯।১৭
আমি সকলের গতি, পালক সবার,
আমি প্রভু, আমি সাক্ষী, আশ্রয় আধার,
বন্ধু আমি, সৃষ্টি স্থিতি আমিই সংহার,
আমিই অব্যয় বীজ, নিধান সবার। ৯।১৮
পত্র পুষ্প ফল জল ভক্তিভরে যেবা
আমাতে অর্পণ করে করে মোর সেবা,
সুসংযত চিত্ত সেই ভকত জনার
সাদরে গ্রহণ করি ভক্তি উপহার। ৯।২৬
যাহা কিছু কর, আর যাহা কিছু খাও,
যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দাও,
যেই তপ কর, সবি করহ অর্পণ
আমারেই ওকিন্তরে কুন্তীর নন্দন। ৯।২৭
কহিনু তোমার প্রতি গুহ হতে গুহ অতি
এই জ্ঞানতত্ত্ব কথা এর সহকারে,
আর তো সংশয় নাই, যাহা ইচ্ছা কর তাই
বিচারিয়া মনে মনে অশেষ প্রকারে। ১৮।৬৩
সতত আমাতে মন কর সমর্পণ,
আমারি ভকত হও যোর পূজারত হও
আমারেই নমস্কার কর অনুক্ষণ,
পাবে তুমি আমাকেই প্রতিজ্ঞা আমার এই
কহিনু তোমারে, তুমি মোর প্রিয়জন। ১৮।৬৫
সমুদায় ধর্মকর্ম কি হবে বিচারি মর্ম ?
সব ছাড়ি লহ শুধু আমারি শরণ,
সর্বপাপে পরিত্রাণ করিব অভয়দান,
মা করিও তুমি কোন শোক কদাচন। ১৮।৬৬

১৮ই এপ্রিল ১৯৬৬, বাণি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে আদর্শ শিক্ষক গোকুলবাবুর তৈলচিত্র দানের উপলক্ষে পঠিত।

উড়িষ্যায় ছাত্রজীবন

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

২

আই. এ. পরীক্ষার পর দিনাজপুর আমার পূর্বস্থানে গিয়েছিলাম। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখিলাম, কোনও মতে প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হইয়াছি। হিসাব মতে কলেজের একটা বৃত্তি পাইলেও পাইতে পারি। কুড়ি টাকার বৃত্তি, সুতরাং কটকে ফিরিয়া আরও কিছু করিতে হইবে। আমার সহপাঠীদের মধ্যে গিরীজাশংকর রায় চৌধুরী ভাল করিয়াছে, চারুচন্দ্র গাঙ্গুলিও (আমাদের অধ্যাপকের জ্যেষ্ঠপুত্র—যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন) ভালই করিয়াছে, তবে চারু আমাদের ছাড়িয়া কলিকাতায় পড়িতে গেল। হরিদাস দত্ত থাকিয়া গেল—সে-ও বেশ করিয়াছিল। আমি কটকে ফিরিয়া একটা শিক্ষকতা জোগাড় করিয়া লইয়াছিলাম। বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য একটা বেসরকারী নিম্ন মধ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সকালে দুই ঘণ্টা ক্লাস লওয়ার জন্য কুড়ি টাকা দক্ষিণায় কাজ জুটিল। সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় ছিলেন প্রধান শিক্ষক, শান্তিনিকেতনের

শিক্ষক শ্রীযজ্ঞেশ্বর আইচ্, মহাশয়ও কিছুদিন কাজ করিয়া গেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানোর আনন্দে সময়টা ভালই কাটিত।

সুতরাং পড়াশুনার তাগিদ রহিল না। কলেজে ল্যাথার্ট সাহেবের স্নেহভাজন ছিলাম, তবে তাহার বাহিরে প্রকাশ ছিল না। ইতিমধ্যে আমাদের কলেজে ডিউক সাহেব চলিয়া গিয়া সৈয়দ হুসেন মাসুদ সাহেব আসিলেন। তিনিও সাহেব, ইতিহাসের অধ্যাপক, ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের কর্মী আই. ই. এস্। এলাহাবাদের আটর্নি মাসুদের ছেলে এবং শুনিয়াছি আফগানিস্থানের আমীরের জামাতা। সুতরাং দস্তুরমত বড় ঘরের ছেলে। একদিন মাত্র তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বাড়িতে গিয়াছিলাম। তবে ঘণ্টা দুই থাকিয়া গিয়াছিলাম। মাসুদ সাহেব অনেক গল্প করিলেন, বিলাতের গল্প, এ দেশের গল্প। বেশ বেলা হইল, কিন্তু বেশ লাগিলও বটে। মাসুদ সাহেব আমাদের টিউটোরিয়াল ইংরেজি কিছু কিছু করাইতেন, আমাদের তো ইতিহাস ছিল না। প্রিন্সিপাল ছাড়া আর একজন নূতন ইংরেজ অধ্যাপক আসিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন পার্সি অরড্রি হুইটলক। সদ্য সদ্য কেম্ব্রিজ হইতে আসিয়াছেন, এবং আমাদের Philology পড়াইতেন, অর্থাৎ Lounsbury হইতে নোট্ দিতেন। ব্যবহারে অতি অমায়িক ছিলেন, এবং ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলিতে ভালবাসিতেন। 'ব্যাকে' খেলিতেন, এবং খুব ভাল 'শুট্' করিতেন।

বি. এ. ক্লাসেও আমার বিষয় নির্বাচনে ভুল হইয়া গেল, ইংরাজিতে অনার্স নিলাম, কিন্তু সঙ্গে থাকিল সংস্কৃত ও অঙ্ক। অঙ্কেতে রস পাইতাম না, আর সংস্কৃত তো কাব্যতীর্থ পরীক্ষা দিয়াই আসিয়াছি। সুতরাং ইতিহাস অর্থনীতি ইত্যাদি কোনও আধুনিক বিষয় নিলাম না। দু ঘণ্টা সকালে পড়াইয়া যে সময়টুকু খরচ করিতাম তাহার জন্য বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। আর অনার্স যখন ইংরেজিতে তখন ও-সব বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার তেমন দরকারই বা কি? তখনকার অপরিণত বুদ্ধিতে এইরূপই মনে করিতাম।

অধ্যাপকদের মধ্যে বন্ধুও লাভ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক সুরেনচন্দ্র বসু মহাশয়ের সঙ্গে ছাত্র ও অধ্যাপকের বন্ধুত্ব সম্পর্কই গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাদের অনেক আবদারেই তিনি রক্ষা করিতেন। তখনও তিনি অবিবাহিত, সুতরাং আমাদের তখন ছিল অবারিত দ্বার। আমাদের অধ্যাপকদের মধ্যে নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় পরে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা লইয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন।

নূতন বোর্ডিং হাউসে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় স্থান পাইয়াছিলাম। দোতলা বাড়ি, সুন্দর দেখিতে, পাশ দিয়া কাঠজোড়ী নদী চলিয়াছে। চৌকি ও বইয়ের শেল্ফ সবই ফিটফাট, নূতন। টিফিন চার পয়সা, যতদূর মনে পড়ে, হস্টেলেই ঠাকুররা চারখানা করিয়া লুচি ভাজিয়া বিকালে দিয়া যাইত। খাওয়া খরচ মাসে দশ টাকার বেশি বোধ হয় কখনও হয় নাই। সে সব দিন কি আর আসিবে!

এই সময়ে একবার কলেজের পক্ষ হইতে অধ্যাপক বর্গের সঙ্গে জামসেদপুর টাটা আয়রণ ওয়ার্কস দেখিতে যাই। আমাদের সঙ্গে দ্বিতীয় বার্ষিকের ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীও ছিলেন। ইনি পরে অতুল আয়রনের অন্যতম প্রধান কর্মী হইয়া উঠেন। অধুনা লোকান্তরিত। তখন হেমেন সেন মহাশয় ওখানে উচ্চ পদে ছিলেন, শালকিউরিক এসিড প্ল্যান্টের চার্জ তাঁহার ছিল। টাটা কোম্পানীর তখনকার কারখানা, আর এখনকার কারখানায় কত প্রভেদ। তবু তখনও আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। টাটা কোম্পানীর সঙ্গে আমার পূর্ব হইতেই পরিচয়

ছিল। ১৯০৭ হইতেই ঢুকিয়া আসিতেছি, কিন্তু এ যে ছাত্র-প্রতিনিধি হইয়া দেখিতে আসা!

তৃতীয় বার্ষিকের শেষের দিকে আরও এক ধাপে যাই। সেবার বাঁকুড়ায় বড় দুর্ভিক্ষ। ছাত্রদের নিকট হইতে কিছু টাকা উঠাইয়াছিলাম। কলেজ হইতে প্রিন্সিপাল আমাদের দুই তিনজনকে টাকাটা সমেত বাঁকুড়া কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট একখানি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আমরা শুশুনিয়া পাহাড়ের নিচে যেখানে বাঁকুড়া কলেজের দুর্ভিক্ষ সাহায্য জন্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল, সেখানে গিয়া কিভাবে সাহায্য করা হয় তাহা দেখিয়া আসিলাম। সমাজ সেবার শিক্ষার হাতেখড়ি এইখানেই হইল।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র ইটেন-হ্যারোর পর কটকে ফিরিয়া পিতৃগৃহে কিছুদিন বাস করেন। কটকে তাঁহার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার সরকার—ইঁহাদেরও উপস্থিতি হইত সুভাষচন্দ্রকেই কেন্দ্র করিয়া। ঘটনাক্রমে আমার সঙ্গেও ইঁহাদের পরিচয় হইতে থাকিল বারেশ্বরে যুগান্তর-বালং-এর ব্যাপার চুকিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে ইঁহাদের সম্পর্ক নাই, তবে এঁরাও প্রাণ দিতে কৃতসংকল্প। অবশ্য সেটা তখনকার দিনে আমার চোখে খুব বড় ছিল না। আমার তো স্বদেশী ভাবনার শুরু দিনাজপুরেই হইয়াছিল, অবশ্যই বলিয়াই বুঝি তাহা নিষ্ফল হইল। কিন্তু 'বিবাহ করিব না' —আমরণ পণের এই আদর্শবাদ আমি কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি নাই, তখনও না, এখনও না। পরবর্তী জীবনে অনেক দেশসেবকই হয়তো আমার এই ভণ্ডামী লক্ষ্য না করিয়া মনে করিতেন, এই সব 'গৃহপালিত' ভাল মানুষের দ্বারা কোন কাজই হইবে না।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া মাস তিনেক পরে বঙ্গ-বিভাগের ছাড়িয়া দিলাম, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মনে করিলেন, আমাকে আর রাখিলে আমার সমূহ ক্ষতি হইবে। কর্তৃপক্ষের মধ্যেও আমাদের অধ্যাপকদের কেহ কেহ ছিলেন। যাহা হউক, এবার একটা নূতন উপসর্গ জুটিল। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে একজনকে রসায়নের অধ্যাপক অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি মহাশয় বোর্ডিং-এর অধ্যক্ষ হিসাবে কিছুতেই বোর্ডিং-এ রাখিবেন না। তখন জানিতাম না, তাহার গূঢ় কারণ আছে, ছাত্রটি ছিল পুলিশের সোর্সেস্। তাহার জন্য সহানুভূতি দেখাইয়া আমিও বলিলাম, বোর্ডিং-এ থাকিব না। সম্ভবত এই কথা মনে করিয়াই যে, বাঙালী ছেলেদের প্রতি কি অবিচার হইতেছে! সুতরাং ওড়িয়াবাজার পাড়ায় সুভাষের বাড়ির নিকটে একটা বাসা ভাড়া করিলাম। সেইখানেই মেস্ হইবে। প্রথম দিন ৪ জন ছাত্র জুটিল, দ্বিতীয় দিন আরও ৫ জন। এইরূপ ক্রমে ক্রমে সমস্ত মেসের লোক ভর্তি হইল। কিন্তু জিদ করিয়া ধরিয়া থাকায় মেস জমিয়া উঠিল। নিকটেই অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলি মহাশয়ের বাড়ি, অন্যদিকে অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র বর্মনের বাসা। পাড়ার ছেলেদের লইয়া সুভাষের দিন কাটিতে লাগিল। তাহাদের নিয়া খেলা ও ব্যায়াম, উৎসবাদির আয়োজন, হাতিলগার প্রফুল্ল মেসের সংবর্ধনা ইত্যাদি চলিতে থাকিল। একটা মুষ্ট সবল বলিষ্ঠভাব পাড়ার সঞ্চারিত হইল। আর আমাদের ঐ মেস বাড়ি হইল তাহার কেন্দ্রস্থল।

একটি সাঁওতাল ছেলে মযূরভঞ্জ হইতে পাস করিয়া কলেজে ঢোকে। কিন্তু বোর্ডিং-এ তাহার জায়গা হইল না। হয়তো এই কারণেই হইল না। আমরা তাহাকে স্থান দিলাম, কিন্তু ভৃত্য তাহার বাসন মাজিতে রাজি হইল না। আমরা তখন ভৃত্যকে বলিলাম, তাহা হইলে কাহারও বাসন তোমাকে মাজিতে হইবে না। আমরাই সকলে নিজের নিজের বাসন মাজিব, তাহারটাও আমরাই মাজিয়া দিব। দুই চারি দিন এই ভাবে চলার পর ভৃত্য রাজি হইল!

কিছুদিন পরে সাঁওতাল ছেলেটি অসুখে পড়ে

আর যে সে অসুখ নয়, একেবারে টাইফয়েড্। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইল, সুভাষের মা সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া রোগীর নিকট সর্বক্ষণ বসিতেন, এবং সেবা শুশ্রূষা করিতেন। আমাদের সঙ্গে সুভাষের পরিবারের আত্মীয়তা-বোধ খুবই দৃঢ় হইয়াছিল, বিশেষত ছোটদের দিকে। শৈলেশ সন্তোষ প্রকৃতি আমাদের ভাইদের মতই দেখিত এবং বহু বৎসর ব্যবধানেও তাহাদের এই ভাব অটুট ছিল।

আমাদের পরীক্ষার বেশি দিন বাকি ছিল না, কিন্তু ইতিমধ্যে সেবার একটা সুযোগ পাইয়া গেলাম। দুঃখশোকের সঙ্গে তাহার ভারও জড়াইয়া আছে। কলেজের বোর্ডিং-এ গিয়া দেখি, ছেলেদের মধ্যে খুবই একটা ব্যস্ত সমস্ত ভাব। শুনিলাম, প্রথম বার্ষিকের একটি ছেলের খুবই পেট ব্যথা; স্থানীয় ডাক্তার বলিয়াছেন, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্। —ও নামের কোনও রোগের সঙ্গে তখনও পরিচয় হয় নাই। ১৬।১৭ বৎসর বয়সের ছেলে, তাহার পরিচিতের সংখ্যা কম, কিছুদিন হইল তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। পিতা রাঁচিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আমরা তখনই তাহাকে কটক মেডিক্যাল স্কুলে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। হস্টেলের কিছু ছেলে আমাদের সঙ্গ লইল। তখনও কটকে মেডিক্যাল কলেজ হয় নাই! ডাক্তারেরা আমাদের পরিচিতও অনেক ছিলেন। ডাঃ দেবেন বাবু যিনি আমাকে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে দেখিয়াছিলেন তাঁহার নিকটে রোগীকে লইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি বাড়িতে ছিলেন না, তাই দেখিতে একটু দেরি হইল। এবং তিনি রোগীকে দেখিয়াই বলিলেন, he is dying. আমরা ত হতভম্ব। স্থির করিতেছিলাম, হাসপাতালে রোগীর কাছে জন চারেককে রাখিয়া বাকি সকলে শহরে ফিরিব—শহরে তো তিন মাইল দূরে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করিতে হইল না—রাত দেড়টার সময় ছেলেটি চলিয়া গেল! বহুদিন পরে এমনি করিয়া পুনরায় মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল!

সে-বার কটকে বিশেষ করিয়া ছাত্রমহলে কলেরার কি প্রাদুর্ভাব! আমরা ছাত্রেরা নিজেরাই সেবাবাহিনী গঠন করিয়া শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলাম, অবশ্য পূর্বোক্ত মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণের সহযোগিতায়। সারদা প্রসাদ সিংহ তল্লকের নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী, ১৮ বৎসর বয়সের ছেলে, মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে পড়িয়া আছে, তাহার দাদা অন্নদাপ্রসাদ সিংহ তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র ছাত্র—পঞ্চবার্ষিক কি ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ইঞ্জেকশন সবে চালু হইতেছে। অন্নদাবাবু সারদার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিলেন। কলেরার রোগী যে glucose ও saline দিলে বাঁচিয়া ওঠে তাহাও প্রথমবার প্রত্যক্ষ করিলাম।

কিন্তু পরীক্ষাও আসিয়া পড়িল। সেবারকার মত এবারও অঙ্কে বড় ফাঁড়া। পরীক্ষার আগে অঙ্কে প্রবীণ একজন ছাত্র দুই চারিদিন থাকিয়া দেখিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, যাক্ থাপনি পাস করিয়া যাইবেন! তাঁহার কথা সত্যই হইল। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বে ছেলেরা নাকি প্রিন্সিপাল ল্যাঘার্টকে গিয়া বলিয়া আসিয়াছিল, 'Sir, প্রিয়রঞ্জন তো অঙ্কে ফেল করিয়াছে!' ফেল করিবারই মত, অর্থাৎ প্রথম পত্রে ৫৩, দ্বিতীয় পত্রে ৮০, তৃতীয় পত্রে ২১—পাইয়াছিলাম। তিনে জড়াইয়া ১০০ হইলেই পাস, সুতরাং পাস। শুনিলাম, ল্যাঘার্ট নাকি তাহাদের বলিয়াছিলেন, ইংরেজিতে তৃতীয় পত্রে প্রথম হইয়াছি। সত্যই তাই। ইংরেজিতে অনার্স পাইয়াছিলাম, তাই রক্ষা। সংস্কৃতে ৭০ শতকরা পাইয়াছিলাম, তাহাতে কি আসে যায়, আর ঐ ইংরেজিতে তৃতীয় পত্রে ৮৪ পাইয়া প্রথম হইয়াছিলাম, সুতরাং অবিশ্বাস্য-স্বর্ণপদক পাইবার যোগ্য হইলাম! ইংরেজিতে

পাঠ্যপুস্তক সর্বদাই কম পড়িয়াছিলাম, না-পড়া বিদ্যায় বেশি পাইতাম! তাহার উপর আরও এক দুর্দৈব! যেদিন পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্বের দিন বৈকালে খেলার ছলে এক বন্ধুকে ঘুসি মারিতে গিয়া তাহার হাতে লাগিয়া (সে বেচারি প্রতিরোধও করে নাই) আমারই ডান হাত ফুলিয়া উঠিল, ব্যথা হইল এবং পোবর দিয়া ও বরফ দিয়া প্রথম তিন পত্র লিখিতে হয়, কাহাকেও লজ্জায় বলিতেও পারি না যে কেমন করিয়া হইল!

এই চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে বাহিরের অর্থাৎ সামাজিক কাজে, বিশেষ করিয়া সেবার কাজে সময় কাটিয়াছিল ভাল। পড়াশুনায় কিছু না-ই হউক, মোড়লি করিবার সুযোগ, সুভাষের সঙ্গ, ইত্যাদি খুবই ভোগ করিয়াছিলাম। পরে কি হইবে সে ভাবনা ছিল না।

সাঁওতালের সহপাঠী

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

(৭)

রোজ দুপুরে মিতুর বাড়ী গিয়ে ওর বাপের কাছে বসে বনজঙ্গলের কতরকম গল্প শুনি। আজ যেতে একটু দেরী হোলো, গিয়ে দেখি রোবে শুয়ে বুড়ো ঘুমুচ্ছে। তাকে ডেকে তুলতে ইচ্ছে হোলো না, যেমন চুপিচুপি এসেছিলাম তেমনি চুপিচুপি আঙিনা থেকে বেরিয়ে এলাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। পুরুষেরা গেছে শিকার করতে, মেয়েরা গেছে বনের ফল সংগ্রহ করতে, সাঁওতাল পল্লী নিস্তব্ধ। আমিও বনের দিকে পা বাড়ালাম।

কয়েকদিন আগে মিতুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলাম নদী পার হয়ে পাহাড়ের দিকে কিছুটা গেলে খানিকটা খোলা জায়গা আছে। সেখানে অনেক বুনো ফুলের ঝোপ, ছোট ছোট গাছ, ডালভরা ফুলের ভারে নুয়ে নুয়ে পড়েছে—কিন্তু সব কাঁটা। এতদিনে পেকে যাবার কথা, তাই সুযোগ পেয়ে সেইদিকে এগিয়ে চল্লাম। পৌষ মাসের মাঝামাঝি, বরফের মত ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাস হু হু করে বয়ে চলেছে—গাছের ডালে পাখীরা পর্যন্ত চড়সড়। নদীর জলে পা দিতেই মনে হোলো পা দুখানা অসাড় হয়ে গেল। নদী পার হয়ে বনের পথ ধরে চলাম। শুকনো ঝরাপাতায় বন ছেয়ে গেছে—পাতা মরে পড়ার টুপটাপ শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। হঠাৎ পথের বাঁদিকে শুকনো পাতায় খড় খড় আওয়াজ হোলো, —চমকে উঠলাম, চেয়ে দেখি কাঠবেড়ালি এক গাছ থেকে লেজে ছুটে আর এক গাছে গিয়ে উঠলো। এ পথ দিয়ে কয়েকবার আসা যাওয়া করেছি কিন্তু একা চলছি আজ প্রথম। বন আমাকে অনেকখানি আপন করে নিয়েছে। মিতু যেমন চারিদিকে মনের চোখ রেখে চলে আমিও তেমনি চলেছি, তার মত আমিও আজ বনের অনেক রহস্য জানি। মনে বেশ গর্ব অনুভব করলাম, ওরতো করছে না।

পাহাড়ের খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছি, বর্ষার শেষে প্রথম যে শ্যামরূপ দেখেছিলাম এখন তেমন নয়, অনেক গাছের পাতা ঝরে গেছে, নীচের আগাছা মরে গিয়ে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। এখন পাহাড়ের

রুক্ষ রূপ। আরো খানিক এগিয়ে চোখে পড়লো মস্ত শিমুল গাছটা, যার ডালে প্রথম ময়ূর দেখেছিলাম। ডানদিকে ঘুরে চলেছি। পাহাড় রইলো বাঁয়ে। এদিকে কেবল মহুয়া গাছ। আর খানিকটা পথ, তারপরেই সেই ছোট্ট একফালি মাঠ। মাঠময় বন কুলের ঝোপ, কুল পেকে ঝোপগুলো লাল হয়ে আছে। মাঠের কিনারায় এসে পড়েছি দুচার পা এগিয়ে গেলেই প্রথম ঝোপটার পাকা কুল দুঠোর মধ্যে পাই, কিন্তু সেই দুচার পা আর এগোনো হোলো না, একটা মহুয়া গাছের আড়ালে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে যে দৃশ্য দেখলাম সে দৃশ্য এর আগে আর দেখি নাই। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য, মাঠে হরিণ চরছে। বেশী নয়, চার পাঁচটা হরিণ, দুটোর বড় বড় শিং। ডাল থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাকা কুল খাচ্ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। তাদের লালচে গায়ের লোম, তার উপরে দাদার ছিট রঙ্গুরে ঝকমক করছে। কর্ণ পাতার একটু আওয়াজ হলেই তারা মাথা উঁচু করে কান খাড়া করে দাঁড়াচ্ছে। তাদের সেই দাঁড়াবার ভঙ্গীটি কি সুন্দর! একটা হরিণ ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি। কতক্ষণ এইভাবে কেটেছে আমার হুঁশ নেই, হঠাৎ মাঠের আর এক প্রান্তে চোখ পড়তেই যা দেখলাম তাতে আবার আমার বুকটা ধড়াস করে উঠলো।

মাঠের আর এক প্রান্তে বন যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে অনেকগুলো ছোট ছোট পলাশের ঝোপ, আমি দেখলাম তার আড়ালে কি একটা জানোয়ার লুকিয়ে আছে। বন পাতার ফাঁক দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখা গেল না, যা দেখলাম তাতে মনে হোলো সে বড় জানোয়ার। হরিণের পিছনে যে জানোয়ার ওতপেতে বসে থাকে সে যে কি জানোয়ার হতে পারে তা আমি আন্দাজ করতে পারি। পারি বলেই আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। হয়তো লাফিয়ে এসে এখনই একটা হরিণের ঘাড়ে পড়বে, কি করবো তখন আমি? এত কাছে আমি দাঁড়িয়ে, আমাকে সে দেখতে পাবেই, তার পরে? ছুটে যে পালিয়ে যাব সে সাহসও নেই —যদি হরিণ ছেড়ে আমাকেই তাড়া করে? এক মুহূর্তের মধ্যে কত কথাই যে মনে হোলো তার অন্ত নেই। মামার বারণ উপেক্ষা করে একলা এতদূরে এসে যে কি অন্যায় করেছি তা এখন বুঝতে পারছি। পা দুটো পাথর হয়ে গেছে, চেষ্টা করলেও পালাতে পারবো না, ঠিক বুঝলাম আজ বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হবে। পলাশের ঝোপের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছি, মনে হোলো ঝোপের আড়ালে আড়ালে বাঘ অনেকখানি এগিয়ে এসেছে, এইবার ডাক ছেড়ে হরিণের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। খুট করে একটু আওয়াজ হোলো ঝোপের আড়ালে, হরিণ ক'টা ঘাড় উঁচু করেই বুঝে নিল ব্যাপারটা, ঝড়ের মত ছুটে পাহাড়ের দিকে চলে গেল। এই বুঝি বাঘ এলো, আর রক্ষা নাই, ঐ যে দুটো ঝোপের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে বাঘ, না বাঘ নয়, হঠাৎ শরীর অত্যন্ত দুর্বল মনে হোলো—ধুপ করে মহুয়া তলায় বসে পড়লাম!

হাতে বল্লম তীর, সামনে এসে দাঁড়ালো মিঠু। তার মুখের দিকে চাইতেই দেখি সে হাসছে। "কি কমল, এখানে কি করছো তুমি? চেহারা অমন কেন?" জিজ্ঞাসা করলো মিঠু। বুকের ভিতর তখনও টিপটিপ করছে, কোন মতে উঠে দাঁড়ালাম, বল্লাম "পলাশের ঝোপের আড়ালে বসে ছিলে তুমি?" আমার অবস্থা দেখে ব্যাপারটা আঁচ করে মিঠু বল "হ্যাঁ আমি, তুমি কি মনে করেছিলে?" প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলাম, বল্লাম "তুমি বুঝি হরিণ মারতে চেয়েছিলে? "তাই তো চেয়েছিলাম", হাসতে হাসতে বল মিঠু "তুমি কিন্তু বাঘ ভেবে ভয় পেয়েছো।" আর তা অস্বীকার করে লাভ নেই, সব কথা খুলেই বল্লাম। শুনে মিঠু

বলে "একা এতদূর এসে খুব অন্যায় করেছো, আমি না হয়ে বাঘ হতে তো পারতো। এটা বাঘের দেশ সে কথা ভুলে যাওয়া তোমার উচিত হয় নাই, বনের মধ্যে হরিণের শিকারে অনেক সময় বাঘ থাকে। আর কখনো এরকম দুঃসাহস কোরো না, আজ তোমার একটা ফাঁড়া কেটে গেল।"

বাড়ীর পথ ধরবার আগে মিতু আমার দুই পকেট পাকা ফুলে ভরে দিল। পথ চলতে চলতে সে তার সকালের ইতিহাস বলতে লাগলো। সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সে ধনুক তীর নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, পাহাড়ের পাশ দিয়ে পশ্চিমমুখো চলতে থাকে। খানিকদূর গিয়ে সে একপাল বুনো শুয়োরের পায়ের দাগ দেখতে পায়। বুনো শুয়োরের মাংস তার বড় প্রিয়, সেজন্য খুশী হয়ে সে শুয়োরের খুরের দাগ দেখে দেখে এগিয়ে চলে। প্রায় আধ মাইল পথ যাবার পরে শুয়োরের পাল পাহাড়ে উঠে যায়। পাহাড়ে তাদের খুঁজে পাওয়া মুস্কিল জেনে মিতু আবার জঙ্গলে নেমে আসে। এবার সে তিতির খুঁজে বেড়ায়। রোদ ওঠবার পরে তারা ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় আসে, তখন তাদের শিকার করা সহজ। অনেক চেষ্টার পর সে একটা তিতির মারে। কোমরে বাঁধা জালের থলেতে সেটা রেখে সে বাড়ীর দিকে ফেরে। ততক্ষণ দুপুর হয়ে যায়। ফেরবার পথে ফুল ঝোপের মাঠে সে হরিণ দেখে ঝোপের আড়ালে আড়ালে এগোয়। এগোতে এগোতে যখন সে হরিণের খুব কাছে এসে পড়ে, ধনুকে তীর লাগিয়ে যেই সে তাক করতে যাবে, পায়ের নীচে একটা শুকনো ডাল পড়ে পুট করে ভেঙ্গে যায়। হরিণের পক্ষে সেই আওয়াজটুকুই যথেষ্ট, তারা ছুটে পালিয়ে যায়। এর পরে যা সব ঘটে তা আমার জানা। শীতের বেলা, সূর্য পশ্চিমে চলতে শুরু করেছে, আর কথা না বলে আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে চলাম।

বর্তমান শিক্ষার সংকট

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমার গ্রামের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে একটি কৃষকের ছেলে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বেলুড় কলেজে প্রবেশ করে; এই বৎসর সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস. সি পরীক্ষার অঙ্কের দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ছেলেটির পিতার বয়স ৬৫, ১৫।১৬ বিঘা জমি আছে, এখনও নিজের হাতে জমি চাষ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র (নবম শ্রেণী অবধি পড়িয়াছে) এবং কনিষ্ঠ পুত্র (অষ্টম শ্রেণী অবধি পড়িয়াছে) ইহারা দুইজনেই পিতার সঙ্গে জমি চাষ করে। এই ছেলেটি কনিষ্ঠ। গ্রামে যখন যাইতাম ছেলেটির পিতা ও ছেলেটি (তখন গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়ে) আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, আমি তখন গ্রামের বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলাম, বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে বা অর্ধ বেতনে ছেলেটি পড়িত। বলা বাহুল্য গ্রামে যখন আমার সহিত দেখা করিতে আসিত পিতা পুত্র দুই জনেই ঘরের মেঝেতে বসিতেন, আমি তক্তাপোষে বসিয়া থাকিতাম; দুই জনেই আমাকে মেঝেতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন; ঘরে ৩।৪ খানা চেয়ার থাকিত, তাহাতে উহারা কেহই বসিতেন না।

ছেলেটি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম

বিভাগে উত্তীর্ণ হইবার পর পিতা ও পুত্র আমার কলিকাতার বাড়ীতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার জন্য ও হোষ্টেলে থাকিবার জন্য আমি যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি। এইবারেও তাঁহারা আমার ঘরের মেঝেতে বসিয়াছিলেন এবং মেঝেতেই ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিয়াছিলেন, চেয়ারে বসেন নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি ছেলেটি তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত।

বি. এস. সি পরীক্ষায় (অঙ্কের দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ) উত্তীর্ণ হইবার পর পিতা ও পুত্র দুই জনেই আমার কলিকাতার বাড়িতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, আমি তক্তাপোষের উপর বসিয়াছিলাম, দু'জনে আমার ঘরে ঢুকিয়াই পূর্বেকার রীতি অনুসারে মেঝেতেই আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং পিতা পূর্বের রীতি অনুসারেই মেঝেতেই বসিয়া পড়িলেন, কিন্তু ছেলেটির বেলায় এই বারে একটু ব্যতিক্রম দেখিলাম, সে আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন আমি তাহাকে একখানা চেয়ারে বসিতে বলিলাম, সে তৎক্ষণাৎ চেয়ারে বসিল; তাহাকে চেয়ারে বসিতে দেখিয়াই পিতা ঘরের একখানা ইজি চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া পড়িলেন, তখন আমি তাঁহাকে আর একখানা চেয়ারে আনিয়া বসিতে বলিলাম, তিনি তাহা করিলেন এবং পিতা পুত্র দুই জনেই চেয়ারে বসিয়া আমার সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় অঙ্ক শাস্ত্রেই পড়িবার কথা আমাকে ছেলেটি বলিল এবং কলিকাতায় অবস্থান করিবার কথা উত্থাপন করিল। বর্তমানে এই দু'টিই সমস্যা। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

কথা প্রসঙ্গে আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম বি. এস. সি পরীক্ষা দিবার পর সে যখন তাঁহার গ্রামের বাড়িতে প্রায় দুই মাস ছিল সে কি ভাবে সময় কাটাইয়াছে? ছেলেটি উত্তর দিল "বই টই পড়তুম"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মাঠে বাবার ও দাদাদের সঙ্গে কোন দিন কাজ করনি?" ছেলেটি নিরুত্তর রহিল, কিন্তু বাবা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "আমি ওকে মাঠে কাজ করতে দিই নি, রোদ্দুরে ওর 'স্কেম' খারাপ হয়ে যাবে বলে।" বাবার এই কথার পরে আমার কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু বলিলাম না। ছেলেটি খুব বিনয়ী, ইহার পর আমার কাছে প্রায় আসিত, অবশ্য প্যান্ট ও সার্ট পরিয়া আসিত, তক্তাপোষের উপরেই আমাকে প্রণাম করিত এবং চেয়ারেই বসিত। আমাকে কিছু বলিতে হইত না।

"শিক্ষার" পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় শিক্ষার এই সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। এই সমস্যার সহিত আমাদের সামাজিক প্রথা প্রধানতঃ জড়িত; কৃষি ও কারিগরি শিক্ষাকে আমরা এখনও কোন সম্মানসূচক স্থান দিই নাই; অবশ্য উচ্চ কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার কথা বলিতেছি না। গ্রামের কৃষি ও গ্রামের কারিগরি কাজের কথাই বলিতেছি; আমরা গ্রামের কৃষককে, গ্রামের ছুতার কামার, কুমার, রাজমিস্ত্রী, প্রভৃতিকে সমাজের প্রথম অঙ্গ হিসাবে তাহাদের কি প্রাপ্য সম্মান দিই? গ্রামের উন্নতি করিতে হইলে ইহাদিগকে প্রাপ্য সম্মান দিতেই হইবে। খুব বড় বড় কথা বলিলে চলিবে না, কাজে কর্মে, আচার ব্যবহারে উহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে। যে কৃষককে বলা হইতেছে 'খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি কর', সমাজে সেই কৃষকের স্থান কোথায়? এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিতেছি। তখন চাকরী করিতাম কৃষি বিভাগে; কোন গ্রামে এক কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যয় বহুল আয়োজন হইয়াছে, উদ্বোধনী সভার জন্য মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে, 'ডায়াস' প্রস্তুত হইয়াছে, 'ডায়াসের' উপরে ও নিচে চেয়ার পাতা হইয়াছে,

আসে পাশে সংরক্ষীও আছে; বলা বাহুল্য 'ডায়াসের উপর চেয়ারে ২।৩ জন ইংরাজ রাজপুরুষ বসিয়াছেন, আরও অনেক হোমরা চোমরা আছেন, যেমন এস্. ডি. ও. জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, সার্কেল অফিসার ইত্যাদি, 'ডায়াসের' নিচের চেয়ারে ও বেঞ্চে স্থানীয় তথাকথিত ভদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের স্থান হইয়াছে, স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সংরক্ষীতে বসিয়াছে। আর স্থানীয় কৃষক ও শিল্পীগণ মণ্ডপের বাহিরে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আছেন, অথচ তাঁহাদের শিক্ষার জন্যই এই কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। কৃষি সম্বন্ধে বলিবার জন্য আমার যখন ডাক পড়িল' আমি প্রতিবাদ জানাইলাম এবং বলিলাম কৃষক ও শিল্পীগণকে মণ্ডপের ভিতর বসিবার স্থান না দিলে আমি কিছুই বলিব না। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল; ইংরাজ রাজপুরুষ (ডেপুটি কালেক্টার) সভাপতিত্ব করিতেছিলেন; তিনি আমাকে সমর্থন করিলেন, কৃষক ও শিল্পীগণের মণ্ডপের ভিতরেই বসিবার স্থান করিয়া দেওয়া হইল। এই রাজপুরুষ এখনও জীবিত; অবসর গ্রহণের পর স্বদেশে আছেন। খুবই দুঃখের বিষয় বর্তমান সময়েও কি সহরের কি গ্রামের প্রদর্শনীতে সেই পুরাতন রীতি এখনও প্রচলিত আছে বরং বর্তমান সময়ে প্রদর্শনীতে ভি. আই. পি.-দের আগমন হেতু প্রকৃত কৃষক ও শিল্পীগণ আরও কোনঠাসা হইয়া পড়িতেছেন। এ সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়গণ বধির।

আর একটি কথা এবং ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, পল্লী অঞ্চলের উন্নতি করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা পল্লী অঞ্চলের "টেলেন্টকে" অর্থাৎ মেধাবী ছাত্রগণকে পল্লী অঞ্চলেই রাখিবার সুব্যবস্থা বা সুপরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে; ইহা না করিতে পারিলে পল্লী অঞ্চলের উন্নতি সুদূরপরাহত; পল্লী অঞ্চলের অসংখ্য কৃষক ও শিল্পী সম্প্রদায়ভুক্ত কত মেধাবী ছাত্র পল্লী অঞ্চলের নিজ নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহরে মর্যাদাসম্পন্ন কাজে নিযুক্ত আছেন এবং উচ্চ জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন ইহাতে উক্ত ছাত্রগণের বা যুবকগণের ও তাঁহাদের অভিভাবকগণের কোন দোষ নাই। সম্প্রতি পল্লী অঞ্চলের এক পরিচিত যুবককে (বি. এইচ. ডি এবং উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম পল্লী অঞ্চলের বাপ ঠাকুর্দার মেটো বাড়ীর কোন সংস্কার করিয়াছেন কি না?—উত্তরে জানিলাম সেখানে বাড়ীর পিছনে কিছু খরচ করা মানে অর্থের অপব্যবহার করা। অথচ ইঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা পল্লী অঞ্চলের মেটো বাড়ীতেই বাস করিতেছেন। ইনি সল্ট লেকে জমি কিনিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। উপস্থিত কলিকাতায় স্বাস্থ্যকর নিজের পদ মর্যাদার উপযুক্ত এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেছেন। এইরূপ বহু উদাহরণ দিতে পারি। ইঁহাদের অভিভাবকগণ ও আত্মীয় স্বজন ইঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত, এই তাঁহাদের সান্ত্বনা। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সন্তানদের মর্যাদার উপযুক্ত বেশ-ভূষা নাই, গৃহও নাই, খাদ্যও নাই, অনেক বলিয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, কিন্তু কে শোনে?

চীৎকার শুনিতেছি গ্রামের উন্নতি কর, কৃষিকে সমৃদ্ধ কর, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি কর, গ্রামের কুটীর শিল্প পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত কর, ইত্যাদি; কিন্তু সব চীৎকার বৃথা হইবে যদি গোড়ার গলদ দূর করা না যায়; গৌরী সেনের টাকার শ্রাদ্ধ যেমন চলিতেছে সেইরূপই চলিবে, বরং বাড়িবে। আর একটা চীৎকার হইতেছে, ঐক্যবদ্ধ হও, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সর্বাগ্রে দরকার; কিন্তু যে শিক্ষা ও যে শিক্ষার প্রসারের ফলে গ্রামের সর্ব সম্প্রদায়ের মেধাবী যুবকগণ গ্রাম হইতে এবং স্ব স্ব পরিবারবর্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া উচ্চতর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন সে ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধতার জমি

নিষ্ফল হইবারই সম্ভাবনা। নিজের নিকট আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কিরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অনেক উদাহরণ দিতে পারি। একটা উদাহরণ দিতেছি। আমরাই এক আত্মীয় তাঁহার পুত্রকে তাঁহার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের (বাল্যে গ্রামে একই সংসারে প্রতিপালিত কিন্তু বর্ত্তমানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত) কাছে যাইতে বলিয়াছিলেন; পুত্র পিতার নিকট হইতে "পরিচয় পত্র" চাহিয়াছিল, পিতা "পরিচয় পত্র" দিয়াছিলেন। পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি। আমি ভবিষ্যদবাণী করিয়া যাইতেছি যে আমার গ্রামের এই বিমাতা দৃষ্ট পুত্রেরও (সি. এস. সি, অঙ্কের সম্মান প্রাপ্ত) এক দিন 'ব্রেন' খারাপ হইয়া যাইবে, তবে মাঠের রৌদ্রে নয়, উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ পদের গৌরবে এবং অভিমানে, সেও গ্রাম ও আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, অবশ্য সে নূতন আত্মীয় স্বজনের এক গোষ্ঠী সৃষ্টি করিবে। তার গ্রামের সহোদর ভাইদের পুত্রদেরও হয় ত পরিচয় পত্র লইয়া তাহার সহিত দেখা করিতে হইবে।

এই ভাবে গ্রামকে সংসারের পথ হইতে রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রস্তুত করা কি একেবারে অসম্ভব? কলিকাতায় শিক্ষা কমিশন আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন পল্লী অঞ্চলে গমন করিয়া শিক্ষার প্রসারের ফলে এই যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধান কি ভাবে হইতে পারে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছেন কি?

———

সূর্য মন্দিরের কথা

শ্রীবাসবিহারী ভট্টাচার্য

সূর্যপূজার প্রচলন রহিয়াছে বহু দেশে। প্রাচীন মিশরে সূর্যদেব প্রথমে রে অথবা রা (Re or Ra.) এবং পরে অসাইরিস (osiris) নামে আখ্যাত ছিলেন।

সূর্যদেবতা গ্রীক-পুরাণে এপোলো (Appollo) নামে খ্যাত। গ্রীকদের বিশ্বাস যে সপ্তাশ্বচালিত আগ্নেয় রথে এপোলো প্রতিদিন নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করেন। ডেল্ফী নগরীতে অবস্থিত এপোলোর মন্দির এক সময় এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল যে দেশ দেশান্তর হইতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন বহু লোক মন্দিরে অর্ঘদান করিয়া পূজারী বা পূজারিণীর মুখনিঃসৃত এপোলোর ভবিষ্যবাণী শ্রবণ করিতেন।

সূর্যদেব জাপানে অমাতেরাসু দেবী নামে পূজিতা। তিনি চন্দ্রদেবের ভগিনী।

পূর্বে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ সূর্যকে প্রধান দেবতা বলিয়া গণ্য করিত। ভারতবর্ষে বৈদিকগণ হইতে সূর্যদেবের পূজা প্রচলিত। যজ্ঞে যূপকাষ্ঠ সূর্যের ও জ্ঞানের প্রতীক।

ভারতে অনেক দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তি বহু তীর্থক্ষেত্রে শোভা পাইতেছে। কিন্তু সূর্যমন্দির ও মূর্তি খুবই বিরল। ইহার কারণ কি? সমস্ত পৃথিবী ও নভোমণ্ডলকে সূর্যেরই মন্দির বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। যেমে পূজিত বায়ু, অগ্নি, বরুণের মত নৈসর্গিক দেবতা বলিয়াই সূর্যের মন্দির এত বিরল মনে হয়।

হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির মধ্যে মাত্র দুইটি সূর্য-

মন্দির বলিয়া প্রচারিত। একটি কাশ্মীরের অবন্তীপুরের 'মার্তণ্ড' ও অপরটি উড়িষ্যার 'কোণারকে'র মন্দির। এই দুইটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিশ্বসমক্ষে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য গৌরবের ও সূর্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে আজও বিদ্যমান।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে ৩৮ মাইল দূরে, 'মার্তণ্ড' নামে একটি প্রাচীন নগর অবস্থিত। সূর্যের একটি নাম 'মার্তণ্ড'; 'মার্তণ্ডে'র বিখ্যাত সূর্যমন্দির হইতেই এই নগরের নামকরণ হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে কাশ্মীরে গোনন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সূর্যের উপাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৩০০৪—২৯৩৬ মধ্যে) প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে সূর্যদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপ একটি পর্বতশীর্ষে তিনি মার্তণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পর কাশ্মীরের পরাক্রমশালী নৃপতি ললিতাদিত্য প্রাচীন মার্তণ্ড মন্দিরের সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বহু শিলাস্তম্ভ স্থাপন করিয়া ও শিলাগাত্রে নানাপ্রকার মূর্তি ও বৃত্ত খোদাই করিয়া কারুশিল্প ও ভাস্কর্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপনা করিয়াছেন, তাহা সমগ্র ভারতে বিরল।

মনীষী স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড লিখিয়াছেন: 'কাশ্মীরের সকল প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে মার্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও চমকপ্রদ।' তিনি বলিয়াছেন, সমস্ত পৃথিবীতে এইরূপ রমণীয় দৃশ্যের স্থান অতি বিরল। সুদূরে নিম্নে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা শিশুবধূসা কাশ্মীর উপত্যকা, আর পশ্চাতে তুষারধবল হিমালয় শৃঙ্গগুলি নীল আকাশের গায়ে তুলি দিয়া আঁকা পটের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

মন্দিরটির পাদদেশে মাওয়ান নামক স্থানে একটি ঝরণা প্রবাহিত। ঝরণাটির নামও 'মার্তণ্ড'। চিনার-কুঞ্জ পরিবেষ্টিত, শতাব্দীর পরিশোভিত বাগবানে নিমজ্জনের জন্য একটি কুণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে। এই কুণ্ডমধ্যে নবনির্মিত একটি মন্দির শোভা পাইতেছে। মন্দিরটির নামও 'মার্তণ্ড' বা সূর্যমন্দির। মোটর বাসের পথ পার্শ্বে এই মন্দিরে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। অনেকেই এখানে ঝরণার জল আচমন করিয়া সূর্যার্ঘ দিয়া পিতৃ-পুরুষের তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদিকার্য দ্বারা বিশেষ পুণ্যার্জন করিয়া থাকেন।

উড়িষ্যার উপকূলবর্তী কোণারকের মন্দিরের নামটি 'কোণার্ক' শব্দটির অপভ্রংশ। যে স্থানটিতে মন্দিরটি নির্মিত হয়, তাহা অতি প্রাচীনকালে 'পদ্মক্ষেত্র' বলিয়া খ্যাত ছিল। পদ্মক্ষেত্রের পরে নামকরণ হয় 'কোণার্ক' (অর্ক অর্থাৎ সূর্য) বা কোণে অবস্থিত সূর্য।

শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব গোপ-বালাদের সহিত ব্যভিচারদোষে পিতৃ অভিশাপে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যাধি দূরীকরণার্থে তিনি 'মৈত্রেয়' বনে গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বহুকাল যাবৎ সূর্যদেবের পূজা ও ধ্যান করিতে থাকেন। সূর্যদেব প্রসন্ন হইলে চন্দ্রভাগা নদী স্রোতে ভাসমান একটি পদ্মোপরি সূর্যদেবের মূর্তি শাম্বের দৃষ্টিগোচর হয়। শাম্ব নদীতীরে সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সূর্যদেবের মূর্তি-স্থাপনা করেন। পদ্মোপরি ভাসমান সূর্যমূর্তি হইতেই স্থানীর নাম 'পদ্মক্ষেত্র' হইয়াছিল। 'শাম্ব পুরাণে' বর্ণিত আছে যে, সূর্যের সহস্র নামের মধ্যে মাত্র একবিংশ অর্থাৎ একুশটির নাম জপ করিয়াই শাম্ব ব্যাধিমুক্ত হইয়াছিলেন।

শাম্ব যেখানে সূর্যমূর্তি স্থাপনা করিয়া পূজা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, অনেকের বিশ্বাস সেই স্থানেই বহু শতাব্দী পরে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় অনঙ্গ ভীমদেবের পুত্র, উড়িষ্যার গঙ্গা-বংশের প্রসিদ্ধ ও পরাক্রমশালী নৃপতি নরসিংহদেব বর্তমান কোণারকের সূর্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'তে যাহা

লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য ও চমকপ্রদ। মন্দিরটি নির্মাণ করিতে নাকি তৎকালীন উড়িষ্যার দ্বাদশ-বর্ষের রাজস্ব সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয়, অর্থাৎ মন্দির নির্মাণকার্যে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা উড়িষ্যার রাজকোষ হইতে নিঃসোদিত হয়। ইহা উচ্চতায় ১৪০ হস্ত, (অর্থাৎ ২২৪ ফুট) ও প্রস্থে ১৯ হস্ত (অর্থাৎ ২৮৪ ফুট) পরিমিত। বিশাল প্রাচীর পরিবেষ্টিত মন্দিরটির ৩টি তোরণ দ্বার। পূর্বদ্বারে দুইটি অতি সুন্দর গজমূর্তি, পশ্চিম দ্বারে দুইজন অশ্বারোহী, উত্তর দ্বারে হস্তিপৃষ্ঠে দুইটি শার্দুল ব্যাঘ্র বিরাজ করিতেছে, আর সম্মুখে ৪০ ফুট উচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তর স্তম্ভ দণ্ডায়মান। মন্দিরের চতুষ্পার্শে নানাভাবে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান প্রস্তরগোদিত অসংখ্য নরনারী ও পশুমূর্তি প্রাণবন্ত বলিয়া মনে হয়। প্রধান মন্দিরের সংলগ্ন আরও ২৮টি মন্দির রহিয়াছে, ২২টি প্রাচীরের বহির্ভাগে।

কোণারকের সূর্যমন্দির বহুকাল বালুস্তূপে নিমজ্জিত ছিল। বহু শ্রম ও অর্থব্যয়ে বালুরাশি খনন করিয়া যখন এই মন্দির পুনরুদ্ধার করা হয়, তখন দেখা গেল যে, সুবৃহৎ চক্রবিশিষ্ট দণ্ডায়মান রথাকৃতি বিমান বা প্রধান মন্দিরের শুধু ভগ্নাবশেষই রহিয়াছে।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে সুরক্ষিত 'মাদলাপঞ্জী' বা উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, লাঙ্গুলো নরসিংদেব ১২০৪ শতাব্দী অর্থাৎ ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে কোণারকের মন্দির নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেন। পঞ্চাশ ফুট কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত যে স্তম্ভের কথা আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায়, সেই স্তম্ভটি মহারাষ্ট্রীয়গণ কোণারক হইতে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে স্থানান্তরিত করেন। এই স্তম্ভটির নাম 'অরুণ স্তম্ভ'। জগন্নাথ মন্দিরের তোরণ দ্বার সম্মুখে আজও দণ্ডায়মান। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটি উপাস্য দেবতা মূর্তিও পুরীতে স্থানান্তরিত করা হয়। কোণারকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাস্কর্য ও শিল্পনৈপুণ্যের যে নিখুঁত ছবি প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, সেরূপ অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

হিন্দী ভাষার যোগ্যতা

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

স্বাধীন ভারতে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান এবং সরকারী কার্যাদি কোন্ ভাষায় হওয়া উচিত? প্রদেশগুলির জন্য প্রাদেশিক ভাষারই ব্যবহার হওয়া উচিত, এবিষয়ে অধিক মতদ্বৈধ নাই। আর কেন্দ্রীয় দপ্তরের জন্য ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৩ ধারা অনুসারে হিন্দীরই ব্যবহার বিহিত। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর এখনও শেষ হয় নাই। অপর দাবীদারের মধ্যে ইংরেজী, উর্দু, বাংলা এবং সংস্কৃত প্রধান। এক এক করিয়া ইহাদের দাবী-গুলির পরীক্ষা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ ইংরেজীকে কোনরূপেই ভারতীয় ভাষা বলা যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহনরূপে এবং নিখিল বিশ্বের ব্যবসায় ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ইহার মহত্ত্ব আছে যখন জাপানাদি উন্নতিশীল দেশ-গুলিতেও ইহার চর্চা হয়। ভারতের বিদ্যালয়-গুলিতেও ইহার উচিত অথবা উচিত অপেক্ষাও বেশী

হাদ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু জাপান প্রভৃতি দেশেও ইহা সরকারী ভাষারূপে মান্য নয়।

ইংরেজীর বর্ণমালা অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক। প্রত্যেক স্বরবর্ণের এবং অনেক ব্যঞ্জনবর্ণের একাধিক উচ্চারণ হয়। C, Q, X অনাবশ্যক বর্ণ, যাহাদের উচ্চারণ K, S দ্বারা হইতে পারে। কিন্তু ব্যঞ্জন বহুবা মূক (silent) থাকে 'কনোব্‌লেড্‌জে' লিখিয়া 'নলেজ' পড়া হয়। এইসব কারণে ভারতীয়ের পক্ষে ইহা শিখা কঠিন।

ইংরেজীর সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থক দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, তামিলাদি মূলত দ্রাবিড়ী ভাষা হওয়ায় তথাকার অধিবাসীদের পক্ষে হিন্দী শিখিতে যথার্থই কিছু কষ্টবোধ হয়, এবং তাহারা পূর্বাবধিই ইংরেজীকে এরূপে আপন করিয়া লইয়াছে যে উহা কিয়ৎ-পরিমাণে মাতৃভাষাই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন নয় যে তাহাদের পক্ষে হিন্দী শিক্ষা অসম্ভব। হাজার হাজার বৎসরের আর্য সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষার চর্চাতে দক্ষিণ ভারত কখনও উত্তর ভারতের চেয়ে পিছনে রহে নাই। আজ দ্রাবিড়ী ভাষার পরিণাম স্বরূপ সেখানে আর্য বিদ্বেষ নানারূপে দেখা দিতেছে এবং হিন্দী বিরোধও তাহারই অঙ্গ। ইংরেজীর সমর্থকেরা হয়ত ইংরেজীর মোহ হইতে, অথবা 'এত ভাষা থাকিতে হিন্দীই কেন এই পদ পাইবে' এইরূপ তর্কেই উহা রাখিতে চান। যেমন নিজে পুরস্কার না পাইলে অনেকে চান যেন উহা প্রতিপক্ষের হস্তগত না হইয়া কোন তৃতীয় পক্ষের হস্তগত হয়।

তৎকাল ১৫ বৎসরের অবধি পর্যন্ত রাজকার্যাদি ইংরেজীতে চলিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। ১৫ বৎসর অতীত হইলে ঐ অবধিকে বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিছু লোক শুধু 'হিন্দী না আসিয়া পড়ে' তাহার জন্যই টালমাটাল করিতে চান। সুতরাং যদি কেহ হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহিতেন, তবে কি শুরু (১৯৪৭) হইতেই চালু করিতে পারিতেন না? যদি পর্তুগীজ, পশু বা বর্মী ভাষার মত ভাষা কোন দেশের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে তবে হিন্দীও অবশ্যই হইতে পারে। অসুবিধা কিছু হইত, ভাষান্তরের সাহায্যও কিছু লইতে হইত, কিন্তু বাধাগুলি এ পর্যন্ত (১৯৬৫) অতিক্রান্ত হইয়া যাইত। ইহা কে বিশ্বাস করিবে ইংরেজ এদেশে না আসিলে আমরা এক যোগ্য ভাষার অভাবে অসহায় অবস্থায় পড়িতাম? যে ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হউক, কিন্তু এই অবধিতেই আমাদের আপত্তি। ১৫ বৎসর পার হইয়া গেলে দেখিলাম যে আমরা পিছনেই আছি, সুতরাং অবধি বাড়াইয়া ৩০ বৎসর করা হউক। আবার ৩০ বৎসর পরেও দেখিব যে আমরা একটুও অগ্রসর হই নাই। বরং বেশীদিন ইংরেজী চলিতে দিলে অভ্যাস ছাড়া আরও কঠিন হইবে। স্বাধীনতালাভের পরে আমরা পরিচ্ছদাদিতে যতটা ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়াছি, পূর্বে ইংরেজ রাজত্বে ততটা ছিলাম না। কেবল শুদ্ধ ইংরেজীর জ্ঞানই আমাদের কম হইতেছে। যদি এই অবধির মধ্যে সাহিত্য-গোষ্ঠী ও পুরস্কারাদি দ্বারা হিন্দীতে অধিকাধিক সংখ্যায় কাব্যনাটকোপন্যাসাদি চেষ্টা করিয়া লিখানও হয়, তথাপি কি উহার কার্যকারিতা বাড়িবে? "যে পর্যন্ত না হিন্দী ইংরেজীর সমান হয়" বলা ইহা বলার সমান যে "যে পর্যন্ত না আমি বাবার সমবয়স্ক না হই।" যদি যথার্থই হিন্দী কিছু উন্নতি করে তো ইংরেজীও কি বসিয়া থাকিবে? মিত্য নব নব টেকনলজি দ্বারা কি উহাও অগ্রসর হইতেছে না? ইংরেজীই যদি আমাদের আদর্শ হয় তো ১৫ বৎসরের বদলে ১৫০ বৎসর পরেও আমরা দেখিব যে পার্থক্যটা ঘুচে নাই। আর ইংরেজীই যে চিরকাল বিশ্বভাষা থাকিবে তাহার প্রমাণ কি? একসময়ে ইয়োরোপে লাটিন সিবলজীর ভাষা ছিল। ধর্ম, সাহিত্য,

রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, এবং ব্যবসায়ে ইহার প্রচলন ছিল। পরে ফরাসী ভাষা (lingua franca) এই পদ প্রাপ্ত হয়। আজ ইংরেজী এক আন্তর্জাতীয় ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কে জানে যে ভবিষ্যতে রুশ ভাষা বিশ্বভাষা হইবে কি না? অতএব জগতে কোন্ ভাষা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইতেছে তাহার মুখপেক্ষী না থাকিয়া আমাদের নিজ দেশের জন্য উচিত ব্যবস্থা করাই কর্তব্য।

অন্যান্য প্রদেশ যখন এই আপত্তি করে যে, "আমাদের উভয়রূপে হিন্দী শিখিবার জন্য আরও অধিক সময় মিলা চাই", তাহাদের ইহারও রিপোর্ট করা আবশ্যক হইয়া পড়ে যে এই ১৭ বৎসরের মধ্যে কতদূর শিখিতে পারিলাম। যথার্থ উত্তর বোধ হয়, এই হইবে যে "কিছুই নয়; আমরা ১৯৪৭-এ যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি।" গঠন যখন কেন্দ্রের, তখন আমরা যদিও উদাসীন, এবং কেন্দ্র হইতে হিন্দী প্রচারের কিছু চেষ্টা হইলেই তাহাতে 'অতিব্যস্ততা' আরোপ করিব এবং অভিযোগ করিব যে হিন্দী প্রচারের নামে জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় হইতেছে। "যে পর্যন্ত না আমরা স্বেচ্ছায় হিন্দীকে গ্রহণ না করি"···কথার আক্ষরিক অর্থ এই যে "ইচ্ছাও করিব না, গ্রহণও করিব না"।

দ্বিতীয় উর্দু ভাষা খড়ী বোলী হিন্দীর উৎপত্তির সঙ্গেই (বা তাহারও পূর্বে) সম্পূর্ণ হিন্দীর গঠন (construction), কিন্তু ফারসী (Perso-arabic) বর্ণমালা এবং 'পদ' সমূহের (terms—বিশেষ, বিশেষণ, অব্যয়) পরিচ্ছেদে সাজিয়া চলিয়া আসিয়াছে। উভয়কে পৃথক ভাষা না বলিয়া একই ভাষার দুই শৈলী (styles) বলাই উচিত। শুধু বর্ণমালার ভিন্নতাই উভয়ের মধ্যে কৃত্রিম দেওয়াল রচনা করিয়াছে। খড়ীবোলীকে উর্দুর 'হিন্দু সংস্করণ' বলা যাইতে পারে। উর্দুর বর্ণমালা অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক এবং উহার পদসম্পদ অধিকাংশই বিদেশী হওয়ার দরুণ ইহা ভারতীয় ভাষাগুলির অনুপযোগী। মহাপ্রাণের জন্য এক হ-কার এবং আর দুই চারিটি অক্ষর যোগ করিয়া এই লিপিকে কথঞ্চিৎ ভারতোপযোগী করা হইয়াছে। অন্যদিকে 'অ', 'ই', 'উ', উচ্চারণের দুই দুই, 'ঋ' উচ্চারণের জন্য তিন, এবং 'ঌ' (ৡ) উচ্চারণের জন্য চার অক্ষর অদ্ভুত আছে। ইহাদের সূক্ষ্ম উচ্চারণ-ভেদ সম্বন্ধে মৌলবীদেরও মতভেদ দেখা যায়। তিনটি মাত্র স্বরবর্ণ দ্বারা কাজ চলা হয় এবং হ্রস্ব স্বরের জন্য কোন অক্ষরের ব্যবহার হয় না। শুধু KM লিখিয়া আবশ্যকানুযায়ী তাহাকে 'কম্', 'কিম্', বা 'কুম' পড়া হয়। এক, দুই বা তিন 'যুক্তা' (বিন্দু) ব্যবহারে অক্ষর পরিবর্তিত হইয়া যায়। কিন্তু অক্ষরকে পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া এবং কিছু অক্ষরকে পৃথক্ করিয়া লিখা হয়। এইসকল কারণে এই লিপি এত জটিল যে একপৃষ্ঠা পড়া অপেক্ষা একপৃষ্ঠা লিখা সহজ।

উল্লিখিত কারণে উর্দুর দাবী কখনও তোয়াক্কা হইতে পারে নাই। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যেরূপ সর্বত্র কংগ্রেসী ঝাণ্ডার সম্মুখে এক মুসলিম লীগের ঝাণ্ডাও খাড়া করিয়া দেওয়া হইত, সেইরূপ হিন্দীর দাবীর সম্মুখে উর্দু দাবীও পেশ করা হইত। মহাত্মা গান্ধীর নীতির দরুণ উভয়ের মধ্যপথ "হিন্দুস্তানী" কিছুকালের জন্য উত্তর-ভারতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃত ছিল। কোন লেখক ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন, হিন্দুস্তানী = ½ হিন্দী + ½ উর্দু। ইহাতে যথাসম্ভব তৎসম ও বিদেশী শব্দ উভয়কেই হটাইয়া কেবল তদ্ভব ও দেশজ শব্দসকলের ব্যবহার নির্দিষ্ট ছিল।* কিন্তু ইহাতে না পারিভাষিক শব্দ (technical terms) প্রস্তুত হইতে পারিত, না ইহাতে উচ্চস্তর ভাব প্রকট হইতে পারিত। বোধহয় দৃষ্টিতে হিন্দী-

* The development and spread of Hindustani must not and will not conflict with the continued

ভাষী ক্ষেত্রের জন্য ইহা এক উত্তম মাধ্যম এবং ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ভাষা থাকিবেই, কিন্তু সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দীই অধিক সুবোধ্য। আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে ইংরাজী তো ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছে ও উর্দু পাকিস্তানে (যদিও উর্দু পাকিস্তানের ভাষা নয়) এবং বিশ্বভাষীর প্রশ্ন সমাপ্ত হইয়াছে।

স্বাধীনতালাভের বহু পূর্ব হইতেই ভূদেবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি অহিন্দীভাষী মনীষীরাও ভারতে হিন্দীর মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং ভারতীয় মাত্রেরই ইহা শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। অন্তত সাহিত্য সঙ্গীতে, বাজারে, ব্যবসার ক্ষেত্রে, রেলস্টেশনে ও তীর্থভ্রমণে হিন্দীর উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। জীবিত ভাষা হিসাবে বহুল কার্যক্ষেত্রে সংস্কৃতাদি অপেক্ষা ইহা অধিক উপযোগী। ইংলণ্ডের স্কুলগুলিতে মাতৃভাষার অতিরিক্ত এক Continental language (বিশেষত ফরাসী) শিখান হয়। Kellog, Platt, Key Grierson, Farquhar-আদি ইওরোপীয় বিদ্বানেরা হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। অতএব অন্য প্রদেশের লোকেরা নিজ দেশের এক শ্রেষ্ঠ ভাষা (সর্বশ্রেষ্ঠ না হউক) শিখিবে এরূপ আশা করা অন্যায় নয়। ইহাতে তাহাদের বিশেষ ভালো ও সন্তোষের কোনরূপ হানি হওয়ার আশঙ্কা নাই।*

হিন্দীর বিরোধে যে কিছু বাঙালী নেতা

* এইরূপ কিছু হিন্দুস্থানী শব্দ দেওয়া হইল—বাপ, বাঁ ভাই বেটা, লড়কা, মুঁহ, মাথা, আঁখ, হাথ, পাঁও, কৈসা লেড়, বহুত, গাঁও, পহাড়, মোঁহ, সুরজ, চাঁদ, আগ, পানী, ঘর, বহী চিট্ঠী, বোলা, কপড়া, দূধ, ঘাস, ঘোড়া, দাঁত, চাঁদী, ঠণ্ডাই, মেঠী, কমাই, জাত, বদমাস, চরাই, লড়াই, জীত, জোড় বটোর, লড়কী, মৈদান, ভাঁচ হাল, হাড়, আঁখী, ছুটি, ছোঁটা, পাঁও, ভর, ভাই, লম্বা, ঠিলাই, ছোটা, বাদেস, আন্ধা, বুরা ভলা, খাটি, খাসী, ঠিক ভুল, পুরা।

যোগদান করিয়াছেন, তাহার কারণ 'সুপিরিয়র রেস' বা উচ্চতর জাতির ঘাতক ধারণা। বঙ্গদেশের কয় লোকই খুশী মনে হিন্দীকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। বাঙালাকেই কেন নয়? এরূপ একটি আওয়াজ মধ্যে মধ্যে উঠান হয়। আমাদের বক্তব্য এই যে, গত দুই এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতের কোন প্রদেশে অধিক বিদ্বান ও মেধাবী ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, সে বিষয়ে ঝগড়া করিয়া কোন লাভ নাই, বরং তাহাতে ভারতীয় একতা ব্যাহত হইবে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ, জগদীশ চন্দ্রকে কে না মহান বলিয়া মানে। শুধু ইহার জন্যই কোনও প্রদেশের লোক বা ভাষাকে ভারতের শাসন ব্যবস্থাতে প্রমুখ স্থান দেওয়া যায় না। ভারতের কোন ভাষা সাহিত্য সম্পদে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাও এক বিবাদাত্মক প্রশ্ন। তামিলাদি ভাষার সাহিত্য সম্পদের পূর্ণ পরিচয় না লওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন রায় দেওয়ার অধিকারীও আমরা নই। হিন্দী ভাষা সাহিত্যিক দৃষ্টিতেও কিছু দরিদ্র নয়। গত ৫০ বৎসরে ইহার অভূতপূর্ব

use and enrichment of the other great languages of India—Bengali etc. Some of these languages are already more wide awake and intellectually alert than Hindustani and they must remain the official languages for educational and other purposes in their respective areas."

Jawaharlal Nehru's Autobiography.

"Hindi cannot and should not lead to the neglect of the mother tongue any more than the citizenship involves the neglect of domestic duties."

C. Rajagopalachariyar.

"As things stand, Hindustani alone has the greatest claim to be the national language..... Bengali habits of pronunciation and the facts that Bengali has two styles, literary and colloquial make it highly unsuitable for the rest of India. A rich literature is no recommendation to be a *lingua franca* .....Its value in commerce is also a great factor. Moreover Hindustani has already become a great idea, the idea of Indian unity, which Bengali or any other Indian speech lacks."

Dr. S. K. Chatterjee's "Languages & Linguistic Problems.

বহুমুখিনী হইয়াছে এবং ইহাতে পৃথিবীর ভাল ভাল সাহিত্যেরও অনুবাদ হইয়াছে। নিম্নলিখিত কারণে আমি সর্বভারতীয় ভাষারূপে হিন্দীকে বাঙ্গালার চেয়ে অধিক যোগ্য মনে করি।

(১) হিন্দী মধ্যপ্রদেশের ভাষা কিন্তু বাঙ্গালা প্রাদেশীয় ভাষা। হিন্দী ভারতের চিরন্তন রাজধানী (Eternal Capital) প্রাচ্যের রোম, দিল্লী শহরে উৎপন্ন হইয়া রাজনৈতিক কারণে আজ ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। এবং ব্রজভূষী, ব্রজভাষা, মগধী, মৈথিলী, হস্তীনগরী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে।

(২) ইহা বহুজনবোধ্য ও বহুপ্রচলিত ভাষা পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম, করাচী হইতে মণিপুর এবং কাশ্মীর ও নেপাল হইতে হায়দরাবাদ পর্যন্ত ক্ষেত্রের অধিবাসী ইহা কিছু না কিছু বুঝে। সুদূর দক্ষিণ (মহীশূর, কেরল ও তামিলনাড়) ছাড়া সমগ্র ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশের লোক (যাহারা ইংরেজী জানে না) ভারতে এবং বহির্ভারতে ও বহুধা হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর মাধ্যমে বার্তালাপ করেন বলিয়া ব্যবসায়াদি ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন অধিক। এজন্য ইংরেজীতে ও বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দী শব্দই অধিক গৃহীত হইয়াছে। যথা—vakil, mukhtar, mohtar, lichi, bilas zamindar, banis (not bone) ভারতের অন্য সাংসদ বা সোভিয়েত প্রচার মুখ্যতঃ হিন্দীর মাধ্যমেই প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। হিন্দী সিনেমাগুলি বোম্বাই ও কলিকাতার লক্ষ লক্ষ মারাঠীকে ও বাঙ্গালীকে আনন্দ দিয়া থাকে।

(৩) হিন্দী দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হয় বলিয়া উত্তরে নেপাল এবং দক্ষিণে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত ইহা সুগম হইয়াছে। অন্য প্রদেশের হিন্দুরাও সংস্কৃতের জন্য ইহা শিখে। এই লিপির সুবিধা এই যে প্রায় সে কোন যুক্তাক্ষর দেখিলেই বুঝা যায় কোন্ কোন্ বর্ণ মিলিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ত, ন্ত, ত্র, ন্দ্র, ক্ষ, ন্ধ, স্ত, ন্ত, ন্দ, ন্ধ, ন্ত, ন্ব, স্ত, ন্ত, ন্ম প্রভৃতি যুক্তাক্ষরের রূপ এত ভিন্ন হইয়া যায়, যে তাহা শিশুদিগকে শিখান অত্যন্ত কঠিন হয়। সংস্কৃত রগ্‌ণ, দিগ্‌ভ্যঃ, প্রভৃতি শব্দের যুক্তবর্ণ ভাঙ্গিয়া লিখিতে হয়। ঐরূপ পালি, প্রাকৃত, হিন্দী উর্দু এবং ইয়োরোপীয় শব্দেরও, যথা—ভিক্‌টু, দিগ্‌ন্ত, ভল্‌লীর প্রভৃতি।

(৪) হিন্দীতে উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষা করা হয় এবং যথাসম্ভব মূলানুগও উচ্চারণ করা হয়। ই-ঈ, উ-ঊ, ন-ন, শ-স, ড-ড়, ব-ব প্রভৃতির উচ্চারণ-ভেদ শৈশব হইতেই শিখান হয়। বাঙ্গালাতে দুই ব একরূপে লিখিত ও পঠিত হয় এবং বহু বাঙ্গালী পণ্ডিতও উহাদের ভেদ জানেন না। রবীন্দ্রনাথও ইংরেজীতে নিজ নাম Rabindranath লিখিতেন। উচ্চারণ ভেদ না মানার কারণেই বাঙ্গালায় নিম্নলিখিত রূপ অশুদ্ধ বানানের প্রচলন হইয়া গিয়াছে—তারিখ, হিস্তি, স্কুল, টিচার, বাবার, খরচ ইত্যাদি। যাহার সেখানে যথার্থ উচ্চারণে একই মাত্রা, (syllable) সেখানেও মাত্রা ভাঙ্গিয়া লিখা হয়, যথা—নকল, বরফ, হিজির, স্কুল, বয়েল, কয়েদ, রেলওয়ে, নিউইয়র্ক। এক পুরাতন সংস্কার যে একসঙ্গে দুইটি স্বরবর্ণ আসিতে পারে না, তাহারই অনুসরণ করিয়া ভুয়া, গোয়া, চাওয়া, প্রভৃতিতে ব্যঞ্জন 'ব' ব্যবহৃত হয় (খাইও' প্রভৃতি অপবাদ)। Goa কে 'গোয়া' লিখিলে soya bean কে কি লিখিব? war কে 'ওয়ার' লিখিলে wire কে কি লিখিব? উচ্চারণ দীর্ঘ করিব, কিন্তু হ্রস্ব লিখিব (মিস, দুধ);* লিখিব দস্তা-স (দহর), কিন্তু উচ্চারণ করিব তালু হইতে—ইহা বাঙ্গালারই রীতি।

---

* জার্মান ভাষাবিদ Geiger তদ্ভব শব্দগুলির উচ্চারণের জন্য এক নিয়ম Law of More আবিষ্কার করিয়াছেন, যথা—মূল শব্দের মাত্রা সংখ্যা তদ্ভব শব্দেও বজায় থাকে। যদি যুক্তাক্ষরে সরলীকরণে একমাত্রার হানি হয় তবে ক্ষতিপূরণের জন্য পূর্ববর্ণ দীর্ঘ হয়। যথা—হস্ত—হাথ, হংস—হাঁস, বিষ—বীষ, ভিক্ষা—ভীখ, তিক্ত—তীতা, মিষ্ট—মিঠা, জিহ্বা—জীভ, মিত্র—মীত, চিত্রক—চীতা, দুগ্ধ—দুধ, দুগ্ধ—দুধ, উষ্ণ—উঠা, উষ্ট্র—উঠ, দক্ষ—ডকা, রাজপুত—রাজপুত। এসব ক্ষেত্রে হিন্দী বানান উচ্চারণেই অনুসরণ করে, বাঙ্গালা তাহার করে না। (লেখক প্রণীত "বাইরামা-বিভ্রাট" দ্রষ্টব্য)।

(৫) হিন্দী এক বিশ্লিষ্ট ভাষা। বিশ্বের অধিকাংশ ভাষাগুলির মত ইহাতে লিঙ্গ বচনাদির সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। বাঙ্গালায়—মোটা ছেলে, মোটা মেয়ে; সে যায়, তাহারা যায় এক ছেলে, পাঁচ ছেলে (ছেলেরা নয়) প্রভৃতি উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে ইহাতে লিঙ্গ বচনাদির সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই।

(৬) হিন্দী ভাষার নিজ বিশেষত্ব (individuality) আছে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা সংস্কৃতের অনুবাদ মাত্র নয়। Formula এক লাটিন শব্দ যাহার ব্যবহার ইংরেজীতে হয়। অতএব ইহার বহুবচনে ইংরেজীর এই স্বাধীনতা আছে যে হয় formula বা foomulas লিখে। ঐরূপ হিন্দীতে আরবী 'কায়দা' শব্দের বহুবচন 'কবাবদ, বা 'কায়দে' উভয়ই হইতে পারে এবং 'সুন্দর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'সুন্দরী' বা 'সুন্দর' দুইই হইতে পারে। খুব শব্দেরও বহুবচন খুবে বা ক্ষীরে হইতে পারে। বাঙ্গালাতে পূরণবাচক শব্দ (প্রথম, দ্বিতীয়), বিশেষণ হইতে বিশেষ্য (দৈর্ঘ্য,), বিশেষ্য হইতে বিশেষণ (বুদ্ধিমান, সাধুত্বিক), কর্মবাচ্য (উক্ত, দৃষ্ট), ক্রিয়াপদের ভাব (দৃষ্টি, চেষ্টা) ইত্যাদি সংস্কৃত হইতে ধার না করিলে চলে না। কিন্তু হিন্দীতে প্রত্যেকের নিজস্ব শব্দ আছে। ইংরেজী ভাষা অত্যন্ত দুর্বল হইতে যদি earth হইতে বিশেষণ earthly শব্দ না থাকিত এবং সর্বত্রই উহাকে লাটিন শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত করিতে হইত। "মরের দৈর্ঘ্য কত হইবে"—তাহা নিরক্ষর বাঙ্গালা রাজমিস্ত্রী জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, কারণ সংস্কৃত 'দৈর্ঘ্য' শব্দটি তাহার জানা নাই; কিন্তু বিহারী রাজমিস্ত্রী অনায়াসে 'লম্বাই' পুছিতে পারে। "আমরা সকলেই ভূখার্ত" এরূপ ভাষা আমরা যথার্থ ভূখার্তদের নিকট আশা করিতে পারি না; কিন্তু "ভূখা" রা অনায়াসে নিজ আবেদন জানাইতে পারে।[১] ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে আমি ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের বিরোধী। উচ্চতর ভাব প্রকাশের জন্য সকল ভাষাই স্ব স্ব সাংস্কৃতিক ভাষা (classical language) হইতে শব্দ সম্ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের বক্তব্য এই যে ভাষায় এরূপ কিছু সরল শব্দ যদ্দ্বারা নিরক্ষর ব্যক্তিও সাধারণ ভাব প্রকাশ করিতে পারে, না থাকিলে কোন ভাষার শক্তি (force) থাকে না।

আগামী সংখ্যায় অন্যান্য কারণগুলির এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

---

১ বহুকোণা রাজধানীর প্রকৃত নাম কি? তিন তিন ভাষায় তিনভাবে ঘোষণায় উহাকে তিন তিন নামে শুনি। তন্মধ্যে "কলিকাতা" নাম কেবল উড়িয়া অনুষ্ঠানেই শুনি। যথা—কলিকাতা কেন্দ্র ওড়িয়া অনুষ্ঠানসূচি শুনিতেছি। এই 'কলকাত্তা' নাম এখন শুধু পুরাতন বাঙ্গালা ও হিন্দীগানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

The Romance of Teaching—By **Muriel Wasi.** National Council of Research and Training, New Delhi Price. Rs. 2/50 P. 1964.

পুস্তকখানি পাওয়ার পর হইতেই পরিচয় দিবার লোভ হইয়াছে। বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইখানির মধ্যে কিশোর পাঠকদের উপযোগী করিয়া রচিত। শত শত বৎসর ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন শিক্ষকেরা যে সাধনা করিয়াছেন তাহার আলোচনা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ—এই আকারে বইখানি লেখা। আমরা ইহার মর্মার্থ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া আমাদের 'শিক্ষায়' ইতিপূর্বে দিয়াছি। লোকে যদি কিছু বলে তাহাতে না ভড়কাইয়া আদর্শের জন্য শিক্ষকেরা চিরকালই 'যুদ্ধ' করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই অপূর্ব সংগ্রামের কথাই ইহাতে আছে। দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া পাঁচফুলে সাজি সাজানো হইয়াছে। যাহারা শিক্ষক তাঁহারা ইহাতে বল পাইবেন, আর যাহারা শিক্ষকতা বৃত্তি হিসাবে এখনও গ্রহণ করে নাই তাহাদেরও মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হইবে। ভারত সরকার হইতে এরূপ সুলিখিত ও সুমুদ্রিত বই প্রকাশ করিয়া অতি সময়োচিত কর্ম করিয়াছেন।

CALCUTTA UNIVERSITY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

২৩শ বর্ষ | কার্তিক, ১৩৭২ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনা

বিজয়ার শুভকামনা

সর্বাগ্রে আমাদের গ্রাহক ও পাঠক সকলকেই বিজয়ার শুভকামনা জানাই। বৎসরের এই দিনটি সকলকে শুভকামনা জানাইবার দিন।

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে দুর্গাণি তরন্তু
মা কশ্চিন দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥

সকলের মঙ্গল হউক, সকলে নীরোগী হউক, সকলে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করুক, কাহারও যেন দুঃখ না ঘটে। Co-existence রাজনৈতিক সংজ্ঞা লাভ করিবার বহুপূর্বে আমাদের দেশে এইরূপ মৈত্রী-ভাবনা ছিল। আজ যখন পৃথিবীতে লড়াইয়ের মরসুম পড়িয়াছে তখন সেই পুরাতন ভাবনাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করি। নূতনকে পুরাতন মন্ত্রেই আবাহন করি।

যুদ্ধ ও শিক্ষা

শিক্ষাজগতেও যুদ্ধের কথা আসিয়া পড়িতেছে, কারণ ইহা সঙ্কটের সময়, যাহাকে বলে state of emergency—সুতরাং বৎসরের এই দিনটিতে ছাত্র শিক্ষক মণ্ডলের বিশেষ কর্তব্য বোধের সে কথা বলিতে ত্রুটি করা চলিবে না। তাঁহাদের প্রধানমন্ত্রী সেকথা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—দুঃস্থ ও দুর্দিনের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। বলবানের আদর্শ, হল ও মুষল—আমাদিগকে করিতে হইবে। যেখানে একটি ফসল উৎপন্ন হইত, সেখানে দুইটি করিতে হইবে, খাদ্য অপচয় যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইবে, এবং যাহা সুলভ অথচ পুষ্টিকর সেরূপ খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করা, সেদিকে দৃষ্টি রাখা—ইহাই হইল এ যুগের ধর্ম। বিশেষ করিয়া ইহা ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য, কারণ তাঁহারাই আদর্শবাদী একথা আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি।

দুঃখের বিষয়, স্বীকার করিতেই হইবে যে আমাদের এ সকল বিষয়ে এখনও সমুচিত চেতনা নাই, সম্যক দৃষ্টি নাই।

শতকরা ৮ ভাগ খাদ্যের জন্য আমরা পরনির্ভর, একটু চেষ্টা করিলেই আমরা খাদ্যে পরাধীনতা

হইতে মুক্তি পাইতে পারি। জগতের দৃষ্টি আজ আমাদের উপর পড়িয়াছে, এইটুকু কি আমরা চেষ্টা করিয়া যাহা বিষয়ে আত্মনির্ভর হইতে পারিব না?

রাষ্ট্রপতির সতর্কতার বাণী

শিলঙে অখিল ভারত গবেষণাগারের উদ্বোধন করিতে গিয়া রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন যে কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আজ কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে বিজ্ঞানের আবিষ্কার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু ইহাই সব নহে। সত্য, পরম সত্যের মুখ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার আবরণ উন্মোচন করাই জীবনের কাজ। এই সত্যানুসন্ধানের পথই হইল শিক্ষার পথ এবং এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বিদ্যালয়ের স্বল্প পরিসরে ইহার যেমন স্থান, মহা-বিদ্যালয়েও ইহার তেমনি ক্ষেত্র—এখানে কলহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিদ্বেষের স্থান নাই।

পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি

শিক্ষা পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধির কথা ইতিপূর্বে জানাইয়াছি, পুনরায় জানাইতেছি। আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে এই সামান্য বর্ধিত হারে চাঁদা দিতে আশা করি কেহ আপত্তি করিবেন না। আমাদের মুদ্রাযন্ত্রের শ্রমিকদের কথা, কাগজের দুর্মূল্যতার কথা সব দিক বিবেচনা করিলে আপত্তির কথা ওঠে না, ওঠা উচিত নয়। শিক্ষা পত্রিকা চালানো লাভের জন্য নয়, ব্যবসার কথা নয়। এই কথা মনে রাখিলে আমাদের মনে কোনও অসন্তোষ জাগিবে না।

নিজের খাদ্য নিজে ফলাও

যে শিক্ষায় জীবনে নিজের নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।

—বিবেকানন্দ

স্নাতকোত্তর ছাত্রজীবনের কথা

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। ১৯১৭ সাল। বি. এ. পরীক্ষা পাশ করিয়া এম. এ. পড়িতে কলিকাতায় আসি। ইংরেজী ক্লাসে ভর্তি হইলাম। তখন ইংরেজী সাহিত্যের খুব কদর। প্রায় তিন শত ছাত্রছাত্রী ইংরেজী ক্লাসে, তিন সেকশনে বিভক্ত। বৃদ্ধ নামজাদা অধ্যাপক হেনরি স্টিফেন বিভাগের কর্তা। তারপরে অনেকে ছিলেন। অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি পড়াইবার সময় রোমান্টিক কাব্য সাহিত্য সহজ, স্পষ্ট ও রঙ্গীন করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে ধরিতেন। অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এবং মৌলিক ইংরেজী কবিতা রচনা করিয়া ইংরেজ কবি সমালোচকদের কাছে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, যাঁহার পাণ্ডিত্য ও শাসন কৌশল ছাত্রদের আকৃষ্ট ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবদ্ধ করিয়া রাখিত। বার্নার্ড অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি পরবর্তী জীবনে স্বাধীন ভারতে পশ্চিম বাংলার গভর্ণর হইয়াছিলেন ; অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ—যাঁহারা ঠিক অর্থটি বুঝাইবার জন্য, গ্রীক ও ইংরেজী শব্দের অবতারণা করিবার জন্য ক্লাসেও বড় বড় অভিধান আনিতেন ও অভিধান দেখিতেন ;—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্নাতকোত্তর বিভাগে যেখানে অর্থাৎ যে যে কলেজে ভাল ভাল অধ্যাপক পাইতেন তাঁহাদের আনিয়া কেন্দ্রীয় এই স্নাতকোত্তর বিভাগের কার্যকারিতা বাড়াইতেন। আমরাও এক জায়গায় এতগুলি পণ্ডিতের সমাবেশে আসিয়া উচ্চ চিন্তার ভাবনায় লাভবান হইতাম, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। স্নাতকোত্তর বিভাগে এই কেন্দ্রীভূত শিক্ষাদান ব্যবস্থায় আমরা প্রথম কি দ্বিতীয় বৎসরের ছাত্রবৃন্দ। বাহির হইতে এই অভিজ্ঞতা নূতন ও বিচিত্র বোধ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি! এ ক্লাসে আবার ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টা। চল্লিশ পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন মিনিটে হয়। সুতরাং সে দিক দিয়াও আমাদের লাভ হইয়াছিল।

আমার প্রথম হইতে নূতনত্বের আভাস। প্রত্যেক অধ্যাপকের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে কতটি বক্তৃতা দেওয়া হইবে, এবং আলোচনার বিষয়বস্তু কি ভাবে আলোচনা হইবে, কোথাও কোথাও আলোচনা সম্পর্কে কি কি বই দেখিতে হইবে, তাহাও ছাপাইয়া ছাত্রদের মধ্যে অফিস হইতে বিতরণ করা হইত। কয়েকটি আমাদের খুবই কাজে লাগিয়াছিল। জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার এ যেন অভিনব উপায়।

কিন্তু পড়াশুনা চলিবে কি প্রকারে? আর্থিক ব্যবস্থা হইবে কোথা হইতে? কোনও আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে থাকিয়া পড়ার ব্যবস্থায় মন সায় দিল না। সরকারী বৃত্তি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাও আর নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ! অবশ্য পরে শুনিলাম ষষ্ঠ বিহার ওড়িষ্যা প্রদেশের কোনও প্রধান শিক্ষকের পুত্র, তিনি বৃত্তি পাইলেন। কিন্তু আমি পাইলাম না কারণ আমি তো 'ডোমিসাইল্ড' নই—আমি বাঙ্গালী হইয়া অন্য প্রদেশের লোক বলিয়া পরিচয় দিতেও চাহিলাম না, পরিচয়ও না। সুতরাং!

নিজে অর্জন করিয়াই পড়িব স্থির করিলাম। দুই দুইটি টুইশানি জোগাড় করিলাম, সকালে দেড় ঘণ্টা বিকালে দেড় ঘণ্টা—অর্থ যোগ হয় দুবেলায় মোট

৫০ টাকা করিয়া মাসিক—ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকিয়া পড়িবার পক্ষে যথেষ্ট। তখন ছাত্রবেতন কম ছিল, হোস্টেল খরচও ১০।১২ টাকা মধ্যে প্রায় কুলাইয়া যাইত। পড়ার বই অপাতত না কিনিলেও চলিবে ভাবিলাম। অধ্যাপকেরা যাহা বলিয়া যাইতেন তাহার কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতাম। তা ছাড়া ব্যসনও ছিল, 'অপাঠ্য' অর্থাৎ যাহা পরীক্ষার পাঠ্য নয়, তাহা পড়া। চশমা ব্যবহার করি, সুতরাং চোখের দিক দিয়া বেশি অসুবিধা নাই। Comparative Philology'র কিছু কিছু বই ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের পাঠ্য বহির্ভূত নানা বিষয়ের ভাষণমালায় উপস্থিত থাকিতাম। তবে সময় বড় কম থাকিত! পঞ্চম বার্ষিকী শ্রেণীর কথা বলিতেছি। আরও দুইটা টুইশানি জুটিল। মোট ৪টি. মাসে ১০০ টাকা আয়। ছাত্রদের মধ্যে—দুই জনের কথা মনে পড়িতেছে। একজন অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র, সে তাহার পূর্বের বৎসর মারা যায়। খুব শান্ত নিষ্ট এবং সর্বভূতে প্রীতির ভাব ছিল। আর একটি ছিল মাষ্টার মশাইয়ের (শ্রীম—) পরিবারের একজন. পৌত্র, তাহার মন থাকিত ঈশ্বরের পায়ে পড়িয়া, লেখাপড়ায় কি হইবে এই সে ভাবিত, আমার কাজ ছিল তাহার মনকে পুস্তকমুখী করা।— আরও যে দুইজন পড়িত, তাহাদের কথাও স্নেহভরে স্মরণ করি, একজন আই. এ. পরীক্ষার্থীও তাহার মধ্যে ছিল। কিন্তু পরিশ্রম হইত বেশ বেশি। সকালে বাহির হইয়া ফিরিতে ফিরিতে এগারোটা বাজিয়া যাইত। বারোটায় স্নান আরম্ভ, কোনও দিন স্নান হইত কোনও দিন হইত না। বিকালেও ৫টার পরে বাহির হইয়া ৯টার পূর্বে আসিতে হইত হোস্টেলে, ৯টার মধ্যেই 'রোল্ কল্' হইত।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, পঞ্চমবার্ষিকীতে ভর্তি হইবার সময় আইন পড়িব কিনা সে প্রশ্নও উঠিয়াছিল। এই প্রশ্নের আলোচনার জন্য আমার অগ্রজ কুমুদবন্ধু সেন আমাকে দেশবন্ধু দাসের নিকট লইয়া যান। ১৯১৭ সাল। পরিবারে পরিবারে পরিচয় ছিল শুনিলাম, আমার পিতাও উকিল ও এটর্নী ছিলেন। এবং দেশবন্ধুর পিতার (স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাস) সঙ্গে এক অফিসেই কাজ করিতেন। এই সূত্র ধরিয়া গিয়া তাঁহার সদ্য রচিত অন্তর্যামী কবিতার আদ্যন্ত পাঠ শুনিলাম। সাগর-সঙ্গীতেরও কিছুটা। মনের মধ্যে এই স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে। ওকালতি পড়িব না, পড়িলেই করিতে হইবে, এই কথা দৃঢ়ভাবে বলাতে আমাকে আর জোর করিয়া কিছু বলা হইল না।

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সঙ্গে এই সময়ে একবার সাহস করিয়া দেখা করি। আমাদের সময়ে এম. এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রদের গবেষণার প্রবেশ পথ খুলিবার চেষ্টা করা হয়—দুইশত নম্বরের গবেষণা প্রবন্ধ দুইটি নির্দিষ্ট পেপারের পরিবর্তে। তুলনামূলক অধ্যয়ন চাই। ডাঃ শীল আমাদের কথা শুনিয়া সরল বিষয় লইয়া গবেষণার কথা বলেন। অবশ্য আমি সোজাসুজি মামুলি ধরণের পরীক্ষাই দিব স্থির করিলাম। গবেষণার পথ অনিশ্চিত বলিয়া মনে হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে বৎসর শেষ হইয়া গেল। ছুটিতে বাহিরে গেলাম। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইলাম। প্রথমেই খুব বেশী জ্বর, ১০৪°/ ১০৫° দিন তিনেক থাকিল, ক্রমে কমিয়া কমিয়া যে জ্বরে দাঁড়াইল, তাহা আর যাইতে চায় না। আমি এই ভীষণ জ্বরে হোস্টেলের সংলগ্ন হাসপাতালে চলিয়া গেলাম এবং ৩নং বিডন্ স্ট্রীটের ছাত্রাবাস হইতে ডাক্তারির ছাত্র দেবেন্দ্রমোহন আসিয়া দিবারাত্র আমার আত্মীয় পরিচর্যে সেবা ও সন্ধানে আমাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। জ্বর কমিল বটে, কিন্তু একেবারে গেল না। নিরুপায় হইয়া ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়কে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনি ব্যবস্থা করিলেন, এইরূপ অল্প অল্প মুরগীর ঝোল ও ভাত এবং সেই সঙ্গে গরম জলে স্নান। তখনও হিন্দু হোস্টেলে আন্তিতেদের চিহ্ন একেবারে লোপ পায় নাই। শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য, বা শুধু বৈদ্যদের জন্য খেওয়ালে (খাওয়ার ঘরে) লেখা থাকিত। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই কার্যত তাহা মানিত না। ডাক্তার বাবুর পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন হিন্দু হোস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে পরস্পর সাহায্য কিরূপ চলিত তাহা আমার দৃষ্টান্ত দিয়াই বলি। মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে মুরগি কিনিয়া অনেক মেডিকাল কলেজের ছাত্র সকালে দিয়া যাইত; শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় তাহা ঘরের মধ্যে স্টোভে বসাইয়া দিয়া লেবরেটরীতে যাইতেন। অন্য একজন কেমিষ্ট্রির ছাত্র তাহা মধ্যাহ্নসময়ে নামাইয়া রাখিতেন আমি ঘরে বসিয়া ভাত খাইতাম, সেই সঙ্গে মুরগীর ঝোল। অহিংসুর খাদ্য চালাইতেছি বলিয়া প্রচারও চলিত না, অভিযোগও আসিত না। বাস্তবিকই অল্প কমিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। তিনমাস তো পড়াশুনা কিছুই হয় নাই, টাকার কথাও ভাবিতে হইল। কত প্রার্থনা করিয়া কটক কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপককে, অনেক আত্মীয়কে ও আরও একজনকে পত্র লিখিলাম। কটক কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক পঞ্চাশ ১০০৲ পাঠাইয়া দিলেন, অন্য স্থান হইতেও পাইলাম। গিরিন দা আসিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অনুমান করিয়া payable when able এই সর্তে কিছু টাকাও দিলেন।

শরীর এতই দুর্বল ছিল যে বায়ুপরিবর্তনে যাইতে হইল। রাঁচিতে সেলাম। আমার বন্ধু রমেশচন্দ্র ঘটকের বাড়িতে ও ছোটনাগপুরের অন্যত্র মাস দেড়েক কাটাইয়া আসিলাম। শরীর একটু সারিলে কলিকাতায় ফিরিলাম। টনসুয়েল্লা যে শুধু আমাকেই কাহিল করিয়াছিল তাহা নয়, সেবার মহামারীরূপে রোগের প্রকাশ। স্কুল কলেজ বন্ধ, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাও পিছাইয়া গেল। আমরা পড়িবার কিছুটা সময় পাইলাম।

এতদিন পড়াশুনা করি নাই। কলিকাতায় থাকিতে অর্থ চিন্তা, বাসন হিসাবে অন্য মাসের চর্চা, নানাভাবে চিত্তবিক্ষেপ হইত। এখন মাস আষ্টেক সময় আছে। রাত্রি না জাগিয়া কোনও একটা পরিকল্পনা মত সব বইগুলি পড়িতে হইবে। বি. এ. পরীক্ষায় ভাল করি নাই, হেলাফেলায় কাটিয়াছে। কিন্তু এম. এ. তে যথাসাধ্য ভাল করিতে হইবে। বি.এ-র সময় দেখিয়াছিলাম, সফলরা কলিকাতা হইতে সম্ভাব্য প্রশ্ন আনিয়া তাহার সযত্নে লিখিত উত্তর করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন, এবং তাহার উপর মধুর দিয়া ও ত্রুটিপ্রদর্শন করিয়া সেগুলি তাঁহাদের নিকট ফেরত যাইত। এ কাজের ভারও লইয়াছিলেন উপযুক্ত অগ্রসর ছাত্রেরা—তাঁহাদের একজন ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনৈক টিউটর। এই আট মাসে তাহা সম্ভব নয় জানিয়া আমি নিজেই প্রশ্ন বাছিয়া প্রস্তুত করিলাম। প্রত্যেক বইয়ের উপর তার পাঁচটি প্রশ্ন সযত্নে বাছিয়া লইতাম এবং প্রথমে পুস্তক ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদির সাহায্যে ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিতাম। প্রথম বছর প্রস্তুতি এইরূপ। দ্বিতীয় বছর উত্তরগুলির বিষয়বস্তু শুধু নির্দেশ করিয়া পড়িতে লাগিলাম। এইভাবে পুস্তকগুলি লইয়া প্রস্তুত হইতে এক মাস লাগিল। তাহার পর হয়তো এক সপ্তাহেই সব বইগুলি দেখা হইয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর পরীক্ষা। মহাসমুদ্রে ধরিয়া রাখিবার মত কিছু নাই। একমাত্র ভরসা নিজের উপর, অথবা ভাগ্যের উপর। স্থির বুঝিয়াছিলাম, পরীক্ষায় ভড়কাইলে চলিবে না। প্রস্তুতি যেমনই থাক, মনোবল মত্ত বল আমিও মনে মনে এই কথা বলিতাম, 'না হয় ফেলই পাব, কিন্তু তার চেয়ে খারাপ তো হবে না।' যাহা বেশি পাই তাহা বাড়তি-ভাগ।

পরীক্ষার শেষ দিনে একজন ছাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইল। দূর হইতে চিনিতাম, আর শ্রেণীতে বেশী ছাত্রের সঙ্গে আলাপও হইত না। মফস্বল হইতে আসিয়াছি, কলিকাতার ছাত্র নই, বয়সও অন্য ছেলেদের তুলনায় কিছু বেশি। কিন্তু শেষ দিন যাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব হইল তিনি সাহিত্যিকুলসিক নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার আগেই কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিলাম। চেষ্টা করিতে হয় নাই। সহাধ্যায়ীদের মধ্যে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অমিয়কুমার সেন ও ধীরেন্দ্রকুমার সেন—সকলেই সুপরিচিত ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ স্থান আমি পাইয়াছিলাম। পরীক্ষা করিতে গিয়া অন্তত দুইজন অধ্যাপকের মনে কৌতূহল হইল, অন্য সকলের কথা তো জানি, তাঁদের ছাত্র, আই. এ., বি. এ.-তে ভাল ফল করিয়াছে, কিন্তু এই অজ্ঞাতকুলশীল চতুর্থ ছাত্রটিকে? অধ্যাপক অমূল্যগোপাল বাবুর রোমান্টিক কাব্যের প্রশ্নে আমি ৫০-এর মধ্যে ৪৬ পাইয়াছিলাম, এবং অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইংরেজী গদ্য ও চলার এই দুইটি বিষয়েই চল্লিশের বেশি পাইয়াছিলাম। অন্য তিনজন সহাধ্যায়ীর কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছিলাম। অধ্যাপক মহাশয়দের দুইজনেরই সঙ্গে পরে দেখা ও পরিচয় করিয়াছিলাম এবং পরবর্তীকালে উভয়েরই অকৃত্রিম স্নেহলাভ করিয়া ধন্য বোধ করিয়াছিলাম। এম্. এ.-তে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারায় অধ্যাপক পদ পাওয়ার সুবিধা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ব্যারো সাহেবের নিকট হইতে প্রশংসাপত্রও পাইতে অসুবিধা হয় নাই।

———

বিদ্যাসাগর ও শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

বিদ্যাসাগরের কথা আলোচনা করতে গিয়ে সাধারণত দুজনের কথা প্রবলভাবে মনে হয়, রাজা রামমোহন এবং চৈতন্যদেব। সাধারণ মানুষের কথা ছেড়ে দিলেও রবীন্দ্রনাথেরও এই কথা কেন মনে হল, সে-কথা ভাববার। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক যায়গায় বলছেন,

'বহুকাল পূর্বে একবার নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।'

'এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই এক জনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।'

অনুরূপের নিয়মে স্মৃতি গঠিত হয়। তুলনা তাই চিন্তাজগতে একেবারে অমূলক নয়। বিদ্যাসাগর শৈশবে দুরন্ত ছিলেন, একগুঁয়ে ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা জানি। কিন্তু তার জন্য নিমাইয়ের কথাটি মনে পড়বে কেন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর নাম জুড়ে আসার আশু কারণ থাকতে পারে। কিন্তু শচীর দুলালের নাম এত সহজে এ প্রসঙ্গে মনে পড়বার আশু কারণ পাওয়া যায় না। বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, রামমোহনের কথা মনে হওয়ার কারণ,

(১) সমাজ সংস্কার করেছিলেন, একজন সতীদাহপ্রথা নিবারণ, অন্যজন বিধবা বিবাহ প্রবর্তন,

(২) এ বিষয়ে দু'জনেই সমান দুর্ধর্ষ ;

(৩) দু'জনেই শাস্ত্র নির্দেশ নিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করেছিলেন,

(৪) দু'জনেই আইন প্রণয়নে সফলকাম হন,

(৫) দু'জনের বিরুদ্ধেই একই সম্প্রদায় আন্দোলন করেন,

(৬) উভয়েই মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন। কিন্তু এইখানেই মিল, তারপর

(১) বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তিত হলেও, বিবাহ তেমন ভাবে চালু হতে পারে নি ;

(২) রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন না,

(৩) বিদ্যাসাগরের মতো রামমোহন অতি সাধারণের দুঃখ মোচনে বেরিয়ে হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন নি,

(৪) রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগর কোন ধর্মান্দোলন করতে চান নি।

তবু মনে হয়, বিদ্যাসাগর যেন রামমোহনের অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন, রাখার অতীত কল্পনাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

কিন্তু নিমাইয়ের কথা তাঁর প্রসঙ্গে মনে পড়বার কি কি কারণ থাকতে পারে ? হয়ত,

(১) বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধ্যমে নিমাইয়ের কাহিনী আমাদের অতি পরিচিত,

(২) শ্রীকৃষ্ণ থেকেও নিমাইয়ের শৈশব বাঙালীর কাছে যেন অধিকতর মধুর,

(৩) নিমাইয়ের শৈশবের দুরন্তপনার সঙ্গে পরবর্তীকালের প্রেমঘন রূপ,

(৪) উভয়েরই পাণ্ডিত্য।

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে শচীমাতার উল্লেখে শচীমাতা এবং নিমাইয়ের সম্পর্ক বড় হয়ে পড়েছে। মায়ের যেমন ছেলেসর্বপ্রাণ, ছেলেরও তেমনি।

এই বাৎসল্যের দৃষ্টান্তটি মধুর কারণ। এরই মধ্য থেকে নিমাইয়ের লোকপ্রেম জেগে উঠেছে, দেশের কল্যাণ হয়েছে। নিমাইয়ের কাছে বাংলাদেশ যা পেয়েছে তার কিছুই পরিশোধ করতে পারে নি। নিমাই এতব্যাপক যে পরিশোধ করবার সীমার মধ্যে আসতে পারা যায় না, তাই যুগ যুগ ধরে বাঙলা দেশের লোক তাঁকে তাঁর সর্ব অবস্থাকে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং স্নেহ দিয়ে নিরীক্ষণ করে আসছে। বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও সেই একই কথা। বাঙলাদেশ তাঁর কাছে এত পেয়েছে, তাঁর অশ্রান্ত বাঙলাদেশকে এমন নিবিড় করে দিয়েছেন আর তার বদলে আমরা একাংশ তখন কৃতজ্ঞতায় তাঁকে এমন বিদীর্ণ করে দিয়েছি যে, জন্মজন্মান্তর ধরে আমাদের অসহায় অন্তর তাঁকে স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি শ্রদ্ধাতে উপশম দিতে ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

অবিরল প্রেমাশ্রুতে যে নিমাই দেশের কল্যাণ কামনা করেছেন তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তুলনায় বিদ্যাসাগর চরিত্র সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। দুঃখ বেদনা অভাব অনটন উপবাস আর সমাজের অত্যাচার সহ্য করবার শক্তি যেন যুগ যুগ ধরে বাঙলার মাটিকে গঠন করেছে। সেই মাটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে বাঙলার, গ্রাম বাঙলার মেয়েদের মধ্য দিয়ে, শিশুদের মধ্য দিয়ে। এই দুজনের প্রতি বিদ্যাসাগরের অসীম করুণা উৎসারিত হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর বাধা পেয়েছেন বয়স্ক পুরুষদের কাছ থেকে, উৎসাহী দেশহিতৈষীদের কাছ থেকে। কোন মেয়ে বা শিশুর কাছ থেকে নয়।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের রচনার রাখাল এবং গোপালের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে বলতে চেয়েছেন রাখালের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের শৈশবের তুলনা বেশি করা যায়, সুবোধ ছেলে গোপালের সঙ্গে নয়। কৃত-বিদ্য ও ভালো ছেলের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এটি আক্ষেপ এবং অভিমান ; সত্য নয়। এই সূত্র ধরে অনেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, অধ্যক্ষ জীবনেও তিনি হিন্দু স্কুল এবং সংস্কৃত কলেজের ছেলেদের মারামারি দেখে কৌতুক বোধ করতেন, কৌতূহলী

হয়ে পড়তেন। এই জন্যই বাকি তিনি দুরন্ত ছেলেকে কখনও দণ্ড দিতে চাইতেন না।

এই বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা আমার খুব মনে ধরে না। রাখাল ছিল আত্মসুখী। অপরিণামদর্শী আত্মসুখী ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা করতে পারতেন না। গোপাল সুবোধ, কেবল পড়াশুনা করে বলেই নয়, সে বাপ মার দুঃখ বোঝে: 'ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভালবাসে।' 'ভাল খাব ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।' 'মাইয়া, আপনার ছোট ভাই বোনগুলি লইয়া, খানিক খেলা করে।' আর, রাখালের পিতা, এক মাসের ভিতর, চারিবার বই কিনিয়া দিয়াছেন। ছোট ভাই ভগিনীগুলির সহিত কলহ ও মারামারি করে।' 'খেলিতে পাইলে, সে আর কিছুই চায় না।' গোপালের মত খানিক খেলা করে না। রাখাল আত্মসুখী, অপরিণামদর্শী। যে শিক্ষক পড়াতে গিয়ে ছেলেদের বেত মারেন তিনিও তেমনি আত্মসুখী। বেত মারাটাই আত্মসুখের কারণ। অসৎ ছেলেদের তিনি শাস্তি দিতেন না, এমন ঘটনা তাঁর জীবনে পাওয়া যায় না। মেট্রোপলিটানের ছাত্রদের তিনি একবার তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তারা অসৎ বলেই। কিন্তু সে দণ্ডপ্রদানে তাঁর আত্মবিস্মরণ ঘটেছিল তাই তিনি তাদের ডেকে আবার অনুযোগ করিয়েছিলেন।

সংস্কৃত কলেজ বা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মারধোরে তিনি কৌতূহল বোধ করেন নি। তিনি দেখতে চেয়েছেন, দুটি কলেজের ছাত্রদের চরিত্রে তফাৎ কোথায়? হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আছে অহমিকা আর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের হীনমন্যতা। এই বিভেদকে কাটিয়ে দেবার জন্যই সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সাধনে ব্রতী হলেন নতুন দিশারি—কি না কে বলতে পারে।

এই আত্মসুখ, অপরিণামদর্শিতা এবং কর্মবিমুখতা যে সব সময় একত্রে আসে তা নয়। পৃথকভাবেও আসতে পারে। ইউরোপীয় লোকে কর্মবিমুখ নয়, কিন্তু আত্মসুখী। জগতে সেজন্য যে কত অত্যাচার ঘটে গেছে তার গণ্য করতে বিদ্যাসাগর ভোলেন নি।

আখ্যানমঞ্জরী নামে তাঁর তিনখানি পুস্তক আছে। প্রথম দুটিতে চরিত্রের গুণগুলি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তৃতীয় ভাগে বিদ্রূপ সুর। 'দুঃসহতার চূড়ান্ত' গল্পে স্পেনবাসী যে আমেরিকার আদিবাসীর উপর কিরূপ অত্যাচার করেছে তা এনাকেরোনার চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ক'রে দিয়েছেন। স্পানিয়ার্ডরা এই অত্যাচার করল কেন, না, 'তাঁহারা অর্থলালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, দুর্বল নিরপরাধ আদিম নিবাসী লোকদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন।' গল্পটির উপসংহারে তিনি লিখেছেন, 'এইরূপে, প্রতিভ্রান্ত ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করাইয়া স্পানিয়া মহাপুরুষেরা এনাকেরোনাকে সান ডোমিঙ্গো নামক স্বাধিকৃত স্থানে লইয়া গেল, এবং বিচারাসনে আসীন হইয়া, তাঁহাকে অপরাধিনী স্থির করিয়া, উদ্বন্ধন দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল। এই হতভাগা রাজ্ঞী স্পানিয়ার্ডদিগের প্রতি পূর্বাপর যে সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়াছিলেন, এত দিনে তাহার সম্পূর্ণ ফললাভ করিলেন।' তাঁর এই বিদ্রূপ অনুরূপ ঘটনা আদিয়ানওয়ালাবাগ সম্পর্কেও ব্যবহার করিতে পারি। তৃতীয়ভাগের আর একটি গল্প 'পুরুষ জাতির দুঃসহতা'। ভাসস ইঙ্গল দক্ষিণের অধিবাসী। গল্পের প্রথমে আছে, 'ইয়ুরোপীয়েরা আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের সর্বনাশ করিয়াছিলেন।' ইঙ্গল এই আদিম নিবাসীদের হাতে পড়ল আর তাকে বাঁচাবার জন্য ঐ প্রদেশের অধিপতির কন্যা ইয়ারিকোর চেষ্টার শেষ নাই। ইয়ারিকো ইঙ্গলকে ভালবাসলেন, এবং দুজনে বারবেডোতে পালিয়ে আসেন। 'ঐ প্রদেশ দাসদাসী বিক্রয়ের এক প্রধান স্থান।' ইঙ্গলের চরিত্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'ইঙ্গলের অর্থলালসা অত্যন্ত প্রবল, অধিক

উপার্জনের মানদেই, সে আমেরিকায় গমন করে।' অতএব 'ইহল তদ্রতা এক দাস বণিকের নিকট ইয়ারিকোকে বিক্রয় করিল। ইয়ারিকো, এই সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, বারংবার পূর্বপ্রস্তাব স্মরণ করাইতে লাগিল। ইহল তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে তোমার সহযোগে আমার গর্ভ হইয়াছে, অন্ততঃ প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর; এরূপ অবস্থায় আমার প্রতি এরূপ নৃশংস আচরণ করা তোমার কদাচ উচিত নয়; কাতর বচনে গলদশ্রুলোচনে এই সকল কথা বলিয়া, তাহার অন্তঃকরণে করুণা জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাহার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণে পূর্ববৎ অবিকৃতই রহিল; বরং গর্ভ সংবাদ অবগত হইয়া, সে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়মানুসারে ক্রেতার নিকট অধিক মূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্রেতা, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া ক্রীতদাসী লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল।' সেক্সপীয়র ইহলের খবর জানতেন না বলেই বুঝি বিপরীত নাটক লিখেছিলেন 'ওথেলো'।

কেবল এই সাধারণ লোকই নয়, মিসনারীরাও আছেন। 'অপত্যস্নেহের একশেষ' গল্পে তিনি লিখছেন,

'আমেরিকার অন্তঃপাতী চিলি নামক জনপদে সান্‌করমান্তো নামে এক নগর আছে। ঘাট বৎসরের অধিক অতীত হইল, তথায় স্পেনদেশীয় মিশনরিদিগের এক আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ মহোদয়ের এই ব্যবসায় ছিল, তিনি অস্ত্রধারী ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অসহায় আদিম নিবাসীদিগের শিশু সন্তান হরণ করিয়া আনিতেন, এবং তাহাদিগকে খৃষ্টান করিয়া, দাসের ন্যায়, স্বজাতীয়বর্গের পরিচর্যায় নিযুক্ত রাখিতেন।' এই রকম মৃগয়া করতে করতে দেখতে পেল, 'এক নারী আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে, আর তাহার দুই শিশু সন্তান সন্নীপদেশে ক্রীড়া করিতেছে।, আর যায় কোথায়, যীশুর বাণীগুলি ঝক্‌ ঝক্‌ করে উঠল। পাদরী সাহেব এই নাড়া আর শিশু দুটিকে বেঁধে রাখতে কত চেষ্টা করছে, কিন্তু বারবারই সে দুঃখে লাফ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে পলাতকা ধরা পড়ল। 'সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। শুনিয়া, মিসনরি মহাপুরুষের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়া সঞ্চার হইল না।.....অকূলনোকো। নদীতীরে মিসনরিদিগের যে আশ্রম ছিল, ঐ হতভাগা নারী অবিলম্বে তথায় প্রেরিত হইল; আর যে পুত্রদিগের স্নেহের বশীভূত হইয়া এত কষ্ট ও এত যাতনা সহ্য করিয়াছিল, একবার এক মুহূর্তের জন্যে, তাহাদের মুখ দেখিতে পাইল না.....সে নিতান্ত হতাশ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইল, এবং একবারেই আহার ত্যাগ ও কতিপয় দিবসেই প্রাণ ত্যাগ করিল।' অথচ এই ইউরোপীয়েরা কর্মবিমুখ নয়, বরং কর্মঠজন। কিন্তু কর্মফলের উৎস তাদের স্বার্থপরতা। ভলটেয়ার ক্যানডিডে স্বার্থপরতার বহু উল্লেখ করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণ লিখেছিলেন: সেখানে রাবণ কপট তপস্বী ছিসেবে সীতাকে হরণ করেছিল। বিদ্যাসাগরের এই কাহিনীতে মিসনারীটি ছদ্মবেশ ধরে নি; আর এই রামায়ণের সীতা বধূ এবং জননী উভয়েই। তার উদ্ধার হয় নি, কারণ তার স্বামীটি খৃষ্টধর্মের আলোক পায় নি এবং সে প্রাচীন সমাজের দাসত্ব মাত্র।

'বহু বিবাহ' পুস্তকের 'তৃতীয় আপত্তি'-তেও বিদ্যাসাগর এই আত্মসুখের দৃষ্টান্ত বহু দিয়েছেন। এরা কেবল আত্মসুখী নয়, কর্মবিমুখ সমাজের ব্যক্তি। তিনি লিখছেন, 'কোনও অতিপ্রধান কুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়। আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি? তিনি অম্লানমুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিক্ষিট পাই সেইখানে যাই।—গত দুর্ভিক্ষের সময়, একজন ভঙ্গকুলীন

অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এই বৃত্তিতে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া সচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি। —গ্রামে বারোয়ারি পূজার উদ্যোগ হইতেছে। পূজার উদ্যোগীরা, ঐ বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্য, কোনও ভদ্রলোককে পীড়াপীড়ি করাতে তিনি, চাঁদার টাকা সংগ্রহের জন্য, একটি বিবাহ করিলেন।' ঐ অধ্যায়ে ভট্টরাজের কাহিনী আছে। বিস্তৃত উল্লেখ করব না। মা আর ভগিনীকে ভট্টরাজের পুত্র ভরণ-পোষণ করতে চায় না। ভদ্রমহিলা মেয়েকে নিয়ে এলেন স্বামীর কাছে। তিনি পাঁচ-ছটি বিয়ে করেছেন। তিনিও রাখলেন না। ভট্টরাজ যে সহৃদয় ব্যক্তির কাছে বৃত্তি পেতেন তাঁর কাছে তাঁরা আবেদন করলেন। ভট্টরাজ তাঁর কথা ঠেলতে পারেন না। কিন্তু তিনি বললেন, 'তোমায়, মাস মাস তাহাদের হিসাবে আর কিছু দিতে হইবেক।' তিনি তা দিতেই অস্বীকার করলেন। ঐ ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, স্থানান্তরে গেলেন, এবং যথাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় পাঠাইতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে, বাটীতে গিয়া তিনি সেই দুই হতভাগা নারীর বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ভট্টরাজ ও তাঁহার ভগিনী স্থির করিয়াছিলেন, বৃত্তিদাতার অঙ্গীকৃত নূতন মাসিক দেয় পুরাতন মাসিক বৃত্তির অন্তর্গত হইয়াছে, আর তাহা কোনও কারণে রহিত হইবার নহে; তদনুসারে, ভট্টরাজ, ভগিনীর উপদেশের বশবর্তী হইয়া, স্ত্রী ও কন্যাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারাও, গত্যন্তরবিহীন হইয়া, কোনও স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। কন্যাটি সুশ্রী ও বয়স্থা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, এবং জননীর সহিত স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছে।'

বিধবা-বিবাহ নিয়ে যে-সব পণ্ডিত প্রবল রকমের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের আত্মম্ভরের প্রমাণও বিদ্যাসাগর দিয়ে গেছেন। তিনি লিখছেন,

'আমার পুস্তক সঙ্কলিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবার কিছুদিন পূর্বে, কলিকাতার অন্তঃপাতী পটলডাঙ্গানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ দাস, নিজ তনয়ার বৈধব্যদর্শনে দুঃখিত হইয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করেন, যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন, পুনরায় কন্যার বিবাহ দিব। তদনুসারে তিনি, সচেষ্ট হইয়া, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন।' ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, সর্বপ্রধান স্মার্ত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, তবানীর বিদ্যারত্ন, মদনমোহন দত্ত বাবুদের সভাপণ্ডিত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, রাজা কমলকৃষ্ণ দেবের সভাসদ ঠাকুরদাস চূড়ামণি এবং হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সভাসদ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি। বিদ্যাসাগর লিখছেন, 'কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, এক্ষণে প্রায় সকলেই বিধবা-বিবাহের বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন।...যদি বিধবা-বিবাহ বাস্তবিক অশাস্ত্রীয় বলিয়া, তাঁহাদের বোধ থাকে, অথচ কেবল তৈলবটের লোভে শাস্ত্রীয় বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথার্থ তন্ত্রের কর্ম করা হয় নাই।'

অন্য প্রকার স্বার্থপরতার প্রমাণও পাওয়া যায়। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য তাঁর বহু ঋণ করতে হয়েছিল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও। দুর্গাচরণবাবু ঋণ শোধের তাগাদা দেওয়াতে বিদ্যাসাগর যে চিঠি লিখেছিলেন, তার কিছুটা তুলে দিচ্ছি:

'তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবা বিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এ ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবা বিবাহ পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্যদান

অঙ্গীকার করিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিবে। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন।..... অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান বাকর কর। এককালীনের অর্দ্ধমাত্র বিদ্যাসাগর অবশিষ্টার্দ্ধ এ পর্যন্ত দাও নাই, এবং কিছু দিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ।.....যাহা হউক আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই।.....আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।.....দেশহিতৈষী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না।'

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তুলনায় নব্যসম্প্রদায়ের লোক। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল আর বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বিকৃত সমস্যা তুলেছেন। এমন বক্তব্যও আছে যে, "এ যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?" বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের ভিতর দিয়ে বাঙলার সমাজকে অসীম ঋণে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। 'বন্দেমাতরম্' যাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয় তাঁর আবির্ভাব দেশে সচরাচর ঘটে না। তবু বলব বঙ্কিম ঔপন্যাসিক হিসাবেই অনন্ত, আর তাই তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা। দিনের আলোয় সমস্যাকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে চান নি। সত্যই বিধবা-বিবাহের যে-সমস্যা তিনি তুলেছেন তা যে বিকৃত তা বলতে পারতেন। দৈবাৎ তিনি বিধবাকে উপন্যাসে এনেছেন, সত্যই ঐ সমস্যাটি বহু বিবাহের আর এই বিষয়েরই ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র। সূর্যমুখী নগেন্দ্র কুন্দ কিংবা রোহিনী হীরালাল-গোবিন্দলাল ভ্রমর প্রভৃতি বহুবিবাহ সম্পর্কীয় সমস্যা। এই দুটি সমস্যাকে এক ক'রে গুলিয়ে ফেলা মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের শোভা পায় নি। শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম জীবনী থেকে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র বহুবিবাহ নিয়ে আন্দোলন করা-কে অবিমৃষ্যতা বলে ভেবেছেন; বহুবিবাহ এমনিতেই রহিত হয়ে যাবে ব'লে তাঁর ধারণা ছিল। নতুন সমাজের চেহারা দেখে এই সিদ্ধান্তে তিনি এসেছিলেন। এখানে তিনি প্রকৃত ব্যাখ্যাই করতে পেরেছেন সন্দেহ নেই। তবু সন্দেহ থাকে, যখন দেখি তার প্রায় শত বৎসর পরেও স্বাধীন যুগে বহুবিবাহ রহিত করার নিমিত্তে আইন করতে হল।

এ বিষয়ে তৎকালেই বিদ্যাসাগর ব্যাখ্যা করে গেছেন। 'বহুবিবাহ' পুস্তকের 'নষ্ট আপত্তি'-তে তার প্রমাণ মিলবে। তিনি লিখছেন,

'কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, এ দেশে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে, সন্দেহ নাই যাহাতে তাহার নিবারণ হয়, তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে সকলের যথোচিত চেষ্টা করা ও যত্নবান হওয়া নিতান্ত উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু, বহুবিবাহ সামাজিক দোষ; সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য; সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া কোনও ক্রমে বিধেয় নহে। এই আপত্তি শুনিয়া, আমি কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি সংবরণ করিতে পারি নাই।'

তিনি বলছেন, 'যাহারা এই আপত্তি করেন, তাঁহারা নব্য সম্প্রদায়ের লোক।' এ সব যে পঠদ্দশার তাব তা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলছেন, 'আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত অপদার্থ, আমাদের হতভাগা সমাজ অতি কুৎসিত দোষ পরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ। এ দিকের চক্ষু ও দিকে গেলেও এরূপ লোকের ক্ষমতায় এরূপ সমাজের দোষ সংশোধন সম্পন্ন হইবার নহে। উল্লিখিত নব্য প্রামাণিকেরা কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ; তাঁহাদের

যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ বিদ্যা, যেরূপ ক্ষমতা, তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ কথা 'কহিয়া থাকেন'। কথা বলা যত সহজ কার্য করা তত সহজ নহে।..... জিজ্ঞাসা করি, এ পর্যন্ত তাঁহারা তন্মধ্যে কোন কোন দোষের সংশোধনে কত দিন কিরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় কোন কোন দোষের সংশোধন হইয়াছে; এক্ষণেই বা তাঁহারা কোন কোন দোষের সংশোধনে চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন।'

সত্যি কথা বলতে কি, এই নব্য সম্প্রদায় যা কিছু সংশোধন করতে চেয়েছেন তা অন্যকে আঘাত দিতেই, উপশম করতে নয়। প্রতিবেশীর বাড়ীতে নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধ পেলেই তাঁরা সংস্কার যুক্তি বলে মনে করেছেন, আর তাতে আপত্তি করলেই তাঁরা চাঁদা তোল বাক্স পিটিয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন: স্বাধীন যুগে আইনের ভয়ে প্রকাশ্য বহুবিবাহ রহিত হয়েছে বটে কিন্তু গুপ্তমুষিকধর্মী স্মার্টেরা ওরই মধ্যে ঐ বিষয়েই মূলধন ক'রে বেশ দুই পয়সা কমাচ্ছে। বিদ্যাসাগরের কথা এখনও সত্য, "আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত স্বার্থপর।" যাই হোক, একথা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে নতুন যুগের আবহাওয়া আমাদের দেশে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি. আমরা পুরনো যুগ আর চরিত্র নিয়েই বহুলাংশে নিশ্চিন্তে ছিলাম। চরিত্রের মধ্যে প্রধান ত্রুটি আত্মসুখ আর কর্মবিমুখতা। দুঃখ-বেদনা আমাদের স্পর্শ করে নি। এরই মধ্যে একমাত্র বিদ্যাসাগর অসমসাহসী, যেমন ছিলেন শ্রীচৈতন্য দেব। তাই বোধ হয় সিজারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তুলনাটি অতি সহজে এসে পড়ে। 'আগমি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়'—দুজনেরই একই কথা, এক ব্রত। কিন্তু যুগের ধর্ম এক নয়।

পৃথিবীর মানচিত্র দেখলেই বোঝা যায়, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অর্থাৎ চীন, ভারতবর্ষ, জাপান, কোরিয়া এবং জাভাতে লোকসংখ্যা কেন বেশি। এই সব অঞ্চলে একর প্রতি খাদ্যোৎপাদন বেশি ঘটে থাকে; যাকে বলে মনুষ্যসিক্ত। ইয়োরোপে এতটা খাদ্য নেই কিন্তু শিল্প-সম্ভাবনা (মনুষ্য ও যন্ত্রচালিত) প্রচুর, বিশেষ ক'রে পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্য ইয়োরোপে; আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও এই সম্ভাবনা প্রচুর। যেখানে শস্যোৎপাদন কম হয়েছে সেখানে শিল্প-বাণিজ্যের পূর্ব যুগে, হয় পশুচারণ করে মানুষ বেঁচেছে, অথবা বাণিজ্য করে, কিংবা অভিযানে বেরিয়ে, কিংবা দাস ব্যবসায় করে লোকশক্তি নিযুক্ত করেছে। ভারতবর্ষে আবার বাংলাদেশই বিশেষ ক'রে উর্বর। কৃষিকাজ এবং জমির উপর নির্ভরতা এখানে তাই অত্যন্ত বেশি। এই অনুসারে লোকচরিত্র আর আচরণের তফাৎ হয়। দু ধরণের লোক পাওয়া যাচ্ছে, (১) স্থিতিশীল এবং (২) বিস্তৃতি পরায়ণ; প্রথম ধরণের লোক দেশে আবদ্ধ থাকে, দ্বিতীয় সম্প্রদায় বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম ধরণের মধ্যে খাদ্য সংস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গেলে হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ করবে নতুবা জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটাবে; দ্বিতীয় সম্প্রদায় হয় দেশত্যাগ করবে নতুবা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে। দেশ-ত্যাগীরা অন্য দেশের ভূমি থেকে সেখানকার অধিবাসীকে বাস্তুচ্যুত করবে অথবা শিল্পসম্ভারে সমৃদ্ধ এমন দেশে গিয়ে চাকরী করবে; বণিকেরা চাইবে বাজার দখল করতে অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে চুকে পড়বে।

ভারতবর্ষ বারবার আক্রান্ত হয়েছে যাদের দিয়ে তারা অধিকাংশই অনুর্বর মধ্য এশিয়ার মানুষ। তাদের বলা যেতে পারে দেশত্যাগী সম্প্রদায়। কিন্তু মুসলমান আমল থেকেই এই দেশত্যাগী সম্প্রদায় ভারতবর্ষের ভূমি থেকে সেখানকার লোকের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছে দেখা যায়। তবে তারা যে ক'টি লোক এসেছিল তার জন্য সুদূর পল্লীগ্রাম

পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে হয় নি। কিন্তু কিছু কিছু অধিবাসী কর প্রদান থেকে নিষ্কৃতি পাবে বলে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। আসলে নিজের জমিতেই নিজেরা থাকছিল। জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন এল না: জনসংখ্যা খাদ্যের অনুপাতে বেড়ে চলল। উইলকক্স এবং পরবর্তীকালে কার-সাণ্ডার্স জনসংখ্যার নির্ধারণ করেছিলেন; তাঁদের হিসাব মতো দেখছি, ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াতে লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি, ১৭৫০-এ ৪৭৯ কোটি, ১৮০০ তে ৬০২ কোটি, ১৮৫০-এ ৭৩৯ কোটি, ১৯০০-তে ১৩৭ কোটি এবং ১৯৩৬ সালে ১১১৫ কোটি লোকের উপর। এশিয়ার জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার থেকে ভারতবর্ষে যে একটু বেশি হবে তা মনে করা যায়। যাই হোক, ১৮৫০ সালে ভারতের জনসংখ্যা সওয়া-দুশো কোটি মতো হবে বলে অনুমান করা যায়। শুধু খাদ্যের উপর কতখানি চাপ পড়ছে তা উৎকটরূপে প্রকাশিত হওয়ার মতো নয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা তখনও ভাববার প্রয়োজন হয় নি। কারণ মানুষের অজ্ঞতা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে জন্মহার মৃত্যুহারের বেশি হত না। তা ছাড়া ছিল আঞ্চলিক যুদ্ধ। সে সব যুদ্ধে লোক নিধন করা আর উৎখাত করা বড় নিয়ম ঐ জমির জন্যেই। ১৮৫০-এর দিকে বাংলা-দেশের জনসংখ্যা যদি বৃদ্ধি হয়ে থাকে তবে খাদ্য পরিমাণের তুলনায় বৃদ্ধি হতে কেবল সুরু করেছে, বৃদ্ধি হওয়ার শেষ অবস্থা নয়।

ভূমি ব্যবস্থার চরিত্র তখন দ্বিমাত্রিক (two dimensional)। বিস্তৃতির দিক দিয়ে সম্পদ, গভীরতার দিক দিয়ে নয়; ত্রিমাত্রিক (three dimensional) অবস্থা এসেছে যখন আমরা খনি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে সুরু করলাম। মুসলমান যুগ পর্যন্ত এই অবস্থাই ছিল, জমির সীমা বাড়ানোই তখন নৃপতিদের, ভূম্যধিকারীর একমাত্র লক্ষ্য। সীমাও খুব ছোট ছোট। তাই ছোট্ট ছোট্ট সীমার মধ্যে মানুষকে বাস করতে হত। বাংলাদেশ পাহাড়িয়া অঞ্চল নয়, নদীমাতার দেশ। কাজেই সেচের দিকে খুব নজর না দিলেও একরকম চলে যেত।

ইংরেজ এল বণিক হিসেবে। পেয়ে গেল রাজত্ব কিন্তু বাণিজ্যও ভুলল না। এই বাণিজ্য তখন নির্ভর করত কাঁচামালের উপর। রাজত্ব এসেছে তাই উপনিবেশ গড়বার দিকে তখনও তত নজর দিয়ে উঠতে পারে নি। ইচ্ছা ছিল, তা পরিণত করতে করতেই সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেল। কিন্তু বাণিজ্যের দরুণ এবং শাসক হিসাবে আমাদের থাকার জন্য ভূমির উপর চাপ পড়ে। তবু গ্রাম বাংলায় এসব আস্ফালন বড় হয়ে ধাক্কা দিতে পারে নি। কলকাতার আশে-পাশে এর প্রতিক্রিয়া এসে পড়ল।

জেমস্ ওয়াট্ টমাস হ্যিসনের পেটেন্ট নিলেন রামমোহন রায়ের জন্মের কয়েক বছরের মধ্যে (১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)। এতকাল বাইরের সূর্যের তাপ, নদীর জল আর বৃষ্টির জলকেই প্রাকৃতিক শক্তি বলে ধরেছি, ওয়াট্ সাহেবই প্রথম সুদূর অতীতের সূর্যোত্তাপকে বাইরে এনে কাজে লাগালেন। তারপর কর্নেরন (Fourneyron)। মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেল, বিক্রয়কেন্দ্রের সন্ধানে সে উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু তা ইংরেজের কথা। তাদের অবসর এল জ্ঞানবিজ্ঞানে প্রাণনিয়োগ করতে পারল। আমাদের দাস্তের মধ্যে এই হল যে, আমাদেরই খাদ্যসম্পদ এখন দুটো দেশকে পোষণ করবে। আমাদের এখানে কল কারখানা তেমন এল না।

আমরা স্থাবর হয়েই ছিলাম, স্থাবরই থাকলাম। ওদের বণিকেরা জড়জগৎ থেকে শক্তি যোগাড় করে ব্যবসায় করে, আমরা নতুন ব্যবসায়ে নামলাম মনুষ্য বা জনশক্তিকে অবলম্বন করে। কাজেই আমাদের গতি মন্থর, অনড়। এই অবস্থায় আমাদের

সেই মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, ব্যবসায়ে প্রবঞ্চনা মুলধন হয়ে উঠল। অথচ নতুন সভ্যতার বিলাসের প্রতি প্রলোভন এসেছে। প্রলোভন দিয়েছে ১৭৯৩ সালে। আমরা অবসর চাই, ঘুড়ি উড়িয়ে টাকা খরচ করি, লাখ-লাখ টাকার কমে মাতৃশ্রাদ্ধ হয় না। পুরনো ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে আমরা সাহেবের মতো ধনী হতে চাই শুধু প্রবঞ্চনাকে অবলম্বন করে। এই দ্বন্দ্বে বেনিয়ান বুদ্ধির চরিত্র-গতি। তাই পুরনো নিয়মকে আমরা ভাঙতে চাই না। সমাজের অনাচার, অত্যাচার (তা কোন এক কালে প্রবর্তিত হয়েছিল সমাজ রক্ষণে) পুরনো শাস্ত্র নির্দেশেই বহাল থাকবে। যাঁরা নতুন স্কুল খুললেন, কলেজ খুললেন (হিন্দু কলেজ প্রভৃতি) তাঁরা মূল ভিত্তি করে ইংরাজের দিকে ছুটলেন ইংরেজ হওয়ার প্রলোভনে। আর যাঁরা পুরনো থাকলেন তাঁরা পুরনো শাস্ত্রের কলেজ চান। এই জন্যই সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে রামমোহনের আপত্তি ছিল, এইজন্য তিনি বিজ্ঞান চর্চা চেয়েছিলেন। সাহেবরা তা দিল না। রামমোহনের অনুগামীরা 'ঈশ্বর ঈশ্বর' ক'রে ইয়োরোপীয় মোহাক আলাক পরে 'কসচর্চ' হওয়ার চেষ্টা করলেন। কোন্ দিকে যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে দেখবার দৃষ্টি নেই।

বিদ্যাসাগর রামমোহনের সেই অন্তর্দৃষ্টি অনুধাবন করেছিলেন। তিনি তাই সেইখানেই এসে দাঁড়ালেন। বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, রামমোহন মারা যান ১৮৩৩ সালে; বিদ্যাসাগরের তখন তের বছর বয়স। বিদ্যাসাগর 'ঈশ্বর' নিয়ে মাতামাতি না ক'রে লোকসমাজের চরিত্র এবং শিক্ষার মান পরিবর্তন করতে চাইলেন।

লোকসমাজের চরিত্র শাস্ত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। শাসনটা শাস্ত্রেরই! এই শাস্ত্র নিয়ে মধ্যস্বত্বভোগীরা দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশ ঐতিহাসিক কালের মধ্যে মঠ-বিদ্যালয় রেখেনি, এদেশে মন্দির সভ্যতা গড়ে ওঠে নি; কাজেই এদেশের লোক কর্মী হওয়ার যোগ্যতা পায় নি, তারা সংগঠিত হতে পারে নি। শাস্ত্র চর্চার থেকে বড় কথা হচ্ছে চিরাচরিত রীতিকে অনুসরণ করে চলা। এইজন্য পণ্ডিতদের জন্য মর্যাদা যতই অনাবশ্যক হয়ে পড়ছে ততই তারা অনাচারী এবং দোষী হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর তাই শাস্ত্র নিয়েই ব্যাখ্যা সুরু করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অনমনীয় হলে হবে কি, বিদ্যাসাগর তাঁর চেয়ে জনমানসের খবর বেশি রাখতেন। ঐ শাস্ত্রের নিয়মের বদলে নতুন নিয়ম চাই তা অবান্তিত রূপে রাজকীয় বিধানই হবে। এইজন্য তিনি গবর্নমেন্টকে টেনে আনতে চান।

সতীদাহ প্রথা বন্ধ হলে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে হবে, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করলে বহু বিবাহ বন্ধ করা উচিত। বিধবা বিবাহ আইন সতীদাহ প্রথার মতো সফল হল না, তার স্বাভাবিক কারণ ছিল; মানুষ হত্যা দেখা যায়, তাকে নিবারণ করা যায়; কিন্তু বিধবা বিবাহ দুটি গোষ্ঠীর সম্মতির উপর নির্ভর করে। বিবাহে যেখানে অর্থপ্রাপ্তি আছে সেখানে সম্মত হবে অর্থনৈতিক কারণেই। বহু বিবাহ বন্ধ করা তার চেয়ে সহজ; কিন্তু বহু বিবাহ বন্ধ করা গেলেও স্ত্রীপণ্যের সওদাগরা বা ব্যভিচার বন্ধ করা যায় না সেই অর্থনীতির কারণেই। বিধবা বিবাহ আইন যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে বলতেই হবে সতীদাহ প্রথা বিরোধ আইনও ব্যর্থ হয়েছে। তার বহু বিবাহের দেশে সমস্যাটা আরও বেড়ে যায়। বয়স্ক সমাজের এই চরিত্রখানাই তিনি তৈরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালের নতুন পুরনো দুটি দলই তা ব্যর্থ করে দিল। ব্যর্থ ক'রে আত্মহত্যা করল। তার ফলভোগ আমরা আজ স্বাধীন যুগেও করছি। আত্মসুখ বিসর্জন করবার শিক্ষা পরের দুঃখে কাতর হওয়ার মতো চরিত্র যদি আমরা তখন থেকে অর্জন করতাম তবে আজকাল খবরের কাগজের পরিসর

অনেক কমে গেছে, কেবল কাগজে-কলমে তেজাল খাদ্যোৎপাদন প্রভৃতি নিয়ে বক্তৃতাবাজী চলতে থাকে।

একটি স্থায়ী সুর বোজনার জন্যই তিনি সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। সেই স্থায়ী সুরটি হচ্ছে চরিত্রের মান বজায়ে। সহানুভূতিশীল হতে হবে, স্বার্থত্যাগী হতে হবে। কর্মপরায়ণ হতে হবে। সহানুভূতিহীন উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সংস্কার তা সে তাঁর মতানুসারী হলেও তিনি সমর্থন করেন নি। ওসব-গুলো স্বদেশ হিতৈষণা হতে পারে কিন্তু ওতে স্বদেশের মানুষ তৈরী করা যায় না, দেশের প্রকৃত মঙ্গল ওতে হয় না। কোন বিষয় নিয়ে সংস্কার হচ্ছে একটা রূপক, তার পিছনের মর্ম হচ্ছে সামগ্রিক মান উন্নয়ন। সংস্কার হচ্ছে দৃষ্টান্ত কিন্তু সামগ্রিকতা হচ্ছে সূত্র। এইজন্যই সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তের দরকারটা তাঁর পছন্দ হয় নি। যে কলেজের কাজে সমস্ত রূপ আত্মনিয়োগ করতে পারে না সে রকম ভলান্টিয়ার দিয়ে কলেজের ছাত্রের মঙ্গল সাধন হয় না। এই জন্য তিনি কলেজের সহসম্পাদকের কাজ ছেড়ে দিলেন। ওর চেয়ে 'আলুর দোকান' করাও ভালো। এই ভলান্টিয়াররা চিরকালই উপদ্রব করে থাকেন। কাজের মধ্যে কেবল অন্যের মাল মসলা নিজের বলে চালানো আর স্বজন পোষণ ক'রে দুর্গাপুরের জঙ্গলে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

সহবাস-সম্মতির বিরুদ্ধে তিনি মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কারণ ঐ ভলান্টিয়ারদের উৎপাত। ১৮৫৬খ্রীষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন হয়, আর সহবাস-সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে তিনি মত দেন ১৮৯১-তে। পঁয়ত্রিশ বৎসর পরের কথা। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি দেখেছেন, ইংরেজ আর সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বের স্বভাবে নেই। পাশ্চাত্য চিন্তা দিয়ে তারা এখন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সংস্কার অর্থে তো উচ্ছেদ নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বণিক ইংরাজ যে কারণেই হোক দেশের সঙ্গে মিলে মিশে মঙ্গলের কথা চিন্তা করত। এখন সে স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে। যারা বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন করতে চায় নি, তারা এখন এরূপ আইন চায় কেন। একদিকে ইংরেজ অন্যদিকে 'ইয়ং বেঙ্গল' এবং সুরেন্দ্র সমিতি উভয়কেই তিনি সমাজ সংস্কারের ভলান্টিয়ার বলে মনে করেছেন। সমাজের মধ্যে না থেকে সমাজ সংস্কার করবার অর্থ সমাজকে আঘাত করা। যে-কারণেই তিনি সমাজকে ছেড়ে দিতে চান না। ঐ একই কারণে মিস্ কার্পেন্টারের স্ত্রী শিক্ষালয়কে তিনি সমর্থন করেন নি। ঐটিও মিশনারীর অনুপ্রেরণা।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এই নীতিই তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করত, চরিত্রকে সংহত এবং সংযত করেছিল।

হিন্দু কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার কারণও তো তাই।

যে-কোন কর্মীকেই একটা কর্মনীতি স্থির ক'রে নিতে হয়। মহান কর্মীরা অনেক প্রচেষ্টার এই নীতি খুঁজে পান। উত্তম কর্মীরা জীবন সুরু থেকেই পেয়ে যান। বিদ্যাসাগর যেন এইরূপ ঈশ্বর প্রদত্ত নীতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতির সঙ্গে যেখানেই বিরোধ হয়েছে সেখানেই তিনি পরিত্যাগ করেছেন। অধ্যক্ষের পর পরিত্যাগ করার পিছনেও এই নীতি কাজ করেছে।

বেনারস গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের উপর খবরদারীর ভার দিতে চেয়েছিল সরকার, বিদ্যাসাগর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। মানেন নি তাঁর কথা। ১৮৫৮ সালের ৭ই মে তারিখে বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে সাহায্য দান নিয়ে সরকার সোদমাস সুরু করলেন। বিদ্যাসাগর তার আগেই বহু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। অনেক ধার-সিদ্ধান্তের পর পুরনো পাওনা ৩৪৩৯৶৪ টাকাই মঞ্জুর করলেন। স্থায়ী

সাহেবকে আর কাছে চাইলেন না। তারপর দক্ষিণ বাংলার ইন্সপেক্টর অব্ স্কুল পদটিতে তাঁকে নেওয়া নিয়ে নানা আপত্তি। কয়েকবারই তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয় নি। লয় সাহেবকে সেই পদে নিযুক্ত করা হয়। ইংরেজের মহিমার প্রকাশ তিনি দেখতে পেলেন। কোথায় তাঁর অপরাধ খুঁজতে চেষ্টা করলেন। পদোন্নতি নেই। তারপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিয়োগ ব্যাপারে শিক্ষা-বিভাগের নূতন ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে মত বিরোধ। 'দেখিয়াছি পদোন্নতির আর কোন আশা নাই, কারণ আমার স্থায় যাহা একাধিকবার উপেক্ষিত হইয়াছে।' তারপর, অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপার। যে বিদ্যাসাগর হ্যালিডে সাহেবকে লিখতে পারেন (ইনস্পেক্টর অব্ স্কুল পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনায়) 'সংস্কৃত কলেজে আমার পদে যাঁহাকে আনা হইবে, তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে আমার সহিত যেন পরামর্শ করা হয়, কেন-না যে-সকল ব্যক্তির মধ্য হইতে নির্বাচন করা হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই, আমার মনে হয়, কে ঐ পদের উপযুক্ত সে সম্বন্ধে আমিই ঠিক কথা বলিতে পারিব।' তিনি সংস্কৃত কলেজের উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করতে অক্ষম, একথা ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি। গর্ডন ইয়ং বাদ সাধলেন। কারণ তিনি ওকে সাহেব ভাতে ডি. পি. আই।

'—বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অধ্যাপক নেন নি কেন?'

—বিজ্ঞাপন না দিয়েও উপযুক্ত লোক নেওয়া হয়েছে।

—তাঁরা উপযুক্ত হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের চেয়েও উপযুক্ত লোক থাকতে পারেন।

ব্যাপারটা শুনতে খুব গণতান্ত্রিক। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন না দিয়ে লোক না নিলে এখন যা আমরা মনে করি। কিন্তু ভাবতে হবে, বিদ্যাসাগরের কথা। বাংলাদেশের এমন অধ্যাপক নেই যাঁদের নাড়ীর খবর তিনি না রাখতেন। না হয় ডিস্ট্রিক্টই কি একমাত্র উপযুক্ততা? না, ইন্টারভিউ আছে, অর্থাৎ গোষ্ঠীগত আক্রমণ। কিন্তু এমন তো দেখা গেছে, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইচ্ছা করলে সেই ইন্টারভিউ বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। এ ব্যাপার তো এখনও হামেশা হয়। যার জন্য সর্বভারতীয় চাকরীর ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশ কোটা ব্যবস্থা করতে চায়। ফলত, আইনের পথে মানবসমাজে যত কারসাজি হয় এমন আর কিছুতে নয়। এই কারসাজি করার উদ্দেশ্য নিয়ে গর্ডন ইয়ং-ই শিক্ষাবিভাগে প্রথম ঢুকেছিলেন। বিদ্যাসাগর সেই উদ্দেশ্য বুঝেছিলেন। দেশের কল্যাণ ছাড়া যারা গোষ্ঠীর কল্যাণ বোঝে তাদের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা করতে চান নি। এই ব্যাপারটি আরও বোঝা যায়, মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ না করতে পারে আশঙ্কায় সিণ্ডিকেটের সভ্য বেথি সাহেবকে যে চিঠি লেখেন তা থেকে। সে পথে প্রধান বাধা ছিল 'মেটিত' অধ্যাপক নিয়োগ করায়। ১৮৭২ সালের চিঠি :

"I would take the liberty to remind you that the Sanskrit College, which teaches upto the B. A. standard, has an exclusively native staff, and that our Professors would be drawn from the same class of men. We feel confident, that native Professors, if selected with care and judgement, would be found quite competent.....and as I have spent, I may say, my whole life in managing schools, I hope you allow me to exercise my own discretion in selecting Professors and regulating their pay....." ১৮৭৪ সালের এফ. এ. পরীক্ষায় যোগেন্দ্র বসু মেট্রোপলিটন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাই দেখে রেভিট্টার সাট্‌ক্লিফ বলেছিলেন, "The Pandit has done wonders."

যাই হোক, এই চিঠি থেকেই ইংরেজের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় কি চেয়েছিল। ইংরেজই হোক আর দেশীয় সাহেবই হোক গোষ্ঠীচক্র রচনা করে দেশকে প্রশিক্ষিত করাই তাদের একমাত্র ব্যবসায়। 'হাবার' কথা থেকে যদি 'সাহেব' এসে থাকে তবে তার অর্থ 'সাথী'। কিসের সাথী? যে-কোন সাহেবই দেশের অকল্যাণ করে থাকে। কারণ, তারা সুবিধাভোগীর দল বৃদ্ধি করতে চায় না। অনেক লোককে কানায় না ফেললে সাহেবেরা পা-ফেলার যায়গা পান না। এমন অবস্থায় যদি সহবাস-সম্মতি আইনে বা কার্পেন্টারের আন্দোলনে বিদ্যাসাগর সম্মতি না দিয়ে থাকেন তবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রানুগই তা হয়েছে। স্ববিরোধী স্বভাব নয়।　　(ক্রমশঃ)

কি আর কী

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

'কী' বানান চলিবে কি না এবং চলিলে কোথায় চলিবে, দেখা যায় আজিও এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ প্রকাশিত বাংলা পাঠ্যপুস্তকে 'কী' বানান যথোচিত মর্যাদা পাইয়াছে বটে, কিন্তু পর্ষদের পরীক্ষা-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীতে 'কী' বানান অস্তাবধি অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া রহিয়াছে। ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ রহস্যজনক। ব্যুৎপত্তি-নির্ধারণকল্পে বিশেষ ভাবে প্রশ্নপত্রেই 'কী' বানানের প্রয়োজন সর্বাধিক। বোধ হয় প্রশ্নকর্তারা এ বিষয়ে প্রাচীনপন্থী। প্রাচীনপন্থীরা সর্বত্রই 'কি' লিখিয়া থাকেন, 'কী' বানানকে তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেছেন না।

প্রাচীনপন্থীদের যুক্তি—

(১) 'কী' দ্ব্য বানান, সংস্কারবিদ্যাপীঠের উৎকট সৃষ্টি।

(২) সংস্কৃত 'কিম্' শব্দ হইতে আগত, অতএব 'কি' বানানই সঙ্গত।

(৩) দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য যা হয় 'কী' লেখা গেল কিন্তু প্লুত উচ্চারণ কেমন করিয়া বুঝানো যাইবে? অতএব হ্রস্ব-ই কে দীর্ঘ-ঈ করার কোনো সার্থকতা নাই।

(৪) একই বানানে শব্দের বহু অর্থ হইতে পারে—প্রসঙ্গ অনুধাবন করিয়াই শব্দের অর্থ বিচার করিতে হয়।

এই যুক্তিগুলির সারবত্তা বিচার করা যাক।

(১) 'কী' নব্য বানান নহে। অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ এই বানান প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু সে ধারণা ঠিক নহে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'কী' বানানের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি-পদাবলীতে, গোবিন্দদাসের পদাবলীতে, মহাভারতপুরাণে, পদ্মাপুরাণে 'কী' শব্দের অজস্র প্রয়োগ আছে। অতএব 'কী' বানান নূতন নহে। অবশ্য একথা সত্য, প্রাচীন পদকর্তারা নির্বিচারে 'কি' ও 'কী' ব্যবহার করিয়াছেন—কোনো প্রকার অর্থবৈলক্ষণ্য দেখান নাই। বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথই অর্থপার্থক্য দেখাইয়া 'কী' বানান প্রচলন করিয়াছেন।

(২) সংস্কৃত 'কিম্' শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়াই

'কি' বানানে সর্বদা হ্রস্ব-ই ব্যবহার করিতে হইবে, এই যুক্তির খুব একটা সার্থকতা নাই। সংস্কৃত 'কীদৃক্, কীদৃশ' প্রভৃতি শব্দও 'কিম্' শব্দ হইতে আগত, অতএব বাংলা 'কী' বানানে তেমন কোনো দোষ দেখা যায় না।

(৩) লৈখিক ভাষার বর্ণবিন্যাসে হ্রস্ব-ই ও দীর্ঘ-ঈ'রই ব্যবস্থা আছে, প্লুত উচ্চারণের জন্ত কোনো বর্ণ সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং প্লুত উচ্চারণের সমস্যা আসে না। 'হরি, মতি, কেষ্ট, হলা, মথা, কানু, বানু, মুরো, কে, ওরে, ওগো' প্রভৃতির প্লুত উচ্চারণের জন্ত যখন বিশেষ বানানের দুশ্চিন্তা কাহারও নাই, তখন 'কি' আর 'কী'র প্লুত উচ্চারণের জন্তও দুর্ভাবনা না করিলেই চলিতে পারে।

(৪) "মত মন্দো, ভাল ভালো, করে ক'রে, হল হ'ল" প্রভৃতি বানানে ও-কার বা ইলেক না দিলেও হয়তো বহু স্থলেই প্রসঙ্গ দেখিয়া শব্দের অর্থবোধ হইতে পারে, কিন্তু 'কি' আর 'কী' সে শ্রেণীর শব্দ নহে। উচ্চারণভঙ্গিতে শব্দ-দ্বয়ের অর্থপার্থক্য যত স্পষ্ট, লেখার বানানের পার্থক্য না ঘটাইলে অর্থপার্থক্য তত স্পষ্ট করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। 'তুমি কি খাবে? সে কি পাখি পোষে? জলে কি রঙ আছে? পূজার জন্ত কি ফুল আনা হয়েছে? আজ বাড়িতে কি রান্না হয়েছে?' প্রভৃতি বাক্যে অর্থ স্পষ্ট নহে। 'তুমি খাবে কি না, কিংবা কোন্ বস্তু খাবে? সে পাখি পোষে কি না, কিংবা কোন্ পাখি পোষে? জলে রঙ আছে কি না কিংবা কোন্ রঙ আছে? পূজার জন্ত ফুল আনা হয়েছে কি না, কিংবা কোন্ ফুল আনা হয়েছে? আজ বাড়িতে রান্না হয়েছে কিনা, কিংবা কোন্ বস্তু রান্না হয়েছে?' ইত্যাদি দুই প্রকার অর্থই হইতে পারে। কিন্তু 'কি' আর 'কী' দুই প্রকার বানান প্রচলিত থাকিলে অর্থবোধে কোনো অসুবিধা হয় না।

প্রাচীনপন্থীদের যুক্তি প্রায় খণ্ডন করা গেল, কিন্তু যাঁহারা সংস্কার-বিরোধী নহেন তাঁহাদের সঙ্গেও আলোচনা আবশ্যক।

আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান 'চলন্তিকা'। চলন্তিকায় 'কী' শব্দ আছে, কিন্তু অর্থ দেওয়া হইয়াছে—'বেশী জোর দিতে', যথা—'কী সুন্দর! তোমার কী হয়েছে!'

আরও কোনো কোনো অভিধানে এই জাতীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা আমিরা লইতে পারিতেছি না। বাংলায় আমরা শুধু 'কি' শব্দের উপরই জোর দিই না—অন্যান্য শব্দের উপরও জোর দিয়া থাকি; কিন্তু সেজন্ত ঐ সমস্ত শব্দের বানান-পরিবর্তন আবশ্যক হয় না, কেবল 'কি' শব্দের বেলায়ই বানান-পরিবর্তন হইবে কেন? 'তুমি খেয়েছ কি না' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমরা বলি, 'তুমি কি খেয়েছ?'—জোর দেওয়া হয় 'খেয়েছ' শব্দের উপর। কিন্তু তুমি যদি উত্তর না দেও, কিংবা উত্তর দিতে বিলম্ব কর, তখন বিরক্ত হইয়া একই প্রশ্ন একটু পালটাইয়া বলি, 'তুমি খেয়েছ কি?'—এবার জোর দেওয়া হয় 'কি' শব্দের উপর। এইজন্ত যদি 'কি' শব্দের বানান বদলাইতে হয়, তাহা হইলে 'তুমি' শব্দের উপর জোর দিলে 'তুমি' শব্দেরও বানান বদলাইতে হয়। অতএব 'বেশী জোর দিতে দীর্ঘ-ঈকার'—এই যুক্তি অচল।

জোর দেওয়ার জন্ত বানান-পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই, কিন্তু অর্থভেদে বানান-পরিবর্তন আবশ্যক। পূর্বেই বলিয়াছি 'কী' প্রাচীন পদাবলীর বানান হইলেও আধুনিক যুগে এই বানান প্রচলিত করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এই বানান সম্বন্ধে যে নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাই যুক্তি-সঙ্গত বিচার। রবীন্দ্রনাথের কথাই উদ্ধৃত করি—

"প্রশ্নসূচক অব্যয় 'কি' এবং প্রশ্নসূচক সর্বনাম 'কী' উভয়ের কি এক বানান থাকা উচিত?

আমার মতে বানানের ভেদ থাকা আবশ্যক। একটাতে হ্রস্ব-ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ-ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝবার সুবিধা হয়। 'তুমি কি রাঁধছ?' 'তুমি কী রাঁধছ?'—বলা বাহুল্য এদুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র। 'তুমি রাঁধছ কি না' এবং 'তুমি কোন্ জিনিস রাঁধছ'—এ দুটো প্রশ্ন একই নয়, অথচ এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের বহর বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে।"

অর্থাৎ শব্দটি অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হইলে বানান হইবে 'কি'; সর্বনাম বা সর্বনামজাত বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে বানান হইবে 'কী'।

গ্রামের বিদ্যালয়ে পি-কক্ রীডার পড়াইবার অসুবিধা

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

ইংরাজী আমাদের পাঠ্যতালিকায় দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা। প্রত্যেক দেশেই ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া একটি বিদেশী ভাষা শিখিতে হয়। সেইদিক হইতে ইংরাজীই আমাদের শিক্ষণীয় বিদেশী ভাষা হওয়া উচিত। কারণ বিদেশী যত ভাষা আছে, তাহাদের মধ্যে ইংরাজীই সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ভাষা এবং ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে ইংরাজী শিখাটা অধিকতর সহজ। তাহা ছাড়া ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশে বহুদিন যাবৎ প্রচলিত হওয়ার জন্য ইহা যেন আমাদের কাছে প্রচলিত ভাষার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন হইতে পারে না। ইংরাজী আমাদের জাতীয় ভাষাও হইতে পারে না। কিন্তু ইংরাজীকে অবহেলা করা চলে না। তাহার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে।

স্বাধীনতার পর হইতে আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের যে জাতীয়তা বোধ ছিল, তাহা যেন আজ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমরা যেন পূর্বাপেক্ষা বেশী পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি। উচ্চ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা যেন আরো বেশী পাশ্চাত্য সমাজের অনুগামী হইতেছেন। তাঁহারা সাক খান, ডিনার খান, Cocktail Partyতে যোগ দেন। এই পাশ্চাত্য ধারাকে অনুকরণ করাই যেন তাঁহাদের জীবনের ধর্ম্ম, জীবন যাত্রার এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমের ফলে তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের English medium স্কুলে পড়িতে পাঠান। কলিকাতায় দেখা যায় স্বাধীনতা অর্জনের পরে কত ইংরাজী medium স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্কুল ভাল কি মন্দ, এই সকল স্কুলের ছেলেমেয়েরা পাশ্চাত্য মনোভাব লইয়া গড়িয়া উঠিবে কিনা, এই সকল তাঁহারা ভাবেন না। আসল কথা, তাঁহারা ছেলেমেয়েদের ইংরাজী medium স্কুলে পড়াইবেন। বস্তুতঃ এই মনোভাব যেন আজকাল সহর ছাড়াইয়া মফস্বলেও দেখা দিতেছে।

সমাজের উচ্চ স্তরের ব্যক্তিরা সাধারণতঃ মাতৃভাষা বাহন বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পড়িতে পাঠান না। সরকার ও ইংরাজী medium স্কুলগুলির প্রতি বেশী নজর দিয়া থাকেন। ইহা ঠিক, যে সকল ছাত্রেরা এখানে পড়ে, তাহারা

ভাল ইংরাজী লিখে। তাহারা তাড়াতাড়ি ইংরাজীতে কথা বলিতে পারে, তাহারা শুদ্ধভাবে ইংরাজী লিখিতে পারে, তাহাদের উচ্চারণ (Pronunciation) ও ধ্বনিভঙ্গী (intonation) ত্রুটীমুক্ত হয়। কারণ এখানে ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকারা শিক্ষা দিয়া থাকেন। মাতৃভাষা বাহন স্কুলে ইংরাজী শিক্ষার মান এত উচ্চস্তরের হয় না। সহরাঞ্চলে ও কোন কোন স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা দানের যোগ্য, অভিজ্ঞ (able, qualified and experienced) শিক্ষক আছেন এবং তাঁহাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি ইংরাজী medium স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকার চেয়ে কম নয়। অবশ্য, এই সকল স্কুলের শিক্ষকদের অনেক অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। শ্রেণীগুলি সাধারণতঃ ছাত্রবহুল (over crowded) থাকে, ছাত্রদের মান গড়ে ভাল থাকে না, ইংরাজী medium স্কুলের ছাত্রদের মত ইংরাজী শিখিবার তত ঝোঁকও থাকে না।

কিন্তু তথাপি সহরাঞ্চলের স্কুলগুলি অপেক্ষা পল্লী অঞ্চলের স্কুলগুলিতে আরো অনেক বেশী অসুবিধা থাকে। সহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে শিক্ষার মান পল্লী অঞ্চলের স্কুলগুলি অপেক্ষা অনেক উন্নত থাকে। তাহার কারণ গ্রামের স্কুলের অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেখানে ইংরাজী শিক্ষার মান খুবই নিচু; কোন মানই নাই বলা যাইতে পারে। তথাপি সহরাঞ্চল ও পল্লী অঞ্চলে সকল স্কুলে একই মানে (standard) ও একই পদ্ধতিতে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পি-কক্ রীডার নামক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশিত করাইয়াছেন এবং এই পুস্তককে অবিবার্য পাঠ্যপুস্তক করিয়াছেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় এই বই যেভাবে লিখিত হইয়াছে তাহা পড়াইবার উপযুক্ত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের প্রতি যত্নবান হইতেছেন না। এইদিকে সরকারের দৃষ্টি আদৌ আকর্ষিত হয় নাই। পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি তো একেবারেই অবহেলিত।

পল্লী অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা যাহারা বিদ্যালয়ে পড়ে তাহারা অধিকাংশই অশিক্ষিত, নিরক্ষর কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়ে। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা পল্লীগ্রামের কৃষকদের মধ্যে এতো বেশী যে, তাহাদের ছেলেমেয়েদের বাংলা শিখানোর প্রতিই তেমন কোন আগ্রহ নাই, ইংরাজী শিখানো তো দূরের কথা। এই সকল পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার কোন অনুকূল আবহাওয়া পায় না। পল্লীতে মাট্রিক পাশ ছেলে দুএকজন পরিবারেই আছে, তাহাদেরও Peacock Reader পড়াইবার মত যোগ্যতা নাই। এই বই পরিমিত শব্দ বিন্যাসে (controlled vocabulary) ও নিয়ন্ত্রিত শব্দ গঠনে (graded structure) লিখিত। এই বই পড়াইবার সময় শিক্ষকের ক্লাসে ইংরাজীতে কথা বলিয়া পড়াইতে হইবে। এবং ছেলেমেয়েদের ইংরাজীতে কথা বলিতে শিখাইতে হইবে। কয়েকটি sentence structure লইতে হইবে এবং অনবরত তাহা প্রয়োগ দ্বারা (drilling) ছাত্রদের ইংরাজী grammar ও sentence structure শিখাইতে হইবে, যাহাতে বার বার drilling এর ফলে ইংরাজী grammar ও syntax এর বিশ্লেষণ না শিখিয়া অজ্ঞাতভাবে ইংরাজীর মূলনীতি সকল শিখিতে পারে। পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয় গুলিতে তাই, Peacock Reader পড়াইবার অসুবিধা। প্রথম অসুবিধা, ছাত্রেরা নিরক্ষর। যদি ইংরাজী ক্লাশে আগাগোড়া ইংরাজী বলা যায়, তবে ছেলেরা কিছুই বুঝিবে না। তাহাদের চাহনি ফাঁকা হইবে, যত সহজ ইংরাজীতেই তা বলা হোক না কেন। তাহার কারণ ছেলেরা ইংরাজী শুনিতে অভ্যস্ত নয়। দাগাদিনের মধ্যে সাধারণতঃ ইংরাজী শিখানোর জন্য ৩০ মিনিটের এক পীরিয়ড নির্ধারিত

থাকে। অন্যান্য বিষয় সকল বাংলার মাধ্যমে শিখানো হয়। এরজন্য ছেলেরা ইংরাজী শুনে বা কথা বলিবার সুযোগ পায় দিনে এক বা দুই পীরিয়ড। এই ৪০ মিনিটের এক বা দুই পীরিয়ডের মধ্যে ইংরাজী ভাষার সঙ্গে উচ্চারণ, স্বরভঙ্গী ইত্যাদির সব রকমের পরিচয় করা একান্তই অসম্ভব। তাহারা বাড়ীতেও কাহাকে ইংরাজী বলিতে শুনে না। যখন তাহারা নিজেরা কথা বলে, তখন কখনও তাহারা কেহ ইংরাজীতে কথা বলে না। ইহা তারা অসঙ্গত যে তাহারা ইংরাজীতে কথা বলিবে, সংবাদপত্র পড়িবে। তাহারা পাঠ্য বইয়ের বাহিরে কোন ইংরাজী বই পড়ে না, ছোট ছোট ভাল ভাল ইংরাজী বই তাহাদের পড়িতে দিয়া দেখা গিয়াছে, খুব অল্প ছেলেই সেই সব বই পড়ে। উপযুক্ত যোগ্য শিক্ষকের অভাব যথার্থই বড় সমস্যা। এই সমস্যাই আজ প্রায় সকল স্কুলে। গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে ইহা বড় সমস্যা। Peacock Reader ক্রমানুসারে শব্দে সাজান এবং নিয়ন্ত্রিত শব্দকোষে (graded structure and controlled vocabulary) লিখিত, সেইজন্য যাহারা এই পদ্ধতিতে পাঠদানে শিক্ষণ প্রাপ্ত এমন যোগ্য শিক্ষকের দ্বারা এই বই পড়াইতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার শিক্ষক গ্রামে পাওয়া খুবই দুষ্কর। ইহা কেবল সহরের ইংরাজী medium স্কুলেই সম্ভব হয়। অতএব সেখানে এই বই ভালরূপে পড়ানো হইয়া থাকে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এই বই কিভাবে পড়ানো হয় তাহা সকলেই জানেন। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, Peacock Reader-এ অনুসৃত নিয়ন্ত্রিত বাক্যগঠন প্রণালী (graded structure method) জানিয়া এই বই মোটেই পড়ানো হয় না, কারণ এই প্রণালীতে পড়াইবার যোগ্য শিক্ষক নাই। এই বই শিক্ষকগণ যেভাবে পড়াইয়া থাকেন তাহা হইল এই যে, ছাত্ররা কঠিন, অজানা শব্দগুলির বাংলা অর্থ ছেলেদের বলিয়া দেন, Important passage-এর বঙ্গানুবাদ করেন। আগাগোড়া সমস্ত পাঠদানই বাংলায় দিয়া থাকেন। শিক্ষকগণের ইংরাজী জ্ঞান কম থাকায় তাঁহারা ক্লাসে ইংরাজীতে কথা বলিতে পারেন না। যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইংরাজী বলেন, তাহাও ছেলেরা বুঝিতে পারে না। শিক্ষকগণ ইংরাজী ক্লাসে এত বেশি বাংলা বলিতে থাকেন, যে ইহা কি ইংরাজী ক্লাস না বাংলা ক্লাস তাহা ধরা যায় না। সুতরাং কোন প্রস্তাবই যেন পরিলক্ষিত হয় না। ক্লাসে একটা ইংরাজী শব্দকে যত নানাভাবে প্রয়োগ করিয়া যায় বার শিখানো যায় (drilling) ততই ভাল। এই ভাবে drilling করিয়া পড়াইতে হইলে ইংরাজী ভাষার উপর সম্পূর্ণ দখল থাকা দরকার। কিন্তু এই সকল শিক্ষকের নিকট হইতে তাহা আশা করা যায় না। যোগ্য শিক্ষকের অভাবই সবচেয়ে বড় বাধা। আমরা যদি উচ্চ বিদ্যালয় ও বহুমুখী বিদ্যালয়গুলির দিকে তাকাই সেখানেও দেখিতে পাই সেইসব স্কুলে Class V-এ ইংরাজী সাধারণতঃ এমন শিক্ষকের দ্বারা পড়ানো হয়, যাহারা উহা পাঠদানে মোটেই যোগ্য নন। Class III, IV ও V-এ পাঠ্য ইংরাজী বই Peacock Reader কেবলমাত্র দক্ষ শিক্ষকগণ (expert teachers) পড়াইতে পারেন। এই বই শিক্ষাদানে এক শব্দ বিভিন্ন রকমে প্রয়োগ করিয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া (drilling) পড়ানো অত্যন্ত আবশ্যক। এই drilling-এর উপরেই সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হইবে। কিন্তু বালক বালিকাদের কেবলমাত্র চিরাচরিত প্রথায় অনুবাদ পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। প্রথমত উচ্চারণ ও স্বরভঙ্গীর উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া সাধারণ পাঠদান (General Reading) দেওয়া হয়। শিক্ষকরা অনেকেই জানেন না, কি ভাবে ইংরাজী শব্দ শুদ্ধ করিয়া ও উপযুক্ত স্বরভঙ্গী দ্বারা উচ্চারণ করিতে হয়। অনেক স্কুলেরই উচ্চারণ ও

স্বরভঙ্গী শিখাইবার জন্য Lingnaphone-এর সদ্ব্যবহার নাই। এই যন্ত্রে disk record-এ lesson করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায়। [redacted] আমাদের পল্লী গ্রামের শিক্ষকরা Peacock Reader পড়াইতে যাইয়া প্রথমত ক্লাশে reading পড়েন। তারপর word meaning ছাত্রদের বলিয়া দেন। সমস্ত পাঠের বাংলা অনুবাদ করিয়া যান, পরে কিছু কিছু কঠিন প্রশ্নের বাংলাতে আলোচনা করেন। এইভাবে পাঠের সমাপ্তি হয়।

গ্রামের বাড়ীতে নিরক্ষরতা, উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাব, বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষকের অভাব, শ্রেণীকক্ষে পাঠানুরাগের অনীহা, শিক্ষা প্রণালীর পার্থক্য গ্রামের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষার পিছনের কারণ। ফলে, ছাত্ররা ইংরাজীকে ভয়ের চোখে দেখে। ইংরাজীই তাহাদের ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ইংরাজী তাহাদের দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা। তাহার জন্য তাহাদের পরিশ্রমের অন্ত নাই। তাহারা সমস্তের শেষে তাহাই ইংরাজী শিক্ষার জন্য বাদ করে তথাপি দেখা যায়, ইংরাজীতেই তাহারা বেশী ফেল করে।

উপরোক্ত কারণগুলির সঙ্গে আরেকটি কারণও যোগ করা যাইতে পারে যাহা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। ইহা হইল অযোগ্য শিক্ষকের দ্বারা ছেলেদের ইংরাজী প্রাইমেটে পড়ানো। পল্লী গ্রামের পক্ষে ইহা অতীব সত্য কথা। যোগ্য শিক্ষক বলিতে আমরা যাহা অর্থ করিয়া থাকি, সেই রকম শিক্ষক বস্তুত কম আছেন। তাই অনুপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা আমাদের ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষা দিতে হয়। আপনারা জানেন কি রকম খারাপ শিক্ষা তাঁহারা দেন। আজকাল প্রাইমেটে টিউশনি একটা বড় লোভনীয় ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যাহারা শিক্ষক নন, যেমন কয়লিক ও অন্য সকল, তাঁহারা এই লোভনীয় ব্যবসায় লিপ্ত থাকেন। শুনিলে হাসি পায়, যে এমন কি দোকানদারেরা এই ইংরাজী বই পড়াইতেছেন। 'শিক্ষা' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কি তাহাদের নিকট হইতে আশা করা যায়। গ্রামে এই ধরণের Peacock Reader পাঠদান প্রায় সর্বত্রই হইতেছে।

এখন কথা হইল কি করিয়া এই ত্রুটি দূর করা যায়। এই ত্রুটি সমাধান করিতে হইলে সরকারকে পল্লীগ্রামের স্কুলগুলির উপর সবিশেষ যত্নবান হইতে হইবে। দ্বিতীয়ত ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত যোগ্য শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। এই শিক্ষকেরা শুধু ক্লাশে ইংরাজীই পড়াইবেন। তাঁহাদের একটি কার্যবিবরণী থাকিবে। তাঁহাদের শিক্ষণের জন্য শিক্ষণকেন্দ্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্কুল, কলেজ বন্ধের সময় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দ্বারা শিক্ষণ দিতে হইবে। হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ইংরাজী শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শক-দের দ্বারা এই শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষা দান করিতে হইবে, প্রত্যেক স্কুলের জন্য সরকার একটা Ligoaphone-এর ব্যবস্থা করিবেন। বিশ্লিষ্ট পঠন প্রণালীর শিক্ষা জোর করিয়া চাপানো হইবে না। যে কোন পদ্ধতিতে শিক্ষা উচ্চ স্তরের মধ্যবিত্ত সহরের ছেলেমেয়েদের অনুকূল হইবে তাহা পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র নিরক্ষর পিতামাতার সন্তানের পক্ষে কিছুতেই উপযুক্ত হইতে পারে না। তাই পল্লী অঞ্চলের স্কুলগুলির জন্য পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা পরিবর্তন করিতে হইবে। সর্বশেষে ক্লাশ দুই ছোট হইবে যাহাতে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া যায়। যাহারা ইংরাজী শিক্ষাদানে শিক্ষণ লাভ করিয়া যোগ্য হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা ছেলেদের ইংরাজী প্রাইমেটে পড়াইতে হইবে। অন্য কাহারো দ্বারা নয়। সময় একদিন আসিবে যখন সরকার এই বিষয়ে বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ করিবেন। আমরা চাই, দেশের ইংরাজী শিক্ষা উন্নতি লাভ করুক, তবে গ্রামের বিদ্যালয়ের বিপুল ছাত্র সংখ্যাকে বলি দিয়া আমরা ইংরাজী শিক্ষার উন্নতি চাই না, তাই তাহাদের সমস্যার কথাও ভাবা দরকার। সহরের সমস্যা আর গ্রামের সমস্যা এক নয়, অতএব সমাধানও ভিন্ন হইবে। সরকারী চালাও ব্যবস্থার দ্বারা কোন সুফল হইবে না। সরকার ও শিক্ষাবিদগণ এ বিষয়ে সচেতন হইতে অধিক বিলম্ব করিলে ক্ষতি আর সামলানো যাইবে না।

—•—